শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

প্রথম খণ্ড



মূল: ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী (রহ.)

ব্যাখ্যা: ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহ.)

شرح العقيدة الطحاوية

শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

(প্রথম খণ্ড)

المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي

মূল: ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

مُراجعة: الشيخ أجمل بن عبد النور

সম্পাদনা: শাইখ আযমল ইবনে আব্দুন নূর

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদি আরব।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

شرح العقيدة الطحاوية

المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

مُراجعة : الشيخ أجمل بن عبد النور

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

web:www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস:

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস:

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৭ ঈসায়ী

পুনঃপ্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৮ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুবাদকের ভূমিকা ১১

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৫

আল্লামা ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী রহিমাহুল্লাহ এর ভূমিকা ২১

নাবী-রসূলগণের আনুগত্য করা ওয়াজীব এবং তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য করাও ওয়াজীব ২৮

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, আমাদের জন্য তা যথেষ্ট ৩০

তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ ৩৫

১. মহান আল্লাহর তাওফীকের প্রতি অন্তর দিয়ে একান্ত বিশ্বাস রেখে তার তাওহীদ সম্পর্কে আমরা বলছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই ৩৭

তাওহীদুল উলুহীয়া এবং তাওহীদুর রুবুবীয়াহ ৪০

তাওহীদুল উলুহীয়া ছিল নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূলভিত্তি ৪৮

রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন, তার প্রকারভেদ ৫৯

২. তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই ৮৭

৩. কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না ১০৪

৪. তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই ১১০

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ব্যাখ্যা ১১২

৫. তিনি কাদীম তার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত-চিরন্তন, তার কোনো অন্ত নেই ১১৬

৬. তার ধ্বংস নেই, তিনি ক্ষয়প্রাপ্তও হবেন না ১২২

৭. আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া অন্য কিছু হয় না ১২৩

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রকারভেদ এবং সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও শরী'আতগত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য ১২৪

৮. কল্পনা ও ধারণাসমূহ তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারে না এবং জ্ঞান-বোধশক্তি তাকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে পারে না ১৩৪

৯. সৃষ্টির কোনো কিছুই তার সদৃশ নয় ১৩৬

১০. তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মারা যাবেন না, চির জাগ্রত, কখনো নিদ্রা যান না ১৪৩

১১. তিনি সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির প্রতি তার কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেন। কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই তিনি রিযিকদাতা ১৪৭

১২. তিনি নির্ভয়ে প্রাণ হরণকারী এবং বিনা ক্লেশে পুনরুত্থানকারী ১৪৯

১৩. সৃষ্টি করার বহু পূর্ব থেকেই তিনি তার অনাদি গুণাবলীসহ চিরন্তন-অবিনশ্বর সত্তা হিসাবে বিদ্যমান, আর সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কারণে তার এমন কোনো নতুন গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না। তিনি তার গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত, চিরন্তন ও চিরঞ্জীব থাকবেন ১৫১

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার ধারণা ১৫৭

১৪. সৃষ্টি করার পর তার গুণবাচক নাম খালিক (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি এবং সৃষ্টিজগৎ উদ্ভাবন করার কারণে তার গুণবাচক নাম বারী (উদ্ভাবক) হয়নি ১৬৬

১৫. আল্লাহ তা'আলা তখনো প্রতিপালন করার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যখন কোনো প্রতিপালিত সৃষ্টি ছিল না। তিনি তখনো সৃষ্টি করার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যখন কোনো প্রতিপালিত সৃষ্ট ছিল না ১৭৪

১৬. মৃতদেরকে জীবন দান করার পর যেমন তিনি জীবনদানকারী নাম ও বিশেষণে বিশেষিত ঠিক তেমনি তাদেরকে জীবনদান করার পূর্বেও তিনি এ নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপ তিনি সৃষ্টিকুলের সৃজনের পূর্বেই স্রষ্টা নাম ও গুণের অধিকারী ছিলেন ১৭৫

১৭. এটা এ জন্য যে, তিনি সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেক সৃষ্টিই তার মুখাপেক্ষী এবং সব কিছুই তার জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর প্রতিই মুখাপেক্ষী নন। তার মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ১৭৭

১৮. তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন ১৮৫

১৯. এবং তিনি তাদের জন্য তাক্বদীর বা সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ১৮৮

২০. তিনি তাদের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন ১৮৯

নিহত ব্যক্তিও তার জন্য নির্ধারিত সময়েই মারা যায় ১৯০

২১. সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তার কাছে গোপন ছিল না। এমনিভাবে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন ১৯৪

২২. এবং তিনি তাদেরকে তার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তার অবাধ্যচারণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ১৯৫

২৩. সবকিছু তার নির্ধারণ এবং ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়। তার ইচ্ছাই কার্যকর হয়, তার ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না ১৯৬

তাক্বদীর দিয়ে দলীল গ্রহণ করে কুফুরী ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অযৌক্তিক ১৯৮

২৪. আল্লাহ অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা, তাকে হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন ২০৩

২৫. আর সকলেই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে এবং সবাই তারই অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ২০৫

২৬. তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার বহু উর্ধ্বে ২০৬

২৭. তার ফায়ছালার কোনো প্রতিহতকারী নেই। তার হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তার নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই ২০৭

২৮. উপরে উল্লেখিত সব কিছুর উপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি যে, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে আগত ২০৭

২৯. নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নাবী এবং পছন্দনীয় রসূল ২০৮

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক ২১০

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা সম্পর্কে কিছু কথা ২১৩

নাবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য ২২৩

৩০. তিনি নাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নাবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রসূলগণের নেতা এবং সৃষ্টিকুলের রবের হাবীব-বন্ধু ২২৫

নাবীদের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে কিছু কথা ২২৭

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হাবীব-বন্ধু ২৩৩

ভালোবাসার স্তরসমূহ ২৩৮

৩১. তার পরে যেসব লোক নবুওয়াতের দাবি করবে, তাদের প্রত্যেকের দাবি ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয় ২৪০

৩২. তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতি সহকারে সমস্ত জিন ও মানুষের প্রতি প্রেরিত ২৪২

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাত বিশ্বজনীন ২৪৩

৩৩. নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কথা বা কালাম, মানুষের সৃষ্টিকর্তারই কালাম। আর তা কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না ২৪৭

আল্লাহর কালাম সম্পর্কিত মাস'আলায় আলিমদের মতভেদ ২৪৮

জান্নাতবাসীদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন ২৫৩

যারা কুরআনকে মাখলুক-সৃষ্ট বলে তাদের জবাব ২৫৫

আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব এবং বিরোধীদের জবাব ২৬৩

কুরআনকে যারা মাখলুক বলে, তারা কাফের ২৮৭

৩৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মানবীয় কোনো বিশেষণে বিশেষিত করবে, সে কাফের হবে। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরের চোখ দিয়ে এতে গভীর দৃষ্টি প্রদান করবে সে সঠিক শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর কাফেরদের মত কুরআনকে মানুষের কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে জানতে পারবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার গুণাবলীতে মানুষের মত নন ২৯১

৩৫. আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য ২৯৩

আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকারকারীদের দলীল ও তার জবাব ২৯৮

৩৬. পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ব্যতীত কারও পা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকতে পারে না ৩২০

৩৭. সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারিফাত ও ছ্বহীহ ঈমান হতে দূরে সরিয়ে রাখবে ৩২৪

কালামশাস্ত্রের অসারতা সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীর স্বীকারোক্তি ৩২৯

আক্বীদাহর ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিভ্রান্তির কারণ ৩৩৩

৩৮. ফলে সে কুফুরী ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যায়ন, স্বীকৃতি প্রদান ও অস্বীকৃতি, সন্দেহ-পেরেশান এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনিশ্চয়তার বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে না সত্যবাদী মুমিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবে ৩৩৫

৩৯. জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভের উপর ঐ ব্যক্তির ঈমান আনয়ন বিশুদ্ধ হবে না, যে কোনো ধারণার বশবর্তী হবে অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সে সাক্ষাতের তাবীল বা ভুল ব্যাখ্যা দিবে ৩৪১

আল্লাহর ছিফাত-গুণাবলী সম্পর্কে অনুমান ও ধারণা করে কথা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক ৩৪৪

التأويل শব্দের অর্থ ৩৪৯

৪০. যে ব্যক্তি রবের জন্য সুসাব্যস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তার সাদৃশ্য বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে ৩৫৪

আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুফুরী ৩৫৫

৪১. আমাদের মহান রব একক ও নজীরবিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তার গুণে ভূষিত নয় ৩৫৬

৪২. আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ-সরঞ্জাম, উপাদান-উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়ার অনেক উর্ধ্বে এবং সকল সৃষ্ট বস্তুকে যেমন ছয়টি দিক পরিবেষ্টন করে রাখে, দিকসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না ৩৫৮

যারা আল্লাহ তা'আলা থেকে দিক নাকোচ করার মাধ্যমে সৃষ্টির উপর তার সমুন্নত হওয়া নাকোচ করতে চায়, তাদের জবাব ৩৬৬

৪৩. আর মিরাজ সত্য ৩৭২

মিরাজের রাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে ছাহাবীদের মতভেদ ৩৭৬

মিরাজ স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল ৩৭৮

৪৪. আর হাউয যা আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার উম্মাতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, তা অবশ্যই সত্য ৩৮২

৪৫. আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা'আত সত্য। যা তিনি উম্মাতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। যেমনটি বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ৩৮৬

বিভিন্ন প্রকার শাফা'আতের বর্ণনা ৩৮৬

দুনিয়ার জীবনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসীলায় দু'আ করা ৩৯৭

৪৬. আল্লাহ তা'আলা আদম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য ৪০৪

৪৭. মহান আল্লাহ আদি থেকেই জানেন, সর্বমোট কত সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে আর কত সংখ্যক লোক জাহান্নামে যাবে। এ সংখ্যায় কোনো কমবেশি হবে না ৪১৮

৪৮. যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজসাধ্য করে দেয়া হয়েছে। শেষ কর্ম দ্বারা মানুষের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে ৪২০

৪৯. তাক্বদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি গোপন বিষয় ৪২৩

ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস সৃষ্টি করার তাৎপয ৪৩০

আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি কেন এটি করেছেন? ৪৫০

৫০. তাক্বদীর বিষয়ে যা জানা ও যার উপর ঈমান আনয়ন করা প্রয়োজন উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে তা বিবৃত হয়েছে ৪৫২

৫১. আর আমরা লাওহে মাহফুযে ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি কলমের উপর। আর যা আল্লাহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তার সবকিছুতেই আমরা বিশ্বাস করি ৪৫৪

কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি কি না এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ ৪৫৫

৫২. যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তা যদি সকল সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও রোধ করতে চায় তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না ৪৫৮

তাক্বদীর লেখার স্তরসমূহ ৪৫৯

আল্লাহর উপর ভরসা করা উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও চেষ্টা করার পরিপন্থী নয় ৪৬২

৫৩. যা বান্দার ভাগ্যে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে না। আর যা বান্দার ভাগ্যে লেখা

আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না ৪৬৪

৫৪. বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব হতে অবহিত রয়েছেন ৪৬৪

৫৫. আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, মারিফাতের মূলবস্তু এবং আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান ৪৬৮

তাক্বদীরের মূলনীতিসমূহ ৪৭১

৫৬. অতএব, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে এবং রোগাক্রান্ত অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে ৪৭২

অন্তরের জীবন, মরণ, রোগ ও সুস্থতা ৪৭৩

প্রকাশকের নিবেদন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোন শরীকও নেই। আর আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রীতি-নীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। এরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত ও সুপথ থেকে বিচ্যুত। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই অবস্থান জাহান্নাম।

পরিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদাহর উপর এ পর্যন্ত যতো কিতাব লেখা হয়েছে, তার মধ্যে ইমাম আবু জা'ফর আত-ত্বহাবী কর্তৃক লিখিত 'আল-আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া' নামক কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক আক্বীদাহর উপর লিখিত এ পুস্তকটিকে শাইখের নামের দিকে সম্বোধন করা এবং শুরুতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম আবু হানীফা এবং তার দু'সুযোগ্য শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের দিকে আক্বীদাহগুলোকে বিশেষভাবে সম্বোধিত করা হলেও এগুলো যে শুধু তাদেরই আক্বীদাহ তা নয়; বরং এগুলো দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামদেরও আক্বীদাহ। তাই সকল মাযহাবের আলেমগণই এ কিতাবটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং কতিপয় মাস'আলা ব্যতীত তাতে আলোচিত সকল বিষয়ই নিজেদের আক্বীদাহ বলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর ক্ষেত্রে এটি একটি প্রামাণ্য পুস্তক বলেই আলেমগণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে তা পাঠ করেন ও তাদের ছাত্রদেরকে পড়িয়ে থাকেন। এর রয়েছে ছোট বড় অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। **তার মধ্যে ইমাম ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র শাইখ ইবনে আবীল ইয্ আল হানাফী রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।**

আমরা **শারহুল আক্বীদাহ আত্-ত্বহাবীয়া** গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। হে আল্লাহ, যারা অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন তাদের উত্তম যাযা প্রদান করুন, তাদের পরিশ্রমকে ছ্বদাকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

প্রকাশক:
ডা. মো. মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ
পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

অনুবাদকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী-রসূলদের সর্বশেষ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তার পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের উপর। আর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে তাদের উপরও ।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম সঠিক ইসলামী আক্বীদাহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাক্কী জীবনের সম্পূর্ণ সময় মুশরিকদের বাতিল আক্বীদাহ বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এ পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ ইসলামে সঠিক আক্বীদাহ-বিহীন আমলের কোন মূল্য নেই।

আল্লাহ তা'আলা, তার দীন ও তার নাবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপরই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের সৌভাগ্য নির্ভর করে। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিই মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বান্দা যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রভুত্ব, ইবাদত, তার অতি সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করবে, ততক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে না। মানুষের মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব, তার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী, তার সৃষ্টি ও কর্মসমূহ, সৃষ্টির সূচনা, তার পরিসমাপ্তি, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাক্বদীর এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও তাতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগ্রত হয়, তার জবাবের জন্য স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বীদাহ অপরিহার্য। পৃথিবীতে মুসলিমদের বিজয়, সাফল্য, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভের মূলে ছিল তাদের সঠিক আক্বীদাহ-বিশ্বাস। যতদিন মুসলিমদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস সঠিক ও সুদৃঢ় ছিল, ততদিন তারা সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছে।

এ জন্যই কুরআন মানুষের আক্বীদাহ পরিশুদ্ধ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল আক্বীদাহর সংশোধন। তারা সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতেন, তা হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যসব বস্তুর ইবাদত বর্জন করা। মক্কাতে একটানা তেরো বছর অবস্থান করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আক্বীদাহ সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

কুরআন ও সুন্নাহ্য় আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম, সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। এগুলো বুঝার জন্য অহীর উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খিলাফতকালে সরকারিভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণ গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামী আক্বীদাহর উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে।

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তার কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, পরিণাম, ক্বিয়ামত, হাশর-নশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ জাতীয় অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র পথ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা ও আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বিবেক ও বোধশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। এ সব বিষয় চোখেও দেখা যায় না। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলেছে,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আশ-শূরা ৪২:১১)*।

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করাই সঠিক আক্বীদাহর উপর টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম।

কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব, তার গুণাবলী, আখিরাত এবং গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলিম দাঁড়িয়ে যান, তারা হলেন মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক দার্শনিকদের জবাব দিতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের যুক্তিগুলো ছিল তুলনামূলক দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সংশয় ও সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এমনসব জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করে, যার জবাব স্বয়ং কালামশাস্ত্রবিদগণ খুঁজে না পেয়ে নিজেরাই সংশয়ে পড়ে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহিমাহুল্লাহ) স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং অন্যান্য বিষয় সাব্যস্ত করতে গিয়ে কুরআন ও হাদীছের উপর বুদ্ধিভিত্তিক দলীলকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি স্বীকার করেন যে, তর্কবিদ্যার পদ্ধতি ও দার্শনিক উপস্থাপন প্রক্রিয়ার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায় এবং তৃষ্ণার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিই আমি নিকটতর পেয়েছি। তার সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শেষ বয়সে তর্কশাস্ত্রবিদদের পথ পরিহার করে সালাফদের নীতিতে ফিরে এসেছেন। ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তর্কশাস্ত্র, দর্শন, সুফী তরীকা এবং যুক্তিবিদ্যাসহ

জ্ঞানের সকল শাখাতেই তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। শেষ জীবনে এসে তিনিও নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর পথে ফিরে এসেছেন। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ছ্বহীহ বুখারী বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

পরিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদাহর উপর এ পর্যন্ত যতো কিতাব লেখা হয়েছে, তার মধ্যে ইমাম আবু জা'ফর আত-ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক লিখিত 'আল-আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া' নামক কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক আক্বীদাহর উপর লিখিত এ পুস্তকটিকে শাইখের নামের দিকে সম্বোধন করা এবং শুরুতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং তার দু'সুযোগ্য শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর দিকে আক্বীদাহগুলোকে বিশেষভাবে সম্বোধিত করা হলেও এগুলো যে শুধু তাদেরই আক্বীদাহ তা নয়; বরং এগুলো দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামদেরও আক্বীদাহ। তাই সকল মাযহাবের আলেমগণই এ কিতাবটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং কতিপয় মাস'আলা ব্যতীত তাতে আলোচিত সকল বিষয়ই নিজেদের আক্বীদাহ বলে এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর ক্ষেত্রে এটি একটি প্রামাণ্য পুস্তক বলেই আলেমগণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে তা পাঠ করেন ও তাদের ছাত্রদেরকে পড়িয়ে থাকেন। এর রয়েছে ছোট বড় অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। **তার মধ্যে ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) এর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।**

আবু মানসূর আল মাতুরীদির অনুসারীগণও আক্বীদাহ ত্বহাবীয়ার একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তারা আল্লামা ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পরিশুদ্ধ আক্বীদাহগুলোর অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন এবং তা টেনে-হিচঁড়ে নিজেদের ভ্রান্ত মাতুরীদি ও আশ'আরিয়া আক্বীদাহর পক্ষে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে আবীল ইয (রহিমাহুল্লাহ) আক্বীদাহর ক্ষেত্রে সালাফী ধারা অনুসরণ করে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তার সুযোগ্য শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর পদ্ধতিতে সহজ-সরল ভাষায় ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্যের এক চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তার ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম হলো,

(شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى) মুসলিম বিশ্বের আলেমদের নিকট আক্বীদাহ ত্বহবীয়ার এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

ঈমানের মাস'আলাসহ যেসব স্থানে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামগণের বিরোধীতা করেছেন, ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) অত্যন্ত আদবের সাথে এবং ইমামের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রেখে সেগুলোর প্রতিবাদ করার সাথে সাথে সে ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনদের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

বাংলাভাষী অধিকাংশ মুসলিম ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মাযহাবের তাক্বলীদ করার দাবী করলেও তারা ইমামের আক্বীদাহ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন বলেই মনে হয়। ফিক্বহী মাস'আলায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর তাক্বলীদ করলেও মাযহাবের অন্যতম মুজতাহিদ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ইমাম ত্বহাবী কর্তৃক সংরক্ষিত ও লিখিত আক্বীদাহ গ্রহণ করতে তারা অনেকাংশেই নারাজ। আশ'আরী ও মু'তাযিলা আলিমদের লিখিত আক্বীদাহ বিষয়ক কিতাবাদি সরকারি এবং বেসরকারী মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিলেবাসভুক্ত থাকা এর অন্যতম কারণ হতে পারে। সে সঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক লিখিত আক্বীদাহর অন্যতম গ্রন্থ 'আল ফিকহুল আকবার'সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ বিষয়ক মূল কিতাবগুলোর অনুবাদ না হওয়া এবং সেগুলোর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার না হওয়াও বাংলাভাষী অধিকাংশ হানাফী মুসলিম ছ্বহীহ আক্বীদাহ থেকে দূরে থাকার আরেকটি কারণ হতে পারে।

তাই বাংলাভাষী মুসলিমদের আক্বীদাহ সংশোধনের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল করে আমরা ইমাম ইবনে আবীল ইয্ (রহ.) কর্তৃক সংকলিত আক্বীদাহ ত্বহাবীয়ার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'শারহুল আক্বীদাহ আত্-ত্বহাবীয়া'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করি। এর দ্বারা অনেকেই উপকৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া এত অল্প সময়ে এ মূল্যবান কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশ করা আমাদের মত অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না।

সহজ বা কঠিন যাই হোক না কেন, মানুষের কেনো কাজই নির্ভুল হয় না। তাই এর মাঝে ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই আমাদের এ কাজটি যেসব শ্রদ্ধাভাজন আলেমদের দৃষ্টিগোচর হবে তাদের কাছে দাবি হলো, তাদের দৃষ্টিতে যদি অনুবাদগত কিংবা অন্যান্য বিষয়ে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তারা যেন সংশোধনের নিয়তে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো সনাক্ত করে প্রকাশক কিংবা সরাসরি আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করেন। পরবর্তীতে ছাপানোর সময় আমরা ভুলগুলো সংশোধন করে নেয়ার চেষ্টা করবো। ইনশা-আল্লাহ।

হে আল্লাহ! এ কিতাবটি অনুবাদের ক্ষেত্রে যত শ্রম ব্যয় করা হয়েছে, তা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কবুল করো এবং আখিরাতে আমাদের নাজাতের উসীলা বানাও। আর যেসব ভাই এ কাজে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের সকলকেই উত্তম বিনিময় দান করো। আমীন

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
ashahed1975@gmail.com
মোবাইল: ০১৭৩২-৩২২১৫৯

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি হলেন আবু জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল আজদী আত্-ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফেয, ইমাম, ফক্বীহ, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ এবং মিশরের হানাফী ফক্বীহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম। ঐতিহাসিকদের বিশুদ্ধ মতে ২৩৯ হিজরী মোতাবেক ৮৫৩ খৃস্টাব্দে তিনি মিশরের ত্বহা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ব-পুরুষগণ যেহেতু ইয়ামানের প্রখ্যাত আজদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই তাকে আজদী বলা হয়। আর তিনি যেহেতু মিশরের ত্বহা নামক গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাই তার জন্মস্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে ত্বহাবী বলা হয়।

জন্ম ও শৈশব

তিনি দীনদার ও আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সে হিসাবে শিশুকাল থেকে তিনি দীনী পরিবেশে প্রতিপালিত হন। শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে ইলম অর্জনের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে সালামার নিকট থেকে শাফেঈ ফিক্হ এর মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। সে সময় তার মামা আবু ইবরাহীম আল-মুযানী ইমাম শাফেঈর সবচেয়ে বড় শিষ্য এবং শাফেঈ মাযহাবের সবচেয়ে বিচক্ষণ ফক্বীহ ছিলেন। তার পরিবারের অন্যরাও শাফেঈ ফিক্হ এর অনুসারী ছিলেন। তাই তিনিও প্রথম জীবনে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি শাফেঈ মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়ে যান।

শিক্ষালাভ

লেখা-পড়ার বয়সে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানার্জন শুরু করেন। তার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় তার মামা আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুযানী (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট। তার মামা আবু ইবরাহীম ছিলেন ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) এর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফক্বীহ এবং ইমাম শাফেঈর ইলমের ভান্ডার। তার মামার নিকট থেকে সর্বপ্রথম জ্ঞান চর্চা শুরু করলেও জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করার মানসে স্বীয় আবাসস্থল থেকে মিশরে আসেন। এ ছাড়াও তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য অনেক জায়গা সফর করেন। যেখানেই কোনো জ্ঞান তাপসের সন্ধান পেতেন, তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং জ্ঞান পিপাসা নিবৃত করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ২৬৮ হিজরীতে সিরিয়া গমন করেন। তা ছাড়া বাইতুল মুকাদ্দাস, আসকালান ইত্যাদি স্থানে সফর করে বিভিন্ন মনীষী থেকে হাদীছ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

ফিকহ শাস্ত্রে তার জ্ঞানের সীমা প্রশস্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনেক ফিকহী মাস'আলার ক্ষেত্রে দিশেহারা হতে লাগলেন। তার মামার নিকট এসব মাস'আলার কোনো সমাধান খুঁজে পেতেন না। এসব মাস'আলার সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি তার মামার আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তার মামা শাফেঈ মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এসবের কোনো সমাধান না পেয়ে ইমাম আবু হানীফার ছাত্রদের কিতাবসমূহের প্রতি প্রায়ই ইঙ্গিত করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মতকে প্রাধান্য দিতে লাগলেন। তার মামা ইসমাঈল আল-মুযানী হানাফী মাযহাবের যেসব মাস'আলা গ্রহণ করেছেন, তা তিনি مختصر المزني **(মুখতাসারুল মুযনী)** নামক কিতাবে সংকলন করে করেছেন।

ইমাম ত্বহাবীর মাযহাব পরিবর্তন

প্রথম জীবনে তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তার বোধশক্তি বৃদ্ধি যতই বাড়তে থাকে তার সামনে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার দ্বার ততই উন্মুক্ত হতে থাকে। এ সময় হানাফী মাযহাবের প্রতি তার মামার আগ্রহ দেখে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতে লাগলেন এবং দীনের মূলনীতি ও শাখা মাস'আলাসমূহের ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতিগুলো অধ্যায়ন করতে লাগলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, তাকে যখন মাযহাব পরিবর্তন করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, জবাবে তিনি বলেছেন, আমার মামা মুযানী হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহ অধিক অধ্যায়ন করতেন। তাই আমিও মামার অনুসরণ করে হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলো অধ্যায়ন শুরু করি। আমার কাছে শাফেঈ মাযহাবের তুলনায় হানাফীদের দলীল-প্রমাণগুলো অধিক মজবুত ও অকাট্য মনে হলো। তাই আমি শাফেঈ মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করি।

অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করার পর তিনি তার মাযহাব পরিবর্তন করলেন এবং শাফিঈ মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেন। তবে হানাফী মাযহাব গ্রহণ তাকে কতিপয় মাস'আলায় ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মতের বিরোধিতা করতে এবং অন্যান্য ইমামের মতকে প্রাধান্য দিতে মোটেই বাধা দিতে পারেনি। মূলত তিনি ইমাম আবু হানীফার অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না। অন্যান্য গবেষক আলিমের মতোই তিনি সুস্পষ্ট দলীলের অনুসরণ এবং ইমামের কথার বিপরীত হলেও তিনি দলীলকেই প্রাধান্য দিতেন। তিনি শুধু মনে করতেন যে, ফিক্বহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর পদ্ধতিই সর্বোত্তম। তাই তিনি এ ধারাতেই চলতেন এবং তাকে অনুসরণ করতেন। এ জন্যই আপনি দেখবেন যে, তার হাদীছের কিতাব: شرح معاني الأثر **'শারহু মা'আনিল আছার'** এর অনেক স্থানেই ইমাম আবু হানীফার মতের বিপরীত মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইবনে যাওলাক (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তিতে আমাদের কথার সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, আমি শাইখের পুত্র আবুল হাসান আলী ইবনে আবু জা'ফর ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কাযী আবু উবাইদ হারবুওয়াই এর ফযীলত ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, কাযী আবু উবাইদ আমাকে বিভিন্ন মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। একদা তিনি আমাকে একটি মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তার জবাব দিলাম। আবু উবাইদ হারবুওয়াই বললেন, এটি ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মত নয়। আমি তাকে বললাম, হে কাযী আবু উবাইদ! আবু হানীফা যা বলেছেন, আমিও কি তা বলতে বাধ্য? তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে ইমামের মুকাল্লিদ মনে করতাম। আমি বললাম, গোঁড়া ও পক্ষপাতী লোক ব্যতীত অন্য কেউ তাকলীদ করতে পারে না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, নির্বোধ লোকেরাও তাকলীদ করে। অতঃপর কাযী আবু উবাইদ ও ইমাম ত্বহাবীর মধ্যকার এ বিতর্কটি মিশরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে গেলো। পরবর্তীতে লোকেরা এটি মুখস্ত করে রেখেছে। এ বিতর্কটি ইমাম ত্বহাবীর সত্যান্বেষী হওয়ার প্রমাণ করে।

ইমাম আবু হানীফার মাযহাব গ্রহণ এবং তার মাযহাব বর্জন সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান বলেন, একদা তার মামা মুযানী সম্ভবত রাগান্বিত হয়ে তাকে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার মধ্যে আমি ভালো কিছু দেখছি না। এতে ইমাম ত্বহাবী রাগান্বিত হয়ে মামার মজলিস ত্যাগ করে আবু জা'ফর ইবনে আবু ইমরান হানাফীর দারসে যোগদান করে হানাফী ফিকহে পান্ডিত্য অর্জন করলেন এবং সমসাময়িক আলেমদের চেয়েও উচ্চ আসনে উন্নীত হলেন।

শাইখের আক্বীদাহ-বিশ্বাস

যদিও তিনি ফিক্বহী মাস'আলায় হানাফী ছিলেন, কিন্তু আক্বীদাহর মাস'আলায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, আহলে হাদীছ ও আছারের অনুসারী ছিলেন। তবে আক্বীদাহর কতিপয় মাস'আলায় মুরজি'আ ফক্বীহদের মত পোষণ করেছেন। তার রচিত 'আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া' এর মধ্যে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। সকল মাযহাবের মুসলিমদের নিকট আক্বীদাহ সংক্রান্ত এটি একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা। এর রয়েছে ছোট-বড় অনেক ব্যাখ্যা। আমরা সেগুলো থেকে আল্লামা ইমাম ইবনে আবীল ইয (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক সংকলিত شرح العقيدة الطحاوية নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থটি অনুবাদ করছি।

শাইখের উস্তাদগণ

তার মামা মুযানী এবং আবু জা'ফর আল-হানাফী ছাড়াও আরো অনেক উস্তাদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। ২৬৮ হিজরীতে সিরিয়ায় তিনি কাযী আবু হাযেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন তার ও সেখানকার অন্যান্য আলেমের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বলা হয়েছে যে, তার তিন শতাধিক উস্তাদ ছিল। ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই ইলম অর্জনের প্রতি তার অত্যধিক আগ্রহ ছিল। মিশরের উস্তাদদের নিকট থেকে ইলম অর্জনের পাশাপাশি সেসময় বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চল থেকে মিশরে কোনো আলেমের আগমনের সংবাদ শুনলেই তিনি তার সার্বক্ষণিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন এবং তার ইলমী ভান্ডারের সাথে অন্যান্য আলেমদের ইলম একত্রিত করতেন। তার উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন,

(১) হাদীছের ইমাম আহমাদ ইবনে শুআইব ইবনে আলী আন্ নাসাঈ (মৃত: ৩০৩ হি:)

(২) নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট আলেম আহমাদ ইবনে আবু ইমরান আল-কাযী (মৃত: ২৮০ হি:)

(৩) ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউনুস আল-বাগদাদী (মৃত: ৩০৪ হি:)

(৪) তার মামা প্রখ্যাত ফক্বীহ ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুযানী (মৃত: ২৬০ হি:)

(৫) ইমাম শাফেঈর প্রসিদ্ধ ছাত্র বাহার ইবনে নসর আল-খাওলানী (মৃত: ২৬৭ হি:)

ইমাম ত্বহাবীর ছাত্রগণ

ইমাম ত্বহাবী তার যুগে ইলমের বিভিন্ন শাখায় পান্ডিত্য অর্জনে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। বিভিন্ন মাস'আলার তাহকীক (বিশ্লেষণ) ও দলীলের সুক্ষ্ম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই তার ইলমের ভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চল থেকে ছাত্রগণ দলে দলে এসে তার মজলিসে ভিড় জমাতে থাকে। ছাত্রগণ তাকে অত্যন্ত সম্মান দিতেন। তার সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন,

(১) মিশরের কাযী আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (মৃত: ৩২৯ হি:)

(২) ঐতিহাসিক আব্দুর রহমান ইবনে আহমাদ (মৃত: ৩৪৭ হি:)

(৩) সুলায়মান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়্যুব আত্-তাবারী (মৃত: ৩৬০ হি:)

(৪) الكامل في الجرح والتعديل। গ্রন্থকার আব্দুল্লাহ বিন আদী আল-জুরজানী (মৃত: ৩৬৫ হি:)

আলেমদের দৃষ্টিতে ইমাম ত্বহাবী

অনেক আলেম ইমাম ত্বহাবীর প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন, তিনি ছিলেন

ثقة ثبت فيقه عاقل حافظ دين له اليد الطولى في الفقه والحديث

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ়, ফক্বীহ, বিচক্ষণ, হাদীছের হাফেয এবং ধর্মভীরু আলেম। ফিকহ এবং হাদীছ শাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞান ছিল।

ইবনে ইউনূস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, ফক্বীহ এবং বিচক্ষণ আলেম। তার যামানায় তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং হাদীছের সুদক্ষ হাফেযদের অন্যতম। ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী ফক্বীহ, প্রচুর কল্যাণকর ও মূল্যবান গ্রন্থের লেখক।

জামাল উদ্দীন আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনুল আমীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি ছিলেন ফিকহ, হাদীছ, আলেমদের মতভেদ, আরবী ভাষা, নাহু-সরফ, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রের ইমাম।

তার ইলমী খেদমত

সঠিক তথ্য উদঘাটন, সংকলন, সংগ্রহ, সুন্দর ও সাবলীল উপস্থাপনার দিক থেকে তার লেখনীগুলো অনন্য। তিনি যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্য রয়েছে,

(১) আহকামুল কুরআনিল কারীম

(২) ইখতেলাফুল উলামা

(৩) শারহু মা'আনিল আছার। এতে তিনি দলীলসহ ফিক্হ এর মাস'আলাসমূহ আলোচনা করেছেন। এতে তিনি মতভেদপূর্ণ ফিকহী মাস'আলাগুলো উল্লেখ করার সাথে সাথে দলীলগুলোও উল্লেখ করেছেন। মাস'আলা ও দলীলগুলো উল্লেখ করার পর সেগুলো পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে তার কাছে যেটি সুস্পষ্ট হয়েছে, সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিতাবটি ছাত্রদেরকে গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়, ফিকহী মাস'আলাগুলোতে আলেমদের মতভেদের কারণ সম্পর্কেও অবগত করে এবং দলীল থেকে হুকুম-আহকাম নির্গত করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এর মাধ্যমে ছাত্রদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়।

(৪) ছ্বহীহুল আছার

(৫) আস্ সুনানুল মাছুরাহ

(৬) মুশকিলুল আছার। যেসব হাদীছ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হয়, মুশকিলুল আছার গ্রন্থে তিনি সেসব হাদীছ উল্লেখ করে বৈপরীত্ব ও অসংগতি দূর করেছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন হুকুম-আহকাম নির্গত করেছেন।

(৭) আল-আক্বীদাতুত ত্বহাবীয়া। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহগুলো এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি আলেমদের নিকট আক্বীদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এর বহু ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল পুস্তিকাটি যেভাবে সকল মাযহাবের অনুসারীগণ কবুল করে নিয়েছেন, ঠিক তেমনি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোও সেভাবে গৃহীত হয়েছে। আমরা যে ব্যাখ্যাটির অনুবাদ করতে যাচ্ছি, তা আলেমদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

(৮) শারহুল জামে আল-কাবীর

(৯) শারহুল জামে আস-সাগীর

(১০) কিতাবুশ শুরুত

(১১) আন্ নাওয়াদের আল ফিকহীয়াহ

(১২) الرد على أبي عبيد (মুতাযেলী ইমাম আবু উবাইদের প্রতিবাদ)

(১৩) الرد على عيسى بن أبان (ঈসা বিন আবানের প্রতিবাদ)।

(১৪) المختصر في الفقه । এ ছাড়া রয়েছে তার আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ, যা দ্বারা মুসলিম জাতি কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে।

ইমামের মৃত্যু

ইবনে খাল্লিকান وفيات الاعيان গ্রন্থে ইমাম ত্বহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ওফাত প্রসঙ্গে বলেন যে, যুগ শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ, সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জ্ঞান তাপস আল্লামা আবু জাফর ত্বহাবী ৩২১ হিজরী মোতাবেক ৯৩৩ খৃস্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে যিলকদ মাসের বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন। সেখানকার গোরস্থানেই তাকে দাফন করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি তাকে নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মশীলদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউছে স্থান দাও। আমাদের সকলকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমীন!

আল্লামা ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) এর

ভূমিকা (مقدمة)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله [نَحْمَدُهُ ، وَ] نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

সমস্ত ইলমের মধ্যে দীনের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাই সর্বোত্তম ইলম। কারণ যে বিষয় সম্পর্কে ইলম অর্জন করা হয়, সে বিষয়ের মর্যাদা অনুপাতেই সে সম্পর্কে অর্জিত ইলমের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় দীনের মূলনীতির গুরুত্ব ও মর্যাদা যেহেতু সর্বাধিক, তাই সে সম্পর্কে অর্জিত ইলমও সর্বোত্তম। দীনের শাখা-মাস'আলা সম্পর্কিত ফিক্বহ এর জ্ঞানার্জনের তুলনায় তার মূলনীতি সম্পর্কে ইলম অর্জন করাই হচ্ছে ফিকহুল আকবার। এ জন্যই ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) দীনের মূলনীতিগুলো একত্র করে যে কিতাব লিখেছেন, তার নাম দিয়েছেন الفقه الأكبر। আল-ফিক্হুল আকবার।

মানুষের যত প্রয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে সঠিক আক্বীদাহ গ্রহণের প্রয়োজনই সর্বাধিক। তাই তাদের প্রয়োজনাদির উপর দীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাকেই প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক। কেননা মানুষের অন্তর ততোক্ষণ পর্যন্ত জীবিত হয় না এবং তা পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করে না, যতক্ষণ না সে তার মাবুদের পরিচয় লাভ করে এবং তার স্রষ্টার সুন্দরতম নামসমূহ, সুউচ্চ গুণাবলী ও তার সকল কর্মসহ চিনতে পারে। সে সাথে উপরোক্ত বিষয়গুলো বান্দার অন্তরে সর্বাধিক প্রিয় হওয়া জরুরী। আর বান্দা এ-প্রাণ উজাড় করে কেবল ঐসব আমল করার প্রচেষ্টা চালাবে, যা সকল সৃষ্টির পরিবর্তে তাকে তার রবের সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে।

মানুষ তার বিবেক ও বোধশক্তির দ্বারা তার প্রভুর অতি সুন্দর নাম, তার সুউচ্চ গুণাবলী ও ক্রিয়া-কর্মসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।[১] এ জন্যই দয়াবান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি অনুসারে যুগে যুগে অনেক নাবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন। তারা সকল সৃষ্টিকে তাদের প্রভুর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মাবুদের ইবাদতের দিকেই আহবান করেছেন। যারা নাবী-রসূলদের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তারা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর যারা

১ . এগুলো যেহেতু গায়িবী বিষয়, তাই মানুষের ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তি দ্বারা তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে তারা জাহান্নামের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তার অতি সুন্দর নাম, সুউচ্চ গুণাবলী ও কার্যাদির পরিচয় লাভ এবং তার তাওহীদ বাস্তবায়ন করাকেই নাবী-রসূলগণের দাওয়াতের চাবিকাঠি ও মূল বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। প্রভুর পরিচয় সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া ও তার তাওহীদকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার আহ্বানই ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নাবী-রাসূলের রিসালাতের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বান্দাদের পক্ষে তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছা সম্ভব।

উপরোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে মানুষকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রদান করেছেন।

(১) সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা তার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথের সন্ধান দিয়েছেন। এটিই হলো আল্লাহ তা'আলার ঐ শরী'আত, যাতে রয়েছে তার আদেশ ও নিষেধসমূহ এবং যা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারবে।

(২) যারা এ শরী'আতের পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে, তাদের জন্য আখিরাতে কী পরিমাণ চিরস্থায়ী ও চক্ষু শীতলকারী নিয়ামত রয়েছে, তাও বলে দিয়েছেন।

সুতরাং যারা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ অনুসরণ করে তারাই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত এবং তার সান্নিধ্য লাভকারীদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। এ জন্যই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ অহীকে রূহ বা প্রকৃত জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা অহীর জ্ঞানার্জন করার উপরই প্রকৃত ও শান্তিময় জীবন লাভ নির্ভরশীল। সে সাথে তিনি তার নাবীর উপর অবতীর্ণ শরী'আতকে নূর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সে অহী ও শরী'আতের অনুসরণ ব্যতীত হিদায়াতের আলো অর্জন করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾

"তিনি মর্যাদা উন্নীতকারী, আরশের অধিপতি। তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে রূহ নাযিল করেন যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়" *(সূরা গাফের: ১৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾

"এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রূহ অহী করেছি। তুমি আদৌ জানতে না কিতাব এবং ঈমান কী? কিন্তু সে রূহকে আমি একটি আলো বানিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চয় আমি তোমাকে সোজা পথের নির্দেশনা প্রদান করেছি। সেই আল্লাহর পথের দিকে যিনি যমীন ও আসমানের সব কিছুর মালিক। সাবধান! সবকিছু আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়" *(সূরা আশ-শূরা: ৫২-৫৩)।*

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তাতেই রূহের প্রকৃত জীবন, শান্তি এবং তা আলোকিত হওয়াতেই প্রকৃত আলো।

এমনি নাবী-রসূলদের প্রতি প্রেরিত অহীকে আল্লাহ তা'আলা শিফা বা আরোগ্য লাভের মাধ্যম হিসাবেও নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾

বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও শিফা স্বরূপ *(সূরা ফুসসিলাত: ৪৪)।*

কুরআন সকলের জন্য হিদায়াত ও শিফা হলেও এর দ্বারা কেবল যেহেতু মুমিনরাই উপকৃত হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছুতে হিদায়াত নেই।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য দীন নিয়ে আগমন করেছেন, সে দীনের সকল বিষয়ের প্রতি প্রত্যেক মানুষের ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। আর দীনের খুটিনাটি সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে জানা উম্মতের সকলের উপর ফরযে আইন নয়; বরং তা ফরযে কিফায়া, যা কিছু লোক আদায় করলে অন্যদের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা প্রচার করা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, বোধশক্তি দিয়ে তা উপলব্ধি করা, ভালোভাবে তা বুঝা, কিতাব ও হিকমাতের জ্ঞান অর্জন করা, তার হেফাযত করা, কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ করা, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা, হিকমাত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে প্রভুর পথে আহ্বান করা এবং উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক-বিতর্ক করা ফরযে কেফায়ার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ঐসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর ওয়াজিব করেছেন। তবে এটি বিস্তারিতভাবে বুঝা এবং তার সকল শাখার জ্ঞান অর্জন করা উম্মাতের লোকদের উপর ফরযে কিফায়া হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যা কতিপয় লোক আদায় করলে অন্যদের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে।

আর তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যা আবশ্যক ও উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে যেসব আদেশ করা হয়েছে, ক্ষমতা, সামর্থ, প্রয়োজন এবং জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন রকম হতে পারে। ইসলামী জ্ঞানের কিছু অংশ শ্রবণ করতে কিংবা

তার সুক্ষ্ম বিষয়গুলো বুঝতে যারা অক্ষম, তাদের উপর তা আবশ্যক নয়। কিন্তু যারা তা বুঝতে ও শিখতে সক্ষম তাদের উপরই কেবল তা আবশ্যক। ঠিক এমনি যে ব্যক্তি শরী'আতের দলীল-প্রমাণ বিস্তারিতভাবে শুনতে পায় এবং তা বুঝতে সক্ষম হয় তার উপর তা থেকে এমন কিছু আবশ্যক হয়, যা ঐসব লোকদের উপর আবশ্যক নয়, যারা তা শুনতে পায়নি। সে সাথে মুফতী, মুহাদ্দিছ এবং বিচারক-শাসকের উপর যা আবশ্যক, অন্যদের উপর তা আবশ্যক নয়।

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে যারা ব্যর্থ হয়েছে অথবা যারা তা থেকে মূল সত্যটি জানতে অক্ষম হয়েছে রাসূলের দীনের অনুসরণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা, দীন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা পরিত্যাগ করা এবং সত্যের প্রতি নির্দেশক দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ না করাই তাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তারা যখন আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হয়েছে, তখনই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾

"আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে ব্যক্তি আমার সে নির্দেশ মেনে চলবে সে বিভ্রান্ত হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না। আর যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? দুনিয়ায় আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, এভাবেই তো আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে"। *(সূরা ত্বহা: ১২৩-১২৬)* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، [أَنْ] لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات

যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যিম্মাদার হয়েছেন যে, সে দুনিয়াতে বিভ্রান্ত হবে না এবং আখিরাতে হতভাগ্য হবে না। অতঃপর ইবনে আব্বাস উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ" قُلْتُ: فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ، لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وهو الذي لا تزيع بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ، وَلَا تنقضي عجائبه، ولا تشبع مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

অচিরেই বড় বড় অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবকে আকঁড়ে ধরার মাধ্যমে এ থেকে বাঁচা সম্ভব। কেননা তাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের খবর। ইহাই তোমাদের মধ্যে ফায়ছালাকারী এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। এটি কোনো হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়। যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ এ কুরআনের উপর আমল বর্জন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি এর বাইরে অন্য কিছুতে হিদায়াত অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটি আল্লাহর মজবুত রশি, প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সীরাতুল মুস্তাকীম। এটি এমন সত্য কিতাব, যার অনুসারীকে নফসের প্রবৃত্তি সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। মুমিনদের জবান দ্বারা তা পাঠ করাতে মোটেই কষ্ট অনুভব হয় না। এর বিস্ময়কর বিষয়গুলোর পরিসমাপ্তি ঘটবে না এবং আলেমগণ এ থেকে জ্ঞান অর্জন করে পরিতৃপ্ত হবে না। যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা কথা বলবে, তার কথা সত্য হবে, যে কুরআন অনুযায়ী আমল করবে, সে বিনিময় পাবে, কুরআন দিয়ে যে বিচারক মানুষের মাঝে ফায়ছালা করবে, সে ন্যায় বিচার করতে সক্ষম হবে এবং যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে আহ্বান করবে, সে সীরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান পাবে।[২] এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তার নাবী-রসূলদের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে সত্য-সঠিক দীন নির্ধারণ করেছেন, তা ব্যতীত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের থেকে এমন কোনো দীন তিনি কবুল করবেন না, যার দ্বারা তারা আল্লাহর ইবাদত করতে পারে।

আর রসূলগণ আল্লাহ তা'আলাকে যেসব সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা ব্যতীত মানুষেরা আল্লাহ তা'আলাকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করে, তিনি নিজের সত্তাকে তা থেকে পবিত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

২. হাদীছের অর্থ সুন্দর, তবে সনদ যঈফ।

"কাফের-মুশরেকরা তোমার রব সম্পর্কে যেসব কথা তৈরি করছে তা থেকে তোমার রব পবিত্র, তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম আল্লাহর রসূলদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই"। *(সূরা সাফফাত: ১৮০-১৮২)*

সুতরাং কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যেসব অশোভনীয় কথা বলেছে, তা থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। সে সাথে রসূলদের উপরও তিনি সালাম পেশ করেছেন। কেননা রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার যেসব সুউচ্চ গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার ঐসব গুণাবলীর কারণে নিজের সত্তার প্রশংসা করেছেন, যা দ্বারা কেবল তিনি একাই বিশেষিত এবং যার কারণে তিনি পূর্ণ প্রশংসা পাওয়ার হকদার।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের যে মূলনীতির উপর ছিলেন, তারই উপর ছিলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ। তারা হলেন ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীগণ। তাদের একজন অন্যজনকে এরই উপদেশ দিতেন এবং উত্তরসূরীগণ পূর্বসূরীদের অনুসরণ করতেন। এর মাধ্যমে তারা সকলেই তাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুবহু অনুসরণ করতেন এবং তার দেখানো পথেই চলতেন। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি বলো, এটিই আমার পথ। পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"। *(সূরা ইউসুফ: ১০৮)*

এ আয়াতে وَمَنِ اتَّبَعَنِي বাক্যটিকে যদি أدعو এর মধ্যকার أنا সর্বনামের উপর সম্পর্ক করা হয়, তাহলে এতে দলীল রয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীগণও ছিলেন আল্লাহর দীনের দাঈ। আর যদি তাকে ضمير منفصل এর উপর অর্থাৎ أنا যমীরের উপর সম্পর্ক করা হয়, তাহলে এ কথা সুস্পষ্ট যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে সত্য দীন নিয়ে এসেছেন, তিনি এবং তার ছাহাবীগণই ছিলেন সে সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক প্রজ্ঞাবান। তবে উভয় অর্থই যথাযথ।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট করেই আল্লাহর দীনের প্রচার করেছেন এবং সত্যান্বেষীদের জন্য তার দলীল-প্রমাণগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তার উম্মতের সর্বোত্তম মানুষগুলো এ সুস্পষ্ট দীনের উপর অটল থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

অতঃপর এমনসব অপদার্থরা আগমন করলো, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং বহুদলে বিভক্ত হয়েছে। পরবর্তী যুগসমূহে দীনের মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে যখন লোকেরা মতভেদ শুরু করলো তখন আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য এমনসব লোক পাঠালেন, যারা

সে মূলনীতিগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهرين عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُمْ»

"আমার উম্মাতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে। যেসব লোক তাদের বিরোধীতা করবে কিংবা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা সে দলটির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"।[৩]

যুগে যুগে যেসব আলেম দীনের মূলনীতিগুলোর সংরক্ষণ এবং তার প্রচার ও প্রসারের পথে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের মধ্যে দু'শত হিজরীর পরে জন্ম গ্রহণকারী আল্লামা ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল আযদী আত্ ত্বহাবী অন্যতম। তিনি ২৩৯ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২১ হিজরী সনে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হে আল্লাহ! তোমার রহমত দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করো। আমীন

উম্মতের সালাফে সালেহীনগণ দীনের যেসব মূলনীতির উপর ছিলেন, ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) সে সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত আল-কুফী এবং তার দু'সুযোগ্য শিষ্য আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আল-হিময়ারী আল আনসারী ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহিমাহুমুল্লাহ) দীনের মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন ও যেসব মূলনীতির মাধ্যমে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি কামনা করতেন, ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

তবে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর যুগ এবং পরবর্তী যুগসমূহের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের সাথে সাথে দীনের মূলনীতিগুলোর মধ্যে বহু বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এমন বিকৃতি ঢুকে পড়েছে, যাকে এর উদ্ভাবনকারীরা তাবীল (অপব্যাখ্যা) হিসাবে নাম দিয়েছে, যাতে সাধারণ লোকেরা এগুলোকে সহজেই গ্রহণ করে। তাদের তাহরীফ (বিকৃতি) ও তাবীলের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই পার্থক্য করতে সক্ষম। কেননা কখনো কখনো শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য এমন এক সম্ভাব্য অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেয়াকে তাবীল বলা হয়, যে সম্ভাব্য অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যদিও সম্ভাব্য অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কোনো লক্ষণ ও দলীল না থাকে। বিনা কারণে ও বিনা দলীলে শব্দকে আসল অর্থ থেকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা থেকেই দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সূচনা হয়েছে। অতঃপর যখন তারা দীনের মূলনীতি ও আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোর বিকৃতি করে ব্যাখ্যা হিসাবে তার নাম দিলো, তখন তা গৃহীত হলো এবং যেসব মুসলিম তাহরীফ ও তাবীলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম নয়, তাদের মধ্যে তার প্রসার ঘটলো।

এরপর থেকেই মুসলিমগণ দীনের মূলনীতি সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করা এবং তার উপর উত্থাপিত সন্দেহগুলো দূর করার প্রয়োজন অনুভব করলো। এতে করে অনেক তর্ক-

৩. ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২০।

বিতর্ক ও শোরগোল হলো। বাতিলপন্থীদের সন্দেহগুলোর প্রতি মুসলিমদের কর্ণপাত করা, তর্কশাস্ত্রবিদদের নিকৃষ্ট যুক্তি-তর্কের পিছনে পড়াই ছিল এর একমাত্র কারণ। অথচ সালাফগণ এ কালাম শাস্ত্রের যথেষ্ট দোষারোপ করেছেন এবং তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, তা নিয়ে মশগুল হওয়া ও তার প্রতি কর্ণপাত করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করতে গিয়েই তারা তা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"তুমি যখন দেখবে, লোকেরা আমার আয়াতের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা এ আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য প্রসংঙ্গে লিপ্ত হয়। আর শয়তান কখনো যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর এ যালেম সম্প্রদায়ের কাছে বসো না" *(সূরা আল-আনআম: ৬৮)*। আয়াতের মর্মার্থ কালাম শাস্ত্রবিদদেরকেও শামিল করে।

আল্লাহর কালাম বিকৃত করা এবং তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার একাধিক স্তর রয়েছে। কখনো তা কুফরীর স্তরে পৌঁছতে পারে, কখনো পাপাচার আবার কখনো সীমা লংঘন আবার কখনো ভুল করার কারণেও আল্লাহর কালামের তাহরীফ (বিকৃতি) ও বিচ্যুতি হয়ে যেতে পারে।

নাবী-রসূলগণের আনুগত্য করা ওয়াজীব এবং তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য করাও ওয়াজীব

- আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে নাবী-রসূলদের আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং তাকে আখেরী নাবী হিসাবে মনোনিত করেছেন। তার উপর অবতীর্ণ কিতাবকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সংরক্ষণকারী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।
- আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশেষ নাবীর উপর কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন এবং তার দাওয়াতকে কবুল করা মানুষ ও জিন সকলের জন্য আবশ্যক করেছেন। তার দাওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এ দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর উপর মানুষের পক্ষ হতে নাবী-রসূল ও দলীল-প্রমাণ না পাঠানোর অভিযোগ পেশ করার সুযোগ নিঃশেষ হয়েছে।

- আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সবকিছুই বর্ণনা করেছেন ও সমগ্র উম্মতের জন্য দীনের সমস্ত সংবাদ ও হুকুম-আহকাম পূর্ণ করেছেন।
- আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর আনুগত্য করা তারই আনুগত্য এবং নাবীর নাফরমানীকে তারই নাফরমানী হিসাবে গণ্য করেছেন।
- তিনি নিজে কসম করে বলেছেন, তারা তাদের নিজেদের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে তাকে একমাত্র ফায়ছালাকারী হিসাবে মেনে না নেয়া পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না।
- তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, মুনাফেকরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে ফায়ছালাকারী বানাতে চায়। আর তাদেরকে যখন আল্লাহ, তার রসূল, তার কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের দিকে আহবান করা হয়, তখন মুনাফেকরা আল্লাহ এবং তার রসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। তারা আরো দাবি করে যে, তাদের কার্যকলাপের পিছনে সৎ উদ্দেশ্য এবং সমন্বয় সাধনই লক্ষ্য ছিল।
- অনেক তর্কশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক এবং অন্যরা মুনাফেকদের মতোই বলে থাকে। তারা বলে, আমরা কেবল বিষয়গুলোর আসল অবস্থা উপলব্ধি করতে চাই। অর্থাৎ ভালোভাবে আয়ত্ত করা ও জানার ইচ্ছা পোষণ করি। যেগুলোকে তারা আকলী বা জ্ঞানগত দলীল হিসাবে নাম দিয়েছে, যদিও সেগুলো জাহেলিয়াত ছাড়া আর কিছু নয়, সেগুলো এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব দলীল এসেছে, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদরা উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রে বলে যে, আমরা শরী'আত ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় করতে চাই।[৪]
- অনুরূপ অনেক বিদ'আতী, সন্ন্যাসী ও সূফী বলে যে, আমরা আমলগুলোকে সুন্দর করতে চাই। আর শরী'আত এবং যে বাতিলের দিকে তারা আহবান করে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে চায়। এসব বাতিল বিষয়কে তারা হাকীকত (বাস্তবসম্মত) বলে দাবী করে, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে মুর্খতা ও ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।
- অনুরূপ অনেক কালামশাস্ত্রবিদ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত অনেক লোক বলে থাকে আমরা কার্যাবলীকে অতি সুন্দর করতে চাই এবং শরী'আত ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় করতে চাই। এমনি তারা আরো অনেক কথাই বলে থাকে।

৪. মূলত সমন্বয় করতে চায় না; আসলে এরা শরী'আতকে দর্শনের অনুগত করতে চায়।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, আমাদের জন্য তা যথেষ্ট

- সুতরাং যে ব্যক্তিই দীনের কোনো বিষয়াদিতে রাসূলের আনীত বিষয়কে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে ফায়ছালাকারী বানাতে চাইবে ও ধারণা করবে সেটিই উত্তম এবং মনে করবে, এতেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত বিধান এবং তার বিরোধী বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন হবে, সে বিভ্রান্ত ও মূর্খ হিসাবে গণ্য হবে।
- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তা পরিপূর্ণ এবং উম্মতের জন্য তা যথেষ্ট। তাতেই রয়েছে সকল সত্য বিষয়।
- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য দীন নিয়ে আগমন করেছেন, যারা নিজেদেরকে তার এ সত্য দীনের অনুসারী বলে দাবি করেছে তাদের অনেকের দ্বারাই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। তিনি দীনের যেসব মূলনীতি আনয়ন করেছেন, যেসব বিষয়কে ইবাদত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং যেসব রাজনৈতিক নের্তৃত্বের বিষয় নিয়ে এসেছেন, তারা সেগুলোর অনেকাংশই জানতে ও বুঝতে পারেনি। অথবা তারা ধারণার বশবর্তী হয়ে ও অন্যের অন্ধ অনুসরণ করে রাসূলের শরী'আতের মধ্যে এমন কিছু বৃদ্ধি করেছে, যা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা থেকে এমন অনেক কিছু বের করে দিয়েছে, যা তার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং এসব লোকের অজ্ঞতা, গোমরাহী ও শৈথিল্যের কারণেই এবং ঐসব লোকের সীমালংঘন, মূর্খতা ও নিফাকের কারণে বহু নিফাকীর উৎপত্তি হয়েছে এবং নাবী-রসূলদের রিসালাতের অনেকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
- সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য দীন নিয়ে এসেছেন, তার পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করা উচিত, তাতে সুক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক এবং তা অর্জনে প্রচুর পরিশ্রম করা আবশ্যক। যাতে করে তা অবগত হওয়া যায়, তাতে বিশ্বাস পোষণ করা যায় এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সে অনুযায়ী আমলও করা যায়। এর মাধ্যমে রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাবের যথাযথ তেলাওয়াত করা সম্ভব হবে এবং তার কোন কিছুর প্রতিই অবহেলা করা হবে না।
- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু অংশ জানতে অথবা তার প্রতি আমল করতে যদি কেউ অপারগ হয়, তাহলে সে অপারগ ব্যক্তি অন্যকে তার প্রতি আমল করতে নিষেধ করবে না; বরং তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, অপারগতার কারণে নিজে আমল না করতে পারলে তাকে দোষারোপ করা হবে না। তবে অন্যরা সে অনুযায়ী আমল করার কারণে তার খুশি হওয়া উচিত। সে সাথে সে নিজে তা পালন করার আকাঙ্খা করবে। এমনটি যেন না হয় যে, সে রাসূলের দীনের কিছু অংশে বিশ্বাস করবে এবং তার কিয়দাংশ বর্জন করবে। বরং সম্পূর্ণ কিতাবের উপর বিশ্বাস করবে এবং তার সাথে এমন কোনো বর্ণনা অথবা মতামত সংযোজন করা হতে দূরে থাকবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

- অথবা আক্বীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে সে এমন কিছুর অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকবে, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা মিথ্যার সাথে সত্যকে মিলিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করো না"। *(সূরা আল-বাকারা: ৪২)*

এ ছিল সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী ছাহাবীদের তরীকা বা পথ। এটিই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণকারীগণের পদ্ধতি হওয়া চাই। প্রথম শ্রেণীর তাবেঈগণই ছাহাবীদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। অতঃপর যারা তাবেঈদের পরে আগমন করেছেন। এদের মধ্যেই রয়েছেন দীনের ঐসব সম্মানিত ইমামগণ, যারা মধ্যমপন্থী উম্মতের নিকট ইমাম হিসাবে স্বীকৃত।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মুতাযেলা ইমাম বিশর আল-মুরাইসীকে একদা বলেছিলেন, কালামশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাই হলো প্রকৃত মূর্খতা এবং তা সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত ইলম। কোনো মানুষ যখন কালামশাস্ত্রে সর্বোচ্চ পান্ডিত্য অর্জন করবে, সে নাস্তিকে পরিণত হবে অথবা তার উপর নাস্তিক্যের অভিযোগ উত্থাপিত হবে। এখানে কালামশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থ হলো তা বিশুদ্ধ না হওয়ার আক্বীদাহ রাখা। এটিই উপকারী ইলম। অথবা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কালামশাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অথবা তার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। এতে করেই মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তি সংরক্ষিত হবে। এ দৃষ্টিকোন থেকে ইলমে কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাকেই ইলম হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কালামশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে সে নাস্তিকে পরিণত হবে, যে ব্যক্তি মাটিকে স্বর্ণ বানিয়ে ধনী হওয়ার চেষ্টা করবে, সে হবে সর্বহারা এবং যে ব্যক্তি বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা অনুসন্ধান করতে যাবে, সে মিথ্যুকে পরিণত হবে।

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, কালামশাস্ত্রবিদদের ব্যাপারে আমার মত হলো তাদেরকে খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটানো হবে, মহল্লায় মহল্লায় তাদেরকে ঘুরানো হবে এবং বলা হবে, এ হলো ঐসব লোকদের শাস্তি যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত পরিহার করে কালামশাস্ত্রের প্রতি ঝুকে পড়ে।

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) কবিতা আকারে আরো বলেন,

كُلُّ الْعُلُومِ سِوَى الْقُرْآنِ مَشْغَلَةٌ ... إِلَّا الْحَدِيثَ وَإِلَّا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ

الْعِلْمُ مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا ... وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ

"কুরআন, হাদীছ এবং দীনের গভীর জ্ঞান ব্যতীত যতো ইলম রয়েছে, তা সবই মূল্যহীন। রাসূলের হাদীছেই রয়েছে প্রকৃত ইলম। এ ছাড়া যতো ইলম রয়েছে, তার সবই শয়তানের কুমন্ত্রনা ছাড়া অন্য কিছু নয়"।

আলেমগণ ফতোয়ায় বলেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রের আওকাফ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বশীল যদি শহরের আলেমদের জন্য ধন-সম্পদ বন্টন করার ফরমান জারী করে তাহলে উক্ত শহরে বসবাসকারী কালামশাস্ত্রবিদরা তা থেকে কিছুই পাবে না।[৫]

এমনিভাবে কোনো আলেম যদি অসীয়ত করে, তার কিতাবগুলো থেকে দীনী কিতাবগুলো যেন ওয়াক্ফ করে দেয়া হয়, তাহলে সালাফগণের ফতোয়া রয়েছে যে, তার মধ্যকার কালামশাস্ত্রীয় কিতাবগুলো বিক্রি করে দিতে হবে। অনুরূপ কথা যাহেরীয়া ফতোয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে।

সুতরাং ব্যাপারটি যেহেতু এরকম, তাই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা ব্যতীত দীনের মূলনীতিগুলোর জ্ঞান কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে! কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,

أَيُّهَا الْمُغْتَدِي لِيَطْلُبَ عِلْمًا ... كُلُّ عِلْمٍ عَبْدٌ لِعِلْمِ الرَّسُولِ

تَطْلُبُ الْفَرْعَ كَيْ تُصَحِّحَ أَصْلًا ... كَيْفَ أَغْفَلْتَ عِلْمَ أَصْلِ الْأُصُولِ

"ওহে জ্ঞানার্জনের পথে প্রত্যুষে গমণকারী! জেনে রাখো! সমস্ত ইলম রাসূলের ইলমের অনুগত। তুমি দীনের মাসায়েল সম্পর্কে ইলম অর্জন করবে, যাতে তার মূলনীতিকে ঠিক করতে পারো? সকল মূলনীতির মূল সম্পর্কে তুমি উদাসীন হলে কিভাবে?

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন বাণী প্রদান করা হয়েছে, যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত কালামের সুন্দর সূচনা ও সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সে সাথে তাকে দেয়া হয়েছে এমন সংক্ষিপ্ত কালাম, যার শব্দ কম, কিন্তু তার ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক, পরিপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত এবং উত্তম পদ্ধতিতে পূর্ববতী ও পরবর্তীদের সকল প্রকার ইলমসহ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ'আতীরা যখনই একটি বিদআত তৈরী করেছে, আলেমগণ বিস্তারিতভাবে তার জবাব দিয়েছেন। এ জন্যই পরবর্তী যুগের আলেমদের বক্তব্য হয়েছে অনেক দীর্ঘ, কিন্তু তাতে বরকত হয়েছে কম। কিন্তু পূর্ববর্তীদের কথা ছিল তার বিপরীত। তাদের কথা ছিল অল্প, কিন্তু তাতে বরকত হয়েছে প্রচুর।

কালামশাস্ত্রবিদদের বিভ্রান্ত ও মূর্খদের কথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলে থাকে সালাফদের পথ ও পদ্ধতি অধিক নিরাপদ। আর আমাদের পদ্ধতি হচ্ছে অধিক শক্তিশালী এবং অধিক প্রজ্ঞা ভিত্তিক!! পরবর্তীদের মধ্য হতে যারা নিজেদেরকে ফক্বীহ বলে দাবি

৫. কারণ তারা আলেমদের মধ্যে শামিল নয়।

করে, তাদের কথাও এর বিপরীত। তারা বলে থাকে ছাহাবীগণ যেহেতু জিহাদ এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা পাহারা দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই তারা কুরআন ও হাদীছ থেকে ফিকহী মাসায়েল নির্গত করা, তার মূলনীতি ও হুকুম-আহকাম সংরক্ষণ করার সুযোগ পাননি। আর পরবর্তীরা যেহেতু সে কাজের সুযোগ পেয়েছেন, তাই তারা ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে ছাহাবীদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হতে পেরেছেন![৬]

সালাফদের মর্যাদার পরিমাণ, তাদের ইলমের গভীরতা, গুরুত্বহীন কাজের প্রতি তাদের আগ্রহের স্বল্পতা এবং তাদের পরিপূর্ণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে এ লোকেরা অবগত নয়। আল্লাহর কসম! পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীদের বৈশিষ্ট্য শুধু এখানেই যে, তারা কেবল গুরুত্বহীন কাজে শ্রম ব্যয় করেছে এবং এমনসব দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যার মূলনীতিগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া, নিয়ম-কানুন সংরক্ষণ করা এবং তার বন্ধনকে মজবুত করার কাজেই সালাফগণ ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ের সুউচ্চ চূড়ায় পৌঁছে যাওয়াই ছিল সালাফদের একমাত্র প্রচেষ্টা। সুতরাং পরবর্তীরা ব্যস্ত হয়েছে একটি বিষয় নিয়ে এবং পূর্ববর্তীরা ব্যস্ত ছিলেন অন্য একটি বিষয় নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

আল্লামা ইমাম ইবনে আবীল ইয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার পূর্বে অনেকেই আল-আকীদাতুত্ ত্বহাবীয়াহ এর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু দেখেছি যে, তাদের কতিপয় ব্যাখ্যাকারী এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কালামশাস্ত্রবিদদের নিন্দনীয় কথার প্রতি কর্ণপাত করেছেন, তাদের থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাদের পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছে। সালাফগণ জাওহার, জিসিম, আরায এবং সঠিক অর্থে অনুরূপ অন্যান্য নতুন পরিভাষা ব্যবহার করে কথা বলা অপছন্দ করতেন। যেমন সঠিক ইলমকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। ঠিক তেমনি সত্যের উপর ঐ শব্দগুলোর নির্দেশনা প্রদান এবং বাতিলপন্থীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় ঐ শব্দগুলো ব্যবহার করতেন না। কিন্তু এ শব্দগুলো মিথ্যা, বানোয়াট ও সত্যের বিপরীত বিষয় সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করাকেই অপছন্দ করেছেন। তাদের শব্দগুলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহয় ব্যবহার না হওয়াও তাদের অপছন্দের অন্যতম কারণ।

---

৬. কোনো কোনো ফিকহী মাযহাবের মুকাল্লিদগণ বলে থাকেন, ছাহাবীদের মধ্যে অনেকেই মুহাদ্দিছ ছিলেন ঠিকই; কিন্তু তারা ফক্বীহ ছিলেন না। তাদের মাযহাবের যেসব কথা হাদীছের বিপরীত হয়, ঐ হাদীছের রাবী (ছাহাবী) সম্পর্কে তারা বলে যে, তিনি ফক্বীহ ছিলেন না! তাই এ মাস'আলায় তার থেকে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়; তাদের ইমাম যেহেতু ফক্বীহ ছিলেন, তাই হাদীছের বিপরীত হলেও ইমামের কথাই আমলযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ তারা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে বলে থাকে যে, তিনি ফক্বীহ ছিলেন না!! তাই তারা তাদের কতিপয় মাস'আলা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হলেও মাযহাবের কথাকেই প্রাধান্য দেয়। মাযহাবী গোঁড়ামির কারণেই তারা এমনটি করে থাকে বলে আমরা মনে করি।

ছাহাবীদের প্রতি পরবর্তীদের এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। ছাহাবীরাই ছিলেন পরবর্তীদের তুলনায় জ্ঞানে ও আমলে সর্বাধিক পরিপূর্ণ। কুরআন ও হাদীছে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের ইলম ও আমলের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের পথে চলার উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং পরবর্তীতে যত আলেম ও ফক্বীহ আগমন করবেন, তাদের কেউই ইলম, ফিকহ এবং অন্যান্য গুণাবলীতে ছাহাবীদের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

এ জন্যই আপনি সাধারণ মুমিনগণ, বিশেষ করে আলেমদের নিকট যে সুদৃঢ় ইয়াকীন, ঈমান ও মারেফত উপলব্ধি করবেন, কালামশাস্ত্র বিদদের নিকট তা খুঁজে পাবেন না।

কালামশাস্ত্র বিদরা যেসব পরিভাষা ও ভূমিকা পেশ করেছে, তাতে হক-বাতিলের সংমিশ্রণের কারণে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, অন্যায় ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে এবং অহেতুক সমালোচনা ও অর্থহীন কথা-বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে তারা নির্ভেজাল শরী'আত ও সুস্পষ্ট বোধশক্তির বিপরীত এমন সব কথার উৎপত্তি করেছে, যা এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ইমাম ত্বহাবীর উক্তি, فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُه...الخ এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় উপরোক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ। সালাফদের পথ অনুসরণ করে এবং তাদের বক্তব্য দ্বারাই আমি এ কিতাবটি ব্যাখ্যা করতে চাই। এর মাধ্যমে আমি তাদের পথের পথিক এবং তাদের কাতারে শামিল হতে চাই। যদিও আমাকে তাদের সাথে যোগদান করার আহ্বান করা হয়নি। আমি ঐসব লোকদের মধ্যে শামিল হতে চাই এবং ঐসব লোকদের সাথে হাশরের দিন উপস্থিত হতে চাই, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

"আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ঐ সমস্ত লোকের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; তারা হলেন নাবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎ কর্মশীলগণ। কতই না উত্তম বন্ধু তারা" *(সূরা আন নিসা, ৪:৬৯)।*

এসব লোকদের দলে থাকার সুবাদে আমি পরকালীন সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই। মানুষের মনে সংক্ষিপ্ত বিষয়ের প্রতিই আগ্রহ বেশি, এটা আমার দৃষ্টিগোচর হলো, তাই এর ব্যাখ্যা লম্বা না করে সংক্ষিপ্ত করাকেই আমি প্রাধান্য দিলাম।

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

"যা কিছু আমি করতে চাই তা সবই আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভর করে। তার উপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি" *(সূরা হুদ ১১:৮৮)।* আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনকারী।

[হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা আবু জাফর ওয়ার্‌রাক আত্-ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) মিসরে অবস্থানকালে বলেছেন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব"।

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ

ফুকাহায়ে মিল্লাত আবূ হানীফা নুমান বিন সাবেত আল কুফী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী এবং আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান শায়বানীর মাযহাব অনুসারে এ পুস্তিকায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে (আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন)। দীনের মূলনীতিসমূহের ক্ষেত্রে তারা যে সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন ও যেসব মূলনীতির মাধ্যমে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি কামনা করতেন, তা এ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।]

তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ[৭]

৭. জানা উচিত, যে তাওহীদসহ আল্লাহ তা'আলা তার রসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যাসহ সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, তার তিনটি অংশ রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথম অংশ হলো তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ: আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে তার মহান কর্মগুলোতে একক সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করা এবং ঈমান রাখা যে, মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, সৃষ্টিজগতের সকলের কার্যাবলী পরিচালনাকারী, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। এগুলোতে তার কোনো শরীক নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা" (সূরা আয-যুমার: ৬২)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি ছয়দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। এমন কোন শাফায়াতকারী নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে

পারে। আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তারই ইবাদত করো। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা ইউনুস: ৩)।

তাওহীদের এ অংশে আরবের মুর্তিপূজারী মুশরিকরা ঈমান রাখতো, যদিও তাদের অধিকাংশই পুনরুত্থান ও হাশর-নাশর অস্বীকার করত। কিন্তু এ ঈমান তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি। কারণ তারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বাতিল মাবুদকে শরীক করতো, তার ইবাদতের সাথে মূর্তি ও অন্যান্য বস্তুরও ইবাদত করতো এবং তারা রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন করেনি।

দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদাহ: যাকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বলেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। আর উলুহিয়্যাহ অর্থই ইবাদত। তাওহীদের এ অংশটিই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের থেকে উল্লেখ করেছেন, তার নিম্নোক্ত বাণীতে,

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾

"আর কাফেররা আশ্চর্য হলো যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন ভীতি প্রদর্শনকারী আসলো এবং কাফেররা বললো, এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য বিষয়" (সূরা সোয়াদ: ৪-৫)। অনুরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে।

তাওহীদের এ অংশ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সত্তা হওয়া এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত বাতিল হওয়া সাব্যস্ত করে। এটিই কালেমা লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর প্রকৃত অর্থ। কেননা এ কালেমার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَاطِلُ﴾

"এটা এজন্য যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য মাবুদ, তাকে ছাড়া তারা অন্য যাকেই আহ্বান করে সে সবই বাতিল"। (সূরা আল-হাজ্জ: ৬২)

তৃতীয় অংশ হলো তাওহীদুল আসমা ওয়াস ছ্বিফাত: আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছ্বহীহ সুন্নাহতে আল্লাহ তা'আলার যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণ সেগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা, সেগুলোকে মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে সাব্যস্ত করা এবং কোনো প্রকার বিকৃতি কিংবা অস্বীকার অথবা কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ বা সাদৃশ্য নির্ণয় ব্যতীত তাতে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

"বলো, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউই নেই"। (সূরা আল-ইখলাছ: ১-৪) তিনি আরও বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ-শূরা: ১১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে অতি সুন্দর নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাকে সেগুলো দিয়েই আহ্বান করো এবং তার নামের ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত, তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা কিছু করছে তার ফল অবশ্যই পাবে"। (সূরা আল-আরাফ: ১৮০)

অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহু সূরা আন-নাহলের ৬০ নং আয়াতে বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ

মহান আল্লাহর তাওফীকের[৮] প্রতি অন্তর দিয়ে একান্ত বিশ্বাস রেখে তার তাওহীদ সম্পর্কে আমরা বলছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই।

.....

ব্যাখ্যা: প্রিয় পাঠক! আপনি জেনে রাখবেন যে, তাওহীদই ছিল নাবী-রসূলদের সর্বপ্রথম দাওয়াত, দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সর্বপ্রথম সোপান এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য বান্দার সর্বপ্রথম ধাপ। সূরা আল আরাফের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

"আর আল্লাহ্‌র জন্যই উত্তম উদাহরণ, আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" এ অর্থে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এখানে উত্তম উদাহরণ বলতে এমন সুউচ্চ গুণাগুণ বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনো অপূর্ণতা নেই। আর এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল ছাহাবী, উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈগণের অভিমত যে, তারা আল্লাহর ছিফাত তথা গুণাগুণ সম্পন্ন আয়াত ও হাদীছসমূহকে যেভাবে এসেছে সেভাবে ছেড়ে দিতেন, সেগুলোর অর্থকে মহান আল্লাহ সুবহানাহুর জন্য সদৃশ নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করতেন।

অনুরূপভাবে তারা মহান আল্লাহ সুবহানাহুকে তার সৃষ্টির কারও সাথে তুলনা করা থেকে পবিত্র করতেন। কিন্তু সেগুলোকে (কুরআন ও হাদীছে) উল্লেখিত গুণাগুণ সম্পন্ন ভাষ্যসমূহকে তারা অর্থহীন করতেন না। আর তারা যা বলেছেন সেটার মাধ্যমেই কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ একই সূত্রে গাঁথা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই যারা তাদের বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আত-তাওবা: ১০০)

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তার একান্ত অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহই সাহায্যকারী।

৮. শাইখের এ কথার মধ্যে যুক্তিবিদ, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদ এবং আহলে সুন্নাতের আলেমদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যুক্তিবিদ ও দার্শনিকরা স্রষ্টার পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয় সাব্যস্ত করতে গিয়ে বিবেক-বোধশক্তি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আল্লাহর পরিচয় এবং অন্যান্য যেসব গায়েবী বিষয়ের ক্ষেত্রে সঠিক আক্বীদাহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, তা কেবল আল্লাহ তা'আলার তাওফীক এবং তার অশেষ অনুগ্রহের কারণেই তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। মূলত তারা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভর করেন।

﴿لَقَدْ أَرْسَـــلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয় আমি 'নুহ'কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তা না করলে আমি তোমাদের উপর একটি মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি"। একই সূরার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদেরই ভাই 'হুদ'কে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

"আর সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদেরই ভাই 'সালেহকে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই" *(সূরা আল-আরাফ ৭:৭৩)*। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

"আমি মাদায়েনের প্রতি তাদের ভাই 'শুআইব'কে প্রেরণ করেছি। সে বললো হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই" *(সূরা আল-আরাফ: ৮৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো" *(সূরা আন নাহল ১৬:৩৬)*।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

"আমাকে মানুষের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না তারা এ কথার স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল”।[৯]

সুতরাং সঠিক কথা হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্কের উপর সর্বপ্রথম ফরয হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য প্রদান করা। স্রষ্টার পরিচয় লাভ করার জন্য কিংবা প্রভুর মারেফত হাসিলের উদ্দেশ্য চিন্তা-গবেষণা করা অথবা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দে থাকা মোটেই বৈধ নয়।[১০]

বরং সালাফদের সকল ইমামের ঐকমত্যে বান্দার উপর সর্বপ্রথম আবশ্যক হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। তারা আরো ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে তার সাক্ষ্য প্রদান করে থাকলে, বালেগ হওয়ার পর তাকে ঐ সাক্ষ্য নবায়ন করার আদেশ প্রদান করা হবে না।

বরং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর অথবা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করার বোধশক্তি অর্জন করার পরপরই তাকে পবিত্রতা অর্জন, ছলাতের মাসায়েল শিক্ষা এবং তা বাস্তবায়ন করার আদেশ দেয়া হবে। কোনো ইমাম এটি আবশ্যক করেননি যে, সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অভিভাবক তার সন্তানকে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য নবায়ন করার আদেশ করবে। যদিও তার স্বীকারোক্তি প্রদান করা সকল ইমামের ঐকমত্যে মুসলিম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ওয়াজিব এবং ছ্বলাত আবশ্যক হওয়ার পূর্বেই তার স্বীকারোক্তি প্রদান করা জরুরী। কিন্তু সে যেহেতু ছ্বলাত ফরয হওয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাই এখন তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

এখানে এমন কিছু মাস‘আলা রয়েছে, যা ফক্বীহগণ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রকাশ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করার পূর্বেই কেউ ছ্বলাত কায়েম করল কিংবা ইসলামের অন্য কোনো কাজ সম্পন্ন করলো, কিন্তু প্রকাশ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিলো না, সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে কি না? এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো ইসলামের কাজগুলো সম্পাদন করার মাধ্যমে সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং তাওহীদই হলো এমন বিষয়, যার মাধ্যমে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাওহীদই শেষ বিষয়, যা নিয়ে বান্দা দুনিয়া থেকে বের হয়ে যায়। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় যার শেষ বাক্য হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[১১]

সুতরাং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বপ্রথম ওয়াজিব এবং এটিই সর্বশেষ ওয়াজিব।

---

৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০, আবূ দাউদ হা/২৬৪১, তিরমিযী হা/২৬০৮।

১০. মুতাযেলা এবং অন্যান্য বিদ‘আতীদের মতে ঈমান ও গায়েবী বিষয়সমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করাই প্রাপ্ত বয়স্কের উপর সর্বপ্রথম আবশ্যক। নাউযুবিল্লাহ

১১. ছ্বহীহ: সুনানে আবু দাউদ, হা/৩১১৬।

তাওহীদুল উলুহীয়া এবং তাওহীদুর রুবুবীয়াহ

তাওহীদ ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় এবং তাওহীদই ইসলামের সর্বশেষ বিষয়। এখানে তাওহীদ দ্বারা তাওহীদুল উলুহীয়াহ উদ্দেশ্য। কেননা সাধারণভাবে তাওহীদ শব্দটি ব্যবহার করলে তা দ্বারা তাওহীদুল উলুহিয়াকেই বুঝায়। অথচ সালাফগণ কুরআন এবং হাদীছ অনুসন্ধান ও গবেষণা করে মোট তিন প্রকার তাওহীদের সন্ধান পেয়েছেন।

(১) আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কিত তাওহীদ

(২) আল্লাহর রুবুবীয়াত সম্পর্কিত তাওহীদ। রুবুবীয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসের একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু এবং

(৩) তাওহীদুল উলুহীয়াহ। আর তা হলো এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলাই ইবাদতের একমাত্র হকদার। তার এবাদতে অন্য কোনো শরীক নেই।

প্রথম প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে কথা হলো আল্লাহর ছিফাতসমূহে অবিশ্বাসীরা তার সুউচ্চ ছিফাতগুলোকে অস্বীকার করাকেই তাওহীদ হিসাবে নামকরণ করেছে। যেমন জাহাম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলীকে অস্বীকার করাকেই তাওহীদ হিসাবে নাম দিয়েছে। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলার জন্য একাধিক ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে একাধিক চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যক হয়। বোধশক্তির দলীল জাহামের কথাটিকে বাতিল সাব্যস্ত করে। কেননা ছিফাত ছাড়া মস্তিষ্কের বাইরে কোনো সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১২] মস্তিষ্ক কখনো কখনো অসম্ভব এবং অবাস্তব বস্তু সাব্যস্ত ও কল্পনা করে। কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর ছিফাতসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে জাহমীয়াদের কথা খুবই ক্ষতিকর। কারণ স্রষ্টার ছিফাতকে অস্বীকার করার মাযহাব থেকেই সর্বেশ্বরবাদের জন্ম নিয়েছে। আর এ মাযহাব দু'টি খৃষ্টানদের কুফরীর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কেননা খৃষ্টানরা শুধু ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহর অবতরণের আক্বীদাহ পোষণ করে। আর এরা বলে সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন। জাহমীয়াদের তাওহীদের সমর্থন করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের সকল লোকই ছিল পূর্ণ ঈমানদার এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত মারেফত হাসিল হয়েছিল। তারা মারেফতের সাগরেই ডুবে

---

১২. শুধু তাই নয়; আমরা যদি নশ্বর এ পৃথিবীর দিকে তাকাই, তাহলে এখানকার প্রত্যেকটি অস্তিত্বশীল বস্তুরই দু'টি দিক রয়েছে। একটি তার দেহ, আকৃতি বা গঠন এবং অন্যটি হচ্ছে সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও গুণাগুণ। মানুষেরও রয়েছে দেহ বা শরীর এবং রয়েছে তার ছিফাত ও গুণাগুণ। একজন মানুষের একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তার মানে এ নয় যে, বাস্তবেই একজন মানুষের বহু ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। সুতরাং ছিফাত ছাড়া যেহেতু কোনো সৃষ্টিই অস্তিত্বশীল নয়; তাই কেউ যদি বলে আল্লাহ আছেন, কিন্তু তার ছিফাত নেই, তাতে আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকা আবশ্যক হয়। নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং বিবেক-বোধশক্তি, বাস্তবতা এবং শরী'আতের দলীল দ্বারা জাহমীয়াদের কথা বাতিল হয়েছে।

মরেছিল। নাউযুবিল্লাহ

জাহমীয়ারা যে ধরণের তাওহীদে বিশ্বাসী, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, মূর্তিপূজকরাও হকের উপর আছে। তারা মূর্তির ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করছে; অন্য কারো নয়।[১৩]

জাহমীয়াদের তাওহীদের মাসআলা সমূহের মধ্যে এও রয়েছে যে, মা কিংবা বোন এবং দূরের মহিলাদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো পার্থক্য নেই। এমনি পানি ও মদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসহবাস করা কিংবা যেনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এসব কিছুকেই এক চোখে দেখতে হবে; শুধু তাই নয়, সবই এক। তাদের তাওহীদের অংশ এটিও যে, নাবীগণ প্রশস্ত বিষয়গুলো মানুষের উপর সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ হলো আল্লাহর রুবুবীয়াত সম্পর্কিত তাওহীদ। আর তা হলো, এ স্বীকারোক্তি প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টিজগতের এমন একাধিক স্রষ্টা নেই, যারা গুণাবলী ও কর্মসমূহে পরস্পর সমপর্যায়ের। এ প্রকার তাওহীদ সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক কালামশাস্ত্রবিদ, যুক্তিবিদ এবং একদল সুফীর নিকট এ প্রকার তাওহীদই মূল উদ্দেশ্য। বনী আদমের মধ্যে প্রসিদ্ধ কোনো দল এ প্রকার তাওহীদকে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্বকে মানুষের অন্তর-এ যেভাবে স্বীকৃতি দেয়, তার চেয়ে আরো বেশী স্বীকৃতি প্রদান করে তাওহীদে রুবুবীয়াহ এর প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা তার রসূলদের সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ১০ নং আয়াতে বলেন,

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"তাদের রসূলগণ বলেছেন, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে কি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?"

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা অজ্ঞ ছিল এবং যারা প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করেছিল, তাদের মধ্যে ফেরআউনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তবে সেও গোপনে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। যেমন মুসা (আলাইহিস সালাম) ফেরআউনকে বলেছিল,

﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾

"তুমি অবশ্যই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি। হে ফেরাউন! আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয় একজন হতভাগ্য ব্যক্তি"। *(সূরা*

১৩. স্রষ্টার বড়ত্ব, মহত্ত্ব, তার অসীম জ্ঞান, সকল সৃষ্টির উপর তার ক্ষমতা, মাখলুকের প্রতি তার অমূখাপেক্ষীতা এবং সকল দিক থেকে সৃষ্টির উপরে হওয়া ইত্যাদি সুউচ্চ ছিফাতকে অস্বীকার করার কারণেই তারা স্রষ্টাকে নগণ্য সৃষ্টির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে একাকার করে ফেলেছে।

বানী ইসরাঈল: ১০২) আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন এবং তার সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

"তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে এবং অহংকারের সাথে নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের এ মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল, তা দেখে নাও"। *(সূরা আন নামাল ২৭:১৪)*

এ জন্যই ফেরাউন যখন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেও না জানার ভান করে অস্বীকারের সুরে বলেছিল, وما رب العالمين؟ "কে সেই সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক?" তবে সে গোপনে আল্লাহর রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান রাখতো। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউনকে বলেছিল,

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"মূসা জবাব দিল, তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে সেগুলোর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, তোমরা শুনছো তো? মূসা বললো, তোমাদেরও রব এবং তোমাদের ঐসব বাপ-দাদারও রব, যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ফেরাউন বললো, তোমাদের কাছে প্রেরিত রসূল তো দেখছি একেবারেই পাগল। মূসা বললো, পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝখানে আছে তিনি সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হতে"। *(সূরা আশ শূরা ৪২:২৪-২৮)*

এক শ্রেণীর লোক মনে করেছে যে, ফেরাউন মূসা (আলাইহিস সালাম) কে স্রষ্টার হাকীকত, ছিফাত ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। আর স্রষ্টার যেহেতু কোনো ছিফাত, হাকীকত ও প্রকৃত অবস্থা ছিল না, তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউনের সামনে স্রষ্টার ছিফাত ও প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। মূলত ফেরাউন সত্য প্রত্যাখ্যান ও তা কবুল করতে অস্বীকার করার জন্যই মূসা (আলাইহিস সালাম) কে প্রশ্ন করেছিল। কুরআনের আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ফেরাউন আল্লাহর প্রতি কুফরী করেছিল এবং তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতো না যে, সে আল্লাহর ছিফাত ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানার আবেদন করতে পারে। এ জন্যই মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট। আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তার রুবুবীয়াতের প্রমাণাদি এত সুস্পষ্ট যে, তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন দরকার নেই। বরং আল্লাহু তা'আলা এতই পরিচিত, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট যে, তার সম্পর্কে অজ্ঞতার কোনো স্থান

নেই। প্রত্যেক পরিচিত ও সুস্পষ্ট বিষয়ের তুলনায় স্রষ্টার মারেফতই সৃষ্টির প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কেই জানা যায়নি যে, সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সমান গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পন্ন দু'জন স্রষ্টা রয়েছে। অগ্নিপূজকদের 'ছানুবীয়া' এবং মানুবীয়া সম্প্রদায় দু'স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তারা আলো এবং অন্ধকারকে স্রষ্টা মনে করে। তারা আরো বলে এ দু'স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টিজগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। তবে তারা সকলেই একমত যে, আলো অন্ধকারের চেয়ে ভালো। আলোই প্রশংসিত মাবুদ। আর অন্ধকার হলো নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। তবে তারা অন্ধকারের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। সেটিও আলোর মত অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তা কি না, এ ব্যাপারে পরস্পর মতভেদ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তারা সমান মর্যাদাসম্পন্ন দু'জন রবের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেনি।

যেসব খ্রিষ্টান তিন মাবুদের অস্তিত্বে এবং তিন মাবুদের ইবাদতে বিশ্বাসী, তারা সৃষ্টিজগতের জন্য এমন তিন প্রভুর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে না, যাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র-স্বনির্ভর ও পরস্পর আলাদা। বরং তারা সকলেই একমত যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা একজন মাত্র। তাই তারা কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বে বলে থাকে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে শুরু করছি। উপাস্য মাত্র একক সত্তা। তৃত্ববাদ সম্পর্কে তাদের কথা মূলতই পরস্পর সাংঘর্ষিক।

ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে তাদের কথা আরো বেশি ভ্রান্ত। এ জন্যই স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের বুঝ এলোমেলো। স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরতেও তারা এলোমেলো কথা বলে থাকে। তাদের কেউ স্রষ্টা সম্পর্কে এমন কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করে না, যার অর্থ বোধগম্য এবং খৃষ্টানদের দুইজন এক কথায় একমতও হতে পারে না। তারা বলে, তিনি স্বীয় সত্তায় এক, মূলে তিন। তারা কখনো কখনো মূলনীতিগুলোকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব, কখনো স্রষ্টার বিভিন্ন গুণাবলী এবং কখনো বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকে। ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে এ কথাগুলো ভুল হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করার যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ দুই স্রষ্টা সাব্যস্ত করে না।

এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোনো সম্প্রদায়ই সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ দুই স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। অথচ অনেক কালামশাস্ত্রবিদ, যুক্তিবিদ এবং দার্শনিক এক স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের কেউ কেউ বোধশক্তির দ্বারা একক স্রষ্টা সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে নিজের অক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছে। পরিশেষে সে ধারণা করেছে যে, আসমানী কিতাবের দলীল থেকেই স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে।

তবে যুক্তিবিদ ও কালামশাস্ত্র বিদগণের প্রসিদ্ধ মত এ যে, বোধশক্তির দলীল দ্বারাই এক আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে হবে। আর তা এ যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা যদি দুই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার সময় তাদের এক স্রষ্টা কোনো একটি সৃষ্টিকে নড়াতে

চাইলে এবং অন্য স্রষ্টা সে সৃষ্টিকে স্থীর রাখতে চাইলে অথবা তাদের এক স্রষ্টা তাকে জীবিত রাখতে চাইলে এবং অপর স্রষ্টা তাকে মেরে ফেলতে চাইলে সম্ভবত দুই মাবুদের ইচ্ছাই জয়ী হবে অথবা তাদের এক স্রষ্টার উদ্দেশ্য সফল হবে কিংবা কারো ইচ্ছাই পূরণ হবে না।

প্রথমটি অসম্ভব। কেননা এতে পরস্পর বিপরীতমূখী দু'টি বিষয় একসাথে মিলিত হওয়া আবশ্যক হয়। তৃতীয়টিও অসম্ভব। কেননা তাতে মানুষের শরীর নড়াচড়া করা এবং স্থির হওয়া থেকেও মুক্ত হওয়া আবশ্যক করে। আর এটি অসম্ভব। সেই সাথে প্রত্যেক স্রষ্টার অক্ষমতাও প্রমাণিত হয়। অক্ষম কখনো মাবুদ হতে পারে না।

আর যখন দুই স্রষ্টার মধ্যকার এক স্রষ্টার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে এবং অন্যটির উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, তখন সক্ষম স্রষ্টাই মাবুদ হিসাবে গণ্য হবেন এবং অন্য অক্ষম স্রষ্টা উলুহীয়াতের হকদার হওয়ার অযোগ্য হবে। উপরোক্ত মূলনীতিটি সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনেক যুক্তিবিদ ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থই হলো বোধশক্তির দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকতো, তবে আসমান-যমীন বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র"। *(সূরা আল আম্বীয়া ২১:২২)*

কেননা তাদের বিশ্বাস হলো, তারা যেই তাওহীদে রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করেছে তা হলো সেই তাওহীদে উলুহীয়াহ, যার বর্ণনা রয়েছে কুরআনে। রসূলগণ এ তাওহীদের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। মূলত বিষয়টি এ রকম নয়। বরং রসূলগণ যে প্রকার তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং যে বিষয়ের দাওয়াতসহ আসমানী কিতাবগুলো নাযিল হয়েছে, তা হলো তাওহীদুল উলুহীয়াহ। তবে ইহা তাওহীদে রুবুবীয়াকেও আবশ্যক করে।

তাওহীদে উলুহীয়াতের অর্থ হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, তার কোনো শরীক নেই। আরবের মুশরিকরা তাওহীদে রুবুবীয়াকে স্বীকার করতো। এ বিশ্বাস করাও তাওহীদে রুবুবীয়াতের অন্তর্ভুক্ত যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। *(সূরা লুকমান: ২৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো তাহলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা বাস করে তা কার? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা ভয় করছো না কেন?" *(সূরা মুমিনুন: ৮৪-৮৫)*

এ রকম আয়াত কুরআনে অনেক রয়েছে। মক্কার মুশরিকরা এ বিশ্বাস করতো না যে, তাদের মূর্তিগুলো সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কাজে আল্লাহর অংশীদার। বরং তাদের অবস্থা ভারতীয়, তুর্কী, বারবার এবং অন্যান্য মুশরিক জাতির মতোই ছিল। তারা কখনো কখনো মনে করতো তাদের মূর্তিগুলো নাবী-রসূল এবং সৎ লোকদের ছবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। তারা এগুলোকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এটিই ছিল আরবদের শির্কের মূল বিষয়। আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

"তারা বলেছে: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে" *(সূরা নূহ: ২৩)।*

ছহীহ বুখারী এবং তাফসীরের কিতাবসমূহ, নাবীদের ঘটনাসমূহ এবং অন্যান্য কিতাবসমূহে ছহীহ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য সালাফ হতে বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামের জাতির সৎ লোকদের নাম। এ সৎব্যক্তিগণ যখন মারা গেল তখন তাদের অনুসারীরা তাদের কবরের উপর অবস্থান করতে লাগলো। অতঃপর তাদের মূর্তি নির্মাণ করল। এভাবে যখন দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলো, তখন তারা এ মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু করে দিলো। এ মূর্তিগুলো হুবহু আরব গোত্রগুলোর কাছে পৌঁছেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি একটি করে গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন।

ছহীহ মুসলিমে আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা আমাকে বললেন,

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرني أن لا أدع صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا و لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

'আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না, যে কাজে স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন, কোন প্রাণীর ছবি

দেখলেই তা বিলুপ্ত না করে ছাড়বে না। আর কোনো উচু কবরকে মাটির সমান না করে ছাড়বে না”।[১৪]

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় বলেছেন,

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا قالت عائشة لَوْلاَ ذَلِكَ لأُبْرِزَ قَبْرُهُ ولكن كره أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»

“ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লা’নত। তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। ইহুদী-নাসারাদের শির্কী কাজ থেকে মুমিনদেরকে সতর্ক করাই ছিল এ কথার উদ্দেশ্য। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, কবরকে ইবাদতখানায় পরিণত করার আশঙ্কা না থাকলে তার কবরকে উঁচু স্থানে উন্মুক্ত রাখা হতো। কিন্তু তার কবরকে মসজিদে পরিণত করা হবে, এটি তিনি অপছন্দ করেছেন”।[১৫]

ছহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন হাবশার একটি গীর্জার কথা তার সামনে বর্ণনা করা হলো। গীর্জাটির সৌন্দর্য এবং তাতে যেসব ছবি ছিল সেগুলোর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন,

«إن أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“তারা এমন লোক, তাদের মধ্যে যখন কোনো নেককার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করতো, তখন তারা তার কবরের উপর মসজিদ তৈরী করতো এবং মসজিদে ঐগুলো স্থাপন করতো। এরাই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক।

ছহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বলেছেন,

«إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

১৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৬৯, নাসায়ী, অধ্যায়: কবর মাটির সাথে সমান করে দেয়ার আদেশ, হা/ ২০৩১।

১৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩১। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অসুস্থতা ও তার মৃত্যু।

"সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি"।[১৬]

যেসব কারণে পৃথিবীতে শির্ক এসেছে, তার মধ্যে তারকা পূজা এবং তারকা সমূহের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যমীনে সেগুলোর নামে মূর্তি তৈরী করা। বলা হয়ে থাকে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের গোত্রের শির্ক ছিল এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এমনি ফেরেশতা ও জিনদেরকেও তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করতো এবং তাদের নামে মূর্তি বানাতো।

এ সব মুশরিক স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতো এবং তারা কখনোই এ কথা বলতো না যে, সৃষ্টিজগতের দু'স্রষ্টা রয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহর মাঝে এবং তাদের নিজেদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করে নিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়"। *(সূরা আয-যুমার: ৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমীনেও না! তারা যে শির্ক করে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার বহু উর্ধ্বে" *(সূরা ইউনুস: ১৮)*।

এমনি অবস্থা ছিল পূর্বের ঐসব মুশরিক জাতির যারা রসূলদেরকে মিথ্যায়ন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা সালেহ আলাইহিস সালামের ঘটনায় তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের নয়জন শক্তিশালী লোক শপথ করে বলেছিল, আমরা রাতের বেলায় অতর্কিত হামলা করে সালেহ এবং তার পরিবারের লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবো। এ ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুশরিকরা তাদের নাবী এবং নাবীর পরিবারকে হত্যা করার জন্য শপথ করেছিল। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা বর্তমান সময়ের মুশরিকদের ঈমানের মতই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করতো।

---

১৬. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩২, অধ্যায়: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ।

তাওহীদুল উলুহীয়া ছিল নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূলভিত্তি

সুতরাং জানা গেল, নাবী-রসূলগণ যেই তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন তা হলো তাওহীদুল উলুহীয়াহ। তবে এটি তাওহীদে রবুবীয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা রূমের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣٠) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٤) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (٣٥) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾

"হে নাবী! তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারাকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহ্‌র ফিতরাত[১৭] (প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হয়ে তাকেই ভয় করো, ছ্বলাত কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তরর্ভুক্ত হয়ো না। লোকদের অবস্থা হচ্ছে, যখন তারা কোনো কষ্ট পায় তখন নিজেদের রবের দিকে ফিরে তাকে ডাকতে থাকে তারপর যখন তিনি নিজের দয়ার কিছু স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান তখন সহসা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক শির্কে লিপ্ত হয়ে যায়। যাতে আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। আচ্ছা তোমরা ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি কি তাদের কাছে কোনো দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের শির্কের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়? আর যখন লোকদের দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে এবং যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন সহসা তারা হতাশ হয়ে যায়" *(সূরা রূম ৩০:৩০-৩৬)*

---

১৭. মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম লাভকারী প্রত্যেক শিশু আসলে মানবিক প্রকৃতির উপরই জন্ম লাভ করে। তারপর তার মা-বাপ তাকে পরবর্তীতে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন প্রত্যেক পশুর পেট থেকে পুরোপুরি নিখুঁত ও সুস্থ পশুই বের হয়ে আসে। কোনো একটা বাচ্চাও কান কাটা অবস্থায় বের হয়ে আসে না। পরে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে এর কান কেটে দেয়। প্রত্যেক সন্তানই প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। যখন কথা বলতে শিখে তখন তার বাপ-মা তাকে ইহুদী-খৃষ্টানে পরিণত করে। অন্য একটি হাদীছে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ঈয়ায ইবনে হিমার আল মুজাশি'য়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, একদিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষণের মাঝখানে বলেন, আমার রব বলেন, আমার সমস্ত বান্দাদেরকে আমি একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি, তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিপথগামী করে এবং তাদের জন্য আমি যা কিছু হালাল করে দিয়েছিলাম সেগুলোকে হারাম করে দেয় এবং তাদেরকে হুকুম দেয় আমার সাথে এমন বস্তুকে শরীক করতে, যেগুলোকে শরীক করার জন্য আমি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইবরাহীমের ১০ নং আয়াতে বলেন,

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾

"তাদের রসূলগণ বলেছিলেন, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ আছে কি?" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كل مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّـرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَـانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» (بخارى:١٣٥٩)

"প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা ইহুদী হলে তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয় অথবা খৃষ্টান হলে তাকে খৃষ্টান বানিয়ে দেয় অথবা অগ্নি পূজক হলে তাকে অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটি চতুষ্পদ জন্তু হিসাবেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক-কান কাটা দেখতে পাও কি?"

এটা বলা যাবে না যে, এখানে অর্থ হলো শিশু এমন সাদাসিধে অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে যে, সে না জানে তাওহীদ এবং না জানে শির্ক কী জিনিস। কেউ কেউ এ কথা বলে থাকে। তাদের কথা ঠিক নয়। তার দলীল হলো উপরোক্ত আয়াতগুলো। হাদীছে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

«إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ»

"নিশ্চয়ই আমি আমার বান্দাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাসী করেই সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে তাদের দীন থেকে সরিয়ে ফেলেছে"।[১৮]

একটু পূর্বে যে হাদীছ অতিক্রান্ত হয়েছে, তা এ কথাই প্রমাণ করে। তাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، "তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয় অথবা তাকে খৃষ্টান বানিয়ে দেয় অথবা তাকে অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়"।

এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি যে, ويسلمانه "অথবা তারা তাকে মুসলিম বানিয়ে দেয়"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক শিশুই মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, এ মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদই প্রদান করেছেন। বিবেক ও জ্ঞানগত দলীলসমূহ এ কথারই সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। জ্ঞানগত দলীলসমূহ নিম্নরূপ:

---

১৮. মুসলিম হা/২৮৬৫ অধ্যায়: জান্নাত এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও অধিবাসীদের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা দুনিয়াতে জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে জানা যায়।

(১) কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ এমনসব আক্বীদাহ, ধারণা ও পরিকল্পনা অর্জন করে, যা কখনো সত্য হয় আবার কখনো মিথ্যা হয়। আর মানুষ তো ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চলমান সংবেদনশীল সৃষ্টি। তার মধ্যে হক বা বাতিলের যে কোনো একটি থাকবেই। সেই সাথে দু'টির একটিকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিষয় মানুষের স্বভাবের মধ্যে থাকা আবশ্যক। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, যখন প্রত্যেক মানুষের নিকট স্রষ্টার অস্তিত্বকে সত্যায়ন করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি পেশ করা হয় এবং তাকে মিথ্যায়ন ও তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি পেশ করা হয়, তখন সে স্বীয় সৃষ্টিগত স্বভাবের দ্বারাই সত্যায়ন করা ও উপকৃত হওয়ার দিকেই ধাবিত হবে। বিষয়টি যখন ঠিক এ রকম, তাই স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করাই সঠিক অথবা সঠিকের বিপরীত। এখানে দ্বিতীয় কথাটি অকাট্যভাবেই বাতিল।

সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রথমটিই সুসাব্যস্ত হয়েছে। অতএব মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, যা স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি জানায়। তারপর দেখতে হবে বান্দার ফিতরাতের মধ্যে কি এমন বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, যা বান্দার জন্য উপকারী? না কি উপকারী জিনিসের প্রতি তার অন্তরে কোনো আগ্রহ ও ভালোবাসা নেই? এখানে দ্বিতীয় কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, বান্দার ফিতরাতের মধ্যে এমন বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, যা তার জন্য উপকারী।

(২) মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে তার নিজের জন্য কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে তার বোধশক্তি ও পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারাই তা করে থাকে। তবে প্রত্যেক মানুষের ফিতরাত নিজের জন্য কল্যাণ অর্জন কিংবা নিজ থেকে অকল্যাণ দূর করতে স্বয়ং সম্পন্ন নয়। সুতরাং ফিতরাত দ্বারা মানুষ তার নিজের জন্য কল্যাণকর জিনিসকে বেছে নিতে পারে এবং তার জন্য যা ক্ষতিকর, তা চিহ্নিত করতে পারে ও তা থেকে সাবধান হতে পারে। তবে প্রত্যেক মানুষের ফিতরাত নিজস্ব ক্ষমতা বলে তা অর্জন করতে পারে না। বরং তার জন্য সহায়ক বস্তুর প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ফিতরাতকে সঠিক শিক্ষা প্রদান করা ও সঠিক পথে পরিচালিত করা অথবা অনুরূপ অন্য কিছু দিয়ে ফিতরাতকে সাহায্য করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যখন ফিতরাতের জন্য সহায়ক বস্তু পাওয়া যাবে এবং তার থেকে প্রতিবন্ধক দূর হবে, তখনই ফিতরাতের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার যে দাবী রয়েছে, সে দাবি পূরণের পক্ষেই সাড়া প্রদান করবে।

(৩) এটা জানা কথা যে, প্রত্যেক মানুষই ইলম অর্জন এবং সত্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা পোষণ করার যোগ্যতা রাখে। তবে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করা এবং সত্য সম্পর্কে জানার উৎসাহ প্রদান করা জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়; সত্য সম্পর্কে জানার জন্যও যথেষ্ট নয়। মানুষের হৃদয়ে যদি সত্য কবুল করার মত শক্তি এবং তার প্রতি অন্তরের ঝোক না থাকে, তাহলে সে কখনোই সত্য কবুল করতে পারবে না। কেননা নির্বোধ ও পশুকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে এবং তার প্রতি উৎসাহ দিলেও কোনো কাজ হয় না। আর এ কথাও জানা যে, বাইরে

থেকে আলাদা কোনো শিক্ষা ও সহায়ক বস্তু ছাড়াই মানুষের নফ্স স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের নিজের সত্তাই যথেষ্ট। সুতরাং নফসের মধ্যে যখন এ দাবী থাকে এবং তা যখন বিরোধমুক্ত হয় তখন বিরোধমুক্ত দাবি তার চাহিদা মোতাবেক বিষয় হাসিল হওয়া আবশ্যক করে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে, বিরোধমুক্ত ও পরিশুদ্ধ ফিতরাতকে যদি বাইরের কোন জিনিস দ্বারা বিপর্যস্ত না করা হয়, তাহলে সেটা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তার ইবাদতকারীতে পরিণত হয়।

(৪) এটা বলা যেতে পারে যে, ফিতরাতের জন্য যখন বাইরের কোনো নষ্টকারী কিংবা সংশোধনকারী না থাকে, তখন তা সংশোধিত ও আসল অবস্থায় থাকার দাবি রাখে। কেননা তাতে ইলম অর্জন এবং সত্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেই সঙ্গে তার কোনো বিরোধীও বিদ্যমান নেই।

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, যুক্তিবাদী ও কালামশাস্ত্রবিদদের একদল লোক স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাওহীদে রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যুক্তি-তর্ক পেশ করার জন্য তার সাথে আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তখন তাদেরকে তিনি বললেন, এ মাসআলার ব্যাপারে আলোচনায় বসার আগে আমাকে বলো, এটি কি সম্ভব যে, ইরাকের দিজলা নদীতে নৌকা একাই চলাচল করে? নৌকা কি নিজে নিজেই খাদ্যদ্রব্য, পণ্য সামগ্রী ইত্যাদি একাই বোঝাই করে? একাই যাত্রা করে এবং একাই ফিরে আসে ও ঘাটে থেমে যায়? মালপত্র নামিয়ে এটি কি আবার একাই ফিরে যায়? কারো পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ছাড়াই নৌকার পক্ষে কি এসব কাজ করা সম্ভব? তারা সকলেই বললো, এটা অসম্ভব। নৌকার পক্ষে কখনোই তা করা সম্ভব নয়।

এবার ইমাম তাদেরকে বললেন, একটি নৌকার পক্ষে যখন পরিচালক ছাড়া চলাচল করা সম্ভব নয়, তাহলে এ বিশাল সৃষ্টিজগতের উর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতের সবকিছুর পক্ষে কী করে একাই সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করা সম্ভব হতে পারে!! ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) ছাড়া অন্যদের থেকেও এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সুতরাং কোনো লোক যদি তাওহীদে রুবুবীয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করে, যার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এ যুক্তিবাদীরা, সুফীদের অনেকেই যাতে একাকার হয়ে যাচ্ছে, তরীকাপন্থীরা যাকে একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে ঠিক করে নিয়েছে এবং যা উল্লেখ করেছেন, مَنَازِلِ السَّائِرِين গ্রন্থকার এবং অন্যরা, তা সত্ত্বেও সে যদি এককভাবে আল্লাহর ইবাদত না করে এবং তার ইবাদত ব্যতীত অন্যান্যদের ইবাদত বর্জন না করে তাহলে সে অন্যান্য মুশরিকদের ন্যায় মুশরিক হিসাবেই থেকে যাবে।

কুরআনে রয়েছে তাওহীদে রুবুবীয়াতের বিস্তারিত আলোচনা, তার বিশদ বর্ণনা এবং তার বহু উপমা, উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত। কুরআন তাওহীদে রুবুবীয়াহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা নেই। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই,

তাই সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। সুতরাং আল্লাহর রুবুবীয়াতই তার উলুহীয়াতের দলীল। কেননা তারা যেহেতু রুবুবীয়াতকে মেনে নিয়েছে এবং উলুহীয়াতের ব্যাপারে মতভেদ করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা যখন মেনে নিয়েছো যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা নেই, তিনিই যেহেতু তার বান্দাদের উপকার করা এবং তাদের থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখেন, এসব বিষয়ে যেহেতু তার কোনো শরীক নেই বলে তোমরা স্বীকার করে নিয়েছো, তাহলে কেন তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করছো এবং তার সাথে অন্যান্য মাবুদ নির্ধারণ করছো?

আল্লাহ তা'আলা সূরা নামলের ৫৯-৬৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١) أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"হে নাবী! বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তার এমন সব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আল্লাহ উত্তম? না কি সেই সব মাবুদ যাদেরকে তারা তার শরীক করেছে? কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করছেন তারপর তার সাহায্যে এমন মনোরম বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছেন, যার গাছপালা উদগত করা তোমাদের আয়ত্তাধীন ছিল না? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলেছে। আর তিনি কে যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী ও তার মধ্যেই গড়ে দিয়েছেন পর্বত মালার পেরেক, আর দু'সাগরের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর সাথে এসব কাজের শরীক অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ। কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শুনেন যখন সে তাকে আহবান করে কাতরভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন? আর কে তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জল ও স্থলে অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাস কে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে এ শির্ক থেকে যা এরা করে থাকে। আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা

করেন এবং তারপর আবার এর পূনরাবৃত্তি করেন? আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে প্রমাণ করো"।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটির শেষে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্ন করেছেন, أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ؟ "আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?" অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য এমন কোনো ইলাহ আছে কি যে এগুলোতে আল্লাহর শরীক থাকে? এটি হচ্ছে অস্বীকারের প্রশ্ন। জানার জন্য এ প্রশ্ন করা হয়নি। এ প্রশ্নটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা, প্রভু এবং ইলাহ থাকাকে অস্বীকার করেছে। বাস্তবেই মক্কার মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপরোক্ত কাজগুলো করেনি। সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন। এখানে প্রশ্ন করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি না? যেমন কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। কেননা এ অর্থ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গের সাথে খাপ খায় না। বিশেষ করে যখন জানা গেল, সে সময়ের আরবের মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদতের সাথে বহু মাবুদের ইবাদত করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾

"এদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়? বলো, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং আর যার কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি। সত্যিই কি তোমরা এমন সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহর সাথে আরো অনেক ইলাহ আছে? বলো, আমি তো কখনোই এমন সাক্ষ্য দিতে পারি না। বলো, আল্লাহ তো মাত্র এক এবং তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত" *(সূরা আল আন'আম: ১৯)*। মক্কার মুশরিকরা বলতো,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

"সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! *(সূরা সোয়াদ: ৫)*

কিন্তু তারা এ কথা বলতো না যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন কোনো মাবুদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল না, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যেই গড়ে দিয়েছেন পর্বত মালার পেরেক, আর দুই সাগরের মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। *(সূরা নামল: ৬১)* বরং তারা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা একাই এ কাজগুলো করেছেন। অন্যান্য আয়াতগুলোর অর্থও অনুরূপ। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে লোক সকল! ইবাদাত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে"। *(সূরা আল-বাকারা: ২১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ আছে যে এগুলো তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে? দেখো, কিভাবে আমরা বারবার আমাদের নিদর্শনগুলো তাদের সামনে পেশ করি? এরপরও তারা কিভাবে এগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়"। *(সূরা আল-আনআম: ৪৬)* অনুরূপ আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

তাওহীদুর রুবুবীয়াকেই এসব যুক্তিবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদ এবং তাদের অনুসারী সুফীরা সর্বোচ্চ তাওহীদ হিসাবে তাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। অথচ এটি সেই তাওহীদুল উলুহীয়ারই অন্তর্ভুক্ত, যা নিয়ে আগমন করেছেন নাবী-রসূলগণ এবং যা সহ নাযিল হয়েছে সমস্ত আসমানী কিতাব।

সুতরাং যখন জানা গেলো যে, তাওহীদুর রুবুবীয়াহ যেহেতু তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবে আলোচিত তাওহীদেরই অন্তর্ভুক্ত, তখন সকলের জন্য জেনে রাখা আবশ্যক যে, নাবী-রসূলগণ যে তাওহীদের আহবান জানিয়েছেন, তার অসংখ্য দলীল রয়েছে। তার মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্তের দলীলসমূহ এবং রসূলদের সত্যতার প্রমাণসমূহ অন্যতম। কেননা মানুষ স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি যত বেশী প্রয়োজন অনুভব করবে, তার রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের দলীলগুলো তাদের কাছে ততোই সুস্পষ্ট হবে। সৃষ্টির উপর রহমত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা নিজেই এগুলো মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এগুলো নিছক বিবেক-বুদ্ধির মূল্যায়নে উপকারী দৃষ্টান্ত হলেও তা দ্বারা দীনী উদ্দেশ্য হাসিল হয়। কিন্তু কুরআন বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করে না। সুতরাং সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর গোমরাহী ছাড়া আর কী থাকতে পারে? কোনো বিবরণ থেকে বিবেক ও বোধশক্তি যখন এমন কোনো প্রমাণিত তথ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, যা সর্ব সমর্থিত তখন তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং তার পক্ষে অন্য কোনো দলীল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না।

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবেক ও জ্ঞানগত দলীল-প্রমাণগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে, কাট-ছাঁট ও পরিপাটি করে এবং সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরতে হবে। এটিই কুরআনের পদ্ধতি। কিন্তু এতে ঐসব মূর্খের দল দ্বিমত পোষণ করে, যারা ধারণা করে যে, কুরআনে বিবেক ও বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ নেই। তবে যেসব বিষয় কখনো কখনো অস্পষ্ট থাকতে পারে এবং যাতে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কুরআন তা খোলাখুলি বর্ণনা করেছে এবং সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

রুবুবীয়াতের মধ্যে শির্ক সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি সকল মানুষেরই জানা ছিল। তারা কখনো এমন দু'স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেনি, যাদের উভয়ের ছিফাতসমূহ ও কর্মসমূহ পরস্পর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কতেক মুশরিক মনে করেছে যে, এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে, যে কতিপয় মাখলুক সৃষ্টি করেছে। যেমন ছানুবীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ধকারকে মন্দের স্রষ্টা মনে করে, কাদেরীয়ারা মনে করে মানুষ এবং প্রাণীর কাজ-কর্ম সে নিজেই সৃষ্টি করে এবং মহাকালের প্রভাবে বিশ্বাসী দার্শনিকরা তারকার চলাচল অথবা প্রাণীর আত্মার স্পন্দনকে অথবা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে স্রষ্টা মনে করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরা এমন কিছু সৃষ্টির অস্তিত্ব সাব্যস্ত করছে, তাদের ধারণায় যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। তারা রুবুবীয়াতের কিছু কিছু বিষয়ে মুশরিক হিসাবে গণ্য। আরব মুশরিকদের কিছু লোক তাদের মাবুদদের মধ্যে কিছু কল্যাণ করার ক্ষমতা থাকা এবং কিছু ক্ষতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করতো। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের মাবুদরাই কিছু কল্যাণ সাধন কিংবা ক্ষতি প্রতিহত করতে পারে।[১৯]

সুতরাং কিছু সংখ্যক মানুষ যেহেতু রুবুবীয়াতের মধ্যে শির্কে লিপ্ত হয়েছিল, তাই কুরআন তা বাতিল সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদই নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র"। *(সূরা আল মুমিনুন: ৯১)*

এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বাক্যের মাধ্যমে যে উজ্জল প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে, তার ব্যাপারে আপনি চিন্তা করুন। কেননা সত্য ইলাহ যিনি হবেন, তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করা

১৯. তবে এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা সর্বদাই কম ছিল, যা গণনার আওতায় পড়ে না।

ও কর্ম সম্পাদন করার গুণাবলী সম্পন্ন হতে হবে এবং সৃষ্টির কল্যাণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে ও তাদের থেকে অকল্যাণ দূর করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

অতএব, আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি অন্য এমন কোনো ইলাহ থাকতো, যে আল্লাহর রাজত্বের অংশীদার, তাহলে তার জন্যও সৃষ্টি করা ও কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক হতো। তখন আল্লাহ তা'আলা কখনোই সেই অংশীদারিত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন না। বরং সেই শরীককে পরাজিত করার ক্ষমতা থাকা এবং তার নিকট থেকে রাজত্ব ও ইলাহিয়াত ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা থাকার কারণে অবশ্যই তা করতেন। যেমন দুনিয়ার রাজাদের একজন অন্যজন থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ যদি অন্যকে পরাজিত করতে পারে এবং অন্যের উপর চড়াও হওয়ার সামর্থ না রাখে, তাহলে তিন অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে।

(১) প্রত্যেক ইলাহ তার সৃষ্টি ও রাজ্য নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে অথবা

(২) এক ইলাহ অন্য ইলাহর উপর চড়াও হবে।

(৩) অথবা সকলেই এক রাজার ক্ষমতাধীন থাকবে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা বাকী সকলকে পরিচালনা করবেন। কিন্তু তারা সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সত্তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বরং তিনি একাই হবেন ইলাহ আর বাকীরা সকলেই হবে সকল দিক থেকেই তার অধীনস্ত ও প্রতিপালিত বান্দা।

সৃষ্টিজগতের সকল বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়া এবং তার নিয়ম-কানুন সুদৃঢ় হওয়াই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক হলেন একক ও অদ্বিতীয় ইলাহ। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, একমাত্র প্রভু, তিনি ছাড়া সৃষ্টিজগতের অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের আর কোনো রবও নেই। সুতরাং বিবেক ও বোধশক্তির দলীল প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা হলেন মাত্র একজন, তিনি ছাড়া আর কোনো রব নেই এবং তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদও নেই। সুতরাং সকল সৃষ্টি ও সৃষ্টির কাজ-কর্মের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তাই ইবাদত এবং ইলাহীয়াতও একমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সমান যোগ্যতা সম্পন্ন দু'স্রষ্টা ও দু'জন রব থাকা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি তাদের জন্য দু'জন মাবুদ থাকাও অসম্ভব।

সুতরাং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী দু'জন স্রষ্টার দ্বারা এ সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্বে এসেছে, -এ বিশ্বাস করা মূলতই অবাস্তব। মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যে দ'জন স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি অবাস্তব হওয়ার বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং বিবেক ও বোধশক্তির সুস্পষ্ট দলীল দ্বারাও ঐ ধারণা বাতিল হয়েছে। অতএব এভাবেই দ'জন মাবুদের উলুহীয়াত বাতিল সাব্যস্ত হলো।

সুতরাং সৃষ্টিগত স্বভাব ও বোধশক্তির মধ্যে যে তাওহীদে রুবুবীয়াত বদ্ধমূল, স্থির ও স্থায়ী হয়ে আছে, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছে। একই সঙ্গে

মানুষের প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত স্বভাব একদিক থেকে যেমন আল্লাহর রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করছে, অন্যদিকে তাওহীদুল উলুহীয়াতকেও আবশ্যক করছে।

নিম্নের আয়াতটিও উপরোক্ত আয়াতের সমর্থ জ্ঞাপক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য মাবুদ থাকত, তবে আসমান-যমীন বিধ্বস্ত হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র"। *(সূরা আল আম্বীয়া: ২২)*

কোনো কোনো সম্প্রদায় মনে করেছে যে, এটিই হলো বোধশক্তির সে দলীল যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো সৃষ্টিজগতের জন্য পরস্পর সমান যোগ্যতা সম্পন্ন দু'জন স্রষ্টা থাকা অসম্ভব। তারা আসলে আয়াতের অর্থ বুঝতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমান-যমীনে যদি তিনি ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকতো.....। তিনি তো এটি বলেননি যে, যদি আসমান ও যমীনে একাধিক রব থাকতো.....।

আসমান যমীন-সৃষ্টি হওয়ার পর এ কথা বলা হয়েছে। আসমান-যমীন থাকা অবস্থায় যদি তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদ থাকতো, তাহলে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لفسدتا আসমান-যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। তিনি এ কথা বলেননি যে, তা সৃষ্টিই হতো না। মোটকথা আয়াত প্রমাণ করছে যে, আসমান-যমীনে একাধিক ইলাহ থাকা অবৈধ। শুধু তাই নয়; এক ইলাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকা সম্ভবই নয়। আর এ এক ইলাহ হলেন আল্লাহ তা'আলা। আসমান-যমীনে বহু ইলাহ হওয়া মানেই তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সে এক ইলাহ যদি অন্য কেউ হয় তাতেও আসমান-যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের একমাত্র মাবুদ বলেই তা সংশোধিত অবস্থায় রয়েছে। সৃষ্টিজগতের জন্য যদি দু'জন মাবুদ থাকতো, তাহলে সৃষ্টিজগতের শৃংখলা নষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং এক আল্লাহর ইনসাফের বদৌলতেই সৃষ্টিজগতের শৃংখলা টিকে আছে এবং তার আদলের কারণেই আসমান-যমীন সুশৃংখল সু-নিপুন অবস্থায় রয়েছে। শির্ক হলো সর্বাধিক বড় যুলুম আর তাওহীদ হলো সর্ববৃহৎ ইনসাফ।

তাওহীদুল উলুহীয়াহ তাওহীদুর রুবুবীয়াতকেও শামিল করে। কিন্তু তাওহীদুর রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করলেই তাওহীদুল উলুহীয়াহর বাস্তবায়ন হয় না। যে সৃষ্টি করতে পারে না, সে অক্ষম। আর অক্ষম কখনো ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾

"তারা কি এমন জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট?"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৯১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?" *(সূরা আন নাহাল: ১৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾

"হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহ থাকতো যেমন এরা বলে থাকে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৪২)*

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পরবর্তী যুগের আলেমদের দু'টি মত রয়েছে।

(১) আরশের মালিককে পরাজিত করার চেষ্টা করতো।

(২) তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতো। কাতাদাহ এবং অন্যান্য সালাফ থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এটিই সঠিক মত। ইমাম ইবনে জারীর এ মতটি ছাড়া অন্য কোন মত উল্লেখ করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾

"এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে"। *(সূরা দাহর: ২৯)*

দ্বিতীয় মতটি সঠিক হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾

"যদি আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহ থাকতো যেমন এরা বলে থাকে"।

কিন্তু তারা এটি বলতো না যে, সৃষ্টিজগতের জন্য দু'জন স্রষ্টা রয়েছে। বরং তারা আল্লাহর সাথে এমনসব মাবুদ গ্রহণ করেছিল, যাদেরকে তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী মনে করতো। তারা বলেছিল,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

"আমরা তো তাদের এবাদাত করি শুধু এ কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে"। *(সূরা আয-যুমার: ৩)* এটি প্রথমোক্ত আয়াতের বিপরীত।

রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন, তার প্রকারভেদ

রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি তাদের উম্মতদেরকে আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহর কিতাবসমূহে যে তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে তা দু'প্রকার।

(১) আল্লাহর পরিচয় ও তার ছিফাত সম্পর্কিত তাওহীদ এবং

(২) আবেদন-নিবেদন, উদ্দেশ্য ও নিয়ত সম্পর্কিত তাওহীদ।[২০]

প্রথম প্রকার হলো, মহান প্রভুর সত্তার বাস্তবতা, তার গুণাবলী, কার্যাবলী এবং তার নামসমূহ সাব্যস্ত করা। উপরোক্ত বিষয়াবলীর কোনটিতেই তার সদৃশ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে এ খবর দিয়েছেন এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপ সংবাদ দিয়েছেন। কুরআন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে এ প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে।

সূরা হাদীদের প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

---

২০. বান্দা যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে কিংবা অকল্যাণ প্রতিহত করার আশা করে যেমন দু'আ করা, ছলাত আদায় করা, সাহায্য চাওয়া, আশ্রয়প্রার্থনা করা, কোরবানী করা, মানত করা ইত্যাদিকে তাওহীদুদ তালাব ওয়াল কাসাদ বলা হয়। অনেক আলেম এটিকে তাওহীদুল উলুহীয়াহ হিসাবেও নাম রেখেছেন। তাদের অনেকেই আবার তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) তাওহীদুর রুবুবীয়াহ,

(২) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ ছিফাত এবং

(৩) তাওহীদুল উলুহীয়াহ।

শাইখ ইবনে আবীল প্রথম দু'টিকে আল্লাহ তাআলার কর্ম ও গুণাবলী সংক্রান্ত তাওহীদকে একই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাওহীদের এ প্রকারভেদ কুরআন-হাদীছের কোন প্রকাশ্য দলীল থেকে গ্রহণ করা হয়নি; বরং কুরআন ও হাদীছের সমস্ত বক্তব্য থেকেই তাওহীদের এ প্রকারভেদের ধারণা এসেছে। বিদআতীদের অনেকেই বলে থাকে, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম তাওহীদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাদের এ কথা ঠিক নয়; বরং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, মুজাহিদ, ইবনে বাত্তা, ইবনে মান্দাসহ আরো অনেক সালাফ থেকেই তাওহীদকে একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রমাণ পাওয়া যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী আলেমদের কথাকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"আসমান ও যমীনসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ। পৃথিবী ও আকাশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিক তিনিই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশিত, তিনিই অপ্রকাশ্য[২১] এবং তিনিই সব বিষয়ে অবহিত। তিনিই

---

২১. আলেমগণ ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ আল্লাহ তাআলার এ নামগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত উপরোক্ত ছ্বহীহ হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এগুলোর ব্যাখ্যা এসেছে, তাই এসব ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ তা'আলার এ চারটি নাম তথা الأَوَّل (সর্বপ্রথম) ও الآخر (সর্বশেষ) এবং الظَاهِر (সব কিছুর উপরে) ও البَاطِن (অতি নিকটে) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকেই সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। الأَوَّل (সর্বপ্রথম) ও الآخر (সর্বশেষ) -এই দু'টি নাম প্রমাণ করে যে, তিনি সমস্ত কাল ও যামানাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ স্থান, কাল এবং তাতে যত মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি ছিলেন। স্থান, কাল ও সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখনো তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবেনা তখনো তিনি থাকবেন।

আর আল্লাহ তাআলার الظَاهِر (সবকিছুর উপরে) ও البَاطِن (অতি নিকটে) এ নাম দু'টি প্রমাণ করে যে, তিনি উর্ধ্বজগৎ এবং নিম্নজগতের সকল স্থান এবং সেসব স্থানের সব কিছুকেই ঘেরাও করে আছেন।

আল্লাহর যাহের নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সকল মাখলুকের উপরে। আরবী ভাষায় প্রত্যেক বস্তুর উপরের অংশকে যাহের বলা হয়। সকল মাখলুক তার নীচে। তার উপরে কোন মাখলুক নেই।

কেউ কেউ যাহের অর্থ করেছেন যে, তিনি প্রকাশ্য। তাদের মতে الظهور থেকে الظاهر নামটি এসেছে। ظهور অর্থ প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং তিনি তার নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে মানুষের বিবেকের নিকট অত্যন্ত প্রকাশিত। আর তিনি الباطن অপ্রকাশ্য এই হিসাবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য দৃশ্যমান জিনিসের মত তাকে দেখা যায় না।

সুতরাং এ চারটি নামের মূল অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই ঘেরাও করে আছেন। সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান থাকা এবং সব সৃষ্টির শেষেও অনন্তকাল তার অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সবশেষে যেসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, তার সবই তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি যাহের তথা সবকিছুর উপরে হওয়া এবং বাতেন তথা সবকিছুর নিকটে হওয়ার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বস্তুকেই ঘেরাও করে আছেন।

সে হিসাবে আল্লাহ তাআলার الأول নামটি তার সর্বপ্রথম হওয়ার প্রমাণ করে। তার الآخر নামটি তার চিরস্থায়িত্বের প্রমাণ করে। তার الظاهر নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সবকিছুরে উপরে এবং তিনি সর্বাধিক মহান। আর আল্লাহ তাআলার الباطن নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টির অতি নিকটে এবং তাদের সাথে।

আল্লাহ তাআলার الباطن নামটির ব্যাখ্যায় আলেমদের থেকে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। ছ্বহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ অর্থাৎ তুমি অতি নিকটে, তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, الباطن অর্থ নিকটে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মাখলুকের নিকটবর্তী এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে তাদেরকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের সকল গোপন এবং অস্পষ্ট বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ "আমি তোমাদের চেয়ে সে মুমূর্ষ ব্যক্তির অধিক

আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন। আসমান ও যমীনের নিরংকুশ সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তারই। সব ব্যাপারের ফায়সালার জন্য তার কাছেই

নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। (সূরা ওয়াকিয়া: ৮৫) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের শাহ রগের চেয়েও অধিক নিকটে আছি"। *(সূরা কাফ: ১৬)*

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা ভিতর এবং বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার তত নিকটে যত নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় পাকড়াও করতে হয় তখনো আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্বাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে বন্দী করবো।

কেউ কেউ বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির দৃষ্টিসীমা ও ধারণার অন্তরালে এবং অপ্রকাশ্য। যারা এ কথা বলেছেন, তাদের কেউ কেউ একটু বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অপ্রকাশ্য, তাই পৃথিবীর কোথাও তাকে খুঁজে বের করা বা তার দেখা পাওয়া যাবে না। তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রীয়সমূহ দ্বারা তার সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তার রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যারা আল্লাহ তা'আলার الباطن নামের উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন, তারা তার الظاهر নামের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যাহের অর্থ প্রকাশ্য। তারা উভয় নামের অর্থ এভাবে করেছেন যে, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য। তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যেসব জিনিস প্রকাশমান তা তারই গুণাবলী, তারই কার্যাবলী এবং তারই নূরের প্রকাশ।

কেউ কেউ বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر اذا عرفت باطنه তিনি সকল গুপ্ত বস্তু সম্পর্কে অবগত। যেমন বলা হয়, بطنت الأمر আমি বিষয়টির গোপন অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ কথা আপনি ঠিক তখনই বলেন, যখন ঐ বিষয়ের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। দেখুন, শাইখ সিন্দী (রঃ) এর টিকাসহ ইবনে মাজাহ, *(৮/২১৭)*

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীছে যেহেতু বলা হয়েছে الظاهر অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপরে, তার উপরে আর কিছু নেই, তাই যাহেরের মোকাবেলায় الباطن এর অর্থ এ রকম বলা যাবে না যে, তিনি সবকিছুর নীচে, তার নীচে আর কিছুই নেই, নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ আমাদের নীচে, এটি বলা অবৈধ। কেননা কোন কিছুর নীচে হওয়া ত্রুটিপূর্ণ ছিফাত বা বিশেষণ। আল্লাহ তাআলার সত্তা উপরে হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত, নীচে হওয়ার বিশেষণে নয়। উপরে হওয়া আল্লাহর সিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত গুণ।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত চারটি নামের ব্যাখ্যায় উপরে বর্ণিত অর্থগুলোর সবগুলোই বা অধিকাংশই সঠিক। তবে ঐ নামগুলোর ব্যাখ্যায় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তাই আমাদের বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া আবশ্যক। যে অর্থ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তার বিপরীত ছাহাবী, তাবেঈ এবং সালাফে সালেহীন থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং তা গ্রহণ করাই অধিক নিরাপদ।

ফিরে যেতে হয়। তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কেও অবহিত"।

সূরা ত্বহার প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

"যেই সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষ থেকে এটি নাযিল করা হয়েছে। পরম দয়াবান আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে, পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে যা আছে এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে, সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চেয়েও গোপনে বলা কথাও জানেন। তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ"। *(সূরা ত্বহা: ৩-৮)*

সূরা হাশরের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত), তিনি رَحْمَٰنُ (পরম করুনাময়) এবং رَحِيمُ (অসীম দয়ালু)। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَلَام (শান্তিদাতা), مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষাকারী), عَزِيز (পরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী), مُتَكَبِّر (মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তার জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী) ও حَكِيم (প্রজ্ঞাবান)"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা সেজদার প্রথম দিকে বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

"আল্লাহই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত উপরে তার কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময়। যিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপে এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির সংমিশ্রণ থেকে। তারপর তাকে সুঠাম সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় স্থাপন করে দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো"। *(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ:৪-৯)*

সূরা আলে-ইমরানের শুরুর দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

"আল্লাহ একক সত্তা, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুর ব্যবস্থাপক ও ধারক"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১)*

আল্লাহ তা'আলা একই সূরায় আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। এ প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৫-৬)*

সূরা আল-ইখলাছের পুরোটাই আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"হে নাবী তুমি বলো, তিনি আল্লাহ্ একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"।

এমনি আরো বহু আয়াতে এ প্রকার তাওহীদের বিবরণ এসেছে।[২২]

আর কুরআন মাজীদের সূরা কাফিরূনে দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ তথা বান্দার আবেদন-নিবেদন, উদ্দেশ্য ও নিয়ত সম্পর্কিত তাওহীদের বিবরণ এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

"হে নাবী বলো, হে কাফেররা! আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা করো। আর না তোমরা তার ইবাদত করো, যার ইবাদত আমি করি। আর না আমি তাদের ইবাদত করবো, যাদের ইবাদত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদত করবে, যার ইবাদত আমি করি তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য"।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

---

২২. আয়াতুল কুরসীতেও আল্লাহ তা'আলার বেশ কিছু অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন। তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান"। *(সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫)*

"হে নাবী বলো, হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এ যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবে না। তারপরও যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যই মুসলিম"।

সূরা যুমারের প্রথম দিকে ও শেষ দিকে তাওহীদুল উলুহীয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"অতএব, তুমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। জেনে রাখো! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না"। *(সূরা আয-যুমার: ২-৩)* একই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ﴾

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করো, তবে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো"। *(সূরা আয-যুমার: ৬৫-৬৬)*

সূরা ইউনুসের প্রথম দিকে, মাঝামাঝি এবং শেষের দিকেও একই বিষয়ের আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"তিনি সকল কার্য পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তারই ইবাদত করো। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?" আল্লাহ তা'আলা এ সূরার শেষের দিকে বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"হে নাবী! বলো, হে লোকেরা! তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করি না। বরং আমি কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত করি, যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু। আমাকে মুমিনদের অন্তরর্ভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সঠিকভাবে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোনো উপকার করতে পারে, না পারে ক্ষতি করতে। যদি তুমি এএটি করো তাহলে যালেমদের দলভুক্ত হবে"।

সূরা আরাফের শুরুতে বলেন,

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

"হে লোক সকল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে থাকো"। *(সূরা আল-আরাফ: ২)* একই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো। তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তারা তোমাদের আহবানে সাড়া দিক"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৯৪)* আল্লাহ তা'আলা একই সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

"তোমার রবের সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তার ইবাদতে বিরত হয় না, বরং তারা তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তার সামনে সিজদাবনত হয়"।

সূরা আন'আমের সর্বত্রই তাওহীদুল উলুহীয়ার বিশদ বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"আমি একনিষ্ঠ হয়ে স্বীয় চেহারা ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত নই" *(সূরা আল আন'আম: ৭৯)*।

মোটকথা কুরআনের অধিকাংশ সূরাতেই উপরোক্ত দু'প্রকার তাওহীদের আলোচনা রয়েছে। বরং প্রত্যেক সূরাতেই রয়েছে তাওহীদের আলোচনা। কেননা কুরআনে যা রয়েছে, তা হয়ত আল্লাহ এবং তার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে, আর এটি হলো আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত তাওহীদ। অথবা তাতে রয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান, তার কোনো শরীক নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যেসব জিনিসের ইবাদত করা হয়, তা বর্জনের আদেশ। আর এটি হলো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, চাওয়া ও আবেদন-নিবেদন সংক্রান্ত তাওহীদ।

অথবা কুরআনে রয়েছে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ এবং তার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা। আর এগুলো হলো তাওহীদের হক ও পরিপূরক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। অথবা তাতে রয়েছে তাওহীদপন্থীদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে সম্মানিত করা, দুনিয়াতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করা এবং আখিরাতে তিনি তাদেরকে যা দিয়ে সম্মান করবেন তদসংক্রান্ত বিষয়াদি। আর এটি হলো তাওহীদ বাস্তবায়নের বিনিময় স্বরূপ।

অথবা কুরআনে রয়েছে মুশরিকদের খবরাদি এবং দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক কী পরিমাণ শাস্তি দিয়েছিলেন এবং আখিরাতে তাদের জন্য কী ধরণের আযাব অপেক্ষা করছে, তার বর্ণনা। আর এটি হলো ঐসব লোকের পরিণাম, যারা তাওহীদের বিধান ও হুকুম বর্জন করেছিল।

সুতরাং সম্পূর্ণ কুরআনই তাওহীদ এবং তার হকসমূহ বাস্তবায়ন করার সুফল সম্পর্কে বিশদ বর্ণনায় ভরপুর। একই সঙ্গে তাতে রয়েছে শির্ক এবং শির্ককারীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কিত আলোচনা। আমরা যদি সূরা ফাতিহার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা"। এতে রয়েছে তাওহীদ।

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

"তিনি অতি মেহেরবান ও পরম দয়ালু"। এতেও রয়েছে তাওহীদ।

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

"তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক"। এতেও রয়েছে তাওহীদ।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই"। এতেও রয়েছে তাওহীদ।

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও"। এটি হলো সেই তাওহীদ, যাতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদপন্থীদের পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে।

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

"সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ"। এখানে তাওহীদ বাস্তবায়নকারীদের অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

"তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে"। এখানে রয়েছে, তাওহীদ বর্জনকারীদের পরিণামের বর্ণনা।

এমনি আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার ফেরেশতারাও তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার নাবী-রসূলগণও একই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দীন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৮-১৯)*

উপরোক্ত আয়াতটি তাওহীদের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করেছে এবং তাওহীদ সম্পর্কে সমস্ত গোমরাহ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেছে। সর্বাধিক মহান সাক্ষ্যদাতা সর্ববৃহৎ বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং এটি সুমহান, সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ এবং সর্বাধিক সত্য সাক্ষ্য।

সালাফগণ **شهد** শব্দের যেসব অর্থ বর্ণনা করেছেন তা হলো, হুকুম করেছেন, ফায়ছালা করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন, বর্ণনা করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন। **شهد** শব্দটি ঘুরেফিরে এ কয়টি অর্থই প্রদান করে। সবগুলো অর্থই সঠিক। তার মধ্যে কোনো পারস্পরিক বৈপরিত্য

নেই। কেননা شهادة শব্দটি সাক্ষ্যদানকারীর বক্তব্য ও তার খবরকে শামিল করে। সেই সাথে জানিয়ে দেয়া, সংবাদ দেয়া এবং বর্ণনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

সাক্ষ্য দেয়ার চারটি স্তর রয়েছে।

(১) যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হবে, সে সম্পর্কে জানা আবশ্যক এবং তার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা জরুরী।

(২) জবানের দ্বারা তা উচ্চারণ করা। যদিও উচ্চারণের মাধ্যমে কাউকে তার বিষয় সম্পর্কে জানানো সম্ভব না হয়। বরং সাক্ষ্যের বিষয়ে নিজের নফ্সের সাথে কথা বলা, তা স্মরণ করা, উচ্চারণ করা অথবা লিখে রাখাই যথেষ্ট।

(৩) সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে অন্যকে জানিয়ে দেয়া, তা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া এবং খোলাখুলি রূপে তার বিবরণ দেয়া।

(৪) এর বিষয় বস্তু অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া এবং তার আদেশ প্রদান করা।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের একত্বের সাক্ষ্য দেয়া এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এ চারটি স্তরকেই শামিল করে। আল্লাহ সুবহানাহু তার একত্বের যেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত রয়েছেন, তিনি তা দ্বারা কথা বলেছেন, তার সৃষ্টিকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ও তার সংবাদ প্রদান করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছেন ও তার বিষয় বস্তু কার্যকর করার দায়িত্ব সৃষ্টির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে ইলম থাকা জরুরী। অন্যথায় সাক্ষ্যদাতা এমন বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে, যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُم يَعْلَمُوْنَ﴾

"তবে যারা অবগত হয়ে সত্য স্বীকার করে"। *(সূরা যখরুফ: ৮৬)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,

«عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ» "এরূপ সুস্পষ্ট বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করবে"।

জবান দ্বারা সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা এবং তার সংবাদ প্রদান করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾

"তারা দয়াবান আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে। তাদের সৃষ্টির সময় কি এরা উপস্থিত ছিল? এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে" *(সূরা যুখরুফ: ১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদের কথাকে সাক্ষ্য হিসাবে নাম দিয়েছেন। যদিও তারা শাহাদাত বা সাক্ষ্য দেয়া শব্দটি উচ্চারণ করেনি এবং অন্যদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

সাক্ষ্য প্রদানের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সাক্ষ্যের বিষয় জানিয়ে দেয়া এবং সে ব্যাপারে সংবাদ দেয়া দু' প্রকার:

(১) কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া।

(২) কর্মের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া।

আদেশের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অন্যকে শিক্ষা দেয়, তার অবস্থা ঠিক এরকম। কখনো কথার মাধ্যমে শিক্ষা দেয় আবার কখনো কাজ-কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়। এ জন্যই যে ব্যক্তি তার ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে, তার ঘরের দরজা প্রশস্ত করে এবং মানুষকে সেখানে প্রবেশ করে ছালাত পড়ার অনুমতি দেয় সে মুখ দিয়ে কথা না বললেও তাকে এ ঘোষণাকারী হিসাবে ধরা হবে যে, সে তা মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। অনুরূপ যাকে দেখা যাবে সে কারো সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য নানা পথ অবলম্বন করছে, তার ব্যাপারে সে মূলত নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য ঘোষণা করছে যে, সে তাকে ভালোবাসে। যদিও সে জবান দিয়ে তা উচ্চারণ না করে। এমনি জবান দিয়ে উচ্চারণ করলেও বুঝা যাবে যে, সে তাকে ভালোবাসার ঘোষণা দিচ্ছে।

এমনি আল্লাহ তা'আলার একত্বতা সম্পর্কে তার নিজের সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো তা বর্ণনা করা ও জানিয়ে দেয়া। এটি কথার মাধ্যমে হতে পারে আবার কাজের মাধ্যমেও হতে পারে। তিনি রসূলদেরকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যা দিয়ে তার আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, তা কথার অন্তর্ভুক্ত।

কাজ-কর্মের মাধ্যমে তার একত্বতা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া ও বর্ণনা করার উদাহরণ যেমন ইবনে কাইসান বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবং তার অপরিবর্তনীয় আদেশসমূহের দ্বারা সৃষ্টির নিকট সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। অন্য একজন বলেছেন,

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِد

"প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে তিনি এক"। কাজ-কর্মের মাধ্যমেও সাক্ষ্য দেয়া যায়। তার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾

"মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণা-বেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়। তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে" *(সূরা আত তাওবা: ১৭)।*

সুতরাং তারা তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা তার নিদর্শনগুলোকে তার একত্বের দলীল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে সৃষ্টি করা ও নির্ধারণ করার দ্বারাই একত্বের দলীল বানিয়েছেন।

আর সাক্ষ্য দেয়ার চতুর্থ স্তর হলো এর বিষয়বস্তু কার্যকর করার আদেশ দেয়া এবং এতে বাধ্য করা। শুধু মুখ দিয়ে সাক্ষ্য উচ্চারণ করা এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়ন করাকে আবশ্যক করে না। কিন্তু এখানে আল্লাহ তা'আলা যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার বিষয়বস্তু বাস্তবায়ন করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা হুকুমকারীর সাক্ষ্যও হুকুমের মতই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের ফায়ছালা করেছেন, তার হুকুম করেছেন এবং বান্দাদের উপর তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো" *(সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩)।* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

"আল্লাহর ফরমান হলো, দু'ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র এক, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো" *(সূরা আন নাহাল: ৫১)।* আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, ছ্বলাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দীন" *(সূরা আল বায়্যিনাহ: ৫)।* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসারত্যাগী-বৈরাগীদিগকে তাদের প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের

ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই, তারা তার যেসব শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পূত-পবিত্র" *(সূরা আত তাওবা: ৩১)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾

"আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কাউকে মাবুদে পরিণত করো না। অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায় পথহারা হয়ে পড়বে" *(সূরা বনী ইসরাঈল: ২২)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তার সত্ত্বা ছাড়া। হুকুম করার অধিকার একমাত্র তারই এবং তারই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে" *(সূরা কাসাস: ৮৮)।*

কুরআনের প্রত্যেক স্থানেই তাওহীদের সাক্ষ্য বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাওহীদ বাস্তবায়ন আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, তিনি যখন এ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, তখন তিনি এ খবর, বর্ণনা, ঘোষণা, হুকুম ও ফায়ছালা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ ইলাহ নেই অথবা তিনি ছাড়া অন্যদের ইবাদত বাতিল।

সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতের হকদার নয় এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্যও নয়। তাই একমাত্র তাকেই ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। لا إله إلا الله এর মধ্যে যে নফী (নেতীবাচক) ও ইছবাত (সাব্যস্ত করা) রয়েছে, তা থেকে সম্বোধিত ব্যক্তি সহজেই উপরোক্ত অর্থ বুঝতে সক্ষম। আপনি যখন কোনো লোককে দেখবেন, সে এমন একজন লোকের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে কিংবা সাক্ষ্য তলব করছে অথবা চিকিৎসা করতে বলছে, যে উক্ত কাজগুলোতে পারদর্শী নয় তখন আপনি জিজ্ঞাসাকারীকে সতর্ক করতে গিয়ে অবশ্যই বলবেন যে, এ লোক মুফতী নয়, অমুক ব্যক্তি সাক্ষ্য দানে পারদর্শী নয় এবং অমুক ব্যক্তি ডাক্তার নয়। অতএব এ থেকে বুঝা যায় যে, আপনার পক্ষ হতে এটি আদেশ এবং নিষেধ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুতরাং 'আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, বান্দার ইবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ। যখন তিনি সংবাদ দিয়েছেন, তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার, তখন এ সংবাদ ইবাদতের

আদেশ করা এবং বান্দার উপর আল্লাহর যেই হক রয়েছে তা আদায় করা আবশ্যক। বান্দাদের উপর আল্লাহর একক অধিকার হলো, তারা কেবল তারই ইবাদত করবে।

حكم এবং **قضاء** শব্দদ্বয় সংবাদ ও খবর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নিছক সংবাদকেও বিচার এবং হুকুম বলা হয়। বলা হয়ে থাকে, মোকাদ্দমাটিতে এ রকম ফায়ছালা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

"শুনে রাখো, আসলে তারা তো মনগড়া কথা বলে। তারা বলে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হলো, কিভাবে এ ফায়সালা করছো?" *(সূরা সাফফাত: ১৫১-১৫৪)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের নিছক সংবাদকে ফায়ছালা হিসাবে নাম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

"আমি কি অনুগতদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করবো? কী হয়েছে তোমাদের? এ কেমন বিচার তোমরা করছো?" *(সূরা কালাম: ৩৫-৩৬)*

তবে এখানে কাফের পক্ষ হতে যেই সংবাদ দেয়া হয়েছে তাতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

সুতরাং 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই' এ হুকুম ও ফায়ছালার মধ্যে এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এখানে যদি শুধু জবানের উচ্চারণ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইহার ইল্‌ম অর্জন করা আবশ্যক হতো না, ইহা দ্বারা কোনো উপকার হতো না এবং এর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করাও সম্ভব হতো না।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে রয়েছে বান্দার জন্য তাওহীদের বর্ণনা, তাদের জন্য রয়েছে দিক নির্দেশনা এবং এর পরিচিতি। যেমন কোন বান্দার কাছে যখন কোন বিষয়ে সাক্ষ্য থাকবে, সে যদি তা বর্ণনা না করে; বরং তা গোপন করে, তাহলে তার দ্বারা কেউ উপকৃত হবে না এবং এর মাধ্যমে কোনো দলীল-প্রমাণও কায়েম হবে না। সুতরাং তাওহীদের সাক্ষ্য বর্ণনা করা ব্যতীত যেহেতু তার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ তা'আলা তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। মানুষের শ্রবণ, দৃষ্টি এবং বিবেক ও বোধশক্তির নিকট আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের দলীলগুলো বর্ণনা করেছেন।

আসমানী কিতাব ও নাবী-রসূলদের মাধ্যমে তাওহীদের দলীলগুলোর ব্যাপারে কথা হলো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার পূর্ণতার গুণাবলী, একত্ব এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন এবং ঐগুলোর খোলাখুলি বর্ণনা প্রদান করেছেন। সে সম্পর্কিত সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর তেলাওয়াত শুনেই তা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে নিজের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং তার শ্রেষ্ঠতম রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, জাহমীয়া, মুতাযেলা এবং কতিপয় ছ্বিফাতকে বাতিলকারী আশায়েরা ও মাতুরীদি সম্প্রদায়ের লোকেরা এ ধারণায় ঐ সব ছ্বিফাতকে অস্বীকার করে যে, তা বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তিকে পরাজিত করে। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুন্নাতে যেসব গুণাবলীর সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা তাদের ধারণার সম্পুর্ণ পরিপন্থী।

আল্লাহ তা'আলা সূরা যুখরুফের শুরুতে বলেন,

﴿حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

"হা-মীম এ সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! সূরা ইউসুফের শুরুতে আরো বলেন,

﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

"আলিফ-লাম-রা! এগুলো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত"। তিনি সূরা হিজ্‌রের শুরুতে আরো বলেন,

﴿ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾

"আলিফ-লাম-রা! এগুলো আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্টভাষী কুরআনের আয়াত"। সূরা আলে-ইমরানের ১৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هُذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

"এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ"।

সূরা মায়েদার ৯২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, সত্য সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৪৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"এ উপদেশ বাণী তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে"।

এমনিভাবে সুন্নাত কুরআনের অর্থকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে এবং তাকে সাব্যস্ত করে। মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা আমাদের দীনের মূলনীতির ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত মত বা রুচি অথবা আবেগ-অনুভূতির অনুসরণ করার মুখাপেক্ষী করেননি। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করেছে, তারা নিজেরাই পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম" *(সূরা আল মায়েদা: ৩)*।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে দীনকে পূর্ণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আবু জা'ফর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর শাইখের বক্তব্য:

لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ

"এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রায় দ্বারা কথা বলি না এবং প্রবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ধারণার উপর নির্ভর করেও কিছু বলি না। কারণ কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত তার দীনকে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে না, যতক্ষণ না সে গায়েবী বিষয়গুলো মহান আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পন করবে এবং যে বিষয়গুলো তার কাছে অস্পষ্ট মনে হবে সেটি কেবল আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দিবে"এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলোর আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ সম্পর্কিত দৃশ্যমান যেসব আয়াত রয়েছে, তাতে চিন্তা-গবেষণা করলে এবং তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করলে দেখা যায় তাতে কুরআনের আয়াত ও হাদীছের বাণীর মতোই তাওহীদের প্রমাণ রয়েছে। আর বোধশক্তির দলীলসমূহ উভয় প্রকার দলীলকে একত্র করেছে। নাবী-রসূলগণ তাওহীদের যেসব দলীল নিয়ে এসেছেন,

বোধশক্তি তার সত্যতাকে সুদৃঢ় করে। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর সাক্ষ্য, দৃষ্টির সামনে দৃশ্যমান সৃষ্টির মধ্যকার নিদর্শনসমূহ, বোধশক্তির দলীলসমূহ এবং ফিতরাতী দলীলগুলো একসাথে মিলিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ আদল, রহমত, অনুগ্রহ এবং হিকমতের কারণে বান্দার অজুহাত কবুল করাকে ভালোবেসেছেন, পছন্দ করেছেন এবং সৃষ্টির নিকট তাওহীদের যুক্তি-প্রমাণ ও অকাট্য দলীল পেশ করার প্রতি খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ জন্যই তিনি যতো নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের সকলকেই এমন নিদর্শন দিয়েছেন, যা তাদের সত্যতার প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ ﴾

"আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে" *(সূরা হাদীদ: ২৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! তোমার আগে আমি যখনই রসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি নিজের অহী প্রেরণ করতাম। যদি তোমরা নিজেরা না জেনে থাকো তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো। আগের রসূলদেরকেও আমি উজ্জ্বল নিদর্শন ও কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং এ বাণী তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে" (*সূরা আন নাহল ৪৩-৪৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"হে নাবী! তাদেরকে বলো, আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছেন, তারা অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন এনেছিলেন এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলছো সেটিও তারা এনেছিলেন" *(সূরা আলে ইমরান: ১৩৮)*।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ১৮৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾

"হে মুহাম্মাদ! এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে তোমার পূর্বে বহু রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, সহীফা ও আলোদানকারী কিতাব এনেছিল"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আশ-শূরার ১৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾

"আল্লাহই এ কিতাব ও মীযান যথাযথভাবে নাযিল করেছেন"।

রসূলদেরকে যেসব নিদর্শন দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে কম প্রকাশ্য আয়াত ছিল হুদ আলাইহিস সালামের নিদর্শনসমূহ। এমনকি তার জাতির লোকেরা বলেছিল, হে হুদ! তুমি তো আমাদের কাছে কোনো নিদর্শনই নিয়ে আসোনি। অথচ তিনি যে নিদর্শনগুলো নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা যাকে এগুলো নিয়ে গবেষণা করার তাওফীক দিয়েছেন, সে কেবল বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হুদ আলাইহিস সালামের নিদর্শনগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন,

﴿إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"হুদ বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি। আর তোমরা সাক্ষী থাকো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করছো, আমি ঐসব কিছু থেকে মুক্ত। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও। অতঃপর তোমরা আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী যত প্রাণী রয়েছে, সবারই কপাল তার মুষ্ঠিতে আবদ্ধ। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন" *(সূরা হুদ: ৫৪-৫৬)*।

হুদ আলাইহিস সালামের কথার মধ্যে তাওহীদের অন্যতম বিরাট নিদর্শন রয়েছে। তিনি মাত্র একজন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চিত্তে, নির্ভয়ে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিরাট একটি জাতির সামনে এ ভাষণ তুলে ধরেছেন। তিনি যা বলেছেন, তাতে তিনি ছিলেন পর্বত প্রবল আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী। তার জাতির লোকেরা যে বাতিলের উপর ছিল, তা থেকে তিনি প্রথমে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন এবং এর উপর আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রেখেছেন। এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন, যাতে তিনি তার উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান। তিনি তার জাতিকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলাই তার একমাত্র অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

সুতরাং তিনি শত্রুদেরকে তার উপর শক্তিশালী করবেন না। অতঃপর হুদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাদের দীন ও তাদের ঐসব মাবুদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের কারণে তারা কাউকে বন্ধু বানায় ও কাউকে শত্রু বানায়

এবং জান-মাল ব্যয় করে ও তাদেরকে সাহায্য করে। অতঃপর তিনি প্রকাশ্যভাবে মূর্তিগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তারা সকলে মিলে যদি হুদ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাকে হত্যা করে মনের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ করতে চায় এবং তারা যদি তাদের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চায় ও কোনো প্রকার অবকাশ না দেয়, তবে তারা কেবল ঐ পরিমাণ ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ তা'আলা তার উপর লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার দাওয়াতকে তাদের কাছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, সেই সত্তাই হলেন তার ও তাদের সকলের রব, যার হাতের মুঠোয় রয়েছে সকলের ললাটের কেশ গুচ্ছ। তিনিই তার অভিভাবক এবং নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকে সাহায্য ও শক্তিশালী করবেন। তিনি সঠিক পথে রয়েছেন। সুতরাং যে তার উপর ভরসা করবে, তার ক্ষমতার স্বীকৃতি দিবে, তিনি তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না এবং তার বিরুদ্ধে তার শত্রুদেরকে খুশী করবেন না।

নাবী-রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন, তার চেয়ে অধিক উত্তম এবং উজ্জল নিদর্শন আর কী হতে পারে? আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের দীনের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তার বান্দাদের জন্য তাকে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অন্যতম অতি সুন্দর নাম হলো, তিনি হলেন, المؤمن (নিরাপত্তা দানকারী)। এ নামের দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হলো, সত্যায়নকারী, যিনি সত্যবাদীদের সত্যের দলীল-প্রমাণগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার বান্দাদেরকে দিক-দিগন্তের এবং তাদের নিজেদের মধ্যকার ঐসব নিদর্শন দেখাবেন, যা তাদের সামনে খোলাখুলি বর্ণনা করে দিবে যে, রসূলগণ যে অহীর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তা সত্য।

আল্লাহ তা'আলা সূরা হামীম সেজদার ৫৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

"অচিরেই আমি এদেরকে সর্বত্র আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে তাও দেখাবো। যাতে এদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটাই সত্য"।

অর্থাৎ কুরআন সত্য। কেননা কুরআন সম্পর্কে আলোচনা পূর্বের আয়াতে অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সেখানে বলেছেন, হে নাবী, এদের বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, সত্যিই এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করতে থাকো তাহলে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে, যে এর বিরোধিতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন?"

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তার রসূল যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য, তিনি ওয়াদা করেছেন যে, বান্দাদেরকে তার সৃষ্টিগত ও কর্মগত নিদর্শনসমূহ থেকে এমন কিছু নিদর্শনও দেখাবেন, যাতে প্রমাণিত হবে যে, কুরআন সত্য। এরপর আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় ও সুস্পষ্ট আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা হলো আল্লাহ তা'আলার এ সাক্ষ্য যে, তিনি সবকিছু দেখেন।

সুতরাং আল্লাহর অতি সুন্দর নামসমূহের অন্যতম হলো, الشهيد অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা, যার দৃষ্টির অন্তরালে কোনো কিছুই আড়াল হয় না এবং যার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। বরং তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, সর্বদ্রষ্টা এবং প্রত্যেক জিনিসের খুটিনাটি সবকিছুই জানেন। এ হলো তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা দলীল গ্রহণের কিছু প্রমাণ। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কথা ও বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে, অতঃপর দিগ-দিগন্তের সর্বত্র বিরাজমান নিদর্শন ও মানুষের নিজেদের মধ্যকার নিদর্শন দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহ এবং সৃষ্টির মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী দ্বারা কিভাবে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে? অথচ মানুষের পরিভাষায় নাম দ্বারা দলীল গ্রহণ করার বিষয়টি পরিচিত নয়।

এর জবাব হলো, যে ব্যক্তির ফিতরাত বা সৃষ্টিগত স্বভাব স্রষ্টার প্রতি কুফরী করা, তার গুণাবলী অস্বীকার করা কিংবা তার গুণাবলীকে মানুষের গুণাবলীর সাথে তুলনা করার দোষে দূষিত হয়নি, আল্লাহ তা'আলা সেই ফিতরাতের মধ্যে এ বিশ্বাস স্থাপন করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নাম ও সুমহান গুণাবলী সব দিক থেকেই পরিপূর্ণ। তিনি ঐ সব বিশেষণে বিশেষিত, যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষিত করেছেন এবং যা দ্বারা তার রসূলগণ তাকে গুণান্বিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার যে গুণাবলী সৃষ্টির নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে, তা তাদের নিকট পরিচিত গুণাবলীর চেয়ে আরো বহুগুণ বড়। তার পবিত্রত ও পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তার এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। এমন অবগত যে, আসমান-যমীনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য একটি অণুপরিমাণ জিনিসও তার অবগতি ও দৃষ্টির বাইরে নয়। যে সত্তার অবস্থা এ রকম, তাহলে বান্দাদের জন্য আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা কিভাবে শোভনীয় হতে পারে? কিভাবেই বা তার ইবাদতের সাথে অন্যকে শরীক করা যেতে পারে এবং তার সাথে অন্যান্য মাবুদ নির্ধারণ করা যেতে পারে?

আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার বিষয়ে কিভাবে এটি শোভনীয় হতে পারে যে, যারা তার উপর মহা মিথ্যা রচনা করবে, তাদেরকে সমর্থন করবেন এবং তাদের সম্পর্কে এমন খবর দিবেন, যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন নয় যে, বাতিলের উপর থাকা সত্ত্বেও তিনি বাতিলপন্থীকে সাহায্য করবেন, তার কাজকে সমুন্নত করবেন, তার আহ্বান শুনবেন, তার শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং বাতিলপন্থীর দীনকে এমন দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন দিয়ে সাহায্য করবেন, যা

আনয়ন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী এবং তার নামে বানোয়াট কথা রচনাকারী।

আর এটি সকলের জানা যে, প্রত্যেক জিনিসের উপর আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টি, তার ক্ষমতা, তার হিকমত, মর্যাদা এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তার পরিপূর্ণ পবিত্রতা উপরোক্ত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। যারা এটিকে জায়েয মনে করবে, তারা আল্লাহর মারেফত থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামগুলোর মাধ্যমে তার জন্য কার্যাদি সাব্যস্ত করার দলীলে কুরআন মজীদ পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দাগণ এ পদ্ধতিতেই আল্লাহ তা'আলার কার্যাদি সাব্যস্ত করেন। তারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ দ্বারা তার কর্মের পক্ষে দলীল গ্রহণ করে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা আরো দলীল গ্রহণ করেন যে, আল্লাহর জন্য কী করা শোভনীয় এবং কী করা শোভনীয় নয়?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾

"যদি এ নাবী নিজে কোনো কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ আমাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না"। *(সূরা আল-হাক্কাহ: ৪৪-৪৭)*

সামনে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ সাব্যস্ত ও শির্ক বাতিল হওয়ার উপর দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَلَام (শান্তিদাতা), مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষাকারী), عَزِيز (পরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী) এবং مُتَكَبِّر (মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র" *(সূরা আল হাশর: ২৩)।*

কুরআনে অনুরূপ আয়াত অনেক রয়েছে। তবে অল্প সংখ্যক লোকই এ পথ অনুসরণ করে। খাঁটি লোকেরাই এ পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। সাধারণ লোকেরা কেবল বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারাই তাওহীদের দলীল গ্রহণ করে থাকে। কেননা এ পদ্ধতি অধিক সহজ এবং অধিক প্রশস্ত। আর আল্লাহ তা'আলা তার কতক সৃষ্টিকে অন্য কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকেন।

কুরআন মজীদে তাওহীদের এমনসব দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনের সমাবেশ ঘটেছে, যা অন্য কোনো কিতাবে ঘটেনি। কুরআন একদিকে যেমন স্বতন্ত্র একটি দলীল অন্যদিকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত। সে সঙ্গে তা সাক্ষী স্বরূপ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা সুসাব্যস্ত। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার নিদর্শন অনুসন্ধান করতে চায়, তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"আর এদের জন্য কি এ নিদর্শন যথেষ্ঠ নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়? আসলে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসীহত" *(সূরা আল আনকাবুত: ৫১)।*

সুতরাং যখন জানা গেল যে, তাওহীদে উলুহীয়াহ হলো ঐ তাওহীদ, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নাবী-রসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যাসহ আসমানী কিতবসমূহ নাযিল করা হয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাই যারা তাওহীদকে নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত করেছে, তাদের কথার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। যারা তাওহীদকে অভিনব পদ্ধতিতে তিনভাগে বিভক্ত করেছে, তারা নাবী-রসূলদের নিয়ে আসা এ তাওহীদুল উলুহীয়াকে নাম দিয়েছে **توحيد العامة** তথা সাধারণ মানুষের তাওহীদ হিসেবে।

তাদের নিকট দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ হলো **توحيد الخاصة** তথা বিশেষ ব্যক্তিদের তাওহীদ।

হাকীকতের মাধ্যমে এ প্রকার তাওহীদ সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ সুফীদের ধারণায় তাদের কেউ হাকীকতের স্তরে পৌঁছতে পারলে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রেমের স্বাদ লাভ করতে পারে ও পরমাত্মার সাথে তার যোগাযোগ হয়। এটা হচ্ছে সুফী সাধনার চুড়ান্ত স্তর। এ স্তরে উন্নীত হলে সুফী ধ্যানের মাধ্যমে নিজস্ব অস্তিত্ব আল্লাহর নিকট বিলীন করে দেয় এবং তাদের জন্য যেই প্রকার তাওহীদ অর্জিত হয়, তাকেই সম্ভবত তারা তাওহীদুল খাস্সাহ হিসাবে নাম দিয়েছে।

আর তৃতীয় প্রকারকে তারা এমন তাওহীদ হিসাবে নাম দিয়েছে, যা চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। এটি হলো توحيد خاصة الخاصة অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বিশেষ স্থানের অধিকারী তাদের তাওহীদ।[২৩]

মানুষের মধ্যে নাবী-রসূলগণই তাওহীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ছিলেন। আর রসূলগণ তাতে নাবীদের চেয়েও অধিক পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন। রসূলদের মধ্যে উলুল আযমগণ ছিলেন তাওহীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ। তারা হলেন, নুহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের মধ্যে আবার আল্লাহর দুই বন্ধু ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ছিল উলুল আযম অন্যান্য নাবীদের চেয়ে আরো বেশী পরিপূর্ণ। তারা ইলম, মারেফত, আমল, অবস্থা, দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে যেভাবে তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছেন, অন্যরা সেভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

সুতরাং রসূলগণ যেভাবে তাওহীদকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন, তাদের চেয়ে অধিক পূর্ণরূপে অন্য কেউ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, তারা যেভাবে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছেন, অন্যরা সেভাবে করতে পারেনি এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেভাবে নিজ নিজ কাওমের লোকদের সাথে সংগ্রাম করেছেন, অন্যরা সেভাবে সংগ্রাম করতে পারেননি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে তাওহীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাবীদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন শির্কের অসারতা বর্ণনা এবং তাওহীদের বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করতে

---

২৩. সুফীরা এভাবে তাওহীদকে ভাগ করেছে। এ শ্রেণী বিন্যাসের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা নাবী রসূলদের কেউ এমন কোনো দ্বীন নিয়ে আসেননি, যাতে সাধারণ মানুষের জন্য এক রকম তাওহীদ ছিল এবং বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য অন্য রকম তাওহীদ ছিল। সেই সাথে তাদের দ্বীনে যাহেরী বাতেনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং সকলেই একই তাওহীদের আওতাধীন ছিলেন। সুফী ও শিয়ারা ধারণা করে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং সাধারণ মানুষকে এক প্রকার ইলম শিক্ষা দিয়েছেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অন্যরকম ইলম শিখিয়েছেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার সন্তানগণ তা শিখেছেন। পরবর্তীতে তরীকতের শাইখদের কাছে তা এসে পৌঁছেছে। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল।

সুফীরা তাওহীদকে যে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছে, তাদের ধারণায় তার দ্বিতীয় প্রকারের স্বরূপ হলো, সকল বস্তুর হাকীকত তথা আসল অবস্থায় পৌঁছার মাধ্যমে উহা অর্জিত হয়। তাদের ধারণায় আসমানী কিতাবসমূহে আল্লাহ তা'আলা যেসব দলীল-প্রমাণ নাযিল করেছেন, আসমান-যমীনের দিক-দিগন্তে যেসব নিদর্শন রয়েছে এবং মানুষের নিজের মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে, তার মাধ্যমে এ প্রকার তাওহীদের স্তরে পৌঁছা সম্ভব নয়। বস্তুসমূহের হাকীকত উপলব্ধি করার মাধ্যমেই কেবল তা অর্জিত হয়। তবে প্রশ্ন হলো কে এ স্তরে পৌঁছতে পারে? তাদের ধারণায় শুধু একজন শাইখ দ্বারাই এ প্রকার তাওহীদের পরিচয় হাসিল অর্জন করা সম্ভব। তার পরে সে যাকে তা দান করবে, সে কেবল তা অর্জন করতে পারবে। এটি তাদের বাতিল ধারণা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের উপর একই তাওহীদের তথা তাওহীদে উলুহীয়াতের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ফরয করেছেন। তাতে মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি।

আর সুফীদের তৃতীয় প্রকার তাওহীদ হলো, এমন তাওহীদ যা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই রয়েছে। তাদের মতে সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমন কোনো মাখলুক নেই যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব রয়েছে। বরং অনাদি, অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থেকেই সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটিকে তারা তাওহীদুল খাস্সাতিল খাস্সা নাম দিলেও এটি ওয়াহদাতুল উজুদের (সর্বেশ্বরবাদ) কুফুরী ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ প্রকার তাওহীদের মধ্যেই সুফীদের সর্বোচ্চ শাইখগণ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট এটিই হলো সর্বাধিক নিকৃষ্ট কুফুরী।

গিয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তার গোত্রীয় লোকদের সাথে যেই তর্ক-বিতর্ক করেছেন, তা উল্লেখ করার পর এবং তার বংশধরদের হতে যারা নাবী হয়েছিলেন, তাদের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾

"তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল, অতএব তাদের পথেই তুমি চলো এবং বলো, এ কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় চাই না। এটি সমগ্র সৃষ্টির জন্য একটি উপদেশমালা" *(সূরা আল-আনআম: ৯০)।*

সুতরাং রসূলকে যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তাদের তাওহীদের চেয়ে অধিক পূর্ণ তাওহীদ কারো নিকট থাকতে পারে না।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে শিক্ষা দিতেন, তারা যেন সকালে ঘুম থেকে উঠে এ দু'আটি পাঠ করে,

«أَصْبَحْنَا على فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَ عَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وماَ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ»

"আমাদের সকাল হলো ইসলামের ফিতরাতের উপর, একনিষ্ঠতার বাণীর উপর, আমাদের নাবী মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের উপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীন ছিল তাওহীদ। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন বলতে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যে আদেশ-নিষেধ, আমল ও আক্বীদাহ-বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, তা উদ্দেশ্য।

কালিমাতুল ইখলাছ্ব বলতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য।

ইসলামের ফিতরাত বলতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে তার প্রতি যে ভালোবাসা, এককভাবে তার ইবাদতের প্রতি যে আগ্রহ, তার সাথে কাউকে শরীক না করার যে স্বভাব এবং তার দাসত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করা, অনুগত হওয়া ও তার দিকে ফিরে যাওয়ার যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা উদ্দেশ্য।

এটিই হলো আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের তাওহীদ। যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদ থেকে বিমুখ হবে, সে সর্বাধিক অজ্ঞ হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"যে ব্যক্তি নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন করেছে সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের দীন থেকে বিমুখ হতে পারে? আমি তো দুনিয়াতে তাকে নির্বাচিত করেছি, আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা এ যে, যখন তার রব তাকে বললো, মুসলিম হয়ে যাও তখনই সে বলে উঠলো, আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রভুর জন্য মুসলিম হয়ে গেলাম" *(সূরা আল-বাকারা: ১৩১-১৩২)।*

যার নিকট সুস্থ অনুভূতি এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্যকারী বোধশক্তি রয়েছে, সে তাওহীদ সাব্যস্ত করতে গিয়ে কালামশাস্ত্রবিদদের যুক্তি-তর্ক, তাদের পরিভাষা এবং তাদের পদ্ধতির প্রতি কখনোই মুখাপেক্ষী হবে না। বরং কখনো কখনো কালামশাস্ত্রবিদদের যুক্তি-তর্কের প্রতি ঝুকে পড়ার কারণে এমন সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে পারে, যাতে সে হয়রান, গোমরাহ এবং সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে।[২৪]

উপকারী তাওহীদ হলো তাই, যার ধারক ও বাহকের অন্তর সকল প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকে। এ পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আগমন করবে, সে হবে সফল। কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার যে তাওহীদের দাবী তারা করেছে এবং যাকে তারা তাওহীদুল খাস্সা এবং তাওহীদু খাস্সাতিল খাস্সা বলে নাম দিয়েছে, তা 'ফানা ফিল্লাতে[২৫] গিয়ে শেষ হয়।

---

২৪. ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি শেষ জীবনে স্বীকার করেছেন, সারাজীবন তর্কশাস্ত্রের পিছনে শেষ করে মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করতে পারেননি। পরিশেষে তিনি কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতির দিকেই ফিরে এসেছেন। ইমাম গাযালী সম্পর্কেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। শেষ জীবনে তিনিও দর্শন, সুফীবাদ ও তর্কশাস্ত্র পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের মানহাজে ফিরে এসেছেন। আরো বলা হয়েছে যে, তিনি বুকের উপর ছুহীহ বুখারী নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া গাযালীর ছাত্রদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাযালী শেষ জীবনে উপনীত হয়ে সুফীবাদ ও কালামশাস্ত্র বর্জন করে ইলমে হাদীছের দিকে ফিরে এসেছিলেন। কালামশাস্ত্রের অন্যতম ভিত্তি নির্মাণকারী ফখরুদ্দীন রাযির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনি শেষ জীবনে কালাম শাস্ত্র থেকে তাওবা করেছেন এবং সালাফদের পথে ফিরে এসেছেন।

২৫. সুফীবাদের পরিভাষায় فناء في الله এর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সুফীগণ এ স্তরে পৌঁছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো রূপ ব্যবধান দেখতে পায় না। অর্থাৎ সুফীর চোখের সামনে তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টা, -এ দু'য়ের মাঝখানে কোনো সীমারেখা পরিলক্ষিত হয় না। সে শুধু একটি অস্তিত্বকেই চোখে দেখে এবং সে নিজেও আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এক কথায় সুফী সাধক এ পর্যায়ে পৌঁছে দুই এর পরিবর্তে পৃথিবীতে শুধু একক স্রষ্টা আল্লাহর হাকীকতকেই দেখতে পায়। অর্থাৎ সবকিছুকেই সে স্রষ্টা মনে করে। এটি মূলত ওয়াহদাতুল উজুদের (সর্বেশ্বরবাদ) বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুফীদের কেউ কেউ ফানা ফিল্লাহর ব্যাখ্যায় বলেছে, তা হলো এমন স্তর, যেখানে পৌঁছে মুমিন ব্যক্তি তার নিজের নফসের অস্তিত্ব অনুভব করে না এবং মানবিক প্রয়োজনাদিও অনুভব করে না। সে শুধু তার নফসের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকেই উপস্থিত মনে করে।

অধিকাংশ সুফীই 'ফানা ফিল্লাহ' এর স্তরে পৌঁছার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এটি একটি বিপদজনক পথ। ইহা মানুষকে ওয়াহদাতুল উজুদের (সর্বেশ্বরবাদ) দিকে নিয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আনসারী আল-হেরাবী (রহিমাহুল্লাহ) "মানাযিলুস্ সায়িরীন" গ্রন্থে যা আবৃত্তি করেছেন, তার প্রতি একটু নযর দিন। তিনি বলেছেন,

مَا وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ ....إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدُ

تَوْحِيدُ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَعْتِهِ..... عَارِيَّةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ

تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ... وَنَعْتُ مَنْ يَنْعَتُهُ لَاحِدُ

১) কোনো মাখলুকই আল্লাহর প্রকৃত তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। যে কেউ আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা করবে, সে মূলত অবিশ্বাসী নাস্তিক বলেই বিবেচিত হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

২) যারা আল্লাহর তাওহীদ এবং তার ছিফাত বর্ণনা করে, তাদের তাওহীদ প্রত্যাখ্যাত হবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাকে বাতিল করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের তাওহীদের কোনো বাস্তবতা নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

৩) আল্লাহ নিজেই নিজের যে তাওহীদ বর্ণনা করেছেন, তাই হলো তার প্রকৃত তাওহীদ। তিনি ছাড়া অন্যরা তার তাওহীদের যে বর্ণনা দেয়, তা ইলহাদ তথা তাওহীদ থেকে বিচ্যুতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। (নাউযুবিল্লাহ)

ইমাম হেরাবী (রহিমাহুল্লাহ) যদিও ফানা বা ওয়াহদাতুল উজুদের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু এ কবিতার মধ্যে তিনি এমন সংক্ষিপ্ত কথা বলেছেন, যার কারণেই ওয়াদাতুল উজুদে বিশ্বাসী লোকেরা তাকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে। কেউ কেউ দৃঢ় শপথ করেই বলেছে যে, তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন। তবে কথা হলো তিনি যেহেতু তাদের মতে সমর্থক ছিলেন না, তাই তিনি যদি শরী'আত সম্মত শব্দমালা দিয়ে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেন, তাহলেই

ইবনে আরাবী ফানা ফিল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, هو زوال الصفات المذمومة وثبوت الصفات المحمودة অর্থাৎ ফানা ফিল্লাহ হলো, মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে যাওয়া এবং স্রষ্টার প্রশংসিত গুণাবলী স্থায়ী হওয়া। এ কথার সারমর্ম হলো, ফানা ফিল্লাহ এর স্তরে পৌঁছে সুফী সাধকের মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তদস্থলে স্রষ্টার গুণাবলী চলে আসে। ফলে সে পানাহার, ঘুম বা দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তুর প্রতি মোটেই প্রয়োজন অনুভব করে না; ইবনে আরাবী ফতুহাতুল মক্কীয়ায় আরো বলেন, غاية الفناء أنه لا يرى إلا الله ولايعلم إلاالله অর্থাৎ ফানার সর্বোচ্চ স্তর হলো, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুফীরা ফানা ফিল্লাহ এর স্তরে পৌঁছে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। পৃথিবীতে যা কিছু দেখে সবই আল্লাহ, যা কিছু আছে বলে জানা যায়, তার সবকিছুই আল্লাহ। এটিই হলো ওয়াহদাতুল উজুদের কুফুরী, যাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা সর্ববৃহৎ কুফুরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুফীদের সকল মাশায়েখই ওয়াহদাতুল উজুদের প্রবক্তা। মানসুর হাল্লাজও এ কথাই বলেছে। সে বলেছে, ما في الجبة إلا الله "আমার জুববার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই নেই"। (নাউযুবিল্লাহ)

তার কথা অধিকতর সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হতো। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, তিনি যে অর্থ নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, তা বাস্তবায়ন করা যদি আমাদের আবশ্যক হতো এবং শরীয়াতে মুহাম্মাদীর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সেদিকে সতর্ক করতেন, মানুষকে সেদিকে আহবান করতেন এবং তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন। কেননা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করাই রাসূলের উপর আবশ্যক ছিল।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় এ কথা বলেছেন যে, এটি হলো সাধারণ লোকের তাওহীদ, এটি হলো খাস লোকদের তাওহীদ আর অমুকটি খাস লোকদের মধ্যে অধিকতর খাস লোকদের তাওহীদ অথবা তিনি এ অর্থের কাছাকাছি কোন বাক্য উচ্চারণ করেছেন? অথবা তিনি কি এ কথাগুলোর প্রতি কোন ইঙ্গিত করেছেন?

সঠিক কথা হলো আমাদের কাছে কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের যেসব দলীল রয়েছে এবং আমাদের যে বোধশক্তি ও বিবেক রয়েছে, তা এ কথাকে বাতিল বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেদেয়।

আল্লাহ তা'আলা যে কালাম নাযিল করেছেন, তা আমাদের সামনে রয়েছে, আমাদের সামনে রাসূলের সুন্নাত সংরক্ষিত রয়েছে, রাসূলের পরে সর্বোত্তম মানুষদের কথা ও আচার-আচরণ লিখিত রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পরিচয় হাসিলকারী ইমামদের বক্তব্যসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে। যারা তাওহীদকে উপরোক্ত তিনভাবে বিভক্ত করেছে, তাদের কাছে প্রশ্ন হলো এভাবে তাওহীদকে ভাগ করা কিংবা 'ফানা' শব্দটি কুরআন-সুন্নাহ্র কোথাও কি উল্লেখ করা হয়েছে? উপরোক্ত কথাগুলো ছাহাবী কিংবা তাবেঈ অথবা অনুসরণীয় ইমামদের কারো পক্ষ হতে এসেছে কি?

বরং দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করার কারণেই এসব পরিভাষার উৎপত্তি হয়েছে। যা খারেজীদের বাড়াবাড়ির মতই। শুধু তাই নয়; খ্রিস্টানরা তাদের দীনের ব্যাপারে যেমন বাড়াবাড়ি করেছিল, এ সুফীদের বাড়াবাড়ি সে পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। আল্লাহ তা'আলা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার নিন্দা করেছেন এবং তা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ}

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলো না (*সূরা আন নিসা :১৭১*)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

"হে নাবী! তুমি বলো হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে

এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে" *(সূরা আল মায়েদা: ৭৭)*।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تُشَدِّدُوا فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ رَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ»

"তোমরা দীনের ব্যাপারে নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করো না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠিন করে দিবেন। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর কঠিন কঠিন বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। ঐ তো তাদের পরবর্তীরা এখনো গীর্জা এবং উপাসনালয়গুলোতে রয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের উপর চাপিয়ে দেইনি"।[২৬] ইমাম আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ

তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই।

.....

ব্যাখ্যা: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্যে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ আর কিছুই নেই। তার সত্তা, ছ্বিফাত এবং কর্মসমূহের কোনো তুলনা নেই। "আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সাদৃশ্য করা থেকে পবিত্র রাখা আবশ্যক", এ কথাটি বিভিন্ন ফির্কার মানুষের কথার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কথায় পরিণত হয়েছে। এ কথার উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে কথাটি গ্রহণযোগ্য। আর যদি আল্লাহর সুউচ্চ গুণাবলীকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর সদৃশ অস্বীকার করেছে এবং মানুষের বিবেক ও বোধশক্তির দলীল দ্বারাও সে অস্বীকার সমর্থিত।

---

২৬. যঈফ: সুনানে আবু দাউদ হা/৪৯০৪। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, দেখুন, সিলসিলা যঈফা হ/ ৩৪৬৮।

এ কথার ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোনো মাখলুককে বিশেষিত করা যাবে না এবং আল্লাহর ছিফাতের সাথে মাখলুকের কোনো ছিফাতের তুলনা চলে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ১১ নং আয়াতে বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই" এ অংশ দ্বারা ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের মতোই মনে করে। আর "তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" এ অংশ দ্বারা ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার ও বাতিল করে। সুতরাং যারা স্রষ্টার ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের অনুরূপ মনে করে, তারা হলো নিন্দনীয় বাতিলপন্থী মুশাব্বেহা সম্প্রদায়। আর যারা সৃষ্টির ছিফাতকে স্রষ্টার ছিফাতের অনুরূপ মনে করে, তাদের কুফুরী খ্রিস্টানদের কুফুরীর মতোই।

যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করে, তাদের কথা হলো, আল্লাহর জন্য কোনো ছিফাত সাব্যস্ত হবে না এবং এ কথা বলা যাবে না যে, তার কুদরত, ইলম ও হায়াত রয়েছে। কেননা বান্দারা এ ছিফাতগুলো দ্বারা বিশেষিত। তাদের কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহর জন্য উপরোক্ত ছিফাতগুলো থেকে নামও সাব্যস্ত করা যাবে না এবং বলা যাবে না যে, তিনি الحي (চিরঞ্জীব), العليم (সর্বজ্ঞাত) এবং القدير (ক্ষমতাবান)। কেননা মাখলুকেরও এ নামগুলো রয়েছে। এমনি আল্লাহর কালাম, তার শ্রবণ, দৃষ্টি, ইচ্ছা এবং অনুরূপ অন্যান্য ছিফাতের ব্যাপারেও একই কথা।

মুতাযেলারা আহলে সুন্নাতের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল, প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাবান এবং চিরঞ্জীব। সৃষ্টিকেও বলা হয় অস্তিত্বশীল, জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান। অথচ তারা এ কথা বলে না যে, মাখলুকেরও যেহেতু এ নামগুলো রয়েছে, তাই আল্লাহর জন্য এগুলো সাব্যস্ত করলে সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যায়। সুতরাং এ নামগুলোও আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু মুতাযেলারা আল্লাহর জন্য নাম সাব্যস্ত করে।[২৭]

---

২৭. মুতাযেলারা আল্লাহর সমস্ত ছিফাতকে এ যুক্তিতে অস্বীকার করে যে, তাতে আল্লাহর সাথে বান্দার তুলনা হয়ে যায়। তাদের মতে আল্লাহর জন্য যদি কুদরত, ইলম ইত্যাদি ছিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে মাখলুকের মধ্যেও যেহেতু এ গুণগুলো রয়েছে, তাই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা হয়ে যায়। কিন্তু তারা আল্লাহর জন্য عليم (জ্ঞানী), قدير (ক্ষমতাবান) ইত্যাদি নাম সাব্যস্ত করে। এগুলো সাব্যস্ত করার সময় তাদের মাথায় এ কথা উদয় হয় না যে, সৃষ্টির মধ্যেও এ নামগুলো রয়েছে। অথচ যে অযুহাতে তারা আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করেছে, সে একই সমস্যা নাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান থাকার কারণে নামগুলোও অস্বীকার করতে হয়। অথচ তারা নামগুলো অস্বীকার করে না। সুতরাং তাদের কথার মধ্যেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আল্লাহর নাম ও ছিফাত একই সূত্রে গাঁথা। তাই আল্লাহর জন্য উভয়টিই সাব্যস্ত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী রয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং সুস্পষ্ট বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারা তা প্রমাণিত। কোনো বিবেকবান ও বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তাতে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। সে নামগুলোর কিছু কিছু নাম দ্বারা তার সৃষ্টিরও নামকরণ করেছেন। এমনি তার সুউচ্চ ছিফাতগুলোকেও বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। সে ছিফাতগুলো থেকে কতিপয় ছিফাত দ্বারা তার সৃষ্টিকে বিশেষিত করেছেন। তার অর্থ এ নয় যে, ঐ ছিফাতগুলো দ্বারা যাদের নাম রাখা হয়েছে, তারা নামকরণকারীর মতোই। আল্লাহ তা'আলা তার নিজেকে চিরঞ্জীব, মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাধর, করুণাবান, দয়ালু, শক্তিমান, প্রজ্ঞাবান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, বাদশাহ, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, মহামহিম ইত্যাদি নামে নামকরণ করেছেন। এ নামগুলো দিয়ে তার কতিপয় বান্দাকেও নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ "তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন"। *(সূরা আল-আনআম: ৯৫, সূরা আর-রূম: ১৯)* সূরা আয-যারিয়াতের ২৮ নং আয়াতে তিনি বলেন,

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ "তারা তাকে একজন জ্ঞানবান সন্তানের সুসংবাদ দিলেন"। সূরা সাফফাতের ১০১ নং আয়াতে তিনি আরো বলেন,

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ "আমি তাকে একটি সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম"। সূরা তাওবার ১২৮ নং আয়াতে তিনি বলেন,

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ "মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াবান করুনাময়"। সূরা দাহারের ২ নং আয়াতে তিনি বলেন,

﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ "আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানিয়েছি"। সূরা ইউসুফের ৫১ নং আয়াতে তিনি আরো বলেন,

﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ "আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে"। সূরা কাহাফের ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ "তাদের সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহ যে প্রত্যেকটি নৌকা জোর করে ছিনিয়ে নিতো"। সূরা সেজদার ১৮ নং আয়াতে তিনি বলেন,

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ "এটা কি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মুমিন সে ফাসেকের মতো হয়ে যাবে? এ দু'পক্ষ সমান হতে পারে না"। সূরা মুমিনের ৩৫ নং আয়াতে তিনি বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ "এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন"।

এটি জানা কথা যে, এক জীবন্ত প্রাণী অন্য জীবন্ত প্রাণীর মতো নয়, একজন জ্ঞানী অন্যজন জ্ঞানীর সমতুল্য নয় এবং এক ক্ষমতাবান অন্য ক্ষমতাবানের সমকক্ষ নয়। অনুরূপ কথা অন্যান্য সকল নামের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ "তার জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)* আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নিসার ১৬৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ "কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু তোমাদের উপর নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিরের ১১ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ "কোনো নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবল আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে"। সূরা যারিয়াতের ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ "আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা, শক্তিধর ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী"। সূরা হামীম সেজদার ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ "তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অথচ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেই চলতো"।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক বিষয়ে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ছাড়া দু'রাকআত ছ্বলাত আদায় করে। অতঃপর যেন এ দু'আটি পড়ে:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»

“হে আল্লাহ্ আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি আর তোমার কাছেই তোমার মহাদান কামনা করছি। কারণ নিশ্চয় তুমি শক্তির অধিকারী কিন্তু আমি মোটেও শক্তি রাখি না। আর তুমি সবই জান অথচ আমি কিছুই জানি না, আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান, আমার এ কাজটা আমার জন্য ভালো হবে, আমার দ্বীনে ও দুনিয়ার জীবনে এবং পরিণামে, বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমার ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। আর যদি তুমি জান যে আমার এ কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমার তড়িৎ কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তা আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখো। আর আমার জন্য ভালো কাজের ফায়ছালা করো তা যেখানে আছে। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করো। অতঃপর প্রয়োজনটির নাম উল্লেখ করবে। ইমাম বুখারী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[২৮]

সুনানে নাসায়ী এবং অন্যান্য কিতাবে আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন,

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

“হে আল্লাহ! সকল গায়েবী বিষয়ে তোমার জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতার ওসীলায় তোমার নিকট এ প্রার্থনা করছি যে, বেঁচে থাকা যতক্ষণ আমার জন্য কল্যাণকর হয়, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো। যখন আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তখন আমাকে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আমাকে তোমার ভয় দান করো। হে আল্লাহ! ক্রোধান্বিত এবং সন্তুষ্ট সকল অবস্থায় আমাকে সত্য বলার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সম্পদশালী এবং দরিদ্র থাকা অবস্থায় আমাকে মিতব্যয়ী হওয়ার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন নেয়ামত প্রার্থনা করছি, যা কখনো শেষ হবে না এবং চক্ষু শীতলকারী এমন সম্পদ চাচ্ছি, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তাক্বদীরের ফায়ছালা আসার পর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কোনো

২৮. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৮২, ইবনে মাজাহ হা/১৩৮৩, আবূ দাউদ হা/১৫৩৮।

প্রকার কষ্ট ছাড়াই তোমার সম্মানিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার স্বাদ ও তোমার সাক্ষাতের নেয়ামত প্রার্থনা করছি। তবে এমন কষ্ট ও মুছীবতের মধ্যে নিপতিত করে নয়, যা আমার দীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর এবং এমন ফিতনায় নিপতিত করে নয়, যা দিশেহারা করে দেয় ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং সঠিক পথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করো"।[২৯]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল উপরোক্ত দলীলগুলোতে তার কতিপয় ছিফাতের নাম রেখেছেন ইলম, কুদরত ও শক্তি। এমনি তার কতিপয় মাখলুকের ছিফাতকে উপরোক্ত নামে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

"আল্লাহ দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেন তারপর এ দুর্বলতার পরে শক্তি দান করেন, এ শক্তির পরে তোমাদেরকে আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সবকিছু জানেন, সব জিনিসের উপর তিনি শক্তিশালী" *(সূরা রূম: ৫৪)*। সূরা ইউসুফের ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"অবশ্যই সে আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানে না"।

সুতরাং এ কথাটি বোধগম্য যে, সকল মানুষের ইলম এক সমান নয়, সকল মানুষের ক্ষমতাও এক সমান নয়। সুতরাং আল্লাহর ইলম তার সৃষ্টির ইলমের মতো হয় কিভাবে? এ রকম উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে। সকল বিবেকবান ও জ্ঞানীদের জন্যই এটি বুঝা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে বিশেষিত করেছেন; যেমন-সন্তুষ্ট হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, ভালোবাসা ও ঘৃণা করা, কেউ যদি এগুলোর কোনোটিকে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে যে, এ জাতীয় ছিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে আল্লাহর সাথে বান্দার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার জন্য দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাকে বলা হবে, তুমি তো আল্লাহর জন্য হায়াত, ইলম, ইচ্ছা, কথা বলা, শ্রবণ করা, দেখা, ক্ষমতা, এ সাতটি বিশেষণ সাব্যস্ত করো। তুমি তো এগুলোকে মাখলুকের ছিফাতের অনুরূপ মনে করো না। সুতরাং আল্লাহ ও তার রসূল আল্লাহর জন্য যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন, যে সন্দেহে তুমি তা অস্বীকার করছো, সে সন্দেহ তো ঐ সাতটি ছিফাতেও বিদ্যমান, যা তুমি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত

২৯. হাদীছটি ছ্বহীহ। ইমাম হাকেমও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম যাহাবী ছ্বহীহ বলেছেন।

করেছো। আসল কথা হলো, তুমি যা সাব্যস্ত করছো এবং যা অস্বীকার করছো, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আর আল্লাহর সমস্ত ছিফাতে অবিশ্বাসী যে মুতাযেলী বলে, বান্দার ছিফাতের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি আল্লাহর জন্য কোনো ছিফাতই সাব্যস্ত করি না, তাকে বলো, তুমি তো আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নামগুলো সাব্যস্ত করে থাকো। যেমন তুমি আল্লাহকে الحي (চিরঞ্জীব), العليم (মহাজ্ঞানী), القادر (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) নামে নামকরণ করে থাকো। বান্দাকেও তো এ নামগুলো দিয়ে নামকরণ করা হয়। এখন মুতাযেলী যদি তোমাকে বলে, এ নামগুলো থেকে আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত হয়, বান্দার জন্য তার অনুরূপ কিছু সাব্যস্ত হয় না, তাহলে তুমি উক্ত মুতাযেলীকে আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে ঐ কথাই বলো, যা সে আল্লাহর নামগুলো সাব্যস্ত করার যুক্তিতে উপস্থাপন করেছে। আসলে যে আশঙ্কায় তুমি আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলো অস্বীকার করেছো, সে আশঙ্কা তার অতি সুন্দর নামগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।[৩০]

আর কেউ যদি বলে, আমি স্রষ্টার জন্য আসমায়ে হুসনা (সুন্দর নামসমূহ) সাব্যস্ত করি না। বরং বলি রূপকার্থে আল্লাহর জন্য নামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এগুলো তার কতিপয় সৃষ্টির নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, তাহলে জেনে রাখা উচিত যে, সীমালংঘনকারী বাতেনী সম্প্রদায় এবং দার্শনিকরা অনুরূপ কথা বলে থাকে।

তার জবাবে বলা হবে, স্রষ্টার অস্তিত্বে তোমার অবশ্যই বিশ্বাস রয়েছে। তুমি বিশ্বাস করো যে, তিনি চিরঞ্জীব, স্বনির্ভর এবং অস্তিত্বশীল। সৃষ্টিও অস্তিত্বশীল এবং স্বনির্ভর। কিন্তু মাখলুক স্রষ্টার সমতুল্য নয়। সুতরাং তোমাকে স্রষ্টার এমনসব নাম ও গুণাবলীতে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, যাতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

কোনো দার্শনিক ও নাস্তিক যদি বলে, আমি স্রষ্টার অস্তিত্ব, তার নাম এবং তার ছিফাত কোনো কিছুই সাব্যস্ত করি না। বরং স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করি।

তার জবাবে বলা হবে যে, বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তুই হয়তো নিজে নিজেই অস্তিত্ব লাভ করে, না হয় নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হয় না। অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তুই হয় অসৃষ্টি-চিরন্তন-অনাদি-অবিনশ্বর-সদা

---

৩০. মুতাযেলারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত নাম স্বীকার করে। তবে নামগুলোর মধ্যে যেসব বিশেষণ ও পূর্ণতার অর্থ রয়েছে, তা তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে না। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা ইলম ছাড়া আলীম, কুদরত ছাড়াই কাদীর, শ্রবণ করা ব্যতীতই সামী...ইত্যাদি। আশায়েরা সম্প্রদায় আল্লাহর নামগুলো এবং মাত্র সাতটি সিফাতে বিশ্বাস করে। মুতাযেলা ও আশায়েরাদের কথায় স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। এটি দেখিয়ে দেয়ার জন্যই লেখক কেবল উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর সিফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তারা আল্লাহর জন্য ঐসব অতি সুন্দর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করে, যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রসূল যেসব ছিফাত তার প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তারা তাও সাব্যস্ত করেন। কোন সিফাতেরই তারা অপব্যাখ্যা বা অস্বীকার করে না।

বিদ্যমান আর তা না হলে তা হবে এমন সৃষ্টি, যা একসময় অস্তিত্বশীল ছিল না, কিন্তু পরে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। সে সঙ্গে বিবেক-বোধশক্তি দ্বারা আরো সাব্যস্ত যে, অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তু হয় সৃষ্টি এবং স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী আর তা না হলে তা হবে অসৃষ্টি এবং স্রষ্টার প্রতি অমূখাপেক্ষী।

অস্তিত্বশীল প্রত্যেক বস্তু হয় অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী, আর না হয় স্বনির্ভর বা অন্যের প্রতি অমূখাপেক্ষী। যে বস্তু নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল নয়, তার পক্ষে নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল বস্তুর সাহায্য ছাড়া অস্তিত্বে আসা অসম্ভব। প্রাক্তন-চিরন্তন-অবিনশ্বর সত্তার সাহায্য ব্যতীত কোন নশ্বর বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। অভাবগ্রস্ত কখনো অভাবহীনের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু সম্পর্কিত উপরোক্ত বিশেষণ থেকে এমন এক অস্তিত্বশীলের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়, যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, অবিনশ্বর-চিরন্তন, সদা বিদ্যমান, স্রষ্টা এবং অন্যের প্রতি অমূখাপেক্ষী। সে অবিনশ্বর-চিরন্তন সত্তা ব্যতীত অন্যরা তার ব্যতিক্রম। ইন্দ্রিয়, বিবেক, বোধশক্তি ও বাস্তবতা দ্বারা এএসব বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, যা নশ্বর এবং অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। আর নশ্বর বস্তু কখনো নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসতে পারে না, সে চিরন্তন, অবিনশ্বর এবং অন্যের স্রষ্টা হতে পারে না। সে সঙ্গে সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত টিকে থাকতেও পারে না।

সুতরাং বাস্তবতা ও বোধশক্তি দ্বারা দু'টি বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো। একটি আবশ্যক এবং অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভাব্য, একটির অস্তিত্ব অনাদি-প্রাক্তন-চিরন্তন-অবিনশ্বর এবং অন্যটির অস্তিত্ব নতুন-নশ্বর। অস্তিত্বশীল এ দু'টির একটি অমুখাপেক্ষী, অন্যটি অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী, একটি স্রষ্টা, অন্যটি সৃষ্টি। দু'টি বস্তুই অস্তিত্বশীল ও বিদ্যমান হওয়ার দিক থেকে একই রকম। অর্থাৎ দু'টিরই অস্তিত্ব রয়েছে। অস্তিত্বশীল থাকার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। আর এটিও জানা কথা যে, উভয়ের অস্তিত্বের প্রকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য পরস্পর সমান নয়। উভয়ের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব যদি পরস্পর সমান হয়, তাহলে যা হওয়া আবশ্যক, যা হওয়া সম্ভব এবং সম্ভব নয় উভয়টি পরস্পর সমান হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে। অস্তিত্বশীল দু'টি বস্তুর হাকীকত যদি একই রকম হয়, একটি চিরন্তন-অবিনশ্বর হওয়া আবশ্যক হবে এবং অন্যটির চিরন্তনতা আবশ্যক হবে না, একটি হবে স্রষ্টা, অন্যটি স্রষ্টা হবে না এবং একটি হবে অমুখাপেক্ষী এবং অপরটি হবে মুখাপেক্ষী।

আর যদি উভয়ের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব পরস্পর সমান হয়, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকটিই চিরন্তন-অবিনশ্বর হওয়া আবশ্যক হবে এবং একই সাথে চিরন্তন-অবিনশ্বর হবে না। নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হবে অথবা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হবে না, স্রষ্টা হবে কিংবা স্রষ্টা হবে না, অভাবহীন-অমুখাপেক্ষী হবে বা অভাবহীন-অমুখাপেক্ষী হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উভয় বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব পরস্পর সমান নির্ধারণ করা হলে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু একসাথে একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়। অতএব বিবেক ও বোধশক্তি

সুস্পষ্ট নির্দেশনা দ্বারা জানা গেল যে, উভয় বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব পরস্পর সমান নয়। শরী'আতের দলীল দ্বারা উক্ত ধারণা বাতিল।

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অবিনশ্বর এবং নশ্বর একদিক থেকে পরস্পর সমান। অর্থাৎ উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। অন্যদিক থেকে পরস্পর ভিন্ন। অর্থাৎ অবিনশ্বরের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব, নশ্বরের প্রকৃতি ও স্বভাব থেকে ভিন্ন। সুতরাং যে ব্যক্তি উভয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করলো, সে বিবেক-বোধশক্তি ও বাস্তবতার দলীল-প্রমাণকে বাতিল করে দিল এবং একটি বাতিল কথা বলল। আর যে ব্যক্তি অবিনশ্বর ও নশ্বরের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বভাবকে পরস্পর সমান মনে করলো অবিনশ্বরের ছিফাতকে নশ্বরের ছিফাতের সাদৃশ্য করে ফেলল সেও একটি বাতিল কথা বলল। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদিও একদিক মূল্যায়নে সমান অর্থাৎ উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অস্তিত্ব, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ কুদরত এবং অন্যান্য বিশেষণে বিশেষভাবে বিশেষিত। বান্দারা এ বিশেষণগুলোর কোনটিতেই আল্লাহ তা'আলার শরীক নয়। বান্দার রয়েছে উপযুক্ত অস্তিত্ব, জ্ঞান ও ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা বান্দার বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবে বিশেষিত হওয়ার অনেক উর্ধ্বে।

আর নশ্বর ও অবিনশ্বরের অস্তিত্ব, ইলম এবং কুদরতকে যখন যৌথ মনে করা হবে, তখন এ যৌথের চিন্তা কেবল এমন ও মস্তিস্কের কল্পনার মধ্যে সীমিত থাকবে, মস্তিস্কের বাইরে ও বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। সুতরাং অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রত্যেকেরই এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব রয়েছে, যাতে অন্যের কোন অংশীদারিত্ব থাকে না।

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সৃষ্টির অস্তিত্বের ব্যাপারে কালামশাস্ত্রবিদ অনেকেই এলোমেলো কথা বলেছে। তারা ধারণা করেছে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে অভিন্ন নাম ব্যবহার করলে কিংবা নামের দিকে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেই স্রষ্টার অস্তিত্ব বান্দার অস্তিত্বের মত হয়ে যায়।

আরেকদল লোক মনে করেছে, "موجود (অস্তিত্বশীল)" এ কথাটি এমন একটি لفظ مشترك "যৌথ শব্দ" যা বিভিন্ন প্রকৃতি ও স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারা তাদের জ্ঞানের অহমিকা প্রদর্শন করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা বিবেক-বুদ্ধির প্ররোচনার শিকারে পরিণত হয়েছে। তাদের কথা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ موجود শব্দটি যৌথ অর্থাৎ বান্দা এবং আল্লাহর জন্য যৌথভাবে ব্যবহৃত হলেও আল্লাহর জন্য এক অর্থে এবং বান্দার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং উভয়ের জন্য মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার জন্য যখন موجود (অস্তিত্বশীল), الحي (চিরঞ্জীব), العليم (জ্ঞানবান) এবং القادر (ক্ষমতাবান) শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে তখন এগুলোর মূল অর্থ উভয়ের

জন্য সাব্যস্ত হবে। তবে উক্ত ছিফাতগুলো দ্বারা উভয়ের বিশেষিত হওয়ার পরিমাণ ও ধরণের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ নামগুলো ব্যাপকার্থবোধক এবং বিভক্তিযোগ্য। যেমন বলা হয়ে থাকে, অস্তিত্বশীল বস্তু বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক অস্তিত্বশীল এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বশীল, অনাদি-চিরন্তন-চিরস্থায়ী-অবিনশ্বর অস্তিত্বশীল এবং নতুন-নশ্বর-ধ্বংসশীল অস্তিত্বশীল। موجود শব্দের সাধারণ বা মূল অর্থ সকল প্রকারের মধ্যেই বিদ্যমান।

ঐদিকে যে لفظ مشترك "যৌথ অর্থ বোধক শব্দ" বিভিন্ন প্রকৃতি ও স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিভক্তি কবুল করে না। যেমন আরবদের ভাষায় مشتري এমন একটি যৌথ অর্থ বোধক শব্দ যা বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। শব্দটি একদিকে ক্রয়-বিক্রয়ের এক পক্ষের জন্য তথা ক্রেতার জন্য ব্যবহৃত হয় আবার আসমানের তারকা বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটি এমন কোন মুশতারিক বা যৌথ শব্দ নয়, যার মূল অর্থে একাধিক বিশেষ্য বিশেষিত হতে পারে। তবে এভাবে বলা যেতে পারে যে, مشتري শব্দটি এ অর্থে অথবা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অপর দিকে موجود শব্দটি এএ لفظ مشترك বা যৌথ অর্থবোধক শব্দ, যার মূল অর্থ একাধিক বস্তুর মধ্যে ভাগ হতে পারে। যেমন বলা হয়, الله موجود "আল্লাহ অস্তিত্বশীল" এবং العبد موجود "বান্দা অস্তিত্বশীল"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে موجود (অস্তিত্বশীল) শব্দটি আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ জাতীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।

আশায়েরা এবং মুতাযেলারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও ছিফাতগুলোকে বুঝতে ভুল করেছে। তাদের ভুলের কারণ হলো, সাধারণ অর্থবোধক শব্দ যে অর্থ বহন করে তা দ্বারা নামকরণকৃত একাধিক বস্তুর মধ্যে সে সাধারণ অর্থ হুবহু বিদ্যমান থাকার ধারণা করেই তারা ভুল করেছে। মূলত বিষয়টি এ রকম নয়। সাধারণ ও যৌথ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা একাধিক বস্তুর নাম রাখলে মস্তিষ্ক ও মনের কল্পনার মধ্যেই কেবল সবগুলো বস্তুর মধ্যে সে সাধারণ অর্থ হুবহু এবং অভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকার ধারণা জাগ্রত হয়। বাস্তবে উক্ত যৌথ ও সমার্থবোধক নামের প্রত্যেকটিতেই আলাদা আলাদা স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সুতরাং موجود (অস্তিত্বশীল), الحي (চিরঞ্জীব), العليم (জ্ঞানবান) এবং القادر (ক্ষমতাবান) শব্দগুলো দ্বারা যখন আল্লাহ তা'আলার নাম রাখা হবে, তখন তার অর্থ কেবল তার জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে। আর যখন বান্দার জন্য ঐ সকল নাম নির্ধারণ করা হবে, তখন তা থেকে কেবল বান্দার জন্য শোভনীয় নির্দিষ্ট অর্থই সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব, হায়াত এত ব্যাপক ও বিশাল যে, তাতে অন্য কেউ শরীক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। শুধু তাই নয়; বরং অস্তিত্বশীল নির্দিষ্ট বস্তুর অস্তিত্বেও অন্য কেউ

অংশীদার হয় না।[৩১] সুতরাং স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে সৃষ্টির অস্তিত্বের তুলনা হয় কিভাবে? অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, এটিই হলো ঐটি। অথচ উভয় বস্তুর বিশেষত্ব, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে বিরাট পার্থক্য থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যেসব নাম ও বিশেষণ আল্লাহ এবং বান্দার জন্য যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে মুশাব্বেহা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলাকে বান্দার জন্য সাব্যস্ত অর্থে বিশেষিত করেছে। কিন্তু তারা হকের সাথে বাতিল যুক্ত করে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ছিফাতকে হুবহু বান্দার ছিফাত বলেছে এবং আল্লাহকে বান্দার সাথে সাদৃশ্য করে ফেলেছে। অপর দিকে মুআত্তিলা সম্প্রদায় বান্দার সাদৃশ্য হতে আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র করেছে ঠিকই, তবে তারা এ সত্যটি সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হওয়ার ভয়ে তার সমস্ত সুউচ্চ ছিফাতকেই অস্বীকার করে ফেলেছে।

আল্লাহ তা'আলার কিতাব তার অতি সুন্দর নাম ও ছিফাতের ক্ষেত্রে কেবল এমন সত্য বিষয় উপস্থাপন করেছে, যা মানুষের সুস্থ ও পরিশুদ্ধ বিবেক-বোধশক্তির পক্ষে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কুরআন এমন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে, যাতে কোনো প্রকার বিকৃতি ও বিচ্যুতি নেই।

সৃষ্টির সাদৃশ্য হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহকে পবিত্র করতে গিয়ে জাহমীয়া সম্প্রদায় খুব সুন্দর কথা বলেছে। কিন্তু একই সময় আল্লাহ তা'আলার জন্য যেসব সুউচ্চ অতুলনীয় গুণাবলী তারা সাব্যস্ত করে তা অস্বীকার করে খুব নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

অপরদিকে মুশাব্বেহা সম্প্রদায় আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুন্দর কথা বলেছে। কিন্তু আল্লাহর ছিফাতকে হুবহু বান্দার ছিফাতের সাথে তুলনা করে খুব নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে অনারব লোকের জন্য যে অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়, সম্বোধিত ব্যক্তি ঐ অর্থ ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না সে শব্দটি দ্বারা মূল জিনিসটি চিনতে পারে। যে শব্দ একাধিক বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, ঐ শব্দের মূল অর্থে সবগুলো বস্তুই শরীক থাকে। অর্থাৎ শব্দটির অর্থের একটি যৌথ্য পরিমাণ ও সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ সবগুলো বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। এ পরিমাণ যৌথ ও সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ না থাকলে শ্রোতাদেরকে কখনো সম্বোধন বুঝানো যাবে না। এমনকি বাক্যের অর্থ শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একক শব্দের অর্থ শেখাতে হয়।

---

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এমন নয় যে, এক সময় তার অস্তিত্ব ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছেন। বরং তিনি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার আগেও ছিলেন, সৃষ্টি করার পরেও আছেন, আগামীতেও থাকবেন। কিন্তু বান্দার অস্তিত্ব এক সময় ছিল না। অতঃপর সে অস্তিত্বে এসেছে এবং তার অস্তিত্ব চিরন্তনও নয়। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিই ধ্বংসশীল। সুতরাং বান্দার অস্তিত্ব এবং আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বান্দার কিছু কিছু ছিফাত এবং আল্লাহর কিছু কিছু সিফাতের নাম এক হলেও উভয়ের সিফাতের পরিমাণ ও ধরণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

শিশুকে ভাষা শিক্ষা দেয়ার সময় সর্বপ্রথম তার সামনে শব্দ উচ্চারণ করা হয় এবং তার অর্থটি প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয় শক্তির সামনে সুস্পষ্ট হলে ইঙ্গিতের মাধ্যমে শিশুকে অর্থটি দেখিয়ে দিতে হয়। যেমন তাকে বলা হয়, لبن (দুধ), خبز (রুটি), أم (মা), أب (বাপ), سماء (আকাশ), أرض (যমীন), شمس (সূর্য), قمر (চাঁদ), ماء (পানি) ইত্যাদি। এ নামগুলো দ্বারা যা উদ্দেশ্য হয়, তার প্রত্যেকটি শিশুকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝানো হয়ে থাকে। তা করা না হলে শব্দের অর্থ এবং শিক্ষকের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জিত শিক্ষা প্রত্যেক বনী আদমেরই প্রয়োজন রয়েছে। আর কেনইবা তা প্রয়োজন হবে না?

অথচ আবুল বাশার আদম (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ঐসব জিনিসগুলো শেখালেন, যা শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায়। অর্থাৎ সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন। আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলেছেন এবং অহীর মাধ্যমে এমন জিনিস শিখিয়েছেন, যা তিনি বোধশক্তির মাধ্যমে জানতে পারেননি।

মানুষ মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে। মানুষের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য মনের মধ্যেই লুকায়িত থাকে। প্রথমে শব্দের মাধ্যমে তা বুঝা যায় না। শব্দের মাধ্যমে কোন অর্থ উদ্দেশ্য করা হচ্ছে, তা সর্বপ্রথম জানা ব্যতীত শব্দের নিছক উচ্চারণের মাধ্যমে অর্থ বুঝা যায় না। যখন তা জানা যায়, অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার শব্দটি শ্রবণ করে, তখন ইঙ্গিত ছাড়াই উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়

আর শব্দের দ্বারা যদি এমন বিষয় উদ্দেশ্য হয়, যা ভিতরে অনুভব হয়, যেমন ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, তৃষ্ণা নিবারণ, দুঃশ্চিন্তা, খুশী ইত্যাদি, এগুলোর নাম ও স্বরূপ কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের মধ্যে তা অনুভব করে। সে যখন তা নিজের মধ্যে অনুভব করবে, তখন তাকে ইঙ্গিত করে বুঝানো হবে এবং বলা হবে যে, এগুলোই হলো ক্ষুধা, তৃপ্তি, পিপাসা ইত্যাদির নাম। ইঙ্গিত কখনো নিজের ক্ষুধা অথবা পিপাসার দিকে হতে পারে। যেমন কেউ কাউকে ক্ষুধার্ত দেখে বলল, তুমি ক্ষুধার্ত হয়েছো, তুমি ক্ষুধার্ত ইত্যাদি। শিশুকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রেও শিশুর মা একই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। শিশু তার মার জবানে উচ্চারিত শব্দ শুনে এবং ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়টিও বুঝে নেয়। অথবা ইঙ্গিতের অর্থ প্রদানকারী এমন আলামত ব্যবহার করে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়। শিশু যখন তার নিজের মধ্যে ক্ষুধা অথবা পিপাসা অনুভব করে তখন তার অবস্থা দেখে শিশুর মা বলে তুমি ক্ষুধার্ত, এ বলে তার মা তার জন্য খাবার অথবা দুধ বাড়িয়ে দেয় এবং খাবার পরিবেশন করার সময় الطعام এবং পানি দেয়ার সময় الماء ইত্যাদি উচ্চারণ করে। প্রত্যেকবারই এ কাজের পুনরাবৃত্তি হওয়া এবং তার মা কর্তৃক খাবার কিংবা পানীয় পরিবেশন করা থেকে শিশুর মাথায় বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ক্ষুধার সময় যা গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় الطعام (খাবার) এবং পিপাসা লাগলে যার প্রয়োজন তার নাম الماء (পানি)। মায়ের এহেন কথা-বার্তা ও ইঙ্গিত থেকেই শিশু الجوع এবং العطش শব্দের অর্থ বুঝে নেয়। শিশু বুঝে নেয়,

তার ভিতরে খাবারের যে প্রয়োজন অনুভব হয় তার নাম الجوع (ক্ষুধা) এবং তার ভিতরে পানির যে প্রয়োজন অনুভব হয়, তার নাম العطش (পিপাসা)। এভাবেই শিশু ইঙ্গিত ছাড়াই শব্দ এবং তার অর্থ বুঝে নেয়। এগুলো বোধশক্তি দ্বারা অনুভূত অভ্যন্তরীন বিষয়। শিশু যখন কাউকে বিষন্ন দেখে তখন যদি তার পিতা বলে هذا غضبان "এ লোকটি ক্রোধান্বিত" এবং শিশু যদি কোনো মানুষের মধ্যে হাশি-খুশীর লক্ষণ দেখে এবং শিশুর পিতা যদি বলে هذا فرح "এ লোকটি আনন্দিত, তা থেকে শিশুরা غضبان এবং فرح -এর অর্থ বুঝে নেয়।

ঠিক এমনি শিশু যখন অন্যদেরকে উক্ত শব্দগুলো দ্বারা তাদের নিজ নিজ অবস্থা তুলে ধরে তখনো শিশুরা শব্দ এবং তার অর্থ বুঝে নেয়।

উপরোক্ত বিশেষণের উদ্দেশ্য হলো, নাবী-রসূলগণ তাদের জাতির লোকদের সামনে যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর একাধিক অবস্থা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যা তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য হতে পারতো। আরেক শ্রেণীর বিষয় ছিল যা ইন্দ্রিয় কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। জিনিসগুলো প্রথম দু'প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলে তা বুঝতে ভাষাজ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। একক শব্দগুলো এবং বাক্যের অর্থ বুঝে নিলেই তা বুঝা সম্ভব। যখন তাদেরকে বলা হয়েছে,

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾

"আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি"। *(সূরা আল বালাদ: ৮-৯)* অথবা যখন তাদেরকে বলা হয়েছে,

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে বের করেছেন এএ অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন এবং হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো"। *(সূরা আন নাহাল: ৭৮)*

অনুরূপ আয়াত আরো অনেক রয়েছে। এ আয়াতগুলোতে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সম্বোধিত ব্যক্তিগণ তা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে নিয়েছে।

আর যেসব বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিংবা চোখ দ্বারা দেখা যায় না এবং সাধারণ বিবেক-বোধশক্তি দ্বারা যা অর্জন করা অসম্ভব হওয়ার কারণে শব্দের মাধ্যমে যার উদ্দেশ্য বুঝা যায় না; বরং তা এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না, সেক্ষেত্রে কথা হলো তা বুঝার জন্য কিয়াস-তুলনা এবং

উদাহরণ উপস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। সে সাথে ঐ বিষয়গুলো এবং বোধশক্তি দ্বারা বোধগম্য দৃশ্যমান বস্তুগুলোর মধ্যে যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রয়েছে তার মধ্যে বিচার-বিবেচনা করা জরুরী। এক্ষেত্রে উপমা ও দৃষ্টান্ত যত বেশী শক্তিশালী হয়েছে, বর্ণনা ততই সুন্দর হয়েছে এবং বিষয়গুলো অধিকতর পূর্ণরূপে বুঝা সম্ভব হয়েছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য এমনসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না। আরবদের ভাষায় এমন কোন শব্দও ছিল না, যা দ্বারা হুবহু ঐ জিনিসগুলো বুঝা যায়। তাই তিনি এমনসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থের সাথে আরবদের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থের মিল রয়েছে। এ শব্দগুলোকেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের নাম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আরবরা যে অর্থে ঐ শব্দগুলো ব্যবহার করতো এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐগুলোকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, উভয়ের মাঝে একটি যৌথ অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ছ্বলাত, যাকাত, সিয়াম, ঈমান, কুফর ইত্যাদি। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আখিরাত সম্পর্কীয় বিষয়াদির কথাও অনুরূপ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অর্থে এ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন, ইসলাম আগমনের পূর্বে তাদের নিকট সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।[৩২] এজন্য হুবহু এ অর্থগুলো প্রকাশকারী শব্দমালাও তাদের নিকট ছিল না। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৩২. তবে তারা এ শব্দগুলো অন্যান্য অর্থে তাদের কথা-বার্তায় ব্যবহার করতো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার মাঝে এবং তৎকালীন আরবের লোকেরা যে অর্থে ঐগুলোকে ব্যবহার করতো, তার মাঝে একটা মিল অবশ্যই রয়েছে। তারা রুকু-সিজদা বিশিষ্ট ছলাতের সাথে পরিচিত ছিল না। কিন্তু তারা এটি বুঝতো যে, الصلاة অর্থ দু'আ, الزكاة অর্থ পবিত্র হওয়া ইত্যাদি। ইসলামের ছলাতের মধ্যে যেহেতু রুকু-সিজদা-কিয়ামের সাথে প্রচুর দু'আর সমাহার ঘটেছে, তাই এটিকে ছলাত নাম দেয়া হয়েছে। এমনি যাকাতের মধ্যে যেহেতু ব্যক্তি ও ব্যক্তির মাল-ধনের পবিত্রতা রয়েছে, তাই সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের বিশেষ যে অংশ বছরে একবার গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয় তাকে যাকাত বলা হয়েছে। আমরা الصيام বলতে ইসলামের যে রোযাকে বুঝি, আরবের লোকেরা তখন সে অর্থে সিয়ামকে বুঝতো না। আমরা নিয়তসহ সুবহে সাদেকের একটু পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং রোযা ভঙ্গকারীর অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকাকে সিয়াম বলি। কিন্তু তারা বিরত থাকা অর্থে সিয়াম শব্দটি তাদের ভাষায় ব্যবহার করতো। ইসলামের পারিভাষিক অর্থ আর তাদের ব্যবহৃত অর্থ যদিও হুবহু এক নয়, কিন্তু উভয় অর্থের মধ্যে মৌলিক মিল রয়েছে। এ মিল না থাকলে কুরআন ও হাদীছের শব্দগুলো বুঝা মোটেই সম্ভব হতো না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষার জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে সময়ের আরবরাও তা ব্যবহার করতো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, আরবরা হুবহু সে অর্থের সাথে পরিচিত ছিল না ঠিকই; কিন্তু সেগুলোর সাধারণ ও মূল অর্থ তাদের কাছে পরিচিত ছিল। শব্দগুলো দ্বারা তিনি অতিরিক্ত কী উদ্দেশ্য করেছেন, তা কথা-বার্তা, উপমা-উদাহরণ, কাজ-কর্ম, ইঙ্গিত-ইশারা এবং বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গায়েবী বিষয়ের ক্ষেত্রেও যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাও আরবরা ব্যবহার করতো। তারা যে অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করতো, তা ঠিক রেখে অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ গায়েবী বিষয়ের শব্দগুলো বহন করে, তা বুঝ শক্তির নিকটবর্তী করার জন্য কুরআন ও হাদীছে বহু দৃষ্টান্ত, উপমা, ইশারা-ইঙ্গিত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐগুলোর চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ পেশ করেছেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

আরবী ভাষা থেকে ইসলামী বিষয়গুলো লোকদের বুঝানোর জন্য এমন উপযুক্ত শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, যাতে আরবদের নিকট পরিচিত অর্থ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আনীত গায়েবী অর্থের মধ্যে সম্পর্ক ও মিল ছিল। এর সাথে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসল উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ইঙ্গিত এবং অনুরূপ বিষয় যোগ করেছেন। যেমন ইঙ্গিতের মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। রাবীআ বিন আবু আব্দুর রাহমান বলেন, জ্ঞানীদের কাছে শিক্ষার্থীগণ ঠিক সেরকম যেমন পিতা-মাতার কোলে শিশুগণ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব গায়েবী বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তার অনুরূপ কিছু বিষয় তারা তাদের ইন্দ্রিয় এবং বোধশক্তি দ্বারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন তিনি মক্কার লোকদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আদ জাতি প্রচন্ড বাতাসের মাধ্যমে ধ্বংস হয়েছে। আদ জাতি ছিল তাদের মতই মানুষ, আর তারা যে বাতাসে ধ্বংস হয়েছিল, তা ছিল তাদের কাছে পরিচিত বাতাসের মতই। তবে তা ছিল অধিকতর প্রচন্ড ও শক্তিশালী। সাগরে ফেরাউনের ডুবে মরার ঘটনাও অনুরূপ। অতীত জাতিসমূহের সংবাদের ব্যাপারেও একই কথা। এ জন্যই আমাদের জন্য পূর্বের জাতিসমূহের ঘটনা বর্ণনা করার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে"। *(সূরা ইউসুফ: ১১১)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এমন বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সার্বিক বিবেচনায় যার অনুরূপ হাকীকত বিশিষ্ট জিনিস তারা কখনো দেখেনি। তবে তিনি যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অর্থের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা তাদের ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের মধ্যে কোনো না কোনো দিক বিবেচনায় সাদৃশ্য রয়েছে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এবং অন্যান্য গায়েবী বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তখন তাদের জানা আবশ্যক ছিল যে, তিনি যেসব শব্দের মাধ্যমে গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তার মাঝে এবং ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা তারা দুনিয়াতে তাদের ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তি দ্বারা বুঝতো তার মাঝে অর্থগত একটা মিল ও সংগতি থাকবে।[৩৩]

---

৩৩. উদাহরণ স্বরূপ কিয়ামতের দিন মানুষের আমল ওজন করার জন্য স্থাপিত দাঁড়িপাল্লা, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে স্থাপিত পুলসিরাত, হাওযে কাউছার, আমলনামা ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। যে অর্থে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সে অর্থ তাদের কাছে পরিচিত ছিল না। কিন্তু এগুলোর মূল অর্থ তাদের জানা ছিল। তাদের কাছে জিনিস-পত্র ওজন করা ও মাপার দাঁড়িপাল্লা ছিল এবং তারা পানির হাওয দেখেছে। অনুরূপ জান্নাতের যেসব ফল-ফলাদির উল্লেখ রয়েছে, তার অনুরূপ বিভিন্ন ফলও তারা দুনিয়াতে দেখেছে ও খেয়েছে। এসব জিনিসের দুনিয়ার এবং আখিরাতের নাম এক ও অভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে অর্থগত একটা মিল ও সাদৃশ্য

আর যখন এমন হতো যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবী বিষয়সমূহের যেসব শব্দ বলেছেন, তার অর্থ তারা তখনো দুনিয়াতে প্রত্যক্ষ করেনি; বরং তিনি তাদেরকে তা পূর্ণরূপে দেখাতে চাচ্ছেন, যাতে তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও গায়েবী বিষয়ের মধ্যকার যৌথ অর্থটি বুঝতে পারে, তখন তিনি তাদেরকে ঐ জিনিসটি দেখিয়েছেন, তাদের বুঝানোর জন্য তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং সে ব্যাপারে এমন কথা বলেছেন, যা তার জন্য বর্ণনা ও সাদৃশ্য স্বরূপ হয়। এতে করে শ্রোতাগণ বুঝে নিতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান হাকীকতগুলোর জ্ঞান হাসিল করাই হলো গায়েবী বিষয়সমূহ জানার একমাত্র পন্থা।

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য পুরোপুরি বুঝার জন্য তিনটি বিষয় জানা আবশ্যক।

(১) তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন তার বিষয়বস্তু যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্যমান হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ ভালোভাবে আয়ত্ত করা।

(২) বোধশক্তি দ্বারা তার সাধারণ অর্থ উপলব্ধি করা।

(৩) ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তির দ্বারা উপলব্দিযোগ্য অর্থসমূহের প্রতি নির্দেশক শব্দগুলোর অর্থ সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করা।

হয়েছে। এ পরিমাণ মিল না থাকলে গায়েবী বিষয়ে নাবী-রসূলদের সম্বোধন তাদের বোধগম্য হতো না। কিন্তু পরিমাণ ও গুণাগুণের দিক থেকে দুনিয়া এবং আখিরাতের গায়েবী বিষয়সমূহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহর ছ্বিফাতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। এগুলোও গায়েবী বিষয়। কুরআন ও হাদীছে আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া, তার ইলম, হায়াত, কুদরত, দেখা, শ্রবণ করা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি বিশেষণের কথা বলা হয়েছে। আখিরাতের বিভিন্ন গায়েবী বিষয় এবং আল্লাহর বিভিন্ন ছ্বিফাত একই সূত্রে গাথা। জান্নাত মানে বাগান। নার মানে আগুন। দুনিয়ার বাগানকে জান্নাত বলা হয়। আখিরাতের মুমিনদের জন্যও রয়েছে জান্নাত। দুনিয়ার আগুন ও আখিরাতের আগুনের মূল অর্থ একই। কিন্তু উভয়ের গুণাগুণ, উত্তাপের পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা।

সুতরাং কোন বিশেষণ দ্বারা একাধিক বস্তু বিশেষিত হলেই উক্ত বিশেষণ দ্বারা সকলেই পরিমাণ, গুণাগুণ, পদ্ধতি, ধরণ ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে সমানভাবে বিশেষিত হয়ে যায় না। দুনিয়ার সকল মানুষকে একত্রিত করলেও সকল দিক থেকে সমান বৈশিষ্ট্যের ও একই চেহারার মানুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। মাখলুকের ক্ষেত্রে বিষয়টি যখন ঠিক এ রকমই, তখন মহান স্রষ্টার ছ্বিফাত এবং নগণ্য সৃষ্টির ছ্বিফাত এক হয়ে যায় কিভাবে? মানুষের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীগণ। কিন্তু সকল মানুষের জ্ঞান সমান নয়। কিন্তু জ্ঞানের মূল অর্থ তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। সকল সৃষ্টির হাত যেখানে এক রকম নয়, সেখানে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের অনুরূপ হওয়ার ধারণা মাথায় আসে কিভাবে?

মোট কথা গায়েবী-অদৃশ্য বিষয়গুলো নাবী-রসূলগণ তাদের নিজ নিজ জাতির কাছে এমনসব শব্দ দ্বারা উপস্থাপন করেছেন, সেসব শব্দের অর্থ তাদের কাছে পরিচিত ছিল বলেই তারা বোধশক্তি কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে নিত। আল্লাহর হাত বলতে তারা হাতই বুঝতো। অর্থাৎ ইহার মূল অর্থ সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়ের জন্যই সাব্যস্ত, -এটা তাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু কখনো তারা এ থেকে তাশবীহ অর্থাৎ আল্লাহর হাতের সাথে বান্দার হাতের সাদৃশ্য বুঝতো না। বিশেষ করে যখন তারা ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তি দ্বারা একাধিক মাখলুককে একই ছ্বিফাত দ্বারা সকল দিক বিবেচনায় সমানভাবে বিশেষিত হতে দেখেনি। তাই ছাহাবীদের যুগে আল্লাহর ছ্বিফাতসমূহ বুঝতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। অর্থাৎ তারা সহজেই বুঝে নিয়েছেন যে, আল্লাহর কোনো ছ্বিফাতই বান্দার সিফাতের মত নয়। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি সম্বোধন বুঝার জন্য এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। তিনি যেখানে আমাদেরকে গায়েবী বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সেখানে গায়েবী বিষয় ও বাস্তব বিষয়ের মধ্যকার যৌথ অর্থ এবং উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য সম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক। দুনিয়ার পরিচিত ও দৃশ্যমান বস্তুগুলো আমরা না বুঝলে গায়েবী বিষয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য করা সম্ভব হতো না।

আর গায়েবী বিষয়গুলো দুনিয়ার পরিচিত বিষয়ের অনুরূপ হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বাতাসের মাধ্যমে আদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছি। আর অনুরূপ ও সাদৃশ্যপূর্ণ না হলে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বলা হবে। এভাবে বলা হবে যে, ঐ বিষয়টি এরূপ নয় এবং এ জাতিয় অন্যান্য কথা।[৩৪]

সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, গায়েবী বিষয় ও দুনিয়ার পরিচিত জিনিসগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য নেই, তখন সম্বোধনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য করাই যথেষ্ট।[৩৫]

তবে এটি জেনে রাখা আবশ্যক যে, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকা উভয়ের মধ্যে একটি যৌথ অর্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এ যৌথ পরিমাণই হলো لفظ مشترك তথা যৌথ শব্দের অর্থ।

---

৩৪. আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাত মাখলুকের সিফাতের অনুরূপ ও সদৃশ নয় এবং আখিরাতের গায়েবী বিষয়গুলোও দুনিয়ার পরিচিত জিনিসগুলোর সদৃশ নয়।

৩৫. উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রথমত যখন কারো প্রতি সম্বোধন না করে শুধু اليد শব্দটি উল্লেখ করা হবে, তখন আমাদের বোধশক্তি মস্তিস্কে হাতের একটি সাধারণ অর্থ কল্পনা করে। এ অর্থের নাম হলো المعنى الكلي العام المشترك অর্থাৎ একাধিক সত্তার জন্য সম্বোধনযোগ্য একটি সাধারণ অর্থ। এটি হতে পারে যেমন আল্লাহর হাত, হতে পারে মানুষের হাত, হতে পারে অন্যান্য প্রাণীর হাত। মন ও মস্তিস্কের মধ্যেই এ যৌথ চিন্তা জাগ্রত হতে পারে। মস্তিস্কের বাইরে এ অর্থে এমন কোনো হাত নেই, যা সকলের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যখন হাতকে কারো দিকে সম্বোধন করা হবে, তখন যৌথ অর্থের চিন্তা কিংবা একজনের হাতের সাথে অন্যের হাতের সাদৃশ্যের সন্দেহ ও ধারণা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যখন يد الله (আল্লাহর হাত), يد الإنسان (মানুষের হাত) يد النملة (পিপড়ার হাত) ইত্যাদি বলা হবে তখন এক জিনিসের হাতের সাথে অন্য জিনিসের হাতের সাদৃশ্যের চিন্তা বাতিল হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেকের জন্য শোভনীয় হাতের ধারণা মাথায় চলে আসে। অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের সাথে যেমন হাত শোভনীয়, তেমনি তার হাত। আমরা তার ধরণ, কায়া, পরিমাণ ইত্যাদি জানি না। কারণ সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়নি। ঐদিকে আমরা মানুষের হাত দেখেছি। সুস্থ ও স্বাভাবিক গঠনের একজন মানুষের হাত কেমন হতে পারে তাও আমরা দেখি। যদিও সকলের চেহারা, গঠন, ধরণ, শক্তি এক রকম নয়। এটি একদম সহজ-সরল ও বোধগম্য কথা। এটিই বাস্তব কথা। বিবেকবান ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী কোন মানুষ কি কখনো বলেছে হাতির পা পিপড়ার পা-এর মত?

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত হচ্ছে যে, সকল সৃষ্টির বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব যেখানে এক রকম নয়, সেখানে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার জন্য হাত বা অন্যান্য ছ্বিফাত সাব্যস্ত করলে যাদের বিবেক ও বোধশক্তির নিকট আল্লাহর হাত বান্দার হাতের মত মনে হয় কিংবা মানুষের অঙ্গের মতই যারা হাতকে কল্পনা করে তাদেরকে বিবেকবান, যুক্তিবিদ ও বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে না।

গায়েবী বিষয় এবং দুনিয়ার পরিচিত বিষয়ের মধ্যে এ পরিমাণ মিল রয়েছে বলেই আমরা গায়েবী বিষয়গুলো বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এ পরিমাণ মিল না থাকলে আমাদের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব হতো না।

(৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ

কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না।

.....

ব্যাখ্যা: তিনি যেহেতু পরিপূর্ণ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাই কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

'আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান' *(সূরা আল-বাকারা: ২০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾

"আল্লাহ সব জিনিসের উপর শক্তিশালী" *(সূরা আল কাহাফ: ৪৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾

"আকাশ মন্ডলীতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার মতো কোন জিনিস নেই। তিনি সবকিছু জানেন এবং সব জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল" *(সূরা আল ফাতির: ৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান" *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)*।

এখানে **لَايَئُوْدُهُ** অর্থ হলো মোটেই কঠিন হয় না, ভারী অনুভব হয় না, তাকে অপারগ করে না। এখানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে যা নাকচ করা হয়েছে, তার বিপরীত বিশেষণ পূর্ণরূপে তার জন্য সাব্যস্ত বলেই তা নাকচ করা হয়েছে। অনুরূপ কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহ

তা'আলাকে যেসব বিশেষণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই একই কথা। যা নাকচ করা হয়েছে, তার বিপরীতটি পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত বলেই সে নাকচ এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"তোমার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না" *(সূরা আল কাহাফ: ৪৯)।*

তিনি যেহেতু আদল বা ন্যায়বিচারের বিশেষণে পূর্ণরূপে বিশেষিত তাই তিনি যুলুমকে নিজের সত্তা থেকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা সাবা'র ৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"তার কাছ থেকে অণু পরিমাণ জিনিস আকাশ সমূহেও লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে ছোট হোক, কিংবা তার চেয়ে বড় হোক, সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা রয়েছে"।

তার ইলম যেহেতু পরিপূর্ণ, তাই তার ইলম থেকে আসমান-যমীনের কোন কিছুই লুকিয়ে নেই। সূরা ক্বফের ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾

"আমি আকাশ-পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সব জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি অথচ তাতে আমি ক্লান্ত হইনি"।

তার ক্ষমতা যেহেতু পরিপূর্ণ ও সার্বভৌম তাই ক্লান্তি ও কষ্ট তার কাছে আসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আয়াতুল কুরসীতে *(সূরা আল-বাকারা:২৫৫)* আরো বলেন,

﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

"তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না"।

তার হায়াত যেহেতু পরিপূর্ণ এবং তিনি যেহেতু সবকিছুর পরিপূর্ণ ধারক, তাই তার পবিত্র সত্তা থেকে তন্দ্রা ও নিদ্রার ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আমের ১০৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

"দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না"। তার বড়ত্ব, সম্মান ও মহত্ত্ব যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তাই তাকে দৃষ্টির মাধ্যমে আয়ত্ত ও পরিবেষ্টন করা অসম্ভব।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে যেসব বিষয় নাকচ করা হয়েছে, তার বিপরীতটি পূর্ণরূপে তার জন্য সাব্যস্ত করার জন্যই তা করা হয়েছে। অন্যথায় শুধু নাকচ করাতে কোন প্রশংসা হয় না।[৩৬]

যে নাকচ করাতে কোনো প্রশংসা হয় না তার উদাহরণ স্বরূপ কবির এ কথাটি পেশ করা যেতে পারে। কবি একটি গোত্রের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন,

قُبَيِّلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ... وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلِ

"তাদের গোত্র এত ছোট যে, তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না এবং মানুষের উপর অণু পরিমাণ যুলুমও করে না। এ লাইনের পূর্বের এবং পরের লাইনে যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং গোত্রের লোকদেরকে বুঝানোর জন্য قبيلة শব্দকে 'তাসগীর' তথা ক্ষুদ্রতা বাচক শব্দের দ্বারা উল্লেখ করাকে যদি গাদ্দারী ও যুলুম নাকচ করার সাথে মিলানো হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, এখানে তাদের অপারগতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। গাদ্দারী ও যুলুম পরিহার করার মধ্যে যুলুম ও গাদ্দারী করার উপর তাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকা বুঝায় না এবং তাদের প্রশংসাও বুঝায় না। কারণ তারা ক্ষমতা না থাকার কারণে যুলুম ও গাদ্দারী ছেড়ে দিয়েছে। ক্ষমতা থাকার পরও যদি ছেড়ে দিতো, তাহলে তারা প্রশংসার হকদার হতো। অন্য কবি বলেছেন,

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ... لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا

"আমার গোত্রের লোকের সংখ্যা অনেক হলেও তারা যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। যদিও তা তুচ্ছ ব্যাপারে হয়ে থাকে"।

এখানে যুলুম প্রতিরোধ না করার মাধ্যমে যখন তাদের নিন্দা করা হয়েছে তখন জানা গেল যে, তাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণেই তারা প্রতিশোধ নেয় না। কারণ প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকার পরও যদি কেউ যালেমকে ক্ষমা করে দেয়, তখনই সে ক্ষমা করা প্রশংসাযোগ্য হয়।[৩৭]

---

৩৬. সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর যেসব ছিফাত নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে নিছক নাকচ উদ্দেশ্য নয়; বরং সে ক্ষেত্রে যা নাকচ করা হয়েছে তার বিপরীতে সিফাতে পূর্ণতা সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা কোন বস্তুর শুধু দোষ-ত্রুটি নাকচ করাতে তার পূর্ণতা ও প্রশংসা সাব্যস্ত হয় না। তবে তা দ্বারা যদি তার বিপরীত গুণ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য হয় এবং কামালিয়াতের ছিফাতগুলো উল্লেখ করা হয়, তাহলেই প্রশংসা হয়।

৩৭. আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তা থেকে যে যুলুমকে নাকচ করেছেন, তাতে শুধু নাকচ করা উদ্দেশ্য নয় এবং তিনি যুলুম করতে সক্ষম নন, -এটিও উদ্দেশ্য নয়। অপরাধী থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম ও দুর্বল বলে তিনি ক্ষমা করে দেন না ও প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকেন না; বরং যুলুম করা এবং প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখার পরও যেহেতু তিনি যুলুম করেন না ও প্রতিশোধ নেন না, তাই এগুলো আল্লাহ তা'আলা থেকে নাকচ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ আদল ও পরিপূর্ণ ক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। একই সঙ্গে এগুলো পরিহার করার কারণে তিনি প্রশংসিতও হন।

এ জন্যই কুরআন মাজীদের যেসব স্থানে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহ সাব্যস্তের আলোচনা এসেছে, সেখানে ছিফাতগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অপর দিকে যেখানে আল্লাহ তা'আলা থেকে কোন কিছু নাকচ করা হয়েছে, সেখানে খুব সংক্ষিপ্তভাবেই করা হয়েছে।[৩৮]

কিন্তু নিকৃষ্ট মাযহাবের উদ্ভাবক কালামশাস্ত্রবিদ এর বিপরীত করেছে। তারা যখন আল্লাহ তা'আলা থেকে কোনো কিছু নাকচ করে, তখন খুব বিস্তারিতভাবে করে থাকে। আর যখন আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করে তখন খুব সংক্ষিপ্তভাবেই করে থাকে। তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলার কোন শরীর নেই, ছায়া নেই, দেহ নেই, ছবি নেই, রক্ত নেই, নেই মাংস, তিনি কোন ব্যক্তি নন, পদার্থ নন, তার কোন অবস্থা নেই, তার কোন রং নেই, ঘ্রাণ নেই, স্বাদ নেই, তিনি গরম নন, ঠান্ডা নন, ভিজা নন, শুষ্ক নন, দীর্ঘ নন, প্রশস্ত নন, গভীর নন, মিলিত নন, বিচ্ছিন্ন নন, তিনি নড়াচড়া করেন না, স্থির হন না, তার কোনো অংশ নেই, তিনি অংশ বিশিষ্ট নন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট নন, কোন দিকে নন। তার কোনো ডান, বাম, সম্মুখ, পিছন, উপর এবং নীচ নেই। কোনো স্থান তাকে বেষ্টন করতে পারে না, তিনি কালের সীমা রেখার বহু উর্ধ্বে, তিনি কারো সংস্পর্শে নন, কারো থেকে দূরেও নন, কোনো স্থানেই তিনি অবতরণ করেন না কিংবা প্রবেশ করেন না, নশ্বর মাখলুকের কোনো বিশেষণেই তিনি বিশেষিত নন। এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি দূরত্বের শেষ প্রান্তে, নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণের মাধ্যমে তাকে বিশেষিত করা যাবে না, তিনি দিকসমূহে গমন করেন না, তিনি সীমাবদ্ধ নন, পিতা নন, পুত্র নন, কোন পরিমাপ দ্বারাই তাকে পরিমিত করা যায় না এবং পর্দাসমূহ তাকে আড়াল করতে পারে না। মুতাযেলাদের থেকে আবুল হাসান আল আশআরী এমনি আরো অনেক জিনিস বর্ণনা করেছেন।

এ বাক্যগুলোর মধ্যে হক ও বাতিলের মিশ্রণ ঘটেছে। যার নিকট কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞান রয়েছে, সে কেবল এগুলো বুঝতে সক্ষম। প্রশংসাবিহীন এ পবিত্রতা বর্ণনা করার মধ্যে কোন প্রশংসা নেই। বরং রয়েছে তাতে আল্লাহর শানে বেআদবী। আপনি যদি কোন বাদশাহকে বলেন, আপনি মেথর নন, ঝাড়ুদার নন, নাপিত নন, দর্জি নন, তাহলে এভাবে বিশেষিত করার কারণে আপনাকে শায়েস্ত না করে ছাড়বে না। যদিও আপনি কথাগুলোতে সত্যবাদী। আপনি যখন সংক্ষিপ্তভাবে তাকে দোষত্রুটি থেকে পবিত্র করবেন এবং বলবেন, আপনি

---

৩৮. এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, সূরা আল-ইখলাছে তো আল্লাহ তা'আলা থেকে পূর্ণতার বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবেই নাকচ করা হয়েছে এবং আরো কয়েকটি স্থানেও বিস্তারিত নাকচ এসেছে। এর জবাব হলো সূরা ইখলাছে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের মিথ্যা অপবাদের জবাব দিয়েছেন। তারা বলেছিল, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। তাই তিনি এখানে বিস্তারিতভাবে তাদের মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করেছেন। অন্যান্য যেসব স্থানে বিস্তারিতভাবে নাকচ করেছেন, সেখানেও কোন না কোন সন্দেহ দূর করার জন্যই দীর্ঘ নফী করেছেন। অন্যথায় সিফাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো الإثبات المفصل والنفي المجمل। "আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতগুলো বিস্তারিতভাবে সাব্যস্ত করা এবং তার শানে অশোভনীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নাকচ করা। কেননা বিস্তারিতভাবে সাব্যস্ত করা ও সংক্ষিপ্ত নাকচের মাধ্যমে পূর্ণতা ও প্রশংসা হয়। অপর পক্ষে বিস্তারিত নাকচের মাধ্যমে পূর্ণতা ও প্রশংসার বদলে বিশেষিত সত্তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা হয়ে যায় এবং তার দুর্নাম হয়।

প্রজাদের কারো মত নন; আপনি তাদের সকলের চেয়ে উপরে, সর্বাধিক ভদ্র এবং মহান, তাহলেই প্রশংসাকারী বলে গণ্য হবেন। দোষত্রুটি থেকে কাউকে পবিত্র করার সময় কম বলা ও সংক্ষেপ করাই সুন্দর আচরণের পরিচায়ক।

সত্য প্রকাশের সময় ঐসব শারঈ শব্দমালা ব্যবহার করা প্রয়োজন, যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলা থেকে গ্রহণ করেছেন। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তরীকা।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, মুআত্তিলারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা সেগুলোর অর্থ নিয়ে গবেষণা করে না। তারা যেসব বিদ'আতী অর্থ ও শব্দ তৈরী করেছে, সেগুলোকেই তারা এএ নির্ভুল আক্বীদাহ মনে করে, যা বিশ্বাস করাকে তারা ওয়াজিব মনে করে।

অপরপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, হকপন্থী এবং ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের কথাকেই হক্ব মনে করে। এটাকে বিশ্বাস করা এবং এর উপর নির্ভর করাকে আবশ্যক মনে করে।

আল্লাহর নাম ও ছ্বিফাতের ব্যাপারে বিদ'আতীরা যা বলেছে, তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা আবশ্যক, কিংবা সেগুলোর আসল অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করা আবশ্যক। সে সঙ্গে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত দ্বারা সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা জরুরী। তবে কোন ক্রমেই ঐগুলোর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহকে তুলনা করা যাবে না।

মোট কথা বিদ'আতীদের অধিকাংশ আক্বীদাহ হলো না বাচক। তারা বলে এমন নয়, ঐ রকম নয়....ইত্যাদি। তারা যা সাব্যস্ত করেছে, তা অস্বীকারের তুলনায় খুব কম। তারা শুধু সাব্যস্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা عالم (জ্ঞানবান), قادر (ক্ষমতাবান), حي (চিরঞ্জীব) বা অনুরূপ কিছু। তারা আল্লাহ তা'আলাকে যেসব দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করেছে তার অধিকাংশই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সংগৃহিত নয়। আল্লাহর ছ্বিফাতে বিশ্বাসী অন্যান্য ফির্কার লোকেরা যে আকলী তরীকা (বিবেক-বুদ্ধিভিত্তিক পদ্ধতি) অবলম্বন করেছে, বিদ'আতীদের তরীকা তা থেকে বহু দূরে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। *(সূরা শূরা: ১১)*

এখানে আল্লাহর সদৃশ নাকচ করার পর তার দৃষ্টি ও শ্রবণ ছ্বিফাত সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নাকচ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র পূর্ণ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ঐসব বিশেষণে বিশেষিত, যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষিত করেছেন এবং যা দ্বারা তার রসূলগণ তাকে বিশেষিত করেছেন। তার ছ্বিফাতসমূহের,

নামসমূহের এবং তার কর্মসমূহের কোন সদৃশ নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এবং আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব গুণ সম্পর্কে জানিয়েছেন, তারও কোন সদৃশ নেই। সে সঙ্গে আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার আরো এমনসব গুণ রয়েছে যা তিনি সৃষ্টির কাউকে অবগত করেননি। যেমন আল্লাহর সত্যবাদী নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের দু'আয় বলেছেন,

«أَللَّهُمّ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ العظيم رَبِيعَ قَلْبِي ونُورَ صَدْرِى وجِلاءَ حُزنِى وذَهَابَ هَمّى»

"আমি তোমার সে প্রত্যেক নামের উসীলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নামের মাধ্যমে তুমি নিজের নামকরণ করেছো বা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছো বা তোমার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছো অথবা যে নামগুলোকে তুমি নিজের জ্ঞান ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছো, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি, বক্ষের নূর, দুঃশ্চিন্তা এবং পেরেশানী বিদূরিত হওয়ার মাধ্যমে পরিণত করে দাও"।[৩৯]

ছ্বিফাত সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বিদ'আতীদের তরীকার বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা, وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ "কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না", এখানে যে সব বিষয় নাকচ করা হয়েছে, তা দ্বারা নিন্দনীয় নাকচ করা নয়; বরং তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾

"আকাশ মন্ডলীতে ও পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার মতো কোন জিনিস নেই। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি সব জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল"। *(সূরা আল ফাতির: ৪৪)*

এ আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা এমন দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, যা তার থেকে অপারগতা ও অক্ষমতার ধারণাকে দূর করে দেয়। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ইলম ও পরিপূর্ণ ক্ষমতা। কর্মী লোক যা করতে চায়, তা করতে দুর্বল হওয়া থেকেই অপারগতা ও অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। আর কাজ করার মত ক্ষমতা থাকলে ইলম না থাকার কারণেও কর্মী কাজ করতে অক্ষম ও অপারগ হয়। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান থেকে অণু পরিমান জিনিসও লুকায়িত নয় এবং তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। সাধারণ বোধশক্তি এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ইলমের প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

৩৯. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, (১/১৯৯)।

সুতরাং ক্ষমতা ও অক্ষমতা যেহেতু পরস্পর বিপরীত দু'টি বিষয় এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য যেহেতু পরিপূর্ণ ক্ষমতা সাব্যস্ত, তাই তার পবিত্র সত্তা থেকে অপারগতা ও অক্ষমতার ধারণা বিদূরিত হলো। কেননা ইলাহ অক্ষম ও অপারগ হওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা অপারগ ও অক্ষম হওয়ার বহু উর্ধ্বে।

(৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ

তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই।[৪০]

---

৪০. কুরআনের যেসব স্থানে এবং অনুরূপ অর্থে অন্যান্য যেসব আয়াত রয়েছে, ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ সেখান থেকেই তাওহীদে উলুহীয়াত সাব্যস্ত করতে এ কথাটি গ্রহণ করেছেন। সূরা আরাফের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই আমি 'নুহ'কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। (তা না করলে) আমি তোমাদের উপর একটি মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। একই সূরার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদেরই ভাই 'হুদ'কে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

"আর সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদেরই ভাই 'সালেহকে। তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই"। *(সূরা আল-আরাফ: ৭৩)* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

"আমি মাদায়েনের প্রতি তাদের ভাই 'শুআইব'কে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য উপাস্য নেই"। *(সূরা আল-আরাফ: ৮৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾

"আর যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন"। *(সূরা যুখরুফ: ২৬)*

.....

ব্যাখ্যা: এটি হলো সেই কালিমাতুত তাওহীদ, যার দিকে সমস্ত নাবী-রসূলই আহবান করেছেন। যেমন ইতিপূর্বে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। নাকচ করা ও সাব্যস্ত করার মাধ্যমে এ কালেমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

নাকচ করা ও সাব্যস্ত করার মাধ্যমে ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করার অর্থ হলো কালেমায়ে তাওহীদের প্রথম অংশ দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বাতিল মাবুদের ইবাদতকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদতকে সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এক কথায় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত করে দেয়া হয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের হকদার হওয়ার অযোগ্য। নাকচ করা ও সাব্যস্ত করার মাধ্যমে ইবাদতকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য হওয়ার সন্দেহ বিদূরিত না করে শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদত সাব্যস্ত করা হলে সম্ভবত এ ধারণা থেকে যেত যে, অন্যান্য মাবুদের জন্যও ইবাদত করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারার ১৬৩ নং আয়াতে বলেছেন,

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

"তোমাদের ইলাহ হলেন এক", এ কথা বলার পরপরই বলেছেন,

﴿لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

"সে দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই" *(সূরা আল-বাকারা:১৬৩)।*

"তোমাদের ইলাহ হলেন এক" এ কথা বলাকেই যথেষ্ট মনে করা হলে, কারো অন্তরে এ শয়তানী ধারণা উদয় হওয়ার আশঙ্কা ছিল যে, আমাদের ইলাহ মাত্র এক ঠিকই। কিন্তু আমাদের ইলাহ ব্যতীত অন্যদেরও রয়েছে আরেক ইলাহ। এ সম্ভাব্য শয়তানী ধারণা দূর করার জন্যই আল্লাহর জন্য ইবাদত সাব্যস্ত করে চুপ থাকা হয়নি, বরং সাথে সাথেই বলা হয়েছে,

﴿لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

"সেই দয়াবান ও করুণাবান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই"।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله) এর ব্যাখ্যা

.....

নাহু শাস্ত্রবিদদের মতে لاإله إلا هو "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই" -এ বাক্যের মধ্যে খবর উহ্য রয়েছে। তারা বলেছেন, মূল বাক্যটি হলো এ রকম, لاإله في الوجود إلا الله "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদের অস্তিত্ব নেই"।[৪১]

---

৪১. শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ এ স্থানে সুন্দর একটি টিকা লিখেছেন। তিনি বলেন, এখানে لا إله এর পরে খবর উহ্য না থাকাই উত্তম বলে মুন্তাখাব গ্রন্থকার যে মন্তব্য করেছেন, তা ভালো মন্তব্য নয়। অনুরূপ এখানে নাহুবিদগণ যে موجود শব্দটিকে উহ্য খবর নির্ধারণ করেছেন তাও সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য মাবুদের সংখ্যা প্রচুর এবং সেগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। موجود কিংবা উজুদ শব্দকে উহ্য খবর মানলে কালেমায়ে তাওহীদ দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ইবাদত সাব্যস্ত করা এবং তার ইবাদত ছাড়া অন্যসব মাবুদের ইবাদত বাতিল করার উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। তখন কেউ এ আপত্তি করতে পারে যে, তোমরা কিভাবে এ কথা বলো যে, لاإله في الوجود إلا الله؟ "সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদের অস্তিত্ব নেই?" অথচ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অনেক মাবুদ থাকার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা হুদের ১০১ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾

"আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেল তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব মাবুদকে ডাকতো তারা তাদের কোনো কাজে লাগলো না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন উপকার করতে পারলো না"। আল্লাহ তাআলা সূরা আহকাফের ২৮ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব বস্তুকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো, তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এটা ছিল তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণাম, যা তারা গড়ে নিয়েছিল"। আর আমরা বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া আরো অনেক মাবুদের ইবাদত হতে দেখেছি। এক শ্রেণীর মুসলিম আব্দুল কাদের জিলানী, সাইয়্যেদ বদবী, হুসাইন, আলী, যাইনাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সহ অন্যান্য অলী-আওলীয়ার ইবাদত করে যাচ্ছে। মিশর, সিরিয়া ইরাক, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি মাযারেই চলছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত।

সুতরাং এ আপত্তি হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, কালেমায়ে তাওহীদের মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য এবং কালেমায়ে তাওহীদ দ্বারা মুশরিকদের সমস্ত মাবুদ ও আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদতকে বাতিল করার জন্য لا إله এর পরে একটি উহ্য খবর নির্ধারণ করা জরুরী। আর নাহুবিদগণ যে موجود শব্দটিকে উহ্য খবর মেনেছেন, তাতে এ মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। তাই এখানে حق শব্দটি উহ্য খবর হিসাবে নির্ধারণ করে এভাবে বলতে হবে لا إله إلاالله حق "আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই"। এ হক শব্দটি উহ্য মানার মাধ্যমেই আল্লাহ ছাড়া বাকী সব মাবুদ এবং তাদের ইবাদত বাতিল হয় এবং সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, সত্য ইলাহ ও সত্য মাবুদ হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অনেক আলেম এটিই সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবুল আব্বাস শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম এবং আরো অনেকেই।

কিন্তু নাহুবিদদের এ কথার উপর মুন্তাখাব গ্রন্থকার আপত্তি করেছেন। যে যুক্তিতে তিনি নাহুবিদদের প্রতিবাদ করেছেন তা হলো, তাদের কথা অনুসারে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল ইলাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নাকচ হয়ে যায়। আর এটি জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাতিল মাবুদের অস্তিত্ব নাকচ করার চেয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদের হাকীকত ও মাহিয়াত (প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাবের) নেই, এ কথা বলাই অধিক শক্তিশালী। সুতরাং এখানে বাক্যটিকে প্রকাশ্য অবস্থায় রেখে দেয়া এবং উহ্য কিছু নির্ধারণ না করাই উত্তম।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবীল ফযল আল-মুরসী 'রাইয়্যুয যামআন' নামক কিতাবে মুন্তাখাব গ্রন্থকারের জবাবে বলেছেন, যারা আরবদের ভাষা সম্পর্কে অবগত নয়, সে কেবল এখানে খবর উহ্য থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারে। কেননা নাহুবিদদের ইমাম সিবওয়াইয়ের মতে এখানে إله শব্দটি মুবতাদার স্থানে রয়েছে। অন্যদের মতে إله শব্দটি لا এর ইসম। উভয় অবস্থাতেই এখানে মুবতাদার খবর থাকা জরুরী। আর মুন্তাখাব গ্রন্থকার খবর উহ্য মানার প্রয়োজন নেই বলে যেই কথা বলেছেন, তা ভুল। আর মুন্তাখাব গ্রন্থকারের

হক শব্দটি উহ্য মানার পক্ষে কুরআনেরও একাধিক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা লুকমানের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

"এসব কিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর আল্লাহই সুউচ্চ ও সুমহান"।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনিই সত্য মাবুদ আর লোকেরা তাকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে আহবান করছে, তা সবই বাতিল। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যেসমস্ত মাবুদের উপাসনা করা হয়, তা সবই বাতিল। তারা মানুষদের মধ্য থেকে হোক, ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হোক, জিনদের মধ্য থেকে হোক কিংবা অন্যসব সৃষ্টির মধ্য থেকে হোক।

সুতরাং لا إله -এর পরে যদি حق শব্দটি উহ্য মানা হয়, তাহলেই কালেমায়ে তাওহীদের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য মাবুদ। কালেমায়ে তাওহীদের এ অর্থের কারণেই মক্কার মুশরেকরা কালেমাটি অপছন্দ করেছিল এবং তা পাঠ করতে অস্বীকার করেছিল। কেননা তারা অবগত হতে পেরেছিল যে, উহা তাদের মাবুদগুলোকে বাতিল করে দেয়। তারা আরো বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, এ কালেমার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত বান্দার ইবাদতে অন্য কারো হক নেই। এ জন্যই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে বলেছিলেন, قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا "হে লোক সকল! তোমরা বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এতে তোমরা সফল হবে", তখন জবাব দিয়েছিল,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

"সে কি বহু মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (সূরা সোয়াদঃ ৫) তারা আরো বলেছিল, ﴿ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ "আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করবো? (সূরা সাফ্‌ফাত: ৩৬) এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা করি এই বর্ণনার মাধ্যমেই কালেমাতুত্ তাওহীদ لا إله إلاالله অর্থ সম্পর্কিত সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি হলো এবং প্রকৃত্য সত্য পরিষ্কার হলো। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

কথা, খবর উহ্য না মানলে স্রষ্টার মাহিয়াতের (প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাবের) নাকচ হয়, এর কোন ভিত্তি নেই। কেননা মাহিয়াতের নাকচ করা আর অস্তিত্বের নাকচ করা একই কথা। অস্তিত্ব ছাড়া কোন মাহিয়াতের কল্পনাই করা যায় না।

সুতরাং মাহিয়াত ও উজুদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটিই আহলে সুন্নাতের মাযহাব। মুতাযেলারা এতে মতভেদ করেছে। তারা অস্তিত্ব ছাড়াই মাহিয়াত সাব্যস্ত করে থাকে।

إلا الله শব্দটি إله لا থেকে বদল হিসাবে মারফু হয়েছে। এটি لا এর খবর নয় এবং মুবতাদারও খবর নয়। আবু আব্দুল্লাহ আল-মুরসী এ কথার পক্ষে দলীল-প্রমাণও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে **لا إله إلا الله** এর ইরাব বর্ণনা করা অর্থাৎ ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো এখানে প্রকৃত তাওহীদ বর্ণনা করা এবং খবর উহ্য মানার ব্যাপারে নাহুবিদদের উপর আরোপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা। সে সঙ্গে আরো সাব্যস্ত করা যে, যারা বলে মুতাযেলারাই নাহুবিদদের উপর অভিযোগটি উত্থাপন করেছে, তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল।[৪২]

---

৪২. তাওহীদ সম্পর্কে মানুষের মতভেদ থেকেই কালেমাতুত তাওহীদ لا إله إلا الله -এর প্রথম অংশ لا إله -এর পরে উহ্য খবরের শব্দটি নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বাতেনী, দার্শনিক, এক শ্রেণীর সুফী এবং সীমালংঘনকারী কালামশাস্ত্রবিদরা বাক্যটির উহ্য রূপ নির্ধারণ করে থাকেন এভাবে لا إله موجود إلا الله "সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ছাড়া অস্তিত্বশীল আর কোন ইলাই নেই"।

যারা এভাবে বাক্যটির উহ্য রূপ নির্ধারণ করে থাকেন, তাদের কথা দ্বারা বড়জোর আল্লাহর তাওহীদ থেকে শুধু তার অস্তিত্ব এবং উহার আনুসাঙ্গিক বিষয়াদিই সাব্যস্ত করা যাচ্ছে।

কালামশাস্ত্রবিদদের আরেকদল এবং সুন্নীদের কিছু লোক অন্য একটি উহ্য খবর মেনেছেন। তারা বলেছেন, এখানে উহ্য বাক্যটি হবে এরূপ, لا إله خالق إلا الله "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য স্রষ্টা নেই" অথবা তারা এরূপ বলেছেন, لا إله رب غير الله "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য প্রভু নেই।

কালাম শাস্ত্রবিদদের কেউ কেউ আবার এখানে কোন কিছু উহ্য মানতেই রাজী নয়। তারা বলেছেন, এখানে উহ্য কিছু মানার দরকার নেই। শুধু لا إله إلا الله -এর মাধ্যমেই তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর উলুহীয়াতকে নাকচ করে থাকেন। এ কথা সত্যের অতি নিকটে। তবে বাক্যটির ভাষাগত দিক মূল্যায়ন করলে দেখা যায় এর মাধ্যমে বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণ হয় না। এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ লোক বাক্যটির উহ্য রূপ এভাবে নির্ধারণ করেছেন, **لا إله بحق، أو لا إله حق، أو معبود بحق** । সবগুলো বাক্যের অর্থই এক, অভিন্ন ও সঠিক। আর তা হলো আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। এভাবে حق শব্দটি উহ্য মানার কারণ হলো, কালেমাতুত তাওহীদের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদসমূহের অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বনী আদমের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বহু মাবুদের ইবাদত করে। যদিও তারা ইবাদত পাওয়ার হকদার নয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বাস্তবতার পরিপন্থি। কেননা বহু মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল মাবুদের ইবাদত করে এবং বিশ্বাস করে যে, ঐগুলো তাদের মাবুদ। প্রত্যেকটি মাযারকেই আপনি মাবুদ বলতে পারেন।

মুন্তাখাব গ্রন্থকার বলেন, ইলাহর অস্তিত্ব নাকচ করার ক্ষেত্রে নাস্তিবিদগণের কথা শর্তযুক্ত নয়। কেননা অস্তিত্বহীনতা কোন জিনিসের বিশেষণ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

"এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না"। *(সূরা মারইয়াম: ৯)*

আর এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, **لا إله غير الله** বা **لَا إِلَهَ غَيْرُهُ** বাক্যটি لاإله إلا الله এর মত নয়। বরং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা إلا এর পরে ব্যবহৃত ইসমের যে ইরাব হয়, সে ইসমের স্থানে غير শব্দটি ব্যবহৃত হয় বলে 'গাইরা' এর ইরাবও তার অনুরূপ

এমনি যারা حق শব্দটি উহ্য না মেনে সাধারণভাবে অন্যান্য মাবুদের উলুহীয়াত সাব্যস্ত করার জন্য শুধু لا إله إلا الله কে যথেষ্ট মনে করে ভাষাগত দিক মূল্যায়নে তাদের কথাও সঠিক নয়। কেননা তা দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ পূর্ণ হয়না। ঐদিকে কালামশাস্ত্রবিদদের ব্যাখ্যা, لا إله خالق أو رازق أو مدبر، أو لا إله يستحق الربوبية غير الله "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, পরিচালক-ব্যবস্থাপক অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই" -এটিও ঠিক নয়। কারণ কালেমাতুত তাওহীদ দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রুবুবীয়াত নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রুবুবীয়াত না থাকার কথা মুশরিকরাও স্বীকার করতো। তারা বলতো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব অর্থাৎ স্রষ্টা ও রিযিক দাতা নেই। মুশরিকরা যে আল্লাহর রুবুবীয়াত মানতো, কুরআন মজীদে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। (সূরা লুকমান: ২৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো, তারপরও কি ভয় করবে না?" (সূরা ইউনুস: ৩১)

সুতরাং মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়াও অন্যান্য যেসব মাবুদের ইবাদত করতো, কালেমাতুত তাওহীদের মাধ্যমে তা নাকচ করা উদ্দেশ্য। এ জন্যই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাদের দাওয়াতের প্রথম মূলনীতি ছিল এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহবান জানানো। এ বিষয়েই নাবী-রসূলদের সাথে তাদের কাওমের লোকদের দ্বন্দ হয়েছিল। আমাদের নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মূল বিরোধটিও এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। কুরআন কঠোর ভাষায় তাদের প্রতিবাদ করেছে এবং কালেমাতুত তাওহীদের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং لا إله إلا الله এ বাক্যের মধ্যে لا إله এর পরে حق শব্দ উহ্য না মানলে তা দ্বারা প্রকৃত তাওহীদ সাব্যস্ত হয় না এবং যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাও সাব্যস্ত হয় না।

হয়। সুতরাং উভয় বাক্যেই একই খবর উহ্য থাকে। তাই এখানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার সন্দেহ এবং তার জবাব উল্লেখ করা হলো। মূল কথা, কালেমাতুত তাওহীদ, لا إله إلا الله -এর মাধ্যমে যে তাওহীদে উলুহীয়া সাব্যস্ত হয়, لا إله غير الله বাক্য দ্বারা একই তাওহীদ সাব্যস্ত হয়।

(৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ

তিনি কাদীম (অনাদি, অবিনশ্বর, প্রাক্তন), তার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত-চিরন্তন, তার কোনো অন্ত নেই।[৪৩]

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনিই الأَوَّلُ (প্রথম), তিনিই الآخِرُ (সর্বশেষ), তিনিই الظَّاهِرُ (সবকিছুর উপরে), তিনিই الْبَاطِنُ (মাখলুকের অতি নিকটে), আর তিনি সর্ব বিষয়ে عَلِيم (মহাজ্ঞানী)"। *(সূরা*

৪৩. আল্লাহ তা'আলার অনাদি সত্তা বুঝানোর জন্য ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ কাদীম বা প্রাক্তন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ এ নামটি মহান আল্লাহর নাম হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহয় আসেনি। যেমনটি বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবন আবিল ইয আল-হানাফী এবং অন্যান্যগণ সতর্ক করে জানিয়েছেন। এটা তো কেবল কালামশাস্ত্রবিদরা উল্লেখ করেছে; তারা এর দ্বারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে সবকিছুর পূর্বে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য ব্যবহার করেছেন। তবে এটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহর নামসমূহ কেবল অহীর মাধ্যমেই সাব্যস্ত হবে। কারণ তা ছাড়া ঐগুলো জানার আর কোন পথ নেই। তাই সেগুলোকে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সাব্যস্ত করতে হবে। অন্য কিছু দ্বারা সাব্যস্ত করা জায়েয নেই। কোনো প্রকার বিবেক ও বোধশক্তির মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। সালাফে সালেহীন তথা পূর্বসুরী আলেমগণ স্পষ্টভাবে এ কথাই বলেছেন। তাছাড়া কাদীম বা প্রাচীন শব্দটিকে কালাম শাস্ত্রবিদরা যে অর্থে ব্যবহার করেছে বাস্তবে সেটি উক্ত অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ আরবী ভাষায় কাদীম বলা হয় যা কোনো কিছুর পূর্বে হয়, যদিও পূর্বে তা অস্তিত্বহীন বিষয় হোক না কেন। যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ "অবশেষে সে চাঁদ শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়"। (সূরা ইয়াসীন: ৩৯) তবে গ্রন্থকারের পরবর্তী কথা, যার কোনো শুরু নেই এর দ্বারা বিশুদ্ধ অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। তারপরও এটাকে আল্লাহর নাম হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কারণ কুরআন বা হাদীছে সেটা নাম হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। তার বদলে আল্লাহর আল-আউয়াল বা সর্বপ্রথম নামটিই যথেষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ "তিনিই সর্বপ্রথম এবং তিনিই সর্বশেষ"। (সূরা আল-হাদীদ: ৩) আল্লাহই তাওফীক দাতা।

হাদীদ: ৩)।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলেছেন,

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ»

"হে আল্লাহ! তুমিই সর্বপ্রথম, তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না"।[৪৪]

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহের অন্যতম আল-আওয়াল এবং আল-আখের নামের অর্থেই ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاء "অনাদি, অবিনশ্বর, প্রাক্তন, যার কোনো শুরু নেই এবং তিনি অনন্ত-চিরন্তন, যার কোনো অন্ত নেই" এ অংশটি ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাতসমূহ থেকে এ দু'টি বিশেষণ মানুষের ফিতরাত তথা সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যেই বদ্ধমূল রয়েছে। কেননা এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, সমস্ত সৃষ্টিই এমন এক সত্তা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, যিনি নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল। এ বিশ্বাস অতীতে সূচনাহীন সৃষ্টির

---

৪৪. ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুয্ যিক্র ওয়াদ্ দু'আ। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমীন বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাদের অতি নিকটে। মূলত আল্লাহ তা'আলার উপরে হওয়া মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়াকে আল্লাহর ইলম ও ক্ষমতা তাদের নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলেও মূলত আল্লাহর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহর ছ্বিফাত ও কর্মকে মাখলুকের ছ্বিফাত ও কর্ম দ্বারা বুঝা অসম্ভব। কোন সৃষ্টির জন্য একই সময় ছাদের উপরে ও ছাদের নীচে সশরীরে থাকা এবং একই সময় সিংহাসনের উপরে থাকা ও সিংহাসনের নীচে থাকা অসম্ভব। কোন রাজা (মানুষ) যখন তার সিংহাসন ছেড়ে বাইরে যায়, তখন তার সিংহাসন খালি হয়ে থাকে। কারণ তার জন্য একই সময় ও একই সাথে সিংহাসনে থাকা এবং দেশের বাইরে থাকার ধারণা অকল্পনীয়। কিন্তু সুমহান ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলার জন্য একই সময় ও একই সাথে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া এবং রাতের শেষাংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা অসম্ভব কিছু নয়। মাখলুকের নিকটবর্তী হলে আরশ খালি হওয়া জরুরী নয়। যারা আল্লাহর ছ্বিফাতকে অস্বীকার করেছে, তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা দ্বারা আল্লাহর বিশাল ছ্বিফাত ও ক্ষমতাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে বলেই বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর ছ্বিফাতকে অস্বীকার করেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এই যে, কুরআন মাজীদে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা কি 'আল্লাহ তা'আলাই সর্বশেষ' এই কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, কোনো সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয় এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। আখিরাতে আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে কেউ জান্নাত বা জাহান্নামে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে- এমনটি নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকবে। পরিশেষে ফেরেশতারাও ধ্বংস হবে।

কিন্তু জান্নাতবাসীগণ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহে এবং জাহান্নামী কাফেররা ও জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকার বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টির পরিসমাপ্তি বিহীন সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার ধারণাকে বাতিল সাব্যস্ত করে।[৪৫]

আমরা প্রাণী, জীবজন্তু, গাছপালা, উদ্ভিদ, খনিজদ্রব্য, মহাশূন্যের বিভিন্ন ঘটনা যেমন মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করি। এসব জিনিস এবং এ রকম অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা অসম্ভব জিনিসের কোনো অস্তিত্ব নেই। আর যা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হয় না। কেননা যে নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হয়, সে কখনো অস্তিত্বহীন হয় না। সৃষ্টিজগতের এ জিনিসগুলো ছিল না। অতঃপর অস্তিত্ব ধারণ করেছে। এগুলোর অস্তিত্ব না থাকা অস্তিত্ব থাকার পরিপন্থী। আর অস্তিত্ব থাকা অস্তিত্ব ধারণ করা অসম্ভব হওয়ার ধারণার পরিপন্থী। আর যে বস্তু অস্তিত্ব গ্রহণ করা কিংবা না করার সম্ভাবনা রাখে সে নিজে নিজেই অস্তিত্ব গ্রহণ করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ يُوقِنُونَ﴾

"তারা কি কোন কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না"। *(সূরা তূর: ৩৫-৩৬)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন, তারা কোন জিনিস ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে না কি তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?

এটি জানা কথা যে, কোনো সৃষ্টিই নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং যে সৃষ্টি নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না এবং নিজেকে নিজেই অস্তিত্বহীন করতে পারে না, নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসা তার পক্ষে অসম্ভব। বরং কেউ তাকে সৃষ্টি করেছে বলেই সে অস্তিত্বে এসেছে। অথচ তার আগে তা ছিল অস্তিত্বহীন। যে বস্তুর অস্তিত্বশীলতা তার অস্তিত্বহীনতার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং অস্তিত্বহীনতা এর অস্তিত্বশীলতার স্থলাভিষিক্ত হয়, তার পক্ষে নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয় এবং তার অস্তিত্বহীন হওয়া আবশ্যক নয়।

কালাম শাস্ত্রবিদ এবং দার্শনিকরা যেসব বিবেক ও বোধশক্তির দলীল পেশ করে থাকে, তাতে যদি কোনো জ্ঞানী লোক গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তাদের

---

৪৫. এখানে সূচনাহীন যেই সৃষ্টি থাকার ধারণাকে বাতিল করা হয়েছে, তা দ্বারা সম্ভবত দৃশ্যমান এ বর্তমান সৃষ্টিজগৎ অথবা নাবী-রসূলদের মধ্যে যেসব সৃষ্টি থাকার কথা জানা গেছে, তা উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কাদীম বা অনাদি ও সূচনাহীন, তাই তার সমস্ত পূর্ণ গুণ ও কাদীম বা অনাদি ও সূচনাহীন। সেই হিসাবে তার সাথে সাথে কাদীম বা সূচনাহীন সৃষ্টি থাকা অসম্ভব নয়। তবে কুরআন-হাদীছ ও বোধশক্তির দ্বারা সাব্যস্ত যে, আল্লাহর পূর্বে আর কিছুই ছিল না, তিনিই প্রথম, তার থেকেই সবকিছুর সূচনা এবং তার সমকক্ষও কেউ নেই। চন্দ্র, সূর্য বা অন্য কোনো গ্রহ-নক্ষত্র অথবা উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের কোনো কিছুই অনাদি, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকের একটি সূচনাকাল আছে। তার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না। আবার প্রত্যেকের আছে একটি সমাপ্তিকাল। তারপর আর তার অস্তিত্ব থাকবে না।

যুক্তি ও উপস্থাপনার মধ্যে যেসব সত্য-সঠিক জিনিস রয়েছে, কুরআনে বর্ণিত আকলী দলীলসমূহেই তার কিয়দাংশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে তা এমন খোলাসা করে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার অনুরূপ বর্ণনা তাদের নিকট অনুপস্থিত। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানের ৩৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

"আর যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি"।

আমরা বলবো না যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং অন্যান্য বিষয় সাব্যস্ত করার জন্য বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তির অস্পষ্ট দলীল পেশ করা উপকারী নয়। কেননা সুস্পষ্ট হওয়া কিংবা অস্পষ্ট হওয়া আপেক্ষিক বিষয়। কখনো কখনো কতিপয় লোকের কাছে সুস্পষ্ট বিষয় অন্যের কাছে অস্পষ্ট থাকে। ঠিক একই বিষয় একই ব্যক্তির কাছে এক সময় সুস্পষ্ট হয়, কিন্তু অন্য অবস্থায় অস্পষ্ট থাকে। আরো বলা যেতে পারে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তির দলীল-প্রমাণ অস্পষ্ট হলেও কতিপয় মানুষ তা মেনে নেয়, কিন্তু তারা এর চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট বিষয়ে ঝগড়া করে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে গবেষণা করে এবং অনুসন্ধান করে অস্পষ্ট বিষয় অবগত হয়ে এত খুশী হয়, যতটা খুশী হয় না প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ বিষয়াদি জানতে পেরে। কোনো সন্দেহ নেই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জ্ঞান এবং তার অস্তিত্ব আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি এমন বাস্তব যে, মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে আছে। তারপরও কতিপয় মানুষের মাঝে এ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থাকার কারণে তা দূর করার জন্য বুদ্ধিভিত্তিক দলীল-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন পড়ে।

কালাম শাস্ত্রবিদরা আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে قديم (কাদীম) শব্দটি ঢুকিয়ে দিয়েছে।[৪৬] অথচ কাদীম আসমায়ে হুসনার (সুন্দর নামসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৭] আরবদের

---

৪৬. শুধু তাই নয়, তাদের কাছে এটিই আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক খাস নাম। এ জন্যই তাদের কিতাবসমূহে ঘুরেফিরে বার বার এ নামটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ তাআলার জন্য এ নামটি ব্যবহার করেই সমস্ত গুণাবলী অস্বীকার করে। তারা বলে থাকে إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء অর্থাৎ আল্লাহর জন্য একাধিক গুণাবলী সাব্যস্ত করতে গেলে একাধিক قديم (অনাদি, চিরন্তন, প্রাক্তন, অবিনশ্বর) সত্তা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের বাতিল ধারণার বহু উর্ধ্বে।

৪৭. সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্য قديم ব্যবহার না করে الأول নামটিই ব্যবহার করা উচিত। কেননা (১) الأول নামের মধ্যে যে সৌন্দর্য রয়েছে, قديم শব্দের মধ্যে তা নেই। আর কুরআন হলো সাহিত্যের সৌন্দর্য সীমা-রেখার উর্ধ্বে। তাতে সুন্দরতম অর্থবহ শব্দই স্থান পাওয়ার যোগ্য। তাই আল্লাহ তাআলার নাম হিসাবে الأول শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। قديم ব্যবহার হয়নি। (২) الأول শব্দটিতে قديم -এর অর্থ রয়েছে। কিন্তু قديم শব্দে الأول -এর অর্থ নেই। (২) কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর নাম হিসাবে الأول শব্দটি এসেছে। তাই কুরআন ও হাদীছের বাইরে থেকে এ অর্থে আল্লাহ

যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, তাতে قديم বলা হয় এমন জিনিসকে, যা অন্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকে। তাই পুরাতন জিনিসের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, هذا قديم (এটা পুরাতন)। নতুন জিনিসের ক্ষেত্রে বলা হয়, هذا جديد (এটা নতুন)। অন্যের চেয়ে অধিক অগ্রগামী বস্তুর জন্যই আরবরা কেবল এ নামটি ব্যবহার করে থাকে। যে জিনিসের আগে অন্য কিছুর অস্তিত্বই ছিল না, তার জন্য আরবরা এ নামটি ব্যবহার করেনি।

আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে সূরা ইয়াসীনের ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾

"আর আমি চাঁদের জন্য মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের পুরাতন শাখার মতো হয়ে যায়"।

খেজুর গাছের নতুন শাখা গজানো পর্যন্ত পুরাতন শাখা বিদ্যমান থাকা। যখন নতুন শাখা বের হয়, তখন প্রথম শাখাকে قديم পুরাতন বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা আহকাফের ১১ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾

"যারা মানতে অস্বীকার করেছে তারা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, এ কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভালো কাজ হতো তাহলে এ ব্যাপারে এসব লোক আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না। যেহেতু এরা তা থেকে হিদায়াত লাভ করেনি তাই তারা অবশ্যই বলবে, এটা পুরাতন মিথ্যা"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ﴾

"এ কথায় ইবরাহীম বললো, কখনো কি তোমরা সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের ইবাদত তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা করে অভ্যস্ত?" (সূরা শুআরা: ৭৫-৭৬)

এখানে পুরাতনের ক্ষেত্রে আধিক্য বুঝানোর জন্য أقدم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ অর্থেই ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) এর قديم ও جديد অর্থাৎ আগের ও পরের পরিভাষাটি ব্যবহৃত

তা'আলার নাম নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। (৪) الأول শব্দটি قديم এর অর্থ প্রদান করার সাথে সাথে আরো বুঝায় যে, সবকিছুর আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ।

হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা হুদের ৯৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾

"কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে"।

অর্থাৎ ফেরাউন তাদের আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। القدم মাসদার থেকে ফেলটি লাযেম ও মুতাআদ্দী উভয় অবস্থায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন লাযেম হিসাবে বলা হয়, أخذت ما قدم وما حدث "আমি পুরাতন ও নতুন উভয়টি গ্রহণ করেছি"।

আর মুতাআদ্দী হিসাবে এভাবে বলা হয়, هَذَا قَدَمَ هَذَا وَهُوَ يَقْدُمُهُ "এটি ঐটির অগ্রণী হয়েছে এবং সে তার চেয়ে অগ্রগামী হচ্ছে"।

এখান থেকেই মানুষের পা-কে قدم বলা হয়। কেননা চলার সময় মানুষের শরীরের অন্যান্য অংশের পূর্বে পা-ই সর্বপ্রথম সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

কালাম শাস্ত্রবিদের অধিকাংশের নিকটই আল্লাহর নাম হিসাবে কাদীম শব্দটির ব্যবহার খুবই প্রসিদ্ধ।

সালাফ (পূর্ববর্তী) ও খালাফ (পরবর্তী) দের অনেকেই আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এটিকে শামিল করার প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ইমাম ইবনে হায্ম (রহিমাহুল্লাহ) অন্যতম। কোন সন্দেহ নেই যে, কাদীম শব্দটি যেখানে মূলত অগ্রণী-অগ্রগামী হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে যার অস্তিত্ব সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে, তিনি অন্যের তুলনায় পূর্বে হওয়ার আরো বেশী হকদার।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ এত সুন্দর যে, তা তার বিশেষ প্রশংসার প্রমাণ করে। التقدم (পূর্বে হওয়া) আভিধানিক অর্থে সাধারণভাবে অগ্রে হওয়ার অর্থ প্রদান করে। সকল সৃষ্টির পূর্বে হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এটি আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়।[৪৮]

---

৪৮. القديم শব্দের উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে একই শ্রেণীর একাধিক জিনিসের মধ্য থেকে যেটি অন্যের তুলনায় অগ্রবর্তী হয়, তার জন্য قديم বা متقدم শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যেহেতু শুধু অন্যান্য জিনিস সমূহের অস্তিত্বের তুলনায় প্রাক্তন নয়, তাই তার জন্য কাদীম নামটি প্রযোজ্য হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে গণ্য নন, তাই তাদের তুলনায় তার অস্তিত্ব পূর্বে হওয়ার ধারণা ঠিক নয় এবং সে অর্থে তার জন্য কাদীম নাম বের করাও অশোভনীয়। মোট কথা ইমাম তাহাবী সম্ভবত দার্শনিক ও কালাম

এ অর্থে কুরআন ও হাদীছে তার الأول (প্রথম) নাম এসেছে। এ নামটি কাদীম এর চেয়ে উত্তম। কেননা الأول (প্রথম) নামটি ইঙ্গিত করে যে, তার পরের সকলেই তার দিকে ধাবিত হয়, তিনিই সবকিছুর আশ্রয়স্থল এবং সকলেই তার অনুসরণ করে। কিন্তু কাদীম শব্দের মধ্যে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে অতি সুন্দর নামসমূহ। তার নামগুলো শুধু সুন্দর নয়; বরং অতি সুন্দর, সর্বাধিক সুন্দর ও সুন্দরতম।

(৬) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لا يَفْنَى وَلا يَبِيدُ

তার ধ্বংস নেই, তিনি ক্ষয়প্রাপ্তও হবেন না।

.....

ব্যাখ্যা: এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার চিরন্তনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হবে। শুধু অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা), যা মহিমাময় ও মহানুভব" *(সূরা আর রাহমান: ২৭-২৮)।*

الفناء এবং البيد শব্দদ্বয় অর্থের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি। বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য উভয় শব্দকে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ বাক্যটি ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর পূর্বোক্ত কথা دائم بلا انتهاء -এর মর্মার্থকেও সাব্যস্ত ও শক্তিশালী করেছে।

শাস্ত্রবিদদের অনুসরণ করে কাদীম শব্দটি আল্লাহর নাম হিসাবে ব্যবহার করেননি; বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার সূচনাহীন অনাদি সত্তা বুঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। قديم শব্দের পরে সরাসরি بلا ابتداء (সূচনাহীন) বাক্যাংশ যোগ করা থেকেই বুঝা যাচ্ছে ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ কাদীম শব্দের ভাষাগত উদ্দেশ্য করেননি। বরং তিনি এর দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন যে, সবকিছুর পূর্বেই রয়েছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তার অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই, শেষও নেই এবং তার দ্বারাই সকল মাখলুক সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

(৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ

আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া অন্য কিছু হয় না।

.....

ব্যাখ্যা: এর মাধ্যমে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) কাদেরীয়া ও মুতাযেলা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেছেন। তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষ থেকে ঈমানের ইচ্ছা করেন। আর কাফের কুফুরীর ইচ্ছা করে। এতে করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা বিজয়ী হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের কথা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। কেননা তাদের কথা কুরআন, সুন্নাহ এবং সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তির পরিপন্থী। এটি তাক্বদীর সম্পর্কীয় সু-প্রসিদ্ধ মাস'আলা। অচিরেই ইনশা-আল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

কাদেরীয়ারা তাক্বদীরকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার কারণেই তাদেরকে কাদারীয়া সম্প্রদায় বলা হয়। এমনি জাবরীয়ারা যেহেতু তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে, তাই তাদেরকেও কাদারীয়া বলা হয়। কিন্তু প্রথম ফির্কাটির উপর এ নামটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা পাপাচার সৃষ্টি ও নির্ধারণ করলেও তিনি তা পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না এবং তার আদেশও করেন না। বরং তিনি পাপাচারকে ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন এবং তা থেকে নিষেধ করেন। এটিই সালাফদের সকলের কথা। তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা চান না, তা কখনো সংঘটিত হয় না।

এ জন্যই ফক্বীহগণের ঐকমত্যে কেউ যদি শপথের মধ্যে এ কথা বলে যে,

وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ

"আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই ইনশা-আল্লাহ এ কাজটি করবো",

তারপর সে কাজটি না করলে শপথ ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে না। যদিও কাজটি ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব হয়। কিন্তু সে যদি ইনশা-আল্লাহর স্থলে إن أحب الله "যদি আল্লাহ পছন্দ করেন" বাক্যটি উচ্চারণ করে, অতঃপর সে কাজটি না করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। কাজটি ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হলেও।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রকারভেদ এবং সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও শরী'আতগত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের হক্বপন্থী আলেমগণ বলেন, আল্লাহর কিতাবে আল্লাহ তা'আলার যে ইরাদাহ বা ইচ্ছার কথা উল্লেখ রয়েছে, তা দু'প্রকার।

(১) ইরাদাহ কাওনীয়া কাদ্‌রীয়া বা সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা।

(২) ইরাদা শারঈয়া দীনীয়া বা শরী'আতের আদেশগত ইচ্ছা।

ইরাদায়ে শারঈয়া কেবল ঐ সব বস্তুর মধ্যেই সীমিত, যা হওয়া আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

আর ইরাদায়ে কাওনীয়া হচ্ছে ব্যাপকভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কার্যকর হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন আর যা পছন্দ করেন না, উভয়টিই এর মধ্যে শামিল। এ প্রকার ইচ্ছার বর্ণনা এসেছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

"অতএব আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তকরণ খুলে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ খুব সংকুচিত করে দেন"। *(সূরা আল আন'আম: ১২৫)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা হুদের ৩৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"এখন যদি আমি তোমাদের কিছু মঙ্গল করতে চাই তাহলে আমার মঙ্গল কামনা তোমাদের কোন কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছেন।[৪৯]

তিনিই তোমাদের রব এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দাম্ভিকতা এবং সদাচারে আগ্রহহীনতা দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও, সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৩)*

আর ইরাদা শারঈয়া দীনীয়া বা শরী'আতের আদেশগত ইচ্ছা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের পক্ষে যা কঠিন তা তিনি চান না"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান"। *(সূরা আন-নিসা: ২৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

"আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ করার ইচ্ছা করেন। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"। *(সূরা আন-নিসা: ২৭-২৮)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিতে, যাতে তোমরা শোকর গুজার হও"। *(সূরা আল মায়িদা:৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে"। *(সূরা আল আহযাব: ৩৩)*

আল্লাহ তা'আলার এ প্রকার ইচ্ছার উদাহরণ মানুষের কথার মধ্যে পাওয়া যায়। তারা কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে বলে থাকে, هَذَا يَفْعَلُ مَا لَا يُرِيدُهُ اللَّهُ "এ লোকটি এমন কাজ করে, যা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন না"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার কাজকে পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না এবং এর আদেশ করেননি।

আর ইরাদায়ে কাওনীয়ার উদাহরণও মুসলিমদের কথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তারা বলে থাকে, "যা কিছু হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেননি, তা হয়নি"।[৫০]

ইচ্ছাকারী নিজে যা করার ইচ্ছা করে এবং অপরের পক্ষ থেকে যা হওয়ার ইচ্ছা করে, এ উভয় ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কর্ম সম্পাদনকারী যখন নিজে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে তখন এটি হয় তার নিজস্ব কর্ম সম্পর্কীত ইচ্ছা। আর যখন অন্যের পক্ষ হতে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন এ ইচ্ছাটি অন্যের কর্মের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এ উভয় প্রকার ইচ্ছাই মানুষের বোধগম্য। আল্লাহ তা'আলার আদেশ দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ তা'আলা যখন তার বান্দাদেরকে কোনো বিষয়ে আদেশ করেন, তখন কখনো কখনো আদিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য করার ইচ্ছা করেন।[৫১]

আবার কখনো কখনো তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা করেন না। অথচ তিনি বান্দার পক্ষ হতে আদেশটি বাস্তবায়ন হওয়ার ইচ্ছা করেন।

আল্লাহ তা'আলার ইরাদা বা ইচ্ছাকে এভাবে শ্রেণী বিন্যাস করার মাধ্যমে তার আদেশের ব্যাপারে মানুষের তর্ক-বিতর্কের অবসান হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শরী'আতগত আদেশ বা ইচ্ছা কি তার ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছার অধিনস্ত? অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম কি সকল সৃষ্টির দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়?

এর জবাব হলো, না। বরং আল্লাহ তা'আলা শরী'আতগত ইচ্ছা দ্বারা যে আদেশ করেন, কারো কারো ক্ষেত্রে তার বিপরীতে সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তা'আলা রসূলদের জবানে মানুষকে এমন বিষয়ের আদেশ করেছেন, যা তাদের জন্য উপকারী এবং এমন জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ

---

৫০. এমনকি মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলে থাকে যে, ধৈর্য ধরো, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, আল্লাহর কাজ সবই ভালো...ইত্যাদি। এসবগুলোই ইরাদায়ে কাওনীয়ার উদাহরণ। এতে আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা থাকা আবশ্যক নয়।

৫১. অর্থাৎ বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যে স্বাধীনতা ও শক্তি দিয়েছেন, তার সঠিক ব্যবহার করে যখন ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিয়ত করে এবং সেদিকে এগিয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালো কাজের তাওফীক দেন ও সাহায্য করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য যেই স্বাধীনতা ও শক্তি দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করে যখন সে নিজেই অপরাধের দিকে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা করে, তখন তাকে জোর করে তা থেকে ফিরিয়ে আনা হিকমতে ইলাহীয়ার পরিপন্থি। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

অন্তর দিয়ে ইচ্ছা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে আদেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলা তা তার জন্য সৃষ্টি করুক। তাই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ঐ কাজটি সৃষ্টি করেন এবং বান্দাকে তার সম্পাদনকারী বানান ও তাওফীক দান করেন।

অন্য দিকে আরেক শ্রেণীর মানুষ ইচ্ছা করে না যে, তার জন্য কর্ম সৃষ্টি করা হোক। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন না, তাকে কর্ম সম্পাদনকারী বানান না এবং তাকে তাওফীকও দান করেন না।[৫২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দাদের কাজ-কর্ম সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করা একই জিনিস। আর বান্দাদেরকে আদেশ করা আরেক জিনিস। এখানে আদেশ করা মানে তাদের জন্য ঐসব জিনিস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যাতে বান্দাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর নিষেধ করা মানে তাদের জন্য ঐসব বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর।

আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন, আবু লাহাব এবং অন্যান্য কাফেরকে ঈমান আনয়নের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে তাদের জন্য ঈমানের উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন। তবে আল্লাহর উপর এটি আবশ্যক ছিল না যে, তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে সাহায্য করবেন। বরং আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের জন্য ঈমান সৃষ্টি করতেন এবং ঈমান আনয়ন করতে তাদেরকে সাহায্য করতেন, তাহলে তার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার ত্রুটি চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেন, তা বিশেষ হিকমতের জন্যই সৃষ্টি করেন।[৫৩]

---

৫২. ইরাদা শারঈয়া ও ইরাদা কাউনীয়ার মধ্যকার পার্থক্য হলো, ইরাদায়ে শারঈয়া কখনো বাস্তবায়িত হয় আবার কখনো বাস্তবায়িত হয় না। কিন্তু ইরাদায়ে কাউনীয়া বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী। সে হিসাবে ইরাদায়ে শারঈয়া ইরাদায়ে কাওনীয়ার মধ্যে শামিল নয়। কিন্তু যেখানে আল্লাহর ইরাদায়ে শারঈয়া বাস্তবায়িত হয়, সেখানে কাওনীয়াও দাখিল থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সকল মানুষ ঈমান আনয়ন করেনি। যারা ঈমান এনেছে, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া ও শরঈয়া উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ঈমান সৃষ্টি করেছেন এবং তা গ্রহনের তাওফীকও দিয়েছেন। অন্য দিকে কাফেররা ঈমানের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পরও ঈমান আনেনি। তাদের মধ্যে শুধু আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছাই তাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ কুফরীও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা শুধু এ সৃষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। এ বিষয়কে অধিকতর পরিষ্কার করার জন্য আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমান ও আবু জাহেলের কুফরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। আবু বকরের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শারঈয়তগত উভয় ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন এবং তার অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেছেন। ঐদিকে আবু জাহেলকেও ঈমান আনয়নের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেননি; বরং কুফরী সৃষ্টি করেছেন। সে কুফরী করেছে। সে হিসাবে তার দ্বারা শুধু আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

৫৩. বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন কুরাইশ নেতা ও মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু তালিবের ঈমান না আনা এবং কিয়ামতের দিন তার শাস্তি ভোগ করার উদাহরণটি পেশ করা যেতে পারে। সম্ভবত তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হিকমতটি এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাপ-দাদাদের দ্বীনের উপর রেখেই তার দ্বারা তার প্রিয় বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজত

বান্দাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে, তা সম্পাদন করাতে বান্দার যে স্বার্থ ও লাভ রয়েছে, আদেশকারী (আল্লাহ তা'আলা) যখন ঐ কাজটি সৃষ্টি করেন এবং বান্দাকে তার সম্পাদনকারী বানান, তখন তার জন্য সেখানে কোনো লাভ বা স্বার্থ থাকা আবশ্যক নয়।

সুতরাং সৃষ্টি করা এক বিষয়, আর আদেশ করা অন্য বিষয়। কোনো কোনো মানুষ অন্যের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে তাকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে ও তার জন্য উপকারী

করবেন এবং মুসলিমদের চরম বিপদের সময় এমন কল্যাণ সাধন করবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে লিখা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আবু তালেবকে তার পিতৃধর্মে লিপ্ত রেখে মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু সে যেহেতু তার ভাতিজার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারের কারণেই পরকালের নিয়ামত তার ভাগ্যে জুটবে না।

এমনি বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য খিযির (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক মিসকীন লোকদের নৌকা ছিদ্র করা ও একজন নিরপরাদ শিশুকে হত্যা করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার কি হিকমত লুকায়িত ছিল- মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রথমে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি খিযির (আলাইহিস সালাম) এর কাজের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। পরক্ষণেই খিযির (আলাইহিস সালাম) স্বীয় কর্ম-কান্ডের হিকমত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। মূলত শুধু ক্ষতির জন্যই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কোনো অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয় না। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই কোন না কোন হিকমত ও কল্যাণ থাকে।

নৌকা ছিদ্র করা মিসকীন লোকদের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু তার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে, তা সে ক্ষতির চেয়ে বহুগুণ উপকারী। কারণ ভালো নৌকাগুলো যালেম বাদশাহর লোকেরা ছিনিয়ে নেয়। ত্রুটিপূর্ণ নৌকার উপর তারা হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং নৌকা একেবারেই না থাকার চেয়ে ছিদ্র অবস্থায় তা থাকা তাদের জন্য কল্যাণকর।

খিযির (আলাইহিস সালাম) যেহেতু জানতে পারলেন ছেলেটি বড় হয়ে কাফের হবে এবং পিতামাতাকে কষ্ট দিবে, তাই হত্যা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও এ হত্যাকান্ডের পিছনেই রয়েছে ছেলেটি এবং তার পিতামাতার জন্য কল্যাণকর পরিণতি। ছেলেটির জন্য এ বয়সে নিহত হওয়া এ দিক থেকে উপকারী যে, এখনো তার দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ হয়নি। সে নিহত হওয়ার পর জান্নাতে যাবে। অপরপক্ষে বড় হয়ে কুফুরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়া তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। ঐ দিকে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে পিতামাতাকে এমন সৎ সন্তান দান করবেন, যারা পিতামাতার প্রতি আনুগত্য থাকবে।

এমনি প্রচুর বৃষ্টি অনেক সময় কারো জন্য ক্ষতিকর হলেও তাতে সা মানুষের জন্য প্রচুর কল্যাণ থাকে। অনেক সময় বন্যায় কারো ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাড়িঘর নষ্ট হওয়া অবশ্যই তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের কল্যাণ থাকতে পারে। যেমন ধরুন ঝড়ে কোন গ্রামের কতিপয় লোকের বাড়িঘর ধ্বংস হলো আবার কারো বাড়িঘর অক্ষত রইল। যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো তারা মনক্ষুন্ন হলো। আর যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো না, তারা খুশী হলো। পরক্ষণই যখন সরকারী ঘোষণা আসল, যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে উত্তরায় একটি বাড়ি দেয়া হবে, তখন যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়নি, তারাও কামনা করতে লাগলো যে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হলেই ভালো হতো। সুতরাং আল্লাহর প্রত্যেক কাজই ভালো। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো কোনো কাজ ক্ষতিকর দেখা যায়।

আল্লাহ তাআলা মদপানসহ অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মানুষ মদপানে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয় এ তাওবাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি এবাদতে পরিণত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মদ পান করে শুধু আল্লাহর নাফরমানী করা হোক এ জন্যই আল্লাহর ইচ্ছায় মদ সৃষ্টি হয়নি; বরং সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। যাতে ভুল করে মদ পান করা হলেও তা থেকে তাওবা করে মদ্যপায়ী আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা অযথা কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না এবং তার কোনো কর্মও হিকমত ছাড়া সংঘটিত হয় না। যা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারি না। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

বিষয় বর্ণনা করে। এত কিছু করা সত্ত্বেও তাকে ঐ আদেশ বা নিষেধ বাস্তবায়নে সাহায্য করার ইচ্ছা করে না। কেননা আপনি অন্যকে যে আদেশ করেন কিংবা তাকে যে উপদেশ দেন তাতে আপনার যে স্বার্থ থাকে, তা বাস্তবায়নে তাকে সাহায্য করতে গেলে আপনার সে স্বার্থ ছুটে যেতে পারে। শুধু তাই নয়; বরং আদেশ বা উপদেশের বিপরীত করার মধ্যেই আপনার স্বার্থ থাকতে পারে। সুতরাং অন্যের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে মানুষ অন্যকে যে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করে তা এক জিনিস, আর নিজের জন্য যে কাজ করে তা ভিন্ন বিষয়। সুতরাং অন্যের জন্য মানুষের আদেশ এবং তার নিজের কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে এ পার্থক্য করা সম্ভব, সেখানে আল্লাহ তা'আলার আদেশ এবং তার নিজের কাজ-কর্মের মধ্যে পার্থক্য করা আরো উত্তমভাবেই সম্ভব।

মুতাযেলারা ঐ ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করে থাকে, যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের আদেশ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে আদেশ দাতা অবশ্যই এমন কিছু করতে বাধ্য, যাতে করে আদিষ্ট ব্যক্তি তার কাজটি সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ পায়। যেমন আদিষ্ট ব্যক্তির সাথে হাসিমুখে ও প্রফুল্ল মনে কথা বলা এবং কাজ সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ও বিভিন্নভাবে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করা ইত্যাদি।

তাদের জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ সাহায্য দু'কারণে করা যেতে পারে।

(১) আদেশ বা উপদেশ প্রদানকারীর যদি সেখানে কোন স্বার্থ নিহিত থাকে। যেমন রাজা তার সেনাপতিকে এমন কাজের আদেশ করলেন, যাতে তার রাজ্যের ভিত্তি মজবুত হয়, মনিব তার চাকরকে এমন কাজ করার আদেশ করলেন, যাতে তার পরিবারের কার্যাদি ঠিক-ঠাক মত চলে, যৌথ কাজের শরীক ব্যক্তি তার অংশীদারকে এমন কিছু করতে বলল, যাতে উভয়েরই স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।

(২) আদেশ দাতা সম্ভবত এমন হবে যে, তিনি আদিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করলে তার নিজের লাভ রয়েছে। যেমন সৎকাজের আদেশকারীর উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। তিনি নেকী ও তাকওয়ার কাজে কাউকে আদেশ করার সাথে সাথে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সহযোগিতাও করে থাকেন। কারণ তিনি অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আনুগত্যের কাজে সাহায্য করার কারণে ছাওয়াব দিবেন। তিনি আরো অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে।[৫৪]

---

৫৪. উপরোক্ত ক্ষেত্রে আদেশকারীর উপর আবশ্যক হলো, তিনি স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। বান্দার আনুগত্য থেকে আল্লাহ তা'আলা কি কিছু লাভ করেন বা তাতে আল্লাহর কোনো স্বার্থ রয়েছে যে, বান্দাকে আনুগত্যের উপর সাহায্য করা আল্লাহর উপর আবশ্যক? বান্দার ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেন,

«يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার উপর তাকে আনুগত্যের কাজে সাহায্য করা জরুরী নয়। কিন্তু তার অনুগ্রহের দাবিতে কেবল তাকেই সাহায্য করেন এবং আনুগত্যের তাওফীক দেন, যে অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে তা কামনা করে।

আর যখন জানা যাবে যে, আদেশকারী শুধু আদিষ্ট ব্যক্তির উপকারের জন্যই আদেশ করেছে, এ জন্য নয় যে, আদিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা আদেশ বাস্তবায়ন হলে আদেশকারীর কোন লাভ হবে না, তখন আদিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করা জরুরী হয় না। যেমন সৎকাজের আদেশদানকারী কিংবা উপদেশ প্রদানকারী যদি মনে করে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সৎকাজ বাস্তবায়নে সাহায্য করলে আদেশকারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না, এমনকি আদিষ্ট কাজে সহযোগিতা করতে গেলে আদিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ হাসিল হলেও আদেশ দাতার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সাহায্য না করাই উচিত। যেমন ফেরাউন গোত্রের যে লোকটি ঈমান গোপন রেখেছিল, সে শহরের শেষপ্রান্ত থেকে দৌড়িয়ে এসে মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল,

﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾

হে মূসা! ফেরাউন গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন *(সূরা কাসাস: ২০)*।

أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»

"হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি তোমাদের সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের সকলের তাকওয়া যদি আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দার তাকওয়ার মত হয়ে যায় তাহলে উহা আমার রাজত্বের মধ্যে কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বান্দার অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা যদি ইবলীসের অবাধ্যতার মত হয়ে যায়, তাহলেও তা আমার রাজত্ব ও ক্ষমতার কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি যদি তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা অনুপাতে দান করি, তাহলেও আমার ভান্ডার থেকে কেবল ঐ পরিমাণই কমতে পারে যেমন সাগরে একটি সুই ঢুকালে তা যে পরিমাণ পানি কমিয়ে দেয়।

হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলগুলো তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করে রাখবো। অতঃপর পরিপূর্ণরূপে তার বিনিময় প্রদান করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো কিছু পায় অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো আমল করার তাওফীক পেয়ে আমল করতে সক্ষম হয় এবং সে আমলের বিনিময়ে ছাওয়াব, নিয়ামত ও পবিত্র জীবন পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়, সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে তার বিপরীত কিছু পায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উপর নিজের কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে আল্লাহর নেয়ামতের কুফুরী করে এবং তার হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পন না করার কারণে খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হবে, সে যেন কেবল নিজের নফসকেই দোষারোপ করে।

সুতরাং লোকটির স্বার্থ এখানেই ছিল যে, সে শুধু মূসা (আলাইহিস সালাম) কে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলবে। চলে যাওয়ায় সাহায্য করাতে তার কোনো লাভ ছিল না। এমনকি সাহায্য করলে ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তার ক্ষতি করতো।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, লোকটি যদি মূসা (আলাইহিস সালাম) কে চলে যেতে সাহায্য করতো, রাস্তা দেখিয়ে দিতো কিংবা হাতে ধরে নিয়ে যেতো অথবা নিজের বাহনের উপর বসিয়ে শহর থেকে বের করে মাদায়েনের পথ দেখিয়ে দিতো, তাহলে ফেরাউন ও তার লোকেরা ঘটনা জানতে পারলে লোকটির ক্ষতি করার আশঙ্কা ছিল। তাই সে শুধু বলে দিয়েছে যে, শহরে থাকলে ফেরাউনের লোকেরা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। বের হয়ে যাওয়া ছাড়া তোমার বাঁচার কোন পথ নেই। সুতরাং তুমি দ্রুত বের হয়ে যাও। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছি। এরূপ উদাহরণ অনেক রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে এমনসব আদেশ করেছেন, যা বাস্তবায়নে তাদের কল্যাণ রয়েছে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে আদেশ বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করা আল্লাহর উপর আবশ্যক। অথচ তিনি সাহায্য করতে সক্ষম।

মুতাযেলারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কর্ম সম্পাদনকারী বানানোর সক্ষম নয় বলেই তিনি সাহায্য করেন না। তাদের এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল। আল্লাহ তা'আলা যা করেন তার মধ্যে বিরাট হিকমত রয়েছে। তার আদেশের মধ্যেও রয়েছে হিকমত। যদিও আমরা সেই হিকমতগুলো জানি না।

আল্লাহর সৃষ্টির একজন অন্যজনকে যখন আদেশ করে, তখন সে আদেশের মধ্যে আদেশকারীর হিকমত ও বিশেষ স্বার্থ থাকে, আর আদেশ বাস্তবায়নে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গেলে সে হিকমত অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক থাকে না; বরং কোনো রকম সাহায্য না করাই কখনো কখনো হিকমতের দাবি বলে গণ্য হয়। যাকে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করা হয় সে আদেশকারীর অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় আদেশ বাস্তবায়নে আদেশকারীর সাহায্যের হকদার হয় না। যেমন পিতা তার ছেলেকে এক খণ্ড যমীন ক্রয় করে দিয়ে ছেলের কল্যাণের জন্য যমীনে চাষ করা ও বীজ বপন করার আদেশ দিলো। কিন্তু এখানে ছেলের যমীনে পিতা নিজে গিয়ে চাষ করা ও বীজ বপন করা আবশ্যক নয় এবং এতে কোনো স্বার্থ, হেকমত ও কল্যাণ নিহিত নেই।

সুতরাং সৃষ্টির কাজের মধ্যে যেহেতু কখনো কখনো হিকমত ও কল্যাণের দাবি এ থাকে যে, তাদের কেউ অন্যের কল্যাণার্থে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করে এবং সে আদেশ-উপদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য না করাতেই কখনো কখনো যেহেতু আদেশকারীর হিকমত ও

কল্যাণ ঠিক থাকে, তাই স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ বাস্তবায়নে সৃষ্টিকে সাহায্য না করা আরো বেশী যুক্তিযুক্ত।[৫৫]

মূলকথা হলো, বুদ্ধিমান মানুষের ক্ষেত্রে যেহেতু এটি সম্ভব যে, সে অন্যকে কোন বিষয়ে আদেশ করে এবং তাকে আদেশ বাস্তবায়নে কোনো প্রকার সাহায্য করে না, তাই স্রষ্টার পক্ষে আরো উত্তমভাবেই সম্ভব যে, তিনি বান্দাদেরকে আদেশ করবেন এবং বিশেষ হিকমত থাকার কারণে তাদেরকে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করবেন না।

সুতরাং যাকে তিনি আদেশ করেছেন এবং আদেশটি বাস্তবায়নে সাহায্য করেছেন, তার ক্ষেত্রে কথা হলো সে আদেশটির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা) এবং ইরাদায়ে শারঈয়া (আদেশগত ইচ্ছা) উভয়েরই সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য কাজটি সৃষ্টি করেছেন এবং তার দ্বারা তা বাস্তবায়ন হওয়া পছন্দ করেছেন। কাজেই তার কাজের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা এবং আদেশগত ইচ্ছা উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর যাকে আদেশ দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করা হয়নি, সে আদেশের সাথে শুধু আল্লাহর শরী'আতগত ইচ্ছার সম্পর্ক রয়েছে, সৃষ্টিগত ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আদেশ দেয়া হলেও কাজটি তার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা তার জন্য কাজটি সৃষ্টি করা হিকমতে ইলাহীয়ার দাবি ছিল না; বরং হিকমতে ইলাহীর দাবি ছিল তার বিপরীত বিষয় সৃষ্টি করা।[৫৬]

---

৫৫. আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও ক্ষতিকর সবকিছু সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন এবং হিদায়াতের সকল দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি কল্যাণের পথে চলার আদেশ করেছেন এবং ক্ষতিকর পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন। উভয় পথের যে কোন একটি গ্রহণ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতাও তাদেরকে দিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য এটি আবশ্যক ছিল না যে, তিনি তাদেরকে কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করবেন ও তাদেরকে জোর করে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবেন এবং তাদেরকে অন্যায়ের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা প্রদান করবেন। এতে আল্লাহর কোন লাভও নেই। এটি করা হলে সৃষ্টির পিছনে তার হিকমত ও উদ্দেশ্য ঠিক থাকতো না এবং ন্যায় বিচারও ছুটে যেতো। সুতরাং হিকমতের দাবি হলো সাহায্য না করেই তাদের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও বোধশক্তির উপর ছেড়ে দেয়া এবং সৎকাজ বা পাপাচার কোনটির উপর বাধ্য না করা। কেননা তিনি সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য এবং ছাওয়াব ও শাস্তি দেয়ার জন্য। এ হিকমত বজায় রাখার জন্য তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতা না দিয়ে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করা হলে এবং বাধ্য করে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা হলে পৃথিবীতে একজন কাফেরও পাওয়া যেতো না। এতে করে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করাও অনর্থক হতো এবং পরীক্ষার মূলনীতি ও ন্যায় বিচার ছুটে যেতো। এমনকি নাবী-রসূল প্রেরণ করা, কিতাব নাযিল করা এবং শরীয়ত নির্ধারণ করা সবই নিরর্থক হতো। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)।

৫৬. উদাহরণ স্বরূপ এখানে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ঈমান আনয়ন এবং আবু জাহেলের কুফরীর বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। তাদের উভয়ের প্রতিই ঈমান আনয়নের আদেশ ছিল। কিন্তু আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈমান আনয়ন করেছেন। আবু জাহেল ঈমান আনেনি। কারণ আবু বকরের জন্য তিনি ঈমান পছন্দ করেছেন এবং তার জন্য তা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার ঈমান আনয়নের মধ্যে আল্লাহর শরী'আতগত ইচ্ছা এবং সৃষ্টিগত ইচ্ছা উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। ঐদিকে আবু জাহেলের ক্ষেত্রে ঈমানের আদেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু বিশেষ হিকমত ও আদলের দাবির কারণে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈমান সৃষ্টি করেননি। কী কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত করেননি, তার জবাব আমরা এ বইয়ের বিভিন্ন স্থানে এবং শারহুল আকীদাহ আল ওয়াসেতীয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রদান করার চেষ্টা করেছি। সে

পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি জিনিসের ক্ষেত্রে কথা হলো একজনের মধ্যে তা থেকে একটি সৃষ্টি করা হলে একই সময় তার মধ্যে তার বিপরীতটি সৃষ্টি করা হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ রোগ-ব্যাধি ও সুস্থতা সৃষ্টির বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। বান্দার মধ্যে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করলে সে তার রবের সামনে নতি স্বীকার করে, বশীভূত হয়, আল্লাহর কাছে দু'আ করে ও তাওবা করে। সেই সঙ্গে তার গুনাহ্র কাফফারা হয়, তার অন্তর নরম হয়, তার অহমিকা-দাম্ভিকতা দূর হয় এবং মানুষের উপর যুলুম করা থেকেও বিরত থাকে।

সুস্থতা সৃষ্টি করা এর বিপরীত। শুধু সুস্থতা সৃষ্টি করলে এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রোগ-ব্যাধি বালা-মুছীবত না থাকলে উপরোক্ত বিরাট উপকার ও স্বার্থগুলো হাসিল হতো না। মানুষকে সবসময় নেয়ামত, সুস্বাস্থ্য, আনন্দ-ফুর্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে এ উপকার হাসিল হতো না।

মুতাযেলারা আল্লাহ তা'আলার কর্মের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল তরীকা অবলম্বন করেছে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে ফেলেছে। তারা মূলত আল্লাহ তা'আলার কর্মের কোনো হিকমতই সাব্যস্ত করেনি।

অংশগুলো মনোযোগসহ পড়ার অনুরোধ রইলো। কারণ তাতে জ্ঞান পিপাসুর জন্য বিরাট উপকার রয়েছে এবং তার দ্বারা তাকদীর সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করা সম্ভব। (আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা)

(৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ

মানুষের কল্পনা ও ধারণাসমূহ তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না এবং জ্ঞান-বোধশক্তি তাকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে পারে না।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

"তিনি তাদের সামনের পেছনের সব অবস্থা জানেন। কিন্তু তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না"। *(সূরা ত্বহা: ১১০)*

ভাষাবিদ ইমাম জাওহারী তার সিহাতে বলেন, توهمت الشيء এর অর্থ হলো ظننته আমি ধারণা করলাম। আর فهمت الشيئ এর অর্থ হলো علمته অর্থাৎ আমি অবগত হলাম বা উপলব্ধি করলাম। এখানে শাইখ এ কথা সাব্যস্ত করেছেন যে, ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে আল্লাহকে উপলব্ধি করা এবং জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেছেন, যা হওয়া সম্ভব তার কল্পনা ও ধারণা করাকে الوهم বলা হয়। অর্থাৎ যার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, তার ছিফাত ও গুণাগুণ এ রকম। আর বোধশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যা আয়ত্ত ও উপলব্ধি করা যায় তাকে الفهم বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা কি রকম, তা জানা সম্ভব নয়। আমরা কেবল তার ছিফাতের মাধ্যমে তার সম্পর্কে এ পরিচয় হাসিল করতে পারি যে, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনি অমূখাপেক্ষী, তিনি কারো পিতা নন, কারো সন্তান নন এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা

পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন। তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)।* সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত), তিনি رَحْمَنُ (পরম করুনাময়) এবং رَحِيمُ (অসীম দয়ালু)। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَـــلَام (পরিপূর্ণ শান্তিদাতা) مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষক), عَزِيز (পরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী) এবং مُتَكَبِّر (মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তার জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (পরাক্রমশালী) ও حَكِيم (প্রজ্ঞাবান)"।

(৯) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا يُشْبِهُهُ الْأَنَامَ

সৃষ্টির কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে ঐসব মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা শূরা:১১১)*। উপরোক্ত কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতসমূহকে নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন ধারণা করে থাকে বিদ'আতীরা।

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) তার সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ফিকহুল আকবারে বলেন, **لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ ولايشبهه شيئ من خلقه** "তিনি সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথেই সাদৃশ্য রাখেন না এবং সৃষ্টির কিছুই তার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।

অতঃপর তিনি বলেন, তার সমস্ত গুণই সৃষ্টির গুণ থেকে ভিন্ন রকম। তার ইলম রয়েছে, কিন্তু তার ইলম আমাদের ইলমের মত নয়। তিনি ক্ষমতাবান, কিন্তু তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, কিন্তু তার দেখা আমাদের দেখার মত নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

ইমাম নু'আইম ইবনে হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাত থেকে কোনো একটিকে অস্বীকার করবে, সে কাফেরে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের পবিত্র সত্তাকে যেসব গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং তার সম্মানিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তাতে কোন সাদৃশ্য নেই।

ইসহাক বিন রাহওয়াই বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে তার ছিফাতগুলোকে মাখলুখের ছিফাতের সমতুল্য মনে করবে, সে মহান আল্লাহর সাথে কুফুরী করবে। তিনি আরো বলেন, জাহাম বিন সাফওয়ান ও তার অনুসারীদের আলামত হলো, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের বিরুদ্ধে এ বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা হলো সাদৃশ্যকারী। তাদের আরেকটি

আলামত হলো, তারা আল্লাহর সমস্ত ছিফাতকে অস্বীকার করে। সালাফদের অনেক ইমাম থেকেই জাহমীয়াদের সম্পর্কে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেছেন, জাহমীয়াদের আলামত হলো, তারা আহলে সুন্নাতের লোকদেরকে সাদৃশ্যকারী বলে থাকে। যারাই আল্লাহর নাম ও ছিফাতসমূহ থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করেছে, তারাই ছিফাত সাব্যস্ত কারীদেরকে সাদৃশ্যকারী বলে থাকে।

এমনি যিন্দীক, বাতেনী এবং দার্শনিকদের যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার নামসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে আল্লাহ তা'আলাকে عالم (জ্ঞানী) قادر (ক্ষমতাবান) ইত্যাদি নামে নামকরণ করা যাবে না, তাদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলাকে উপরোক্ত নামগুলোতে নামকরণকারীরা সাদৃশ্যকারী। তারা এ কথার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছে, সৃষ্টিকে যে নামে নামকরণ করা হয়, স্রষ্টার জন্য সে নাম সাব্যস্ত করা হলে ঐ যৌথ নামের যৌথ পরিমাণ অর্থ উভয়ের জন্য সমানভাবে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয়।[৫৭]

আর চরমপন্থী জাহমীয়ারা আল্লাহর নামগুলো কেবল রূপকার্থেই সাব্যস্ত করে থাকে। তাদের ধারণা হলো, যারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞানবান এবং প্রকৃতপক্ষেই ক্ষমতাবান, তারাও সাদৃশ্যকারী। এমনি যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেছে, তার কোন ইলম নেই, ক্ষমতা নেই, কথা নেই, ভালোবাসা নেই এবং ইচ্ছা নেই, তারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত কারীদেরকে মুশাব্বেহা (সাদৃশ্যকারী) এবং দেহবাদী বলেছে। এ জন্যই আপনি দেখবেন, আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে অবিশ্বাসী জাহমীয়া, মুতাযেলা, রাফেযী এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য বাতিল ফির্কার লোকেরা তাদের কিতাবসমূহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদেরকে সাদৃশ্যকারী ও দেহবাদী নামে নামকরণ করে পরিপূর্ণ করেছে। তারা তাদের কিতাবসমূহে বলে থাকে, দেহবাদীদের এমন একটি দল রয়েছে, যাদেরকে মালেকীয়া বলা হয়। তারা মালেক বিন আনাস নামের একজন লোকের দিকে নিজেদেরকে সম্বোধিত করে থাকে। তাদের আরেকটি দল রয়েছে, যাদেরকে শাফেঈয়া বলা হয়। তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ- শাফেঈর দিকে সম্বোধিত করে থাকে!! এমনকি তাদের মধ্য থেকে যারা কুরআনের ব্যাখ্যা করেছে, যেমন মুতাযেলী ইমাম কাযী আব্দুল জববার, জারুল্লাহ জামাখশারী এবং অন্যরা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্তকারী ও কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাৎ সাব্যস্তকারীদেরকে সাদৃশ্যকারী নামে নামকরণ করেছে। পরবর্তীকালের অধিকাংশ বিদ'আতী ফির্কার লোকেরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের জন্য এ নামটি ব্যবহার করেছে।

---

৫৭. তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ একাধিক বস্তুকে এক নামে নামকরণ করা হলে একই নামধারণকারী প্রত্যেকটি বস্তুর প্রকৃত অবস্থা, গুণাগুণ ও স্বভাব একই রকম হওয়ার ধারণা শুধু মস্তিষ্কের ভিতরেই জাগতে পারে। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আমরা এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে সাব্যস্ত করেছি যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব যেমন সৃষ্টির অস্তিত্বের মত নয়, তেমনি তার নাম ও গুণাবলীও সৃষ্টির নাম এবং গুণাবলীর অনুরূপ নয়।

তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধ আলেমদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নাকোচ করেন; কিন্তু এ নাকোচ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহ নাকচ করা তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করে, তাদের প্রত্যেককেই তারা সাদৃশ্যকারী বলে বিশেষিত করে না। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা নাম, ছিফাত এবং ক্রিয়া-কর্মের ক্ষেত্রে তিনি কোনো সৃষ্টির সদৃশ নন।

যেমন ইতিপূর্বে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার ইলম রয়েছে, কিন্তু তার ইলম আমাদের ইলমের মত নয়, তিনি ক্ষমতাবান, কিন্তু তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়, তিনি দেখেন, কিন্তু তার দেখা আমাদের দেখার মত নয়। এটিই আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা শূরা: ১১)* -এর অর্থ। এখানে আল্লাহর সদৃশ নফী করার সাথে সাথে তার সুউচ্চ ছিফাতগুলোও সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) সামনে অচিরেই আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করার সময় এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন। সেখানে তিনি সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহর সদৃশ নাকচ করলেই তার ছিফাত নাকচ করা আবশ্যক হয় না।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মূল কথা হলো আল্লাহর ইলম বা অন্যান্য ছিফাতের মধ্যে ঐ রকম قياس تمثيل চলবে না, যেমন কিয়াস করে থাকেন ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিদগণ। অর্থাৎ তারা যেমন কোনো জিনিসের মূল এবং শাখার মধ্যে অভিন্ন কারণ থাকার কারণে উভয়ের উপর একই হুকুম প্রয়োগ করেন, ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলার ছিফাতকে মাখলুকের ছিফাতের উপর কিয়াস বা অনুমান করা যাবে না এবং এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর ইলম রয়েছে এবং আল্লাহর কতিপয় সৃষ্টিরও ইলম রয়েছে। সুতরাং উভয়ের ইলম একই সমান হয়।[৫৮]

---

৫৮. ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে কোনো জিনিসকে তার মূলের সাথে একই হুকুমের মধ্যে শামিল করে দেয়াকে কিয়াসে তামছীলি বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোনো জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট কোনো হুকুম সাব্যস্ত হয় এবং তার অনুরূপ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একই কারণ বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে তার জন্য একই হুকুম সাব্যস্ত করাকে কিয়াসে তামছীলি বলা হয়। লোকেরা আলেমদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলো, আমরা বিমানের মধ্যে কিভাবে ছলাত পড়বো? জবাবে আলেমগণ বলেছেন, নৌকায় ভ্রমণকালে যেভাবে নামায পড়া হয়, বিমানেও ঠিক সেভাবেই ছলাত পড়া হবে। সুতরাং বিমানকে নৌকার উপর কিয়াস করা হবে। এমনি চাউলকে গমের উপর কিয়াস করে তা লেন-দেন করার সময় কম-বেশী করাতে সুদের হুকুম লাগানো। কেননা চাউল ও গম উভয় খাদ্যদ্রব্য এবং দানা জাতিয়। সুতরাং চাউল এবং গমের হুকুম একই। আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এ জাতিয় কিয়াস নিষিদ্ধ। তবে আলেমগণ আল্লাহ তা'আলার জন্য কেবল সর্বোত্তম কিয়াস ও দৃষ্টান্ত জায়েয বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, তিনি পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময়"। (সূরা নাহাল: ৬০) এর অর্থ হলো প্রত্যেক পূর্ণতার ছিফাত থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য কেবল সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাণ সাব্যস্ত। যেমন

এমনি আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে এমন قياس شمولي বা এমন আম বা যৌথ অর্থবোধক জিনিসের উপরও কিয়াস করা চলবে না, যার অধিনস্ত একক জিনিসগুলো পরস্পর সমান স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী।[৫৯]

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শ্রবণ, দৃষ্টি, জ্ঞান, ক্ষমতা, জীবন, প্রজ্ঞা ইত্যাদি ছিফাত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলারও এসব ছিফাত রয়েছে। তবে আল্লাহ তাআলার জন্য এসব থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাণই সাব্যস্ত হবে। কেননা সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণতার যেই বিশেষণ রয়েছে, তা স্রষ্টা থেকেই এসেছে। অপর পক্ষে সৃষ্টি অপূর্ণতার যেই বিশেষণে বিশেষিত হওয়া থেকে নিজেকে পবিত্র করে, স্রষ্টা সেই বিশেষণ থেকে পবিত্র হওয়ার আরো বেশী হকদার। তাই আমরা কখনো কখনো বোধশক্তির দলীল দ্বারা শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ তাআলার সিফাতের জন্য সর্বোত্তম কিয়াস ব্যবহার করি।

প্রথম শর্ত হলো কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হতে হবে এবং

দ্বিতীয় শর্ত হলো সেগুলো সার্বিক দিক থেকেই পরিপূর্ণ হতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, উলু বা উপরে সমুন্নত হওয়া ও জ্ঞানবান হওয়া সৃষ্টির পূর্ণতার অন্যতম বিশেষণ। মাখলুক এ জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত হলে কোনোভাবেই দূষিত হয় না। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে সাব্যস্ত পূর্ণতার যেই বিশেষণের মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, স্রষ্টার জন্য উহা আরো উত্তমভাবেই সাব্যস্ত করা হবে। আলেমগণ সিফাতের আলোচনায় প্রায়ই এ ধরণের কথা বলে থাকেন। তবে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিরাট পার্থক্য থাকার কারণে উভয়ের মাঝে ফিকাহ শাস্ত্রীয় কিংবা যুক্তিবাদী কিয়াস চলবে না। কারণ আমরা কখনো ওয়াজিবকে জায়েযের উপর কিয়াস করি না কিংবা জায়েযকে ওয়াজিবের উপর কিয়াস করি না। সুতরাং সিফাতের ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এ ধরণের কিয়াস থেকে আরো বেশী দূরে থাকা আবশ্যক। কেউ যদি আপনাকে বলে, আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে এবং সৃষ্টিরও অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং সে যদি সৃষ্টির অস্তিত্বের উপর আল্লাহর অস্তিত্বকে কিয়াস করে বলে আল্লাহর অস্তিত্ব সৃষ্টির অস্তিত্বের মতই। তার জবাবে আমরা বলবো যে, এ কিয়াস বাতিল। কেননা স্রষ্টা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং তার অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয় ও সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভাব্য। সে সঙ্গে স্রষ্টা কোনো সময় অস্তিত্বহীন ছিলেন না, কখনো তার অস্তিত্ব শেষও হবে না। ঐদিকে সৃষ্টি এক সময় ছিল না। পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং স্রষ্টার সত্তা, বিশেষণ ও তার ক্রিয়া-কর্মের সাথে মাখলুকের সত্তা, ছিফাত ও ক্রিয়া-কর্মের কোনো তুলনাই চলে না।

৫৯. যুক্তিবিদরা বিভিন্ন জিনিসের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যাপকভাবে এ প্রকার কিয়াস ব্যবহার করে থাকে। তারা বলে থাকে, জিনিসটি যেহেতু এ রকম, ও রকম, তাই ফলাফল দাঁড়ায় এরূপ...। এভাবে তারা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রত্যেক জিনিসের একটির উপর অন্যটির হুকুম লাগিয়ে থাকে। তাদের কিতাবে রয়েছে, العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই সৃষ্টি, সুতরাং পৃথিবীও সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত। কিয়াসে শুমুলীর উদাহরণ হিসাবে তারা আরো বলে থাকে যে, زيد مثل علي "যায়েদ আলীর মতই"। কেননা যায়েদ মানুষ, আলীও মানুষ। প্রত্যেক মানুষই যেহেতু حيوان ناطق অর্থাৎ বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী, তাই زيد حيوان ناطق "অর্থাৎ যায়েদ বাকশক্তি সম্পন্ন একটি প্রাণী। যায়েদ কথা বলে, মানুষও কথা বলে। সুতরাং যায়েদ একজন মানুষ....।

আসলে এভাবে যুক্তি পেশ করে ফলাফল বের করা সময়ের অপচয় এবং সহজ বিষয়কে আরো জটিল করা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ আমরা সৃষ্টিগত স্বভাব, বোধশক্তি ও বাস্তবতার আলোকেই প্রমাণ করতে পারি যে, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা সদাসর্বদাই নতুন নতুন বস্তু সৃষ্টি হতে দেখছি, ধ্বংসও হতে দেখছি। আর নাবী-রসূলদের মাধ্যমে আগত আসমানী কিতাব ও শরীয়তের দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া সবকিছুই সৃষ্টি এবং তিনি ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।

আর বনী আদমের বাকশক্তি আছে বলেই যুক্তি ভূমিকা পেশ করে তাদের কাউকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করে মানুষ বানানোর প্রয়োজন নেই। কারণ বাকশক্তি ছাড়াও মানুষের অন্যান্য এমন স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের উপর কিয়াস করে এ কথা বলা যাবে না যে, মানুষ বলতে যেমন বনী আদমের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝায় এবং তাদের প্রত্যেকেই যেহেতু একই প্রকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই আল্লাহ তা'আলাও তাদের যে কোনো একজনের মত অভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতি সম্পন্ন। তাই যদি বলা হয় আল্লাহর হাত আছে এবং তিনি আরশের উপর সমুন্নত, তার মানে হলো অন্যান্য জিনিসের মত তার জিসিম বা দেহ-কাঠামো-কায়া আছে। আর প্রত্যেক দেহ বা কাঠামোরই মূল বস্তু ও তার আনুসাঙ্গিক বিষয় ও অবস্থা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহরও মূল সত্তা এবং বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। তাই দার্শনিক ও যুক্তিবিদরা তাদের কল্পনা অনুসারে আল্লাহ তা'আলাকে সাধারণ সৃষ্টিসমূহের আওতায় এনে একটি সৃষ্টির মতই কল্পনা করেছে।

এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে অন্যের সাথে তুলনা করা যাবে না। সে সঙ্গে তাকে এবং অন্যান্য বস্তুকে এএ যৌথ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, যার প্রত্যেকটি বিষয় পরস্পর সমান। এ জন্যই দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের অনেক দল আল্লাহর ছিফাতসমূহের ক্ষেত্রে এ কিয়াসগুলোর আশ্রয় নেয়ার কারণে সুদৃঢ় ঈমানের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। বরং তাদের যুক্তিগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক। পরিশেষে তারা হয়রানী ও এলোমেলো অবস্থায় আটকা পড়েছে। বিশেষ করে যখন তারা দেখেছে যে, তাদের যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ ভুল অথবা তাদের এবং প্রতিপক্ষের দলীলগুলো পরস্পর সমান শক্তিশালী।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে قياس الأولى তথা সর্বোত্তম কিয়াস ব্যবহার করা বৈধ রয়েছে। কিয়াসে তামছীলে হোক কিংবা কিয়াসে শুমুলী হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আন নাহাল: ৬০)*

জানা আবশ্যক যে, সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণতার যেসব বিশেষণের মধ্যে কোনো দিক বিবেচনাতেই ত্রুটি নেই, অবিনশ্বর স্রষ্টা সেসব বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়ার আরো বেশী হকদার। আর ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন পূর্ণতার প্রত্যেক বিশেষণের যে অংশ প্রতিপালিত ও পরিচালিত সৃষ্টির জন্য সাব্যস্ত, সৃষ্টি কেবল তা তার স্রষ্টা, প্রভু ও পরিচালকের নিকট থেকেই লাভ করেছে। সুতরাং সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টাই তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার আরো বেশী হকদার। আর যে দোষ-ত্রুটি এ পূর্ণতাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়, তাকে যখন কোনো সৃষ্টি থেকে নাকচ

আমাদের কাছে সুস্পষ্ট, যা তাকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করে দেয়। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

করা আবশ্যক হয়, তখন মহান স্রষ্টা থেকে নাকচ করা আরো উত্তমভাবেই আবশ্যক হবে। তবে এর জন্য একাধিক শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্ত হলো কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা সেগুলো আল্লাহর জন্য মৌলিকভাবে সাব্যস্ত হতে হবে এবং দ্বিতীয় শর্ত হলো সেগুলো সার্বিক দিক থেকেই পরিপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ এমন হবে না যে, একদিক থেকে তা পূর্ণতার পরিচয় বহন করলেও অন্যদিক বিবেচনায় তা অপূর্ণতার পরিচায়ক। কেননা কোনো কোনো বিষয় মাখলুকের জন্য একদিক বিবেচনায় পূর্ণ হয়, কিন্তু অন্যান্য দিক মূল্যায়নে পূর্ণ হয় না। এমন পূর্ণতার বিশেষণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা বৈধ নয়।

উদাহরণ স্বরূপ পানাহার গ্রহণ করা ও সন্তান জন্ম দান করার ব্যাপারটি পেশ করা যেতে পারে। যে মাখলুক পানাহার করতে পারে সে ঐ মাখলুক হতে অধিক পরিপূর্ণ, যে স্বাস্থ্যগত ত্রুটি বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে খাবার গ্রহণ করে তা হজম করতে পারে না। এমনি যে নারী-পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে পারে, সে ঐ নারী-পুরুষ থেকে অধিক পরিপূর্ণ, যারা সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মাখলুকের জন্য এগুলো পূর্ণতার বিশেষণ হলেও যেহেতু এগুলোর প্রতি তার প্রয়োজন রয়েছে, তাই এগুলো সার্বিক দিক থেকে পূর্ণতার গুণাবলী নয়। তাই এগুলোকে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তা থেকে পবিত্র করেছেন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, যারা আল্লাহর ছিফাত অস্বীকারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত তারা এ আয়াতে কারীমা, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও ছিফাতকে অস্বীকারের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। তারা বলে, ওয়াজিবুল উজুদের ছিফাত এ রকম নয়, এরূপ নয়।[৬০]

অতঃপর তারা বলে থাকে, দর্শনের মূলকথা হলো যথাসাধ্য আল্লাহর স্বভাবে বিশেষিত হওয়া। এটি অর্জন করাকেই তারা তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং এটিকেই তারা কামেল মানুষ হওয়ার সর্বোচ্চ মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছে। কতিপয় সুফী এ কথায় দার্শনিকদের সাথে একমত পোষণ করে এবং তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে থাকে যে তিনি বলেছেন,

«تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ»

"তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও"।[৬১]

---

৬০. ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ছিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলে থাকে, তার দেহ নেই, আকৃতি নেই, ছায়া নেই, তিনি ভিতরে নন, বাইরেও নন.....ইত্যাদি।

৬১. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটি একটি সনদবিহীন হাদীছ। দেখুন: ইমাম আলবানীর তাহকীক ও তাখরীজসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৫১।

তাদের কথা পরস্পর সাংঘর্ষিক। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ছিফাতই অস্বীকার করেছে। আল্লাহর জন্য কোনো ছিফাতই তারা সাব্যস্ত করে না। তারা শুধু আল্লাহ তা'আলার ছিফাতবিহীন সাধারণ সত্তা সাব্যস্ত করে। এখন তাদের কাছে প্রশ্ন হলো, তোমরা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার কোনো ছিফাতই বাকি রাখোনি, তাহলে বান্দা তার রবের কোন্ স্বভাবকে নিজের চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে?!

আসল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথেই সাদৃশ্য রাখেন না এবং কোনো সৃষ্টিই তার সাথে সাদৃশ্য রাখে না। খ্রিস্টানরা, সর্বেশ্বরবাদীরা এতে বিরোধিতা করে থাকে। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক! তিনি সৃষ্টির কারো সাথে সাদৃশ্য না রাখার দাবি হলো, সৃষ্টির কেউই তার সাথে সাদৃশ্য রাখেনা।

তাই শাইখ এ কথা বলাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, وَلَا يُشْبِهُهُ الْأَنَامَ "সৃষ্টির কোনো কিছুই তার সাদৃশ্য রাখে না"। এখানে الأنام অর্থ হলো মানুষ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে الأنام বলতে প্রত্যেক প্রাণী উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জিন ও মানুষ উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾

"পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন" *(সূরা আর রহমান:১০)* অন্যান্য অর্থের তুলনায় প্রথম অর্থকেই সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

(১০) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَيُّومٌ لَا يَنَامُ

তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মারা যাবেন না, চির জাগ্রত, কখনো নিদ্রা যান না।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)*

আল্লাহ তা'আলা থেকে তন্দ্রা ও নিদ্রাকে নাকচ করা তার পরিপূর্ণ জীবন ও চিরজাগ্রত থাকার কথা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾

"আলিম, লাম, মিম। আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি তোমার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১-৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾

"লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে যুলুমের গুনাহ্‌র ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে"। *(সূরা ত্বহা: ১১১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

"তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না"। *(সূরা আল-ফুরকান: ৫৮)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনের ৬৫ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তোমাদের দীনকে তার জন্য নিবেদিত করে তাকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা"।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না, ঘুমানো তার জন্য শোভনীয় নয়"।[৬২]

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার সদৃশ হওয়া নাকচ করার পর এমন বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা তার মাঝে এবং তার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করে। সে সঙ্গে তিনি এমনসব ছ্বিফাতের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন, যা দ্বারা কেবল তিনিই বিশেষিত হয়েছেন। তার সৃষ্টির কেউ তা দ্বারা বিশেষিত নয়। এসব ছ্বিফাতের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি চিরজীবন্ত, তার কোনো মৃত্যু নেই। চিরস্থায়ী জীবন কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট। কোনো মাখলুকের-ই চিরস্থায়ী হায়াত নেই। সকল সৃষ্টিই মৃত্যু বরণ করবে। এ অর্থেই শাইখ বলেছেন, قَيُّومٌ لَا يَنَامُ "তিনি চিরজীবন্ত, কখনো ঘুমান না"।

নিদ্রা ও তন্দ্রা দ্বারা বিশেষিত না হওয়া আল্লাহ তা'আলার খাস বিশেষণ। সৃষ্টির কেউ এর দ্বারা বিশেষিত নয়। তারা সকলেই ঘুমায়। এখানে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর সদৃশ হওয়া নাকচ করা দ্বারা তার সুউচ্চ ছ্বিফাতের নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সুমহান ও পূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত। তার সত্তা যেহেতু সকল দিক থেকেই পরিপূর্ণ, তাই তার ছ্বিফাতও পরিপূর্ণ। চিরন্তন জীবনের মাধ্যমে যিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা জীবিতদের সদৃশ হতে পারেন না। এ জন্যই দুনিয়ার জীবন শুধু সাময়িক ভোগ-বিলাস ও খেল-তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের মত। আর আখিরাতের জীবন জাগ্রতকালীন জীবনের মত।

এ কথা বলা যাবে না যে, আখিরাতে মাখলুকের হায়াত আল্লাহ তা'আলার হায়াতের মতই অবিনশ্বর-চিরন্তন হবে। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, চিরন্তন সত্তার অন্যতম বিশেষণ হলো চিরস্থায়ী ও পূর্ণতম হায়াত। আর তিনিই সৃষ্টিকে আখিরাতে চিরস্থায়ী হায়াত দান করবেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টিকে প্রদত্ত চিরস্থায়ী হায়াত যতদিন স্থায়ী রাখবেন, ততদিন তা স্থায়ী থাকবে। এটি নয় যে, সৃষ্টির চিরস্থায়ী হায়াত সৃষ্টির নিজস্ব কোনো আবশ্যকীয় ছ্বিফাত। কিন্তু স্রষ্টার হায়াত সৃষ্টির হায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার অন্যান্য ছ্বিফাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। স্রষ্টার ছ্বিফাত তার জন্যই শোভনীয় এবং সৃষ্টির ছ্বিফাত সৃষ্টির জন্যই শোভনীয়।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, এ দু'টি নাম অর্থাৎ الحي এবং القيوم কুরআনের তিনটি সূরাতে একসাথে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এ দু'টি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সর্ববৃহৎ অতি সুন্দর নাম। এমনকি আরো বলা হয়েছে যে, এ দু'টি নাম

৬২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯, ইবনে মাজাহ হা/১৯৫।

ইসমে আ'যম। কেননা এ নাম দু'টিই আল্লাহ তা'আলার জন্য উত্তমভাবে অন্যান্য পূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করাকে আবশ্যক করে।[৬৩]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার القيوم। নামটি তার এমন অনাদিত্ব-সূচনাহীনতা এবং অবিনশ্বরতা-চিরন্তনতার প্রমাণ বহন করে, যা القديم। শব্দটি বহন করে না। একই সঙ্গে কাইয়্যুম নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল। তিনি ওয়াজিবুল উজুদ হওয়ার অর্থ এটিই।

القيوم শব্দটি القيام এর চেয়ে অধিক পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। কেননা واو অক্ষরটি الف অক্ষরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। মুফাস্সিরে কুরআন ও ভাষাবিদদের ঐকমত্যে আলিফের বদলে واو দ্বারা গঠিত القيوم। শব্দটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। সর্বসাধারণের নিকট এটি একটি জ্ঞাত বিষয়। তবে القيام। শব্দটি থেকে কি এটি বুঝা যায় যে, তিনি অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী এবং অন্যকে পরিচালনাকারী?

এতে দু'টি মত রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, القيام। শব্দটিও উপরোক্ত অর্থ প্রদান করে। এটি আল্লাহ তা'আলার সর্বদা বিদ্যমান থাকা এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা প্রমাণ করে। তিনি কখনো বিলীন হবেন না, অদৃশ্যও হবেন না। সে বিলীন হয়ে যায়, সে আসলে নিঃশেষই হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হন না, তার কোনো ঘাটতিও হয় না, তিনি কখনো নিঃশেষ হবেন না এবং অস্তিত্বহীনও হবেন না। বরং তিনি চির বিদ্যমান। তিনি সর্বদাই পূর্ণতার বিশেষণে বিশেষিত আছেন, সবসময় এ রকম থাকবেন। তার الحي। (চিরঞ্জীব) নামটি সমস্ত ছিফাতে কামালিয়ার (পূর্ণতার) জন্য আবশ্যক। এটি তার চিরস্থায়িত্ব, অবিনশ্বরতার প্রমাণ বহন করার সাথে সাথে তার ত্রুটিমুক্ততা এবং কখনো অস্তিত্বহীন না হওয়ার দাবি করেন।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ "আল্লাহ একক সত্তা, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুর ব্যবস্থাপক ও ধারক" *(সূরা আল-বাকারা:২৫৫)* এ আয়াতটি কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান বলে গণ্য হয়েছে।

যেমন ছ্বহীহ বুখারীতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং الحي এবং القيوم নামের উপরই আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা ভিত্তিশীল। এ দু'টি নাম সমস্ত নামের অর্থের কেন্দ্রস্থল। কেননা সমস্ত ছিফাতে কামালিয়ার জন্য হায়াত আবশ্যক।

---

৬৩. কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য হায়াত বা জীবন সাব্যস্ত করা ব্যতীত ইলম, কুদরত এবং অন্যান্য ছিফাত সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। হায়াত ব্যতীত বাকী ছিফাতগুলো কায়েম হওয়াও সম্ভব নয়।

হায়াতের মধ্যে দুর্বলতা থাকার কারণেই বাকী ছিফাতগুলোর কোনোটি অনুপস্থিত থাকতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার হায়াত যেহেতু পরিপূর্ণ, তাই তার বাকী ছিফাতগুলো তার জন্য পরিপূর্ণ অবস্থায় সাব্যস্ত। কোনো ছিফাতকে নাকচ করা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ছিফাতের পরিপন্থী।

আল্লাহ তা'আলার القيوم নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি পরিপূর্ণ ধনী এবং পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। কোনোভাবেই তিনি অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। একই সঙ্গে তিনি অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর এ দু'টি নামের সাথে পূর্ণতার ছিফাতগুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।

(১১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ رَازِقٌ بِلَا مؤنَةٍ

তিনি সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির প্রতি তার কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই তিনি রিযিকদাতা।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী"। *(সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

"হে লোক সকল! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত"। *(সূরা ফাতির: ১৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾

"আল্লাহ তো পরিপূর্ণ ধনী। আর তোমরাই তার প্রতি মুখাপেক্ষী"। *(সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾

"হে মুহাম্মাদ বলো, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবো? অথচ তিনি জীবিকা দান করেন, জীবিকা গ্রহণ করেন না"। *(সূরা আল-আনআম: ১৪)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

«يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ»

"হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি তোমাদের সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের সকলের তাকওয়া যদি আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দার তাকওয়ার মত হয়ে যায় তাহলে তা আমার রাজত্বের মধ্যে কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বান্দার অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা যদি ইবলীসের অবাধ্যতার মত হয়ে যায়, তাহলেও তা আমার রাজত্ব ও ক্ষমতার কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি যদি তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা অনুপাতে দান করি, তাহলেও আমার ভান্ডার থেকে কেবল ঐ পরিমাণই কমতে পারে যেমন সাগরে একটি সুই ঢুকালে তা যে পরিমাণ পানি কমিয়ে দেয়"।[৬৪] ইমাম মুসলিম এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ত্বহাবীর উক্তি, بلا مؤنة অর্থ হলো কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই।

৬৪. হাদীছটির সনদ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ

তিনি নির্ভয়ে প্রাণ হরণকারী এবং বিনা ক্লেশে পুনরুত্থানকারী।

.....

ব্যাখ্যা: মৃত্যু একটি বিশেষণ। এর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে দার্শনিক এবং তাদের অনুসারীরা এতে ভিন্ন মত পোষণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। *(সূরা মূলক: ২)*

সুতরাং যার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাকে সৃষ্টি হিসাবে বিশেষিত করা হয় না। হাদীছে রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَّهُ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

"কিয়ামতের দিন সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রেখে যবেহ করা হবে"।[৬৫]

যদিও মৃত্যু একটি বিশেষণের নাম, তথাপিও আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে আকৃতি দান করবেন। যেমন বান্দার সৎ আমলের ব্যাপারেও বলা হয়েছে যে, তা সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে আমলকারীর নিকট আগমন করবে। আর মন্দ আমল আসবে নিকৃষ্ট আকৃতিতে।[৬৬]

কুরআনের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তা ফ্যাকাশে ও মলিন চেহারা বিশিষ্ট যুবকের আকৃতিতে উপস্থিত হবে।[৬৭] অতঃপর বলবে, আমি তোমাকে রাতে জাগ্রত রেখেছিলাম এবং দিনের বেলায় পিপাসিত রেখেছিলাম।

---

৬৫. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৭৩০।

৬৬. বারা বিন আযিব থেকে বর্ণিত হাদীছে এ কথা এসেছে। হাদীছটি দলিলসহ সামনে আসছে।

৬৭. দুনিয়াতে কুরআন তেলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে যেহেতু কারীগণের শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই তাদের দুনিয়ার আকৃতিতেই তাদের কুরআন তেলাওয়াতের আমল উপস্থিত হবে। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন পাঠকারী কিয়ামতের দিন তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান পাবে।

অন্যান্য আমলের ব্যাপারে কথা হলো তা কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় রাখা হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বান্দার আমলগুলো কিয়ামতের দিন আকৃতি প্রদান করা হবে। কেননা আকৃতিহীন বস্তু মীযানের পাল্লায় রেখে ওজন করা যায় না।

সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে-ইমরানের ফযীলতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উভয়েই তার পাঠকারীকে কিয়ামতের দিন ছায়া দিবে। মনে হবে তারা যেন দু'টি মেঘখণ্ড অথবা ডানা প্রসারণকারী সারিবদ্ধ দু'ঝাক পাখি।[৬৮]

ছ্বহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, বনী আদমের আমল আসমানে উঠে। এ ব্যাপারে কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইনশা-আল্লাহ।

৬৮. শারহুন নববীসহ ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

(১৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلِقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ كَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا

সৃষ্টি করার বহু পূর্ব থেকেই তিনি তার অনাদি গুণাবলীসহ চিরন্তন-অবিনশ্বর সত্তা হিসাবে বিদ্যমান রয়েছেন, আর সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কারণে তার এমন কোনো নতুন গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না। তিনি তার গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত, চিরন্তন ও চিরঞ্জীব থাকবেন।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই পূর্ণতার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত। তার ছিফাত-গুণগুলো দু'প্রকার। ছিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত ছিফাত এবং ছিফাতে ফে'লীয়া বা তার কর্মগত বিশেষণসমূহ।

এ কথা বিশ্বাস করা বৈধ নয় যে, এক সময় আল্লাহ তা'আলার কোনো ছিফাত ছিল না। অতঃপর তিনি তা দ্বারা বিশেষিত হয়েছেন। কেননা তার ছিফাতগুলো পরিপূর্ণ। কখনো তা না থাকা ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত। তার জন্য এমনটি শোভনীয় নয় যে, তিনি পূর্ণতার গুণাবলী অর্জন করেছেন। অথচ তিনি এক সময় পূর্ণতার বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে ফে'লীয়া, বাছাইকৃত গুণাবলী কিংবা অন্যান্য ছিফাতের ক্ষেত্রে এ কথা শোভনীয় নয়। যেমন সৃষ্টি করা, রূপদান করা, মৃত্যু ঘটানো, জীবন দান করা, সঙ্কোচিত করা, সম্প্রসারণ করা, ভাজ করা, সমুন্নত হওয়া, আগমন করা, নেমে আসা, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য যেসব বিশেষণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজেকে বিশেষিত করেছেন কিংবা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তার ক্ষেত্রেও একই কথা। যদিও আমরা আল্লাহর ছিফাতগুলোর এমন কোনো প্রকৃত অবস্থা ও স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নই, যাকে তাবীল-অপব্যাখ্যা বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর ছিফাতগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রায় দ্বারা কথা বলি না এবং প্রবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ধারণার উপর নির্ভর করেও কিছু বলি না। তবে ছিফাতগুলোর মূল অর্থ আমাদের জানা রয়েছে। যেমন ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন

{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [سورة الْأَعْرَافِ: ٥٤]

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত" *(সূরা আল-আরাফ: ৫৪)* -আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এবং অন্যান্য ছিফাতের ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, ؟**كيف اســـتوى** আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন? জবাবে ইমাম মালেক (র.) বললেন,

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

"আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়।[৬৯] তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত"।[৭০]

যদিও এ ছিফাতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোনো সময়কে বাদ দিয়ে অন্য সময় বিশেষিত হয়ে থাকেন। যেমন শাফা'আতের হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত অতীতে আর কখনো হননি। আজকের পরে আর কখনো অনুরূপ রাগান্বিত হবেন না। এভাবে কোনো সময়কে বাদ দিয়ে অন্য সময় এগুলো দ্বারা বিশেষিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার শানে এ কথা বলা যাবে না যে, এগুলো এক সময় আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিল না; বরং পরবর্তীতে তিনি তা অর্জন করেছেন।

আপনি কি জানেন না, যে ব্যক্তি আজ কথা বলেছে, গতকালও কথা বলেছে, তার ব্যাপারে এটি বলা ঠিক নয় যে, আজ তার জন্য কথা বলার বিশেষণ অর্জিত হয়েছে। তবে যদি কোনো ত্রুটির কারণে যেমন ছোট্ট শিশু অথবা বোবা লোক যেদিন কথা শুরু করে সেদিন বলা হয়, حدث له الكلام "আজ তার জন্য কথা বলার বিশেষণ অর্জিত হয়েছে"।

সুতরাং বাকশক্তি সম্পন্ন যে লোক বিনা কারণে চুপ থাকে, তার ব্যাপারে বলা হয় যে, সে কথা বলার শক্তি রাখে। অর্থাৎ সে যখন ইচ্ছা কথা বলে। আর যখন সে বাস্তবেই কথা বলতে থাকে তখন তাকে **متكلم** (বক্তা) বলা হয়। এমনি যে লোক লেখালেখি করে তার ক্ষেত্রেও একই রকম কথা বলা হয়। সে যখন বাস্তবেই লিখতে থাকে, তখন তাকে **كاتب** (লেখক) বলা হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে লেখার কাজে ব্যস্ত থাকে না, তখনও তাকে লেখক বলা হয়। উক্ত ব্যক্তি লেখক বলে সম্বোধন করা হয় লেখার যোগ্যতা থাকার কারণে। চাই সে বর্তমানে লিখুক বা না লিখুক।

আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে حلول الحوادث তথা ছিফাত ও ক্রিয়া-কর্ম প্রবেশ করা কালামশাস্ত্রবিদদের নিকৃষ্ট মাযহাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের কথা হলো, আল্লাহর সত্তার মধ্যে ছিফাত ও ক্রিয়া-কর্ম প্রবেশ করা বা না করার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ্য় বর্ণিত হয়নি।

---

৬৯. আমরা আল্লাহর সিফাতের ধরণ জানি না, -এ কথার অর্থ এ নয় যে, আসলেই তার কোন ধরণ নেই; বরং অবশ্যই তার সুমহান ছিফাতগুলোর ধরণ আছে। কিন্তু আমরা উহা জানি না। সেগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকা প্রমাণ করে না যে, তার সিফাতের কোনো ধরণ নেই। আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন, তার ছিফাতগুলোর ধরণ কেমন।

৭০ . অতঃপর সে বিদ'আতী লোককে ইমাম মালেক (রহি.) এর মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো। কেননা এটি এমন প্রশ্ন, যা সালাফে সালেহীনদের কোনো লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেননি।

حلول الحوادث কথাটির মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। এ কথার মাধ্যমে যা নাকচ করা হয়েছে, তা দ্বারা যদি এটি নাকচ করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার মধ্যে সৃষ্টির কোনো বিশেষণ প্রবেশ করে না অথবা যদি এটি নাকচ করা উদ্দেশ্য হয় যে, তার জন্য এমন নতুন নতুন ছিফাত তৈরী হয়, যা পূর্বে ছিল না, তাহলে এ ধরণের কিছু নাকচ করা করা সঠিক। কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলার বাছাইকৃত গুণাবলী নাকচ করা হয় অর্থাৎ যদি নাকচ করা হয় যে, তিনি নিজের জন্য ক্রিয়া-কর্ম বাছাই করে যখন ইচ্ছা তা করেন না, যখন যা ইচ্ছা তা বলেন না, তিনি রাগান্বিত হন না, সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য ছাড়াই সন্তুষ্ট হন না এবং নেমে আসা, সমুন্নত হওয়া, আগমন করা ইত্যাদি আরো যেসব বিশেষণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে শোভনীয় পদ্ধতিতে বিশেষিত করেছেন, তা নাকচ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা বাতিল।

নিকৃষ্ট মাযহাবের অনুসারী কালাম শাস্ত্রবিদরা আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে حلول الحوادث তথা ছিফাত ও ক্রিয়া-কর্ম প্রবেশ করাকে নাকোচ করে থাকে। সুন্নীরা কালাম শাস্ত্রবিদদের কথাকে যখন এ ভেবে সমর্থন করেন যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে ঐসব বিষয় নাকচ করা উদ্দেশ্য, যা তার জন্য শোভনীয় নয়, তখন বিদ'আতীরা সুন্নীদের উপর বাছাইকৃত গুণাবলী এবং কর্মগত বিশেষণগুলো নাকচ করার বিষয়টিও চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার মধ্যে حوادث বা নশ্বর বস্তুর অনুপ্রবেশ নাকোচ করার মাধ্যমে তার বাছাইকৃত গুণাবলী ও ক্রিয়া-কর্ম নাকচ করা আবশ্যক নয়। সুন্নীরা কেবল ভালো ধারণার বশবতী হয়েই কখনো কখনো বিদআতীর সংক্ষিপ্ত নফীকে সমর্থন করে থাকে। কিন্তু সুন্নী যখন সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা চাইবে, তখন বিরোধীর বাতিল ব্যাখ্যায় সুন্নী কখনো সম্মতি দিবে না।[৭১]

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। ছিফাত কি তার সত্তার উপর অতিরিক্ত কোনো জিনিস? না কি সেরকম নয়? এটি একটি সংক্ষিপ্ত কথা। অনুরূপ এ কথা বলা যে, আল্লাহর ছিফাত কি তার সত্তা থেকে আলাদা কোনো বিষয়? না কি আলাদা নয়? এ কথার মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। এর মাধ্যমে কখনো আল্লাহ তা'আলার সত্তা উদ্দেশ্য না হয়ে তার ছিফাত উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার কখনো এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আল্লাহর সত্তা থেকে তার ছিফাত সম্পূর্ণরূপে আলাদা স্বতন্ত্র একটি বিষয়।[৭২]

---

৭১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো, আল্লাহ তাআলার গুণ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে বিদ'আতীরা যখন এমন সংক্ষিপ্ত কথা বলবে, যা সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে, তখন তার সে সংক্ষিপ্ত কথা সমর্থন কিংবা বর্জন কোনোটিই করা যাবে না; বরং তার কথার ব্যাখ্যা চাইতে হবে এবং জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তার কথার উদ্দেশ্য কী? তাতে যদি সত্য কিছু থাকে, তাহলে উহাকে শরী'আত সম্মত শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আর তাতে বাতিল কিছু থাকলে তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

৭২. ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তীতে আগমনকারী আহলে সুন্নাতের লোকদের মাথায় এ ধরণের দার্শনিক প্রশ্ন জাগ্রত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের মন-মস্তিষ্ককে এ ধরণের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে পবিত্র করেছেন। পরবর্তীতে

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ আল্লাহর ছিফাত বা তার কালামের ব্যাপারে কখনো এ কথা বলতেন না যে, আল্লাহ তা'আলার ছিফাত তার সত্তা ব্যতীত অন্য জিনিস এবং এ কথাও বলতেন না যে, তার ছিফাত তার সত্তা ব্যতীত অন্য বিষয় নয়। কেননা যদি সাব্যস্ত করা হয় যে তার সত্তা এক জিনিস এবং ছিফাত আরেক জিনিস, তাহলে এ ধারণা আসতে পারে যে, আল্লাহর ছিফাত তার সত্তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর যদি এ রকম অস্পষ্ট বিষয়কে নাকচ করা হয়, তাহলে এ ধারণা আসতে পারে যে, আল্লাহর সত্তা ও ছিফাত একই বিষয়। কেননা غير (অন্য) কথাটির মধ্যে সংক্ষিপ্ততা রয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া এ কথা আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

এ কথার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহর শুধু স্বনির্ভর স্বতন্ত্র একটি সত্তা রয়েছে এবং তার কোনো ছিফাত-গুণ নেই, তাহলে এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল। আর যদি এ কথার উদ্দেশ্য এমন হয় যে, আল্লাহর ছিফাতসমূহ তার ঐ সত্তার উপর অতিরিক্ত একটি বিষয়, যা তার ছিফাত থেকে বোধগম্য অর্থ থেকে ভিন্ন, তাহলে ঠিকই আছে। তবে এ কথা সঠিক যে, বাস্তবে ছিফাতশূণ্য কোনো সত্তা নেই। বরং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য সাব্যস্ত পূর্ণতার বিশেষণগুলো তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা কোনো জিনিস নয়। শুধু মাথার মধ্যেই এ কল্পনা জাগতে পারে যে, সত্তা এক জিনিস এবং ছিফাত আলাদা জিনিস। প্রত্যেকটিই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয়; বরং বাস্তবে এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা ছিফাত বা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত নয়। এটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যদিও তর্কের স্বার্থে এ কথা মেনে নেয়া হয়, আল্লাহর শুধু অস্তিত্ব রয়েছে, তারপরও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ অস্তিত্ব কখনো অস্তিত্বশীল থেকে আলাদা হয় না। যদিও মস্তিষ্কের মধ্যে আলাদা এক সত্তা এবং আলাদা এক অস্তিত্বের ধারণা জাগ্রত হয়। মস্তিষ্ক একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা হিসাবে কল্পনা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে উভয়ের একটি অন্যটি থেকে আলাদা হিসাবে পাওয়া যাবে না।

এখন কেউ যদি বলে, ছিফাত দ্বারা বিশেষিত মূল সত্তা উদ্দেশ্য নয় এবং অন্য কিছুও নয়, তাহলে এ কথার একটি সঠিক অর্থ রয়েছে। এ সঠিক অর্থটি হলো, ছিফাত হুবহু সে মাওসুফের সত্তা নয়, যাকে মস্তিষ্ক এককভাবে কল্পনা করে; বরং সেটি অবশ্যই মূল সত্তা ছাড়াও আরেকটি অতিরিক্ত বিষয়। তবে তা বিশেষিত সত্তা ছাড়া অন্য কোনো আলাদা জিনিসও নয়; বরং বিশেষিত সত্তা তার বিশেষণগুলোসহ একই জিনিস, একাধিক বিষয় নয়। আপনি যখন বলেন, أعوذ بالله "আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি", তখন আপনি পূর্ণতার

গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুতাযেলা এবং অন্যান্য বাতিল ফির্কার লোকেরা এ ধরণের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন মুসলিম সমাজে আমদানী করেছে। সঠিক কথা হলো ছিফাত-গুণ ছাড়া কোনো জিনিসের অস্তিত্বই বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেসব বিশেষণে বিশেষিত পবিত্র সত্তার আশ্রয়ই গ্রহণ করলেন, যা তার জন্য সাব্যস্ত এবং তা তার সত্তা থেকে কোন অবস্থাতেই তা আলাদা হয় না।

আর যখন আপনি বলবেন, أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ "আমি আল্লাহর ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি", তখন আপনি আল্লাহ তা'আলার কোনো একটি ছিফাতের আশ্রয় গ্রহণকারী গণ্য হবেন। আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণকারী হিসাবে গণ্য হবেন না। যাত বা সত্তা শব্দ থেকে এ অর্থ বুঝা যায়। কেননা ذات শব্দটি মুযাফ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে ذات وجود অস্তিত্বশীল, ذات قدرة ক্ষমতার অধিকারী, ذات عز সম্মানের অধিকারী, ذات علم ইলমের অধিকারী, ذات كرم দানশীল। এমনি আরো অনেক ছিফাতের দিকে যাত শব্দটিকে সম্বোধন করা হয়। সুতরাং ذات كذا অর্থ হলো ইহার অধিকারী। ذات শব্দটি ذو - এর مؤنث। শব্দটির মূল অর্থ হলো অধিকারী।

সুতরাং জানা গেল যে, কোনোভাবেই যাত থেকে ছিফাতকে আলাদা হিসাবে কল্পনা করা সম্ভব নয়। যদিও মানুষের মাথায় ছিফাত ছাড়া যাতের অস্তিত্বের ধারণা জাগ্রত হয়। এমনি অসম্ভব জিনিসের কল্পনাও মানুষের মাথায় কল্পিত হয়।[৭৩]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলেছেন,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

"আমি নিজের মধ্যে যে ব্যথা অনুভব করছি এবং অন্যান্য যেসব রোগ-ব্যাধির আশঙ্কা করছি, তার ক্ষতি থেকে আমি আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার আশ্রয় কামনা করছি"। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ»

"আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে। তার সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে"।

---

৭৩. যেমন দশহাত ও তিন মাথা বিশিষ্ট মাথা ওয়ালা মানুষের অস্তিত্ব মানুষের মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পারে। পানিতে সাগরের বউ আছে, খিযির (আলাইহিস সালাম) পানিতেই থাকেন, ইত্যাদি কাল্পনিক ধারণা ও কাহিনীর শেষ নেই। বাস্তবে এ জাতীয় কোনো মাখলুক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং মানুষের মাথা অসম্ভব বস্তু কল্পনা করতে পারে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, বাস্তবেও উহার অস্তিত্ব রয়েছে। এমনি জাহমিয়া এবং তাদের অনুসারীরা ছিফাত বিহীন আল্লাহর সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। কিন্তু বাস্তবে যেখানে ছিফাত ছাড়া কোনো মাখলুকই খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে গুণাবলী ও বিশেষণ ছাড়া স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করা বোকামি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় আরো বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِرِضَاك مِنْ سَخَطك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتك وأعوذبك منك»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার ক্ষমা গুণের উসীলায় তোমার শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করছি এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার নিকটই আশ্রয় চাচ্ছি"।[৭৪]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

«وَنعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا» "হে আল্লাহ! আমরা তোমার বড়ত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধ্বসে আমাদের হঠাৎ মৃত্যু বরণ করা হতে"।

«أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ»

"আমি তোমার সে চেহারার আলোর আশ্রয় চাই, যা দ্বারা অন্ধকার দূরিভূত হয়ে যায়"।[৭৫]

কালামশাস্ত্রবিদরা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, আল্লাহর নামগুলো দ্বারা কি আল্লাহর সত্তা উদ্দেশ্য? না কি তার নামগুলো দ্বারা সত্তা ছাড়া অন্য কিছু বুঝায়? এ মাস'আলায় যেহেতু অনেকেই ভুল করেছে এবং তাতে সঠিক সিদ্বান্তে পৌঁছতে পারেনি, তাই আমরা বলবো যে, কখনো কখনো নাম দ্বারা নামকরণকৃত সত্তা উদ্দেশ্য হয় এবং কখনো কখনো নাম দ্বারা এমন শব্দ বুঝায়, যা দ্বারা অন্য কিছু উদ্দেশ্য হয়।

সুতরাং আপনি যখন বলবেন, আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলেছেন অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন অথবা আপনি যখন অনুরূপ অন্যান্য কথা বলে থাকেন, এখানে আল্লাহ নাম দ্বারা তার সত্তা উদ্দেশ্য। আর আপনি যখন বলবেন, আল্লাহ শব্দটি একটি আরবী নাম, আর্ রাহমান নামটি একটি আরবী নাম অথবা আর্ রাহমান আল্লাহর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত, অথবা অনুরূপ অন্য কোনো কথা বলবেন, তখন এখানে এ শব্দগুলো দ্বারা কেবল নাম উদ্দেশ্য হবে, নামকরণকৃত সত্তা উদ্দেশ্য হবে না। এ কথাও বলা হবে না যে, নাম দ্বারা অন্য কিছু উদ্দেশ্য। কেননা 'অন্য কিছু' শব্দটির মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। যদি অন্য কিছু দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, শব্দ এক জিনিস এবং অর্থ অন্য জিনিস, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, তখন তার কোনো নাম ছিল না। অতঃপর তিনি তার নিজের জন্য অনেক নাম সৃষ্টি করেছেন অথবা সৃষ্টিরা

---

৭৪. ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৭৫১।

৭৫. সীরাতে ইবনে হিশাম। ইমাম আলবানী (রহি.) এ বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: ফিকহুস্ সীরাত, (১/১২৫)।

তাদের কাজ-কর্মের অনুপাতে তাকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছে, তাহলে এটি হবে তাদের বিরাট মুর্খতা এবং আল্লাহর নামের মধ্যে ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "সৃষ্টি করার অনেক পূর্ব থেকেই তিনি তার অনাদি-অনন্ত ও চিরন্তন গুণাবলীসহ বিদ্যমান রয়েছেন, আর সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্বে আসার কারণে তার এমন কোনো নতুন গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না। তিনি তার গুণাবলীসহ যেমন অনাদি, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত"।

শাইখ এ কথা দ্বারা মুতাযেলা, জাহমিয়া এবং তাদের অনুসারী শিয়াদের প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা এক সময় কর্ম সম্পাদনে এবং কথা বলতে সক্ষম ছিলেন না। অতঃপর সক্ষম হয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদন করা এবং কথা বলা অসম্ভব থাকার পর সম্ভব হয়েছে। মূলত তিনি অসম্ভাব্য সত্তা থেকে সম্ভাব্য সত্তায় পরিণত হয়েছেন![৭৬]

ইবনে কুল্লাব, আবুল হাসান আল-আশআরী এবং তাদের অনুসারীরা বলেছে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদন করা অসম্ভব থাকার পর সম্ভব হয়েছে। আর তার কথা বলা বিশেষণ সম্পর্কে তারা বলে যে, কথা বলা আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করে এবং স্বীয় ক্ষমতার মাধ্যমে কথা বলেন না; বরং কথা বলার বিশেষণ আল্লাহর সত্তার জন্য একটি আবশ্যিক জিনিস মাত্র। এমন নয় যে, তিনি কথা বলেছেন। নাউযুবিল্লাহ।

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার ধারণা

জাহমিয়াদের থেকেই এ কথার উৎপত্তি হয়েছে। তারা বলেছে, সূচনাহীন সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং তার চিরস্থায়িত্ব অসম্ভব। সৃষ্টির জন্য একটি সূচনা থাকা জরুরী। এমন কোনো সৃষ্টি নেই, যা সূচনাহীন। তাদের মতে এটি অসম্ভব যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই কর্ম

---

৭৬. ইসলামের স্বর্ণযুগে এ জাতীয় অযথা তর্ক-বিতর্কের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া দ্বীনের অনুসরণ করতেন, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জন করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অযথা ও অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু পরবর্তীতে আব্বাসীয় খেলাফতকালে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবগুলো আরবীতে অনুবাদ হলো, তখন থেকেই মুসলিমদের একদল মেধাবী আলেম স্রষ্টার অস্তিত্ব, স্বরূপ ও গুণাবলী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে যুক্তি ও বোধশক্তির আশ্রয় নিতে লাগলেন। আরেক শ্রেণীর আলেম কালামী পদ্ধতিতে তাদের জবাব দেয়া শুরু করলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জনের বদলে তারা মরিচিকার পিছনে ছুটে বেড়ায়। এতে করে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো কিতাবাদিতে ভরপুর হয়েছে ঠিকই; কিন্তু জাতির ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হয়নি।

সম্পাদন করা, কথা বলা এবং ইচ্ছা করার বিশেষণে বিশেষিত রয়েছেন; বরং এ গুলোর উপর তিনি ক্ষমতাবানই ছিলেন না। কেননা অসম্ভব কিছু করাও ক্ষমতা রাখাও অসম্ভব!!

তাদের এসব কথা সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ এ কথা প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। অথচ তা সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির অস্তিত্ব না থাকার পর যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে, তাই বুঝা গেল, সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। যা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তা সৃষ্টি হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যে কোনো সময় তা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদন করা এবং তার জন্য তা সম্ভব হওয়ার নির্দিষ্ট ও সীমিত কোনো সময় নেই।

সুতরাং নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, সবসময় তার জন্য কাজ-কর্ম করা সম্ভব, বৈধ ও সঠিক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান। যখন তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি, তখনো তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন। এতে প্রমাণিত হলো, এমন সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, যা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবসময় সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তাই তার পক্ষে অতীতের যে কোনো সময় সৃষ্টি করা সম্ভব। নির্দিষ্ট এমন কোনো সময়সীমা নেই, যেখান থেকেই কেবল তিনি সৃষ্টি করার বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন এবং সৃষ্টি করা শুরু করেছেন।

জাহমিয়া এবং তাদের অনুসারীরা বলেছে, আমরা এ কথা স্বীকার করিনা যে, এমন সৃষ্টি থাকার সম্ভাবনা আছে, যার কোনো সূচনা নেই। তবে আমরা বলি, সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না, তার কোনো সূচনা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা বলে, আমাদের মতে অনাদি সৃষ্টি থাকা অসম্ভব। বরং এ শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়া যেমন আবশ্যক এবং তা অনাদি ও সূচনা বিহীন হওয়াও অসম্ভব। তবে নির্দিষ্ট কোনো সময়ে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক নয়। সৃষ্টির সূচনা হওয়ার পূর্বে তা সৃষ্টি হওয়ার কোনো প্রারম্ভ না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু একক সৃষ্টিগুলো এর ব্যতিক্রম। এগুলো সৃষ্টির সূচনা অবশ্যই রয়েছে।

তাদেরকে বলা হবে, তোমরা উপরোক্ত কথা বলে থাকো। তবে তোমাদের মতে সৃষ্টির শ্রেণী ও ধরণের জন্য একটি সময়সীমা রয়েছে। কেননা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি হওয়ার শ্রেণী বিশেষ তৈরী হওয়া অসম্ভব হওয়ার পর সম্ভব হয়েছে। তবে এটি কখন সম্ভব হয়েছে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। অতীতে কোনো একটি সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার যে কোনো সময়ই নির্ধারণ করা হোক না কেন, তার পূর্বে আরেকটি সময় সাব্যস্ত করা বৈধ।[৭৭]

---

৭৭. উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেউ যদি বলে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এক হাজার বছর আগে, তাকে জিজ্ঞেস করা যুক্তিসংগত যে, দুই হাজার বছর আগে সৃষ্টি হতে মানা কোথায়? বিশেষ করে যেহেতু জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা সবসময় সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের কাছে যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টির কোনো নির্দিষ্ট সময় জানা নেই, তাই যেমন এটি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এক হাজার বছর পূর্বে, তেমনি দুই হাজার বছর...তিন হাজার বছর..বা আরো আগে।

সুতরাং সব সময় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এমনটি না হলে সৃষ্টির শ্রেণী বিশেষ কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া ছাড়াই অসম্ভব থেকে সম্ভবে পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

বুদ্ধিমানদের নিকট এটি জানা বিষয় যে, সৃষ্টি হওয়ার প্রকৃতি, কিংবা সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি অথবা ক্রিয়া-কর্মের প্রকৃতি অথবা সৃষ্টি করার প্রকৃতি অথবা অনুরূপ বিষয়ের প্রকৃতি অসম্ভব থেকে সম্ভবের দিকে পরিবর্তিত হওয়ার অর্থ হলো বিনা কারণে অসম্ভবকে সম্ভব ও বৈধ করে দেয়ার শামিল। বিবেক-বুদ্ধি সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, ইহা অসম্ভব। সেই সঙ্গে এটি অসম্ভব সত্তাকে সম্ভব সত্তায় পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক করে।

সুতরাং তাদের মতে অসম্ভব সৃষ্টির সত্তা সম্ভাব্য সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ পরিবর্তন নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সাথে সীমিত নয়। কেননা অতীতের যে কোনো সময়কে সৃষ্টির সূচনার জন্য নির্ধারণ করা হলে সেই সম্ভাব্য সময়ের পূর্বে আরেকটি সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা বৈধ। এতে আবশ্যক হয় যে সব সময়ই এ পরিবর্তন সম্ভব। এতে আরো আবশ্যক হয় যে, সবসময়ই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা সম্ভব। সবসময় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, -এ কথার চেয়ে সবসময়ই অসম্ভব বস্তু সম্ভবে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব বলাই অধিক পরিপূর্ণ। এতে করে তাদের জন্য তাই অধিক আবশ্যক হয়েছে, যা থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। কেননা সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্বে আসার বিষয়টি বোধগম্য। আর এটিও বোধগম্য যে সবসময়ই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু অসম্ভব বস্তু সম্ভব হওয়া মূলত অসম্ভবই থেকে যায়।[৭৮]

সুতরাং কিভাবে বলা যেতে পারে যে, সবসময়ই অসম্ভব বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে? মূলত এ কিতাবটি এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৭৯]

---

৭৮. সুতরাং সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, -এ বিশ্বাস রাখা অসম্ভবকে সম্ভব করার আকীদাহ পোষণ করার চেয়ে অধিক সহজ। অসম্ভবকে সম্ভব করার বিশ্বাস করার আকীদাহ থেকে প্রশ্ন জাগে যে, কার উপর অসম্ভব ছিল? কখন অসম্ভব থেকে সম্ভব হয়েছে? ইত্যাদি।

৭৯. এগুলো মুতাযেলা ও জাহমীয়া দার্শনিকদের নিছক অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ এবং যুক্তি-তর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়গুলোতে প্রবেশ করার প্রয়োজনই ছিল না। তারা যেহেতু এ অকল্যাণকর বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং মুসলিমদের আকীদাহকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা করেছে, তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণও তাদের অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যই তাদের সাথে যুক্তি-তর্কে নেমেছেন। মূলত এটি এমন অকল্যাণকর বিষয়, যাতে প্রবেশ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এটি এ সময় তৈরী হয়েছে, ঐটি ঐ সময় তৈরী হয়েছে, এটি হওয়া সম্ভব, ঐটি অসম্ভব, মুসলিমগণ এ জাতীয় কথা-বার্তার জবাব দেয়ার মূলনীতির প্রতি মোটেই মুখাপেক্ষী নন। কেননা আমরা সৃষ্টিজগৎ তৈরী হওয়ার সময় সম্পর্কে অবগত নই। আমরা যদি নির্ধারণ করি যে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে একহাজার বছর পূর্বে, তাহলে এও সম্ভাবনা আছে যে, উহা দুই হাজার বছর পূর্বে তৈরী হয়েছে। আরেকজন বলতে পারে যে, তা আরো বহু পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং কোনো মানুষই জানেনা যে, সৃষ্টিজগৎ কখন তৈরী হয়েছে। তবে আমরা জানি যে, একসময় সৃষ্টিজগৎ ছিল না। পরে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ "মানুষের উপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না?"। (সূরা দাহার: ১)

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো সৃষ্টির সাধারণ ধারাবাহিকতা কি বিরামহীনভাবে ভবিষ্যৎ ও অতীতের দিকে অব্যাহত? এর কি কোনো সূচনা বা পরিসমাপ্তি নেই? না কি অতীতের দিকে এর একটা সূচনা রয়েছে; কিন্তু ভ্যবিষ্যতের দিকে এর কোনো সময়সীমা নেই? না কি সমাহীন অতীত থেকেই সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলে আসছে এবং ভবিষ্যতের দিকে এর জন্য সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে?

এ মাস'আলায় মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ এবং অন্যদের তিনটি মত রয়েছে।

অর্থাৎ তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এমনি জিন সৃষ্টি করেছেন। তাদেরও অস্তিত্ব ছিল না। ফেরেশতাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান-যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এমনি সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারেও একই কথা। এগুলোর কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে এ জীব-জন্তুগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, নদ-নদী, সাগর, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ফল-মূল ও রিযিক সৃষ্টি করেছেন। এগুলো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর পূর্বে সম্ভবতঃ তিনি অন্যান্য মাখলুকও সৃষ্টি করেছেন। তবে তা আমরা জানি না। আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনিই পরিচালক।

আমাদের উপর আবশ্যক হলো, আমরা এসব দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবো। এগুলো আমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার। সুতরাং আমরা এককভাবে তারই ইবাদত করবো। এ সীমা কখনো অতিক্রম করবো না। মুসলিমদের জন্য এটিই আবশ্যক ও উত্তম।

উপরোক্ত আলোচনায় ممكن (সম্ভব) এবং ممتنع (অসম্ভব) কথা দু'টি একাধিকবার এসেছে। যা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং যা ঘটার ধারণা করা যায়, উহাকে কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় ممكن (সম্ভব) বলা হয়। আর বিবেক-বুদ্ধি যা সংঘটিত হওয়ার কল্পনা করে না, উহাকে ممتنع (অসম্ভব) বলা হয়। ممتنع-এর অপর নাম مستحيل।

এ বিষয়টি সকলের জানা যে, অতীতে সৃষ্টিজগৎ ছিল না। অতঃপর তা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু অনেক জিনিস সৃষ্টি করা অসম্ভব বলেই তা সৃষ্টি হয়নি। যেমন পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি জিনিস একত্রিত করা অসম্ভব। সংকীর্ণ একটি স্থানে একই সাথে আলো ও অন্ধকার একত্রিত হওয়া অসম্ভব। একই সাথে কারো চেহারা কালো ও সাদা হওয়া অসম্ভব এবং একই কাপড় সাদা ও কালো হওয়া অসম্ভব...ইত্যাদি। কেননা পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি জিনিস একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

তবে এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি জিনিস একসাথে মিলাতেও সক্ষম। তিনি অসম্ভব বস্তু সৃষ্টি করতেও সক্ষম। তবে পরস্পর বিপরীতমুখী বস্তুগুলো একসাথে একত্রিত না করা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মানুষ এগুলো কল্পনা করে না। আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু গায়েবী জিনিস সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাতে পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয়কে একত্র করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا "জাহান্নামে সে মরবেও না, বাঁচবেও না"। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এটিকে অসম্ভব মনে করতে পারে। একজন মানুষের অবস্থা কিভাবে এমন হতে পারে যে, সে মরবেও না এবং বাঁচবেওনা? এর জবাব হলো আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি একই সময় জীবিত ও মৃত রাখার ক্ষমতা রাখেন। জাহান্নামবাসী এমন জীবন লাভ করবে, যাতে সে আগুনের আযাব ভোগ করবে। সে এমন মৃত্যু বরণ করবে না, যাতে সে আযাব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। বরং সে শাস্তির যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু কামনা করবে; কিন্তু মৃত্যু হবে না।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বিশেষণ হলো, তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয় ও জিনিসগুলোকেও একসাথে মিলাতে সক্ষম। তবে সৃষ্টিজগতের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিস একসাথে মিলিত না হওয়া আল্লাহর নীতিতে পরিণত হয়েছে।

(১) সবচেয়ে দুর্বল মত হলো ঐ ব্যক্তির কথা যে বলে অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো সময়ই সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা সম্ভব নয়। এটি জাহাম বিন সাফওয়ান এবং ইবনুল হুযাইল আল্লাফের কথা।

(২) ভবিষ্যতে সম্ভব হতে পারে; কিন্তু অতীতে অনাদি সৃষ্টির ধারণা অবৈধ। এটিই অনেক মুতাকাল্লিম এবং তাদের মাযহাবের অনুসারী ফিকাহবিদ ও অন্যদের মত।[৮০]

(৩) অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় কালেই সৃষ্টির ক্রমধারা অব্যাহত থাকা সম্ভব। মুহাদ্দিছগণ এ কথাই বলেছেন। এটি একটি বিরাট মাস'আলা। সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা অতীতে সম্ভব ছিল, ভবিষ্যতে সম্ভব নয়, -এ কথা কেউ বলেনি।

সকল ফির্কার অধিকাংশ মানুষ বলে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া যা আছে, তা সবই মাখলুক। এগুলো প্রথমে ছিল না। পরে সৃষ্টি হয়েছে। রসূলদের কথাও তাই। নাবী-রসূলদের অনুসারী মুসলিমগণ, ইহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও তাই বলেছে।

বিবেক-বুদ্ধির নিকট এটি একটি জানা বিষয় যে, কর্তার সাথে সাথে সদাসর্বদা কর্মযুক্ত থাকা এবং কাজকর্ম চলতে থাকা অসম্ভব। তবে কর্মসম্পাদন করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা সবসময় কর্তার বিশেষণ হিসাবে তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত। ভবিষ্যতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকা এ কথার পরিপন্থী নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ, তার পরে আর কিছুই নেই।[৮১] কারণ আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই স্বনির্ভর ও স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। জান্নাতের নেয়ামতকে আল্লাহ তা'আলা অনন্তকাল রাখবেন বলেই তা অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে, কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাতের নেয়ামত ধ্বংসের আওতামুক্ত থাকা প্রমাণ করে না যে, তা আল্লাহর মতই চিরন্তন ও অবিনশ্বর। অনুরূপ অতীতের সবসময়ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলতে থাকা এ কথার পরিপন্থী নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম এবং তার পূর্বে আর কিছুই ছিল না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আছেন। সবসময়ই স্বীয় ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদনকারী, যা ইচ্ছা, তাই করেন এবং যখন ইচ্ছা কথা বলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ "এমনটিই হবে। আল্লাহ যা চান তাই করেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৪০)*

---

৮০. কেননা তারা বলে থাকে যে, অতীতে সূচনাহীন, অনাদি ধারাবাহিক সৃষ্টি থাকার বিশ্বাস করা হলে একাধিক অনাদি ও সূচনাহীন সত্তা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। এটি তাওহীদের পরিপন্থি। এ কারণেই তারা অতীতে ধারাবাহিক সৃষ্টি থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

৮১. কেননা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। কখনো জান্নাতের নিয়ামত এবং জাহান্নামের আযাব শেষ হবে না। এ বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষে বিদ্যমান থাকার পরিপন্থি নয়। কেননা হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أنت الآخر فليس بعدك شيئ "হে আল্লাহ! তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে আর কিছুই নেই"। সুতরাং এটি যেহেতু সম্ভব, তাই অপর পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু প্রথম, তার পূর্বে যেহেতু আর কিছুই ছিল না, তা সত্ত্বেও তার সৃষ্টি করা বিশেষণটিও অনাদি এবং প্রাক্তন হওয়াতে কোনো বাধা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা সবসময়ই স্ব-ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদনকারী রয়েছেন।

অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

"কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾

"আরশের মালিক, মর্যাদাবান এবং তিনি যা চান তাই করেন"। *(সূরা বুরুজ: ১৫-১৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী লেখা শেষ হবে না"। *(সূরা লুকমান: ২৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

"হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনয়ন করি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না"। *(সূরা কাহাফ: ১০৯)*[৮২]

পূর্ণতার যেসব গুণাবলী আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা সম্ভব, তা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত। তা এমন যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা ইচ্ছা বলেন। কোনো কালের সাথে তার কাজ বা কথা সীমিত নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কোনো সময়ের ক্ষেত্রেই এটি সম্ভব। এর বিপরীত কিছু সাব্যস্ত করা হলে আল্লাহর পূর্ণ গুণের পরিপন্থী হবে।

সৃষ্টি করা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ও অনাদি বিশেষণ, তাই তার পূর্ণতম স্তর অনাদি ও সূচনাহীন। প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার জন্য তা এভাবে সাব্যস্ত যে,

---

৮২. এখানে কালেমা বা আল্লাহ তা'আলার কথা বলতে তার ঐসব আদেশ উদ্দেশ্য, যা দ্বারা তিনি সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এতে প্রমাণ মিলে যে, অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলার কথা ও কাজের কোনো শেষ সীমা নেই। এগুলো আল্লাহর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। অতীত ও ভবিষ্যৎ সবসময়ই আল্লাহর ক্রিয়া চলতে থাকার মধ্যেই তার পূর্ণতার প্রমাণ নিহিত। যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পূর্বেই কোনো সৃষ্টি ছিল কিংবা তিনি প্রথমে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এরকম ধারণা করা তার পূর্ণতার পরিপন্থি।

সৃষ্টির কোনো অংশই কোনোভাবেই স্রষ্টার সমপর্যায়ের নয়। অর্থাৎ মূল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার মতই অনাদি ও চিরন্তন নয়। একক সৃষ্টিগুলো অনাদি ও সূচনাহীন নয়। বরং তার এমন শুরু ও সূচনা রয়েছে, যেখান থেকে একক সৃষ্টিগুলো অস্তিত্বে এসেছে।

ভবিষ্যতের সবসময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকাও তার পূর্ণ গুণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কর্ম সম্পাদনকারী হওয়া যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার বিশেষণ, তাই সবসময়ই সৃষ্টি করতে থাকাও পূর্ণতার বিশেষণ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বলেছেন, التسلسل। (সৃষ্টির ধারাবাহিকতা) কথাটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। কুরআন ও হাদীছে এ শব্দটির নাকচ করা বা সাব্যস্ত করা কোনোটিই করা হয়নি। সুতরাং এ শব্দটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক নয়। তাসালসুল বা সৃষ্টির ধারাবাহিকতা তিন প্রকার।

(১) আবশ্যক,

(২) অসম্ভব এবং

(৩) বৈধ।

সৃষ্টির মধ্যে তাসালসুল বা বিরতিহীনভাবে সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা অসম্ভব ও নিষিদ্ধ। এটি এভাবে হতে পারে যে, প্রত্যেকে সৃষ্টিই তার পূর্ববর্তী বস্তুর মাধ্যমে প্রভাব অর্জন করেছে, যা সীমাবদ্ধ নয়।

যে ধারাবাহিকতা আবশ্যক, বিবেক-বুদ্ধি ও শরী'আতের দলীল দ্বারা তা সাব্যস্ত। স্রষ্টা ও প্রভুর ক্রিয়াসমূহ অতীতে যেভাবে চালু ছিল, ভবিষ্যতেও সেভাবে চলতেই থাকবে। জান্নাতীদের একটি নেয়ামত যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য আরেকটি নেয়ামত তৈরী করবেন। জান্নাতীদের নেয়ামত কখনো শেষ হবে না। এমনি অতীত ও অনাদির দিকেও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ধারাবাহিকভাবে চালু ছিল। অতীতে আল্লাহ তা'আলা যেসব ক্রিয়া-কর্ম সৃষ্টি করেছেন, তার পূর্বে আরেকটি ক্রিয়া ছিল। আল্লাহর কালাম বিশেষণের ক্ষেত্রেও একই কথা। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই কথা বলেছেন। নির্দিষ্ট কোনো একটি সময়ে তার কালাম সৃষ্টি হয়নি। এমনি তার বাকিসব কাজ তার হায়াতের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ তিনি যেহেতু চিরজীবন্ত, তাই তার কর্ম বা সৃষ্টি করার ক্ষমতাও চিরবিদ্যমান। কেননা প্রত্যেক জীবিতই সক্রিয়। জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য হলো ক্রিয়া সম্পাদন করা। জীবিত ব্যক্তি কাজ করতে পারে, মৃত ব্যক্তি তা সম্পাদন করতে পারে না। এ জন্যই সালাফদের অনেকেই বলেছেন, প্রত্যেক জীবন্তই কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। উছমান বিন সাঈদ বলেছেন, প্রত্যেক জীবন্তই কর্ম সম্পাদনকারী। আর আমাদের প্রভু কখনোই কর্ম করতে অক্ষম ছিলেন না। তিনি সবসময়ই কথা বলা, ইচ্ছা করা এবং কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম ছিলেন ও থাকবেন।

সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা বৈধ ও সম্ভব, তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে হয়ে থাকে। অনন্তকাল পর্যন্ত ভবিষ্যতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে। যেহেতু তিনি চিরজীবন্ত, চির সক্ষম, সর্বদাই ইচ্ছা পোষণকারী এবং কথা বলতে সক্ষম, আর এটি যেহেতু তার সত্তার জন্য আবশ্যক, তাই এ বিশেষণগুলোর দাবি হলো আল্লাহ তা'আলার জন্য সবসময়ই সক্রিয় থাকা সম্ভব। কাজ না করার চেয়ে তা করার মধ্যেই তার অধিক পূর্ণতা রয়েছে। কথা না বলার চেয়ে বলাই তার অধিকতর পূর্ণতার প্রমাণ এবং ইচ্ছা করাই না করার চেয়ে পূর্ণতম। এ বিশ্বাস পোষণ করা আবশ্যক করে না যে, এ সৃষ্টিগুলোও আল্লাহর সাথে সাথে অনাদি এবং সূচনাহীনভাবেই বিদ্যমান। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টির পূর্বে রয়েছেন। এমনভাবে তিনি প্রথমে রয়েছেন, যার পূর্বে আর কেউ নেই। প্রত্যেক মাখলুকেরই একটি সূচনা রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কোনো সূচনা নেই। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া বাকিসবই সৃষ্টি। সৃষ্টি এক সময় ছিল না, পরে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ধারাবাহিকতা নিষিদ্ধ। অবশ্যই সৃষ্টির একটি পরিসীমা রয়েছে। আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে এ সীমা শেষ হয়।[৮৩]

এ কথা ছাড়া আর যত মত রয়েছে, বিবেক-বুদ্ধির সুস্পষ্ট দলীল সেগুলো বাতিল করে দেয় এবং সেগুলো বাতিল হওয়ারই দাবি রাখে। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা সবসময় ক্রিয়াশীল তাদের প্রত্যেকেই দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি স্বীকার করতে বাধ্য। এ দু'টি বিষয় স্বীকার করা ব্যতীত আর কোনো পথ নেই। তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সবসময় ক্রিয়া সম্ভব অথবা এটি স্বীকার করতে হবে যে, সবসময়ই বাস্তবে আল্লাহর কাজ-কর্ম সংঘটিত হয়েছে। অন্যথায় তার কথার মধ্যে পারস্পরিক অসংগতি দেখা দিবে। অসংগতিটি এভাবে হবে যে, সে ধারণা করবে যে সবসময় আল্লাহ তা'আলা কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখেন, অথচ ক্রিয়া সম্পাদন করা তার সত্তার জন্য অসম্ভব। যদি তিনি তা করার ইচ্ছা করেন, তাহলে তা অস্তিত্বশীল হয় না; বরং তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব, অথচ তিনি তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন। এটি এমন কথা, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, শরী'আত ও বিবেক-বুদ্ধির দলীল প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া যা আছে, তা সবই মাখলুক-সৃষ্ট। সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর এ ধারণা করা যে, আল্লাহ তা'আলা এক সময় কাজশূণ্য ছিলেন, অতঃপর সক্রিয় হয়েছেন, শরী'আত ও বিবেক-বুদ্ধির এমন কোনো দলীল নেই, যা এ কথা সাব্যস্ত করে। বরং শরী'আত ও বোধশক্তির দলীল এ কথার বিপরীত।

ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল জুআইনী তার 'আল-ইরশাদ' নামক কিতাবে

---

৮৩. এ অংশ এভাবে বুঝলে ভালো হবে যে, আল্লাহর যেমন কোনো শুরু নেই, ঠিক তেমনি তার কাজ করা বিশেষণটিরও কোনো শুরু নেই। এটি তার সাথে সাথেই অনাদি ও অনন্ত এবং চিরবিদ্যমান। কিন্তু তিনি তার কাজ করার ক্ষমতা বিশেষণ দিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন বা করেন, তার একটি সূচনা ও পরিসমাপ্তি অবশ্যই রয়েছে।

এবং অন্যান্য কালাম শাস্ত্রবিদ উল্লেখ করেছেন যে, অতীতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা থাকা অসম্ভব।

তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, আপনি যদি বলেন, لَا أُعْطِيكَ دِرْهَمًا إِلَّا أُعْطِيكَ بَعْدَهُ دِرْهَمًا "আমি তোমাকে এক দিরহাম দেয়ার পর আরেক দিরহাম দিবো", এ ওয়াদা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কিন্তু আপনি যখন বলবেন, لَا أُعْطِيكَ دِرْهَمًا حَتَّى أُعْطِيَكَ قَبْلَهُ دِرْهَمًا "আমি তোমাকে এক দিরহাম দিবো না, যতক্ষণ না তার পূর্বে আরেক দিরহাম দেই" এ ওয়াদা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

এ উদাহরণ ও তুলনা সঠিক নয়। বরং সঠিক তুলনা হলো, আপনি এভাবে বলবেন, مَا أَعْطَيْتُكَ دِرْهَمًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَ قَبْلَهُ دِرْهَمًا "আমি তোমাকে এক দিরহাম দেইনি, যতক্ষণ না তার পূর্বে আরেক দিরহাম দিয়েছি"। এখানে আপনি এক অতীতের পূর্বে আরেক অতীত নির্ধারণ করেছেন। যেমন আপনি সেখানে এক ভবিষ্যতের পরে আরেক ভবিষ্যত নির্ধারণ করেছেন।

কিন্তু কারো এ কথা বলা যে, **لَا أُعْطِيكَ حَتَّى أُعْطِيَكَ قَبْلَهُ** "আমি তোমাকে দিবো না, যতক্ষণ না তার পূর্বে আরেকবার দেই"। এখানে ভবিষ্যতে এবং পূর্বে কিছু অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আরেক ভবিষ্যৎ নাকচ করা হয়েছে। এক ভবিষ্যৎ অর্জন না পাওয়া পর্যন্ত আরেক ভবিষ্যৎ নাকচ করা হয়েছে। এটি অসম্ভব। কিন্তু এক অতীত অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আরেক অতীত নাকচ করা সম্ভব। দানকারী ভবিষ্যতে দান করবে। যে ভবিষ্যতের শুরু ও শেষ রয়েছে, তার পূর্বে সীমাহীন ভবিষ্যৎ হয় না। কেননা যার সীমা রয়েছে, তাতে সীমাহীনের অস্তিত্বের ধারণা করা অসম্ভব।[৮৪]

৮৪. এগুলো নিছক বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলকথা হলো অতীতে ও ভবিষ্যতে আল্লাহর সৃষ্টি ও ক্রিয়া চালু থাকা শুধু সম্ভবই নয়; বরং আবশ্যক। এতেই আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত হয়। স্রষ্টা যেহেতু চির বিদ্যমান ও চিরজীবন্ত, অনাদি-অবিনশ্বর তাই তার ক্রিয়া ও সৃষ্টি অতীতে এবং ভবিষ্যতের সবসময় ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকার মধ্যেই তার পূর্ণতা রয়েছে। তা সাব্যস্ত করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতা সাব্যস্ত হয় না। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত। শাইখ ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ জাহমিয়া এবং দার্শনিকদের কথা টেনে এনে কুরআন-হাদীছের দলীল ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা বাতিল করে দিয়ে এ সত্যটিই সাব্যস্ত করেছেন। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

(১৪) অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسم الْخَالِقِ وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسم الْبَارِي

সৃষ্টি করার পর তার গুণবাচক নাম খালেক হয়নি এবং সৃষ্টিজগৎ উদ্ভাবন করার কারণে তার গুণবাচক নাম উদ্ভাবক হয়নি।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি অতীতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা থাকার বিষয়টি সমর্থন করেন না। সামনে আলোচনা করা হবে যে, ভবিষ্যতে তিনি সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সাব্যস্ত করেন। সেখানে তিনি বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্বেই সৃষ্ট করা হয়েছে। এ দু'টি কোনোদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং ক্ষয় প্রাপ্তও হবে না। এটিই অধিকাংশ আলেমের মত। যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা বলেছে অতীত ও ভবিষ্যতের কখনোই ধারাবাহিকতা সম্ভব নয়, তাদের কথা নিঃসন্দেহে বাতিল। জাহাম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা এ কথাই বলেছে। সে বলেছে, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কথা যেমন সম্পূর্ণ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দলীলগুলো সামনে আসছে, ইনশা-আল্লাহ।

আর অবিনশ্বর সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকার কথা স্বীকারকারীদের মধ্য থেকে যারা বলেছে যে, এমন সৃষ্টি থাকা সম্ভব, যার কোনো সূচনা নেই, তাদের কথা ঐসব লোকদের চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট ও সত্য, যারা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে। অর্থাৎ যারা বলেছে, অতীতে সৃষ্টির সূচনাহীন ধারাবাহিকতা থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু ভবিষ্যতে সম্ভব। এ মত ঠিক নয়; কারণ আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই জীবন্ত। আর জীবিত থাকার দাবিই হলো সব সময় সক্রিয় থাকা। সুতরাং তিনি সবসময় স্বীয় ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদনকারী। তিনি নিজেকে এ বিশেষণেই বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾

"আরশের মালিক, শ্রেষ্ঠ সম্মানিত এবং তিনি যা চান তাই করেন" *(সূরা বুরুজ: ১৫-১৬)*। উপরোক্ত আয়াত একাধিক বিষয়ের প্রমাণ করে,

(১) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেন।

(২) তিনি সর্বদা একই রকম। কেননা তিনি নিজের প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়েই উপরোক্ত কথা বলেছেন। সর্বদা সক্রিয় থাকাই তার পূর্ণতার প্রমাণ। কোনো সময়ই এ পূর্ণতা থেকে খালি থাকা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি সজাগ হবে না?" *(সূরা আন নাহাল: ১৭)*

সুতরাং সৃষ্টি করা কিংবা কাজ করা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতা ও বড়ত্বের বিশেষণ, তাই তার অবস্থা এমন নয় যে, প্রথমে তা ছিল না, পরে সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) আল্লাহ তা'আলা যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। فعال لما يريد এর মধ্যে ما শব্দটি সাধারণ মাওসুলা। অর্থাৎ এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা যা করার ইচ্ছা করেন, তা সবই করেন। তার কাজের সাথে সম্পৃক্ত ইচ্ছার ব্যাপারে এ কথা। তার যে ইচ্ছা বান্দার কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তার জন্য রয়েছে আরেক অবস্থা। বান্দা থেকে তিনি যে কাজ সম্পাদিত হওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু নিজের পক্ষ হতে বান্দাকে যদি উক্ত কাজ করতে সাহায্য না করেন এবং বান্দাকে কর্ম বাস্তবায়নকারী না বানান তাহলে সে কাজ সংঘটিত হয় না। যদিও তিনি শরী'আতগত দিক থেকে তার ইচ্ছা করেন। কিন্তু বান্দাকে কর্ম সম্পাদনকারী না বানানো পর্যন্ত সে কাজ সংঘটিত হয় না।

কাদারীয়া এবং জাবরীয়াদের নিকট এ মাস'আলাটি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট রয়েছে।[৮৫] তারা তাক্বদীরের মাস'আলায় আন্দাজ-অনুমান করে এলোমেলো কথা বলেছে। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ গাফেল। বান্দা করুক, আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছা করা এবং বান্দাকে কর্ম সম্পাদনকারী বানানোর ইচ্ছা করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাক্বদীরের মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। ইনশা-আল্লাহ।

(৪) আল্লাহর কর্ম এবং তার ইচ্ছা পরস্পর সংযুক্ত। অর্থাৎ উভয়ের একটি অন্যটিকে আবশ্যক করে। তিনি যা করার ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই করেন। আর যা তিনি করেছেন, তা করার ইচ্ছা অবশ্যই করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা মাখলুকের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা মাখলুক এমন ইচ্ছাও করে, যা সে বাস্তবায়ন করে না, কিংবা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখে না। সে সঙ্গে বান্দা এমন কাজও করে, যা সে করার ইচ্ছাই রাখে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এমন কোনো ক্রিয়া সম্পন্নকারী সত্তা নেই, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

---

৮৫. কাদারীয়াদের মতে বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে; তাতে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা বা দখল নেই। সে হিসাবে তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে দু'ভাগে তথা ইরাদায়ে কাওনীয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা) এবং ইরাদায়ে শারঈয়া (শরী'আতের আদেশগত ইচ্ছা) এ দু'ইভাগে বিভক্ত করাকে সমর্থন করে না। তারা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা শুধু সকল মানুষ থেকে ঈমান আনয়নেরই ইচ্ছা করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বান্দা ঈমানের পরিবর্তে যে কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত হয় বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে; আল্লাহ তা'আলা নন।

জাবরীয়াদের মাযহাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলে, বান্দা কিছুই করে না। ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে দিয়ে করিয়ে থাকেন। এমনকি বান্দার কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতাও নেই। উভয় দলের কথাই কুরআন, সুন্নাহ এবং বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

(৫) আল্লাহ তা'আলার কর্ম যেহেতু বিভিন্ন, তাই কর্ম অনুযায়ী তার ইচ্ছাও একাধিক ও বিভিন্ন। তার প্রত্যেক কাজের জন্যই খাস ইচ্ছা রয়েছে। সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত স্বভাব দ্বারাই এ অর্থ বোধগম্য। আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা হলো, তিনি সবসময়ই ইচ্ছা করেন এবং যা ইচ্ছা তাই করেন।

(৬) আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে যা কিছুই সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ, তা সৃষ্টি করা ও সংঘটিত করা তার জন্য জায়েয। সুতরাং তিনি যখন প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসার ইচ্ছা করেন, তখন তথায় নেমে আসেন। কিয়ামতের দিন যখন বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য কিয়ামতের আঙ্গিনায় নেমে আসার ইচ্ছা করবেন, সৃষ্টিকে দেখানোর জন্য স্বীয় সত্তাকে প্রকাশ করবেন, যেভাবে ইচ্ছা তাদের সামনে পর্দা উন্মুক্ত করবেন, তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলবেন, হাসবেন এবং ইত্যাদি আরো যেসব বিষয়ের ইচ্ছা করবেন, তা সংঘটিত করা তার জন্য অসম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। আল্লাহ তা'আলা যা করার ইচ্ছা করেন অর্থাৎ তার জন্য যা সাব্যস্ত করা হবে কিংবা তাকে যা থেকে পবিত্র করা হবে, তা কেবল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য খবরের উপরই নির্ভর করেই করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তার ছ্বিফাত সম্পর্কে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন, তা সত্যায়ন করা জরুরী।

এমনি আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা লাওহে মাহফুয থেকে মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা তথায় বহাল রাখেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন।

যদি বলা হয় যে, সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট একটি সূচনার সময় রয়েছে, তাহলে এ কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, সে সময়ের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি থেকে অকেজো ও বেকার ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)[৮৬]

সে সঙ্গে আরো আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ক্রিয়াশীল ছিলেন না, অতঃপর ক্রিয়াশীল হয়েছেন। এতে করে সৃষ্টিজগতের জন্য অনাদি ও প্রারম্ভহীনতা আবশ্যক হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া বাকিসব বস্তুই সৃষ্টি। এগুলো অতীতের যে কোনো সময় সৃষ্টি

---

৮৬. এটি বিদ'আতীদের আকলী দলীল। শাইখ এখানে সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার যেমন শুরু ও সূচনা নেই তেমনি তার এমন সৃষ্টিও রয়েছে, যার কোনো সূচনা নেই। কেননা তিনি তার কর্মসহ অনাদি-অনন্ত। সুতরাং তার যেমন শুরু নেই, তেমনি তার কাজের বা সৃষ্টিরও শুরু নেই। অর্থাৎ এ কথা বলা যাবে না যে আল্লাহ এক সময় বেকার ছিলেন। পরে কাজ শুরু করেছেন। আরেকটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলতে হয় যে, তার সৃষ্টি করা বিশেষণ ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখা তার মতই চিরবিদ্যমান এবং তার পবিত্র সত্তার সাথে সাথেই অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান। তার কোনো সূচনা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলারও কোনো শুরু ও সূচনা নেই। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান ও অস্তিত্বশীল এ সৃষ্টিগুলোর অবশ্যই একটি সূচনা রয়েছে। এগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। এগুলোর প্রত্যেকটিকে তিনি একই সময় সৃষ্টি করেননি। কুরআন-হাদীছ দ্বারা এ সত্যটি সুসাব্যস্ত। একেকটি একেক সময় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর আরশ ও কলম প্রথম দিকের সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে এগুলোই যে প্রথম সৃষ্টি তা বলা কঠিন।

শাইখের কথাকে উপরোক্তভাবে ব্যাখ্যা না করলে আল্লাহর সাথে সাথে অনাদি ও সূচনাহীন একাধিক অস্তিত্বশীল বস্তু সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ কুরআন, হাদীছ, প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা একাধিক অনাদি সত্তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

হওয়া সম্ভব ছিল। আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেছেন বলেই অস্তিত্বে এসেছে। এগুলো মূলত অস্তিত্বহীন ছিল। আল্লাহ ছাড়া যত বস্তু রয়েছে, দারিদ্র ও মুখাপেক্ষীতা তার প্রত্যেকটির মৌলিক বিশেষণ। আল্লাহ তা'আলা নিজে নিজেই অস্তীত্বশীল এবং সত্তাগত দিক থেকে অমুখাপেক্ষী। অমুখাপেক্ষীতা তার সত্তাগত বিশেষণ।

এ সৃষ্টিজগৎ কোনো পদার্থ ও ধাতু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে কি না, এ সম্পর্কে লোকদের দু'টি মত রয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টি কোনটি সে সম্পর্কেও তারা মতভেদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

"তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যখন এর আগে তার আরশ পানির উপর ছিল"। *(সূরা হুদ: ৭)*

ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমামগণ ইমরান হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, ইয়ামানের অধিবাসী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো,

جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ:«كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِهِ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ؛ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ"، وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

"দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য এবং সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আমরা আপনার কাছে এসেছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, তার পূর্বে কিছুই ছিল না"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ "তার সাথে কিছুই ছিল না"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ তখন তার আরশ পানির উপর ছিল। তিনি যিকিরের মধ্যে সবকিছু লিখে দিয়েছেন এবং আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ "অতঃপর তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন"।[৮৭] এখানে যিকির বলতে লাওহে মাহফুয উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

"আর যাবুরে আমি উপদেশের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা"। *(সূরা আম্বীয়া: ১০৫)*

৮৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪১৮।

যিকিরের (লাওহে মাহফুযের) মধ্যে যা লেখা হয়, তাকে যিকির বলা হয় যেমন কিতাবের মধ্যে লিখিত বিষয়কে কিতাব বলে নামকরণ করা হয়।

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে লোকদের দু'টি মত রয়েছে। **প্রথম মত** তাদের কেউ কেউ বলেন, এ হাদীছের মধ্যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, এ খবর দেয়া যে, অনাদিতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্বদা ছিলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত সৃষ্টির সূচনা করেছেন। সুতরাং বিভিন্ন সত্তা ও প্রকৃতির সৃষ্টি এবং অস্তিত্বশীল বস্তুগুলো প্রথমে ছিল না, পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। কাল ও যুগ সৃষ্টি করা হয়েছে, তবে কোনো কালের মধ্যে তা সৃষ্টি করেননি। কারণ তখন কালের অস্তিত্বই ছিল না। সৃষ্টির সূচনা করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করতেন না। অথচ তিনি সবসময় সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। সৃষ্টি করা সবসময় তার জন্য সম্ভব ছিল।

দ্বিতীয় মত হলো, এখানে হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের সূচনা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, যা তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। কুরআনের একাধিক স্থানে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে। ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তার আরশ ছিল পানির উপরে"।[৮৮]

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমানসমূহ সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই ছয়দিনে এ সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তখনও তার আরশ পানির উপরই ছিল।

একাধিক কারণে এ দ্বিতীয় প্রকার মতটির সত্যতা প্রমাণিত।

(১) ইয়ামানবাসীদের কথা, جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ "সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আমরা আপনার কাছে এসেছি"। এখানে هذا اسم إشارة -এর মাধ্যমে অস্তিত্বশীল দৃশ্যমান এ বর্তমান সৃষ্টিজগতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। الأمر শব্দটি এখানে المأمور অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার আদেশের মাধ্যমে যে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কেই ছিল ইয়ামানবাসীর প্রশ্ন। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্তিত্বশীল এ সৃষ্টিজগতের সূচনা সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। সর্বপ্রথম সৃষ্টিকৃত মাখলুক বা

৮৮. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহ বুখারী ৩১৯১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৮১৩।

সৃষ্টির জাতি-প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেয়া হয়নি। কেননা তারা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আসমান-যমীন সৃষ্টি সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন তার আরশ পানির উপরই ছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আরশ সৃষ্টি সম্পর্কে খবর দেননি। আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, তার পূর্বে কিছুই ছিল না"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ "তার সাথে কিছুই ছিল না"। অন্য বর্ণনায় রয়েছে وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غيره "তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না"। একই মজলিসে এবং একই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছে বিভিন্ন শব্দে এসেছে। এতে বুঝা গেল, তিনি মাত্র একটি শব্দ বলেছেন। আর বাকী শব্দ দু'টি দ্বারা একই অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। قبل শব্দটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীছ ছাড়াও অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলতেন,

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»

"হে আল্লাহ! তুমি أَوَّل (সর্বপ্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমি آخِر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি ظَاهِر (সকল সৃষ্টির উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমি بَاطِن (মাখলুকের অতি নিকটে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই"।[৮৯]

---

৮৯ . ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১৩, অধ্যায়: কিতাবুয্ যিক্র ওয়াদ্ দু'আ। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাদের অতি নিকটে। মূলত আল্লাহ তাআলার উপরে হওয়া মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়াকে আল্লাহর ইলম ও ক্ষমতা তাদের নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলেও মূলত আল্লাহর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহর ছ্বিফাত ও কর্মকে মাখলুকের ছ্বিফাত ও কর্ম দ্বারা বুঝা অসম্ভব। কোন সৃষ্টির জন্য একই সময় ছাদের উপরে ও ছাদের নীচে সশরীরে থাকা এবং একই সময় সিংহাসনের উপরে থাকা ও সিংহাসনের নীচে থাকা অসম্ভব। কোন রাজা (মানুষ) যখন তার সিংহাসন ছেড়ে বাইরে যায়, তখন তার সিংহাসন খালি হয়ে থাকে। কারণ তার জন্য একই সময় ও একই সাথে সিংহাসনে থাকা এবং দেশের বাইরে থাকার ধারণা অকল্পনীয়। কিন্তু সুমহান ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার জন্য একই সময় ও একই সাথে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া এবং রাতের শেষাংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা অসম্ভব কিছু নয়। মাখলুকের নিকটবর্তী হলে আরশ খালি হওয়া

উপরের হাদীছে অর্থাৎ ইয়ামানবাসীদের হাদীছে বর্ণিত, معه এবং غيره শব্দ দু'টির কোনো একটি শব্দও অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এ জন্যই অনেক মুহাদ্দিছ শুধু قبل শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করে থাকেন। যেমন ইমাম হুমাইদী, বগবী এবং ইবনুল আছীর এ রকম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি যখন ঠিক এ রকম, তাই জানা গেল যে ইয়ামান বাসীদের হাদীছে সকল সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। এমনকি সর্বপ্রথম সৃষ্টি কোন্‌টি সে ব্যাপারেও কোনো কথা আসেনি। আরো বলা যেতে পারে যে,

«كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ أَوْمَعَهُ أَوْغَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ»

"আল্লাহ ছিলেন, তার পূর্বে আর কিছুই ছিল না অথবা তার সাথে আর কেউ ছিল না অথবা তিনি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তার আরশ ছিল তখন পানির উপর। তিনি লাওহে মাহফুযের মধ্যে সবকিছু লিখে রেখেছেন"। এখানে واو -এর মাধ্যমে আতফ (যুক্ত) করে এ তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

ইয়ামান বাসীদের হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» "অতঃপর তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন"। এখানে خلق শব্দের পূর্বে হরফে আতফ واو এবং ثم উভয়টি এসেছে। এ থেকে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে, ইয়ামান বাসীদেরকে শুধু আসমান-যমীন এবং তার মধ্যকার সৃষ্টিগুলোর সূচনা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়াই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল। আর এগুলোই হলো ছয়দিনে সৃষ্ট মাখলুকসমূহ। এগুলোর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদও দেননি। আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনকে এমন শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ

জরুরী নয়। যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করেছে, তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা দ্বারা আল্লাহর বিশাল ছিফাত ও ক্ষমতাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে বলেই বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করেছে।

৮৯. এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এ যে, কুরআন মাজীদে জান্নাত ও জাহান্নাম বাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা কি 'আল্লাহ তাআলাই সর্বশেষ' এ কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয় এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে আর সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। আখিরাতে আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে জান্নাত বা দোযখে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে- এমনটি নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকবে। পরিশেষে ফেরেশতারাও ধ্বংস হবে।

কিন্তু জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহে এবং জাহান্নামী কাফেররা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকার বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে যেসব জিনিস ছিল, সেগুলোকে এমন শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, ঐগুলোও সৃষ্টি হয়েছে এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে যেসব বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সূচনা কখন হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

ইয়ামান বাসীদের হাদীছ যেহেতু একাধিক শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তাই বিনা দলীলে জোর দিয়ে বলা যাবে না যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে কোন্ শব্দটি বলেছেন? যে ব্যক্তি জোর দিয়ে বলবে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, অর্থাৎ আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহর কোনো ক্রিয়া বা সৃষ্টি ছিল না, - ইয়ামানবাসীদের জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, তারা নিশ্চিত ভুলের মধ্যেই রয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্য় এমন কোনো দলীল নেই, যা এ কথাকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং এ কথা এমনভাবে সাব্যস্ত করা যাবে না, যাতে ধারণা হয় যে, এটিই হাদীছের অর্থ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

«كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ» "আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, তার সাথে অন্য কিছুই ছিল না" এটি কোনো একক বর্ণনা নয়। বরং তা পূর্বোল্লেখিত বর্ণনার সাথেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এমন কোনো ধারণা করার সুযোগ নেই যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময় পর্যন্ত কাজশূণ্য ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ,

«كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ أَوْمَعَهُ أَوْغَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ»

"আল্লাহ ছিলেন, তার পূর্বে আর কিছুই ছিল না অথবা তার সাথে আর কেউ ছিল না অথবা তিনি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তার আরশ ছিল তখন পানির উপর। তিনি লাওহে মাহফুযের মধ্যে সবকিছু লিখে রেখেছেন", এ হাদীছের অর্থ এটি হওয়া ঠিক নয় যে, আল্লাহ তা'আলা একাই ছিলেন এবং তার সাথে কোনো মাখলুকই ছিল না। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,

«وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» "তার আরশ ছিল তখন পানির উপর" এ কথা উপরোক্ত ধারণাকে বাতিল সাব্যস্ত করে। কেননা এ বাক্যটি অর্থাৎ «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» অবস্থা জ্ঞাপক বাক্য অথবা জুমলায়ে পূর্বোক্ত বাক্যের সাথে যুক্ত বাক্য। উভয় অবস্থাতেই অর্থ হলো আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আরশ ছিল। সুতরাং জানা গেল যে, হাদীছের উদ্দেশ্য হলো আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে বর্তমানের এ দৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের কিছুই ছিল না।[৯০]

---

৯০. উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ হলো, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের পূর্বে আর কোনো জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহর অস্তিত্ব শুরু ও সূচনাহীন অস্তিত্ব। তার অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই, তার শেষও নেই। বাকীসব সৃষ্টির সূচনা ও শুরু রয়েছে। তার পরিসমাপ্তিও রয়েছে। আল্লাহর দ্বারা সকল

(১৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقَ

আল্লাহ তা'আলা তখনো প্রতিপালন করার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যখন কোনো প্রতিপালিত সৃষ্টি ছিল না। তিনি তখনো সৃষ্টি করার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যখন কোনো সৃষ্ট ছিল না।

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রব বা প্রতিপালক হিসাবে বিশেষিত। যাদেরকে তিনি প্রতিপালন করেন, তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তিনি এ বিশেষণে বিশেষিত। সে সঙ্গে মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তিনি স্রষ্টা এবং অনাদি থেকেই তিনি সৃষ্টি করার বিশেষণে বিশেষিত।

আকীদায়ে ত্বহাবীয়ার কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) الخالقية না বলে لَـهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّـةِ وَمَعْنَى الْخَـالِقِ বলেছেন। কারণ الخـالق অর্থ হলো ঐ সত্তা, যিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে কেবল কোনো জিনিসকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন। الخالق শব্দ দ্বারা এ ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না।

সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, তাও আল্লাহর দ্বারাই সৃষ্টি হবে এবং দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আখিরাত দিবসের পর যা টিকে থাকবে, তাও আল্লাহ তাআলা টিকিয়ে রাখবেন বলেই উহা টিকে থাকবে। কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখারও কেউ নেই। সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতি এবং বিবেক-বুদ্ধির দলীলের নিকট এটিই সুস্পষ্ট। ইয়ামানবাসীদের উপরোক্ত হাদীছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি কোন্‌টি এ সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি; বরং এখানে শুধু এটি সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পূর্বে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তার সাথে সাথে এমন অনাদি সৃষ্টি থাকা কিংবা এমন সৃষ্টি থাকা, যার কোনো শুরু নেই, -এ কথাকে নাকচ করা হয়নি। কারণ সৃষ্টি করা, ক্রিয়াশীল থাকা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ছিফাতই কামেল বা পরিপূর্ণ। তাতে কোনো ত্রুটি ও দোষ নেই। সুতরাং সৃষ্টি করা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পূর্ণগুণের অন্তর্ভুক্ত, তাই অতীতের, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবসময়ই এ সিফাতের প্রভাব জারি থাকাই তার পূর্ণতার প্রমাণ। অতীতের কোনো সময় কাজ ও ক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকার ধারণা তার কামালিয়াতের মধ্যে ত্রুটি থাকার ধারণা করারই নামান্তর। যেমনটি ধারণা করে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের বিদ'আতীরা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেমন কাদীম বা অনাদি, তার সমস্ত ছিফাতও তেমন অনাদি ও কাদীম। তার সৃষ্টি করা ও সৃষ্টি করতে থাকা ছিফাতটিও কাদীম এবং অনাদি। সে হিসাবে আল্লাহর সৃষ্টি করা সিফাতের প্রভাব হিসাবে তার সাথে সাথে কাদীম ও সূচনাহীন সৃষ্টি থাকার বিশ্বাস করা তাওহীদের খেলাফ নয়। কারণ সব সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাওহীদের পরিপন্থি হবে কেবল তখনই, যখন বিশ্বাস করা হবে, আল্লাহর পূর্বে অন্য কেউ ছিল কিংবা আল্লাহর সাথে সাথে এমন অনাদি ও কাদীম সৃষ্টি রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার দ্বারা সৃষ্টি হয়নি কিংবা উহা আল্লাহর সৃষ্টি করা সিফাতের প্রভাব নয়; বরং স্বতন্ত্রভাবেই উহা অস্তিত্ব লাভ করেছে। (আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

কিন্তু রব শব্দটি বহু অর্থ প্রকাশ করে। যেমন রাজত্ব পরিচালনা করা, হেফাযত করা এবং তদবীর করা ইত্যাদি। الرب বা التربيـة শব্দের অর্থ হলো কোনো জিনিসকে ধীরে ধীরে প্রতিপালন ও পরিচর্যা করে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া।

সুতরাং ইমাম ত্বহাবী এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা উপরোক্ত সবগুলো অর্থই বুঝায়। আর তা হলো الربوبيـة। ভাষ্যকারের কথা এখানেই শেষ। তবে এ কথার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কেননা الخلق শব্দটিও তাক্বদীর তথা নির্ধারণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১৬) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ

মৃতদেরকে জীবন দান করার পর যেমন তিনি জীবনদানকারী নাম ও বিশেষণে বিশেষিত ঠিক তেমনি তাদেরকে জীবনদান করার পূর্বেও তিনি এ নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপ তিনি সৃষ্টিকুলের সৃজনের পূর্বেই স্রষ্টা নাম ও গুণের অধিকারী ছিলেন।[৯১]

---

৯১. এসব গুণ অনাদিকাল হতে আল্লাহর সত্তার সাথে সংযুক্ত আছে। স্রষ্টার এসব গুণ মাখলুক সৃষ্টি করার কারণে অর্জিত হয়নি।

আল্লাহ তা'আলার এসব গুণবাচক নাম, সিফাতে কামালিয়া ও কর্মসমূহ যদি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার সাথে সম্পৃক্ত হতো অর্থাৎ মাখলুকের সাথে আল্লাহর কর্মের সম্পর্ক হওয়ার কারণে যদি এ সকল গুণবাচক নাম অর্জিত হতো, তাহলে এসব গুণবাচক নাম সৃষ্টিজগৎ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত হতো না।

অনুরূপভাবে এ সকল গুণবাচক নাম অনাদি-অনন্ত অস্তিত্বশীল এবং সমস্ত সিফাতে কামালিয়ার সমষ্টিগত নাম আল্লাহ শব্দের সাথে মাযী মুতলাক তথা সাধারণ অতীতের শব্দের সাথে উল্লেখ করা হতো না। অতএব কুরআনে এ অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, অস্তিত্বশীল আল্লাহ তা'আলার এ সব সিফাতে কামালিয়া অনাদিকাল থেকে ছিল এবং অনন্তকাল থাকবে। এগুলো তার কোনো কর্ম সংঘটনের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং কর্ম সম্পাদনের পূর্বে যেমন ছিল, পরেও তেমনি আছে এবং থাকবে।

আবার দেখা যায় কুরআনে আল্লাহ তা'আলার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে, যেগুলো তার সত্তার সাথে কোনো কালের সাথে সংযুক্ত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলোতে বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এভাবে বিশেষিত যে, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করার পূর্বেই জীবিতকারী। ঠিক একইভাবে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে তাকে খালেক (স্রষ্টা) বিশেষণে বিশেষিত করা হবে।

মুতাযেলাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) একথা বলেছেন। যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।[৯২] ইতিপূর্বে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অনাদি থেকেই যা ইচ্ছা তাই করেন।

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত), তিনি رَحْمَنُ (পরম করুনাময়) এবং رَحِيمُ (অসীম দয়ালু)। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَلَام (পরিপূর্ণ শান্তিদাতা) مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষক), عَزِيز (পরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী) এবং مُتَكَبِّر (মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তার জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (পরাক্রমশালী) ও حَكِيم (প্রজ্ঞাবান)"।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতী নামগুলো কোনো কালের সাথে সীমাবদ্ধ না হওয়াতে এ কথা বুঝায় যে, তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতে অনাদিকাল সৃষ্টিকর্তা, রূপদানকারী ও নব উদ্ভাবক ছিলেন এবং মাখলুক সৃষ্টির পরেও অনন্তকাল তিনি এসব গুণে গুণান্বিত থাকবেন। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার ছিফাতী নামগুলো তার সত্তার উপর প্রয়োগ হতো কোনো কালের সাথে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তাআলা সিফাতে কামালিয়াসহ অনাদিকাল থেকে বিশেষিত ছিলেন এবং অনন্তকাল থাকবেন।

যেমন কোনো ব্যক্তির লিখার যোগ্যতা রয়েছে, তখন তাকে লেখক বলে সম্বোধন করা হয়। আর যখন কোনো কিছু না লিখে তখনো তাকে পূর্বের লেখনের কারণে লেখক বলে সম্বোধন করা হয়। উক্ত ব্যক্তিকে লেখক বলা হয়, তার লিখার যোগ্যতা থাকার কারণে। তার লিখা নামক ক্রিয়ার কারণে নয়। চাই সে বর্তমানে লেখুক বা না লেখুক। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

৯২. তারা বলে থাকে সৃষ্টি করার পর তিনি নিজের জন্য এ নাম ধারণ করেছেন। এর আগে তার এ নাম ছিল না। আল্লাহর অন্যান্য নাম ও গুণের ক্ষেত্রেও তারা এমন কথা বলে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথা হলো, আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর কোনো কিছুই নতুন নয়।

(১৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ إليه يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

এটা এ জন্য যে, তিনি সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেক সৃষ্টিই তার মুখাপেক্ষী এবং সব কিছুই তার জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর প্রতিই মুখাপেক্ষী নন। তার মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে অনাদি থেকেই আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সাব্যস্ত। এখানে كل (প্রত্যেক) শব্দের মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা দ্বারা কতটুকু ব্যাপকতা উদ্দেশ্য, তা শব্দটির প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারাই নির্ধারিত হবে। আল্লাহর কালাম (কথা বলা বিশেষণ) সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে, -ইনশা-আল্লাহ।

{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة الْبَقَرَة: ٢٨٤] "আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান" *(সূরা আল-বাকারা:২৮৪)।*

মুতাযেলারা এ আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করেছে। তারা বলেছে, আল্লাহ কেবল ঐসব বিষয়েই ক্ষমতাবান, যা তার ক্ষমতাধীন। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাজগুলো সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নন। (নাউযুবিল্লাহ)

অতঃপর তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে যে, বান্দাদের কাজের অনুরূপ কাজ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম কি না? আয়াতের অর্থ যদি তাদের কথার অনুরূপ হতো, তাহলে তাদের কথাটি এ কথার সমপর্যায়ের হতো, وهو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه তিনি যা জানেন, তার সবকিছু সম্পর্কে তিনি জ্ঞানী এবং তিনি যা সৃষ্টি করেন, তার সবকিছুরই তিনি স্রষ্টা"। অনুরূপ আরো অনেক বাক্য রয়েছে, যাতে কোনো উপকার নেই। সুতরাং তারা প্রত্যেক বিষয়ের উপর থেকে আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা থাকার বিষয়কে অস্বীকার করেছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান। সম্ভাব্য প্রত্যেক বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। একই জিনিস একই সময় ও অবস্থাতে অস্তিত্বশীল হওয়া বা অস্তিত্বহীন হওয়াই কেবল অসম্ভব। এ রকম জিনিসের কোনো হাকীকত নেই। এ জাতীয় জিনিসের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। বিবেকবান ও বুদ্ধিমানদের ঐকমত্যে একে কোনো জিনিস বা বস্তু হিসাবে নাম দেয়া যায় না।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাজের অনুরূপ কাজ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম কি না, এ প্রশ্নের অনুরূপ বাতিল প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার মত আরেকটি সত্তা সৃষ্টি করতে সক্ষম কি না? তিনি তার নফস্‌কে ধ্বংস করতে সক্ষম কি না? অনুরূপ এমন আরো প্রশ্ন, যার কোনো জবাব নেই। প্রশ্নগুলো যেহেতু মূলতই বাতিল, তাই তার জবাব পাওয়া আবশ্যক নয়।

আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ও সার্বভৌম রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে এটিই হলো মূলনীতি। যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি এ বিশ্বাস করবে না যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসাবে বিশ্বাস করেছে বলে গণ্য হবে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াতের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

অতঃপর বিদ'আতীরা অস্তিত্বহীন সম্ভাব্য বস্তু সম্পর্কে মতভেদ করেছে। এ রকম বস্তুকে কোনো জিনিস হিসাবে নাম দেয়া যাবে কিনা? আসল কথা হলো, অস্তিত্বহীন বস্তুর কল্পনা শুধু মাথার মধ্যেই জাগ্রত হয়। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৯৩]

কিন্তু যা সৃষ্টি হওয়ার তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা অবগত থাকেন এবং লিখে রাখেন। সে সঙ্গে তা আগেই বর্ণনা করেন এবং লিখে রাখেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

"হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার"। *(সূরা হাজ্জ: ১)*

কিয়ামত যেহেতু এখনো সংঘটিত হয়নি, তাই এর প্রকম্পন আল্লাহর ইলমে এবং লাওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। বাস্তবে এখনো তা অস্তিত্বে আসেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

৯৩. মানুষের মস্তিষ্ক দশ হাত এবং একাধিক মাথা বিশিষ্ট সৃষ্টির কল্পনা করতে পারে। এমন সৃষ্টির ছবিও মানুষ একেঁ থাকে, যার দেহ ঘোড়ার মত, চেহারা সুন্দরী মহিলার চেহারার মত এবং তার রয়েছে পাখির মত পাখা। সাগরে হুবহু মানুষ আছে বলেও কল্পনা করা হয়। একে আরবদের রূপকথায় আরুসুল বাহার বা সাগরের বউ বলা হয়। এগুলো মন ও মাথার কল্পনা মাত্র। বাস্তবে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষ অসম্ভব কল্পনা করতে পারে, তাই বলে বাস্তবে সে রকম কিছু থাকা অসম্ভব। তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে কামেলা সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, তার জন্য উপরোক্ত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের বস্তু সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়; বরং সবকিছুই তার জন্য সম্ভব। এবার আল্লাহর সিফাতের প্রশ্নে আসি। আল্লাহর অন্যতম ছিফাত হাতের কথা বলা হলেই মানুষের মাথায় তাশবীহ বা সৃষ্টির হাতের সদৃশ কল্পনা জাগতে পারে। এ পরিমাণ ধারণা জাগ্রত হওয়া জরুরী। কিন্তু বাস্তবে স্রষ্টার হাতের সাথে সৃষ্টির হাতের কোনো মিল নেই, আল্লাহর হাত বান্দার হাতের সদৃশও নয়। আল্লাহ তা'আলার বাকী ছিফাতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير "আল্লাহর সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে এ বলে আদেশ করেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। *(সূরা ইয়াসীন: ৮২)*

আল্লাহ তা'আলা যাকারীয়া আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

"এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না"। *(সূরা মারইয়াম: ৯)* অর্থাৎ তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বে তুমি কেবল আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যেই ছিলে। বাস্তবে তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা সূরা দাহারের প্রথম আয়াতে বলেন,

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

"মানুষের উপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?"।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ১১ নং আয়াতে বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই" এ অংশ দ্বারা ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের মতই মনে করে। আর "তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" এ অংশ দ্বারা ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার ও বাতিল করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ছিফাতে কামালিয়ার মাধ্যমে বিশেষিত। তার ছিফাতের কোনো সদৃশ নেই।

সৃষ্টি যদিও এভাবে বিশেষিত যে, সে শ্রবণকারী এবং দ্রষ্টা, কিন্তু তার শ্রবণ ও দৃষ্টি রবের শ্রবণ ও দৃষ্টির মত নয়। স্রষ্টার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করাতে কোনো তাশবীহ বা সাদৃশ্য আবশ্যক হয় না। কেননা সৃষ্টির ছিফাত সৃষ্টির জন্যই শোভনীয় এবং স্রষ্টার ছিফাত তার জন্যই শোভনীয়।

হে মুসলিম! আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, তা তুমি অস্বীকার করো না। সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন

তার প্রভু সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। তিনি তার প্রভুকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, তুমি তাও অস্বীকার করো না। কেননা আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করা আবশ্যক এবং যা তার জন্য অশোভনীয়, সে সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী, উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্টভাষী এবং সত্য বর্ণনায় সর্বাধিক সক্ষম। তুমি যদি স্রষ্টার কোনো ছিফাতকে অস্বীকার করো, তাহলে তুমি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা দ্বারা যখন তুমি তাকে গুণান্বিত করবে, তখন তুমি স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করেছো বলে বিবেচিত হবে না। কেননা তার মত আর কিছুই নেই। তুমি যদি তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করো, তাহলে তুমি কাফের বলে গণ্য হবে।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ নুআইম বিন হাম্মাদ আল-আনসারী বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সমতুল্য মনে করলো, সে কুফরী করলো। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো ছিফাতকে অস্বীকার করলো, সেও কুফরী করলো।

তবে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রসূল তাকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই। শাইখের উক্তি, من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه "যে ব্যক্তি রবের প্রতি সম্বোধিত গুণাবলীকে অস্বীকার এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্য করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে", এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য সর্বোত্তম গুণাবলী ও দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই তো খারাপ গুণের অধিকারী। আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার উপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী"। *(সূরা আন নাহাল: ৬০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তাকে পুনরুত্থিত করবেন এবং এটি তার জন্য সহজতর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণাবলী তারই। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী"। *(সূরা আর রূম: ২৭)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে তার দুশমন মুশরিক এবং তাদের মূর্তিদের জন্য দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন নিকৃষ্ট স্বভাব-প্রকৃতি সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে পূর্ণতার কোনো গুণ নেই বলে উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম গুণাবলী কেবল তার জন্যই। এ সর্বোত্তম গুণাবলী একমাত্র তার জন্যই পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণতার একটি গুণ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে ছিনিয়ে নিল, সে তার জন্য নিকৃষ্ট গুণ সাব্যস্ত করলো এবং আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যেসব সর্বোত্তম গুণ সাব্যস্ত করেছেন, তাকে অস্বীকার করলো।

আল্লাহ তা'আলার জন্য পূর্ণতার সর্বোচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত। এ কামালিয়াতের দাবি হলো, প্রকৃতভাবেই তা তার জন্য সাব্যস্ত এবং তার অর্থগুলোও তার সাথে প্রতিষ্ঠিত ও সুসাব্যস্ত। এ কামালিয়াতের ছিফাতগুলো দ্বারা বিশেষিত সত্তার মধ্যে যত বেশী এবং যত পূর্ণ আকারে বিদ্যমান থাকবে, তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা অন্যদের তুলনায় অধিক পূর্ণ ও অধিক মহান হিসাবে গণ্য হবেন।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাত যেহেতু সীমাহীন ও পূর্ণতম, তাই তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম উদাহরণ। অন্যরা ব্যতীত তিনিই এগুলোর জন্য অধিক হকদার। শুধু তাই নয়; পূর্ণতম ও সর্বোচ্চ ছিফাত ও উদাহরণ একই সাথে একাধিক সত্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকা অসম্ভব। কেননা দু'জন যদি সকল দিক বিবেচনায় সমান গুণাবলী সম্পন্ন হয়, তাহলে তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে না। আর দু'জন যদি পরস্পর সমান না হয়, তাহলে সর্বোচ্চ গুণাবলী ও উদাহরণ দ্বারা বিশেষিত কেবল একজনই হয়। সুতরাং যার জন্য সর্বোচ্চ বিশেষণ ও উদাহরণ সাব্যস্ত, তার কোনো সদৃশ বা সমকক্ষ থাকতে পারে না।

المثل الأعلى বা 'সর্বোচ্চ গুণাবলী ও সর্বোত্তম উদাহরণ, -এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দিয়েছেন, সে কেবল আলেমদের এ কথাগুলোর মাঝে সমন্বয় করা এবং তা বুঝার তাওফীক পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাত, তা সম্পর্কে সৃষ্টিসমূহের পরিচয়, তার ইলমের অস্তিত্ব, তার খবরাদি এবং ছিফাতগুলোর যিকির উদ্দেশ্য। সে সঙ্গে ইবাদতকারী ও যিকিরকারী বান্দাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের যে ইলম ও পরিচয় রয়েছে, তার মাধ্যমে তার ইবাদত করাও উদ্দেশ্য। এখানে চারটি বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক।

(১) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত হয়। বান্দারা তা সম্পর্কে অবগত থাকুক বা না থাকুক। যারা المثل الأعلى -এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর ছিফাতের মাধ্যমে, এটিই তাদের কথা।

(২) সর্বোত্তম উদাহরণ বলতে বান্দাদের ইলম ও অনুভূতির মধ্যে ছিফাতগুলোর ইলম বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের অনেকেই এ কথা বলেছেন। ইবাদতকারীদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যে পরিচয়, যিকির, ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা,

আল্লাহর ভয়, তার রহমতের আশা, তার উপর ভরসা এবং তার দিকে ফিরে যাওয়ার গভীর বিশ্বাস রয়েছে, এর দ্বারা তাই উদ্দেশ্য। বান্দাদের অন্তরে উপরোক্ত যে বিষয়গুলো রয়েছে, তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ শরীক নয়। বরং বান্দাদের মধ্যে এগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই খাসভাবে রয়েছে। যেমন খাসভাবেই রয়েছে তার জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ। المثل الأعلى -এর এ ব্যাখ্যা করেছেন ঐসব মুফাস্সির, যারা বলেছেন, আল্লাহর জন্যই রয়েছে সর্বোত্তম গুণাবলী ও দৃষ্টান্ত, এর অর্থ হলো, আসমানবাসীগণ আল্লাহকে মর্যাদা দেয়, তাকে ভালোবাসে এবং তার ইবাদত করে। যমীনবাসীরাও তাই করে। যদিও লোকেরা আল্লাহর সাথে শির্কও করে থাকে, তার নাফরমানী করে এবং তার ছিফাতগুলোকে অস্বীকারও করে। সুতরাং যমীনবাসীরা আল্লাহর মর্যাদা দেয়, তার বড়ত্ব বর্ণনা করে, তার বড়ত্বের সম্মুখে অবনত হয় এবং তার শক্তি ও প্রতিপত্তির সামনে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছুই আছে সবই তার। সবাই তার হুকুমের তাবেদার"। *(সূরা আর রূম: ২৬)*

(৩) এর দ্বারা আল্লাহর ছিফাতসমূহের আলোচনা, সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া এবং তার ছিফাতগুলোকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করা ও তার জন্য সাদৃশ্য বর্ণনা করা থেকে দূরে থাকা উদ্দেশ্য।

(৪) আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, তার তাওহীদ, তার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া, তার উপর ভরসা করা এবং তার দিকে ফিরে যাওয়া উদ্দেশ্য। আল্লাহর ছিফাতসমূহের প্রতি বান্দার বিশ্বাস যতই গভীর ও পরিপূর্ণ হবে, তার প্রতি বান্দার ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতা ততো বেশি শক্তিশালী হবে।

সুতরাং وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ "আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম গুণাবলী ও উদাহরণ, এ কথার ব্যাখ্যায় আলেমদের থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে উপরোক্ত চারটি কথাই মূল।

সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ "সর্বোচ্চ গুণাবলী ও উদাহরণ তারই" *(সূরা রূম:২৭)* এবং আল্লাহর বাণী: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'তার মতো আর কিছুই নেই *(সূরা শূরা: ১১)*, এর মধ্যে পারস্পরিক অসংগতি আছে বলে মনে করে?

সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "তার মত আর কিছুই নেই", -এ আয়াতকে তার ছিফাত নাকচ করার দলীল হিসাবে পেশ করে এবং আয়াতের শেষাংশ, وَهُوَ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আশ-শূরা: ১১)*। পাঠ করা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখে।

আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে কারো কারো গোমরাহী এ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, যার কারণে সে খলীফা মামুনকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, কা'বার গেলাফে যেন সূরা আশ-শূরার ১১ নং আয়াত ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" পরিবর্তন করে এভাবে লেখা হয়, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান"।

আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি ছিফাতকে অস্বীকার করার জন্য কাযী আহমাদ বিন দুয়াদ খলীফা মামুনকে এ পরামর্শ দিয়েছিল।[৯৪]

আরেক গোমরাহ জাহাম বিন সাফওয়ান বলেছে, আমার ইচ্ছা ছিল কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী: ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ "অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন" *(সূরা আল-আরাফ:৫৪)* এ আয়াতটি হাতের নোখ দিয়ে ঘষে উঠিয়ে ফেলি।[৯৫]

সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার বিশেষ অনুগ্রহে ও সত্য-সঠিক কথার উপর দুনিয়া ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। আমীন।

كَمِثْلِهِ শব্দের ইরাব বা ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ নিয়ে নাহুবিদদের একাধিক কথা রয়েছে। (১) বিষয়কে শক্তিশালী করার জন্য كاف অক্ষরটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আরবী সাহিত্যের কবি আওস বিন হাজার বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِ الْفَتَى زُهَيْرٍ... خَلْقٌ يُوَازِيهِ فِي الْفَضَائِلِ

---

৯৪. এ মূর্খ লোকটি মনে করেছিল, আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হলে বান্দার সিফাতের সাথে আল্লাহর সিফাতের তাশবীহ ও সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই সে কুরআন থেকে এ আয়াতটিই উঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে এটি বুঝতে সক্ষম হয়নি, যে সন্দেহে সে আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি অস্বীকার করেছিল, আল্লাহর জন্য ইজ্জত ও হিকমত সাব্যস্ত করলে সে একই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। কেননা মানুষেরও ইজ্জত এবং হিকমত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রয়েছে। মোট কথা আল্লাহর জন্য জ্ঞান ও হিকমত সাব্যস্ত করলে যেমন মানুষের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় না, ঠিক তেমনি তার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করলেও মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় না। কেননা সৃষ্টির জন্য যেমন ছিফাত শোভনীয়, তার জন্য উহা সেভাবেই সাব্যস্ত এবং স্রষ্টার বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য যেমন গুণবলী শোভনীয় তিনি সেভাবেই উহা দ্বারা বিশেষিত।

৯৫. অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জনৈক আলেম আহমাদ বিন দুয়াদের কাছে এসে বলল, লিখিত কুরআন থেকে তুমি আল্লাহর এ বাণীটি উঠিয়ে ফেলতে সক্ষম হলেও মুসলিম উম্মাহর আলেম ও হাফেযদের অন্তর থেকে উহা উঠিয়ে দেয়া তো দূরের কথা তাদের শিশুদের অন্তর থেকেও এটি উঠাতে পারবে না।

যুহাইর এমন এক সম্মানিত যুবক, যার অনুরূপ সম্মানের অধিকারী আর কোনো মানুষই নেই। এখানেও কবি বাক্যের মর্মার্থকে শক্তিশালী করার জন্য مثل শব্দের পূর্বে كاف বর্ণকে অতিরিক্তি হিসাবে যোগ করেছেন। আসলে কবির এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, لَيْسَ مثل الْفَتَى زُهَيْر أحد من الخَلْقْ। আরেক কবি তার প্রশংসিত ব্যক্তিদের প্রশংসায় বলেন, مَا إِنْ كَمِثْلِهِمُ فِي النَّاسِ مِنْ بَشَرِ "তাদের মত সম্মানিত আর কোনো মানুষ নেই"। এখানেও مثلهم শব্দের পূর্বে একটি অতিরিক্ত كاف ব্যবহার করা হয়েছে। আসল বাক্যটি ছিল, ليس مثلهم في النَّاس من أحد "মানুষের মধ্যে তাদের অনুরূপ আর কেউ নেই"। আরেক কবি বলেছেন, وَقَتْلَى كَمِثْلِ جُذُوعِ النَّخِيلِ "খেজুর গাছের কাঠ যেভাবে পড়ে থাকে, অনেক নিহত লোক অনুরূপভাবেই পড়ে রয়েছে"।

সুতরাং উপরোক্ত আয়াতে مثله শব্দটি ليس এর খবরে মুকাদ্দাম। كاف অব্যয়টি অতিরিক্ত। আর شيئ শব্দটি ليس -এর ইসম। ইরাবের এ পদ্ধতিটিই অধিক শক্তিশালী ও সুন্দর। আরবদের ভাষায় এভাবে অক্ষর বৃদ্ধি করার বিষয়টি বোধগম্য। এভাবে অক্ষর বৃদ্ধি করে সম্বোধন করা হলে তাদের কাছে বাক্যের অর্থ মোটেই অস্পষ্ট থাকে না। আরবদের ভাষায় বাক্যের বিষয়কে শক্তিশালী করার জন্য حرف جر কাফ বৃদ্ধি করে সম্বোধন করার নযীর আরো কতিপয় কবির কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনি কবিদের কবিতায় كاف অতিরিক্ত হওয়ার আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন কবি বলেন, وَصَالِيَاتٍ كَكَمَا يُؤَثْفَيْنَ। অন্য কবি বলেন, فَأَصْبَحَتْ مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ। এখানেও حرف جر কাফ অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ -এর মধ্যে مثل শব্দটি অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বাক্যটি এরূপ ليس كهو شيئ। এ কথা সত্য সঠিক নয়। কেননা مثل শব্দটি اسم বা বিশেষ্য। বাক্যের অর্থকে জোরালো করার জন্য ইস্‌ম ব্যবহার করার চেয়ে অব্যয় ব্যবহার করাই উত্তম।

(৩) আসলে এখানে অতিরিক্ত কোনো কিছু নেই। বরং কথাটি এমন যে, مِثْلُكَ لَا يَفْعَلُ كَذَا তোমার মত লোক এরূপ করতে পারে না। অর্থাৎ তুমি এমন করবে না। এখানে مبالغة বা আধিক্য বুঝনোর জন্য مثل শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তারা মুবালাগার অর্থে বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثْلٌ لَوْ فُرِضَ الْمِثْلُ "যদিও ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহর উদাহরণ রয়েছে, তাহলেও আল্লাহর উদাহরণের মত আর কোনো উদাহরণ নেই"।

সুতরাং যেই সত্তার কোনো উদাহরণ নেই, তিনি কত মহান, কত বড় তা কেবল প্রকৃতপক্ষে তিনিই অবগত রয়েছেন। এ ছাড়াও আরো অনেক কথা রয়েছে। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক সুস্পষ্ট।[৯৬]

(১৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ

"তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন"।

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন, তৈরী করেছেন এবং উদ্ভাবন করেছেন। خَلَقَ শব্দটি قدر অর্থাৎ নির্ধারণ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। الخلق শব্দটি মাসদার হলেও ইহা এখানে المخلوق (সৃজিত বস্তু) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بعلمه বাক্যাংশটি হাল বা অবস্থা জ্ঞাপক শব্দ হিসাবে নসবের অবস্থানে রয়েছে। মূল বাক্যটি এরূপ, خلقهم عالمابهم অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের সম্পর্কে অবগত থাকা অবস্থায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালোভাবে অবগত"। *(সূরা মূলক: ১৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا

---

৯৬. কুরআনে অতিরিক্ত কিছু আছে, -এ ধারণা থেকে মুক্ত থাকার জন্যই তারা বলেছে, এখানে كاف অব্যয়টি অতিরিক্ত নয়। বরং অর্থের আধিক্য বুঝানোর জন্য كاف অব্যয়টি এসেছে। তাদের কথা ঠিক নয়। বরং অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হওয়াই অধিকতর বিশুদ্ধ। তবে এর অর্থ এটি নয় যে, কুরআনে এমন বিষয় রয়েছে, যার প্রতি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এবং যার কোনো মূল্য নেই। এ রকম ধারণা করা মারাত্মক ভুল। শব্দ ও বাক্যের অর্থগুলো বুঝানোর জন্য এ পরিভাষাগুলো নির্ধারণ করেছে।

جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জল ভাগের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তার অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। "তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ হয়। অবশেষে তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কী আমল করছিলে"। *(সূরা আল আন'আম: ৫৯-৬০)*

এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসী মুতাযেলাদের প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর ইলমসহ অন্যান্য ছিফাতকে অস্বীকার করে থাকে।

ইমাম শাফেঈর শিষ্য ইমাম আব্দুল আযীয মাক্কী (রহিমাহুল্লাহ) যখন আল্লাহ তা'আলার ইলম সম্পর্কে মুতাযেলী আলেম বিশর আল-মুরাইসীকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন বিশর বললেন, আমি আল্লাহর ইলম সম্পর্কে এ কথা বলছি যে, তিনি অজ্ঞ নন। উল্লেখ্য খলীফা মামুনের উপস্থিতিতে আব্দুল আযীয আল-মাক্কী এবং বিশর আল-মুরাইসীর মাঝে যেই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে তিনি বিশরকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। ইমাম আব্দুল আযীযের অন্যতম কিতাব 'আলহাইদা'তে এ বিতর্কের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আব্দুল আযীয আল্লাহর ছিফাত ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলেন এবং তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বিশর বলেই যাচ্ছিল, আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞ নন। বিশর এ কথা স্বীকার করছিলেন না যে, আল্লাহ তা'আলার এমন ইলম রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। ইমাম আব্দুল আযীয তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা থেকে মূর্খতা নাকোচ করা তার প্রশংসার বিশেষণ হতে পারে না। কেননা তুমি যদি কোনো জড় পদার্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বলো এটি অজ্ঞ নয়, তাহলে এ কথার মাধ্যমে তার প্রশংসা সাব্যস্ত হয় না এবং এটিও সাব্যস্ত হয় না যে, তার ইলম রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তার নাবী-রসূল, ফেরেশতা এবং মুমিন বান্দাদের ইলম রয়েছে বলে তাদের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং মুসলিমদের উচিত হলো, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা এবং তার নিজের সত্তা থেকে যা নাকোচ করেছেন, তা বিদূরিত করা ও তিনি যা সাব্যস্ত কিংবা নাকোচ করা থেকে বিরত রয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে অবশ্যই অবগত রয়েছেন, -এ ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির দলীল হলো, বিনা ইলমে বস্তুসমূহ সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি স্বীয় ইচ্ছার মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার ইচ্ছা করার জন্য উদ্দিষ্ট বস্তুর আকৃতি সম্পর্কে কল্পনা করা আবশ্যক। উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে এ কল্পনার নাম ইলম। সুতরাং

সৃষ্টি করার জন্য ইচ্ছা করা জরুরী। আর ইচ্ছার জন্য ইলম আবশ্যক। একই সঙ্গে সৃষ্টি করার জন্যও ইলম থাকা জরুরী।

এ কথা সকলের জানা আছে যে, সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমন এমন বলিষ্ঠ ও সুনিপুণ সৃষ্টি রয়েছে, যা সৃষ্টি করার জন্য ইলম থাকা জরুরী। কেননা সুনিপুণ ও বলিষ্ঠ কাজ ইলম ছাড়া সম্পাদন করা অসম্ভব। এমন সৃষ্টি রয়েছে, যিনি আলেম বা জ্ঞানী। ইলম পূর্ণতার অন্যতম বিশেষণ। সুতরাং স্রষ্টার ইলম না থাকা অসম্ভব। দু'টি পদ্ধতিতে এ কথা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতি হলো, আমরা বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা অবশ্যই জানতে পারি যে, স্রষ্টা সৃষ্টির চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ এবং যিনি নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, তিনি অন্যের দ্বারা অস্তিত্বশীল বস্তুর চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ। বোধশক্তির দলীলের মাধ্যমে আমরা আরো জানতে পারি যে, আমরা যদি এমন দু'টি সৃষ্টিকে সামনে রাখি, যাদের একটি জ্ঞানী এবং অন্যটি জ্ঞানী নয়, তাহলে আমাদের বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে জ্ঞান সম্পন্ন সৃষ্টিটিই হবে অধিক পরিপূর্ণ। সুতরাং স্রষ্টা যদি ইলমের ছিফাতে বিশেষিত না হন, তাহলে মাখলুকই খালেকের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক হয়। আর এটি অসম্ভব।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো সৃষ্টির মধ্যে যত ইলম রয়েছে তার সবই স্রষ্টার পক্ষ হতে এসেছে। আর এটি অসম্ভব যে, কামালিয়াতের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক তা থেকে খালী বা শুণ্য থাকবেন। বরং তিনিই তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার আরো বেশী হকদার। আল্লাহ তা'আলার জন্যই রয়েছে সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি এবং সৃষ্টি সমান নন। কিয়াসে তামছীলি কিংবা কিয়াসে শুমুলী কোনো দিক থেকেই সৃষ্টি ও স্রষ্টা সমান নয়।[৯৭]

সুতরাং মাখলুকের জন্য কামালিয়াতের যে বিশেষণ সাব্যস্ত সৃষ্টিকর্তা তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার আরো বেশী উপযুক্ত এবং সৃষ্টি অপূর্ণতার যে বিশেষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়, স্রষ্টা তা থেকে পবিত্র হওয়ার আরো বেশী হকদার।[৯৮]

---

৯৭. কিয়াসে তামছিলী ও কিয়াসে শুমুলীর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ কিয়াসে তামছিলী এবং যুক্তিবিদগণ তাদের কথা কিয়াসে শুমুলী কথাটি অহরহ ব্যবহার করে থাকেন।

৯৮. তবে এর জন্য শর্ত রয়েছে। দলীল দ্বারা কামালিয়াতের সে বিশেষণটি সাব্যস্ত হতে হবে অথবা দলীল দ্বারা অপূর্ণতার সেই বিশেষণটির নাকোচ থাকতে হবে।

(১৯) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا

এবং তিনি তাদের জন্য তাক্বদীর বা সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"এবং তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। *(সূরা আল-ফুরকান: ২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

আমি প্রত্যেক জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।[৯৯] *(সূরা কামার: ৪৯)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾

"এটিই আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধান চূড়ান্ত ও স্থিরকৃত"। *(সূরা আহযাব: ৩৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুঠাম করেছেন। যিনি তাক্বদীর গড়েছেন তারপর পথ দেখিয়েছেন"। *(সূরা আলা: ২-৩)*

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

৯৯. অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ আছে। সে অনুসারে প্রত্যেক বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্ব লাভ করে, একটা বিশেষ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে। একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ লাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ স্বভাবগত নিয়ম-নীতি অনুসারে এ দুনিয়াটারও একটা 'তাকদীর' বা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা চলেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে। এর পরিসমাপ্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার এক মুহূর্ত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না কিংবা এক মুহূর্ত পরে তা অবশিষ্টও থাকবে না। এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী নয় যে, চিরদিনই তা আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিংবা কোন শিশুর খেলনাও নয় যে, যখনই তোমরা চাইবে তখনই তিনি এটাকে ধ্বংস করে দেবেন। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

«قدر اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তার আরশ ছিল পানির উপরে"।[১০০]

(২০) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا

তিনি তাদের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন। এভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, যখন তাদের সে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন সামান্য পরেও হবে না, পূর্বেও হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

"তারপর যখন সে সময়টি এসে যায় তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্তও আগাতে পারে না, পিছেও যেতে পারে না"। *(সূরা নাহাল: ৬১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا﴾

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৪৫)*

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একবার বললেন,

---

১০০. ছ্বহীহ: বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র, ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৫৩।

«اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ سَأَلَتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَجَلِهِ، وَلَنْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ أَجَلِهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ»

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার স্বামী আল্লাহর রসূল, আমার পিতা আবু সুফিয়ান এবং আমার ভাই মুআবীয়ার সাথে দীর্ঘায়ু দান করো। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কেবল আল্লাহর কাছে নির্ধারিত সময়সীমাগুলো, নির্দিষ্ট দিনসমূহ এবং বণ্টিত রিযিকসমূহই প্রার্থনা করেছো। আল্লাহ তা‘আলা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো সৃষ্টিরই মৃত্যু দান করবেন না এবং তার জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও মৃত্যু দিবেন না। এর পরিবর্তে তুমি যদি আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করতে যে, তিনি যেন তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান এবং কবরের আযাব হতে মুক্তি দেন, তাহলে এটাই তোমার জন্য ভালো ও উত্তম হতো”।[১০১]

নিহত ব্যক্তিও তার জন্য নির্ধারিত সময়েই মারা যায়

সুতরাং নিহত ব্যক্তিও তার জন্য নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু বরণ করে। আল্লাহ তা‘আলা আগে থেকেই অবগত আছেন এবং নির্ধারণ করেছেন যে, এ লোকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, অমুক ব্যক্তি হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করবে, অমুক দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ করবে, কেউ আগুনে পুড়ে মারা যাবে, কেউ বা ডুবে মারা যাবে এবং অন্যরা অন্যান্য কারণে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহই জীবন-মরণ সৃষ্টি করেছেন। বেঁচে থাকার উপকরণ এবং মৃত্যুর কারণও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

মুতাযেলারা বলে যে, নিহত ব্যক্তিকে হায়াত থাকতেই মারা হয়। তাকে যদি হত্যা না করা হতো, তাহলে সে তার জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাঁচতো। তাদের কথা মোতাবেক নিহত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সময় দু’টি। এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি এ কথা সম্বন্ধ করা সঙ্গত নয় যে, নিহত ব্যক্তির জন্য তিনি এমন একটি বয়োসীমা নির্ধারণ করেছেন, যে সম্পর্কে তিনি জানেন যে সে কখনোই সে সীমা পর্যন্ত বাঁচবে না অথবা

১০১. ছ্বহীহ মুসলিম: ২৬৬৩। হাদীছটি মুসলিমের শর্তে ছ্বহীহ। দেখুন ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৮৮।

তার জন্য দু'টি বয়োসীমার মধ্য থেকে যে কোন একটি নির্ধারণ করেছেন। যেমন পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা এমন কাজ করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো নিহত ব্যক্তি যদি নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু বরণ করে, তাহলে হত্যাকারী থেকে কিসাস কিংবা রক্তপণ নেয়া হয় কেন?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, হত্যাকারী যেহেতু নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে এবং এমন কাজ করেছে, যা ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ, এ কথার সাথে সংগতি বজায় রেখেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন,

«صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ»

"আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার বয়স বাড়িয়ে দেয়"।[১০২] অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স বৃদ্ধির উপায়।

আল্লাহ তা'আলা আগেই জানতে পেরেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন যে, এ ব্যক্তি তার আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এ কারণে সে এ সময়সীমা পর্যন্ত হায়াত পাবে। এ আমলটি না করলে, সে এ সময়সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জেনেছেন যে, সে এ আমলটি করবেই। তাই তিনি তাকে তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। এমনি তিনি আগে থেকেই জানতে পেরেছেন যে, অমুক ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেই। সুতরাং এ কারণে সে এ বয়োসীমা পর্যন্ত অর্থাৎ কম বাঁচবে। নিহত ব্যক্তির নিহত হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একই কথা বলেছি।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, বয়স বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বা না রাখার যেমন প্রভাব রয়েছে, তা বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে দু'আরও অনুরূপ প্রভাব আছে কি না?

এর জবাবে আমরা বলবো, বয়স বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে দু'আর প্রভাব পড়ে না। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেছেন, "তুমি কেবল আল্লাহর কাছে নির্ধারিত সময়সীমাই প্রার্থনা করেছো"। ইতিপূর্বে হাদীছটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সকল সৃষ্টির বয়স পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।

সুতরাং তা পরিবর্তনের জন্য দু'আ করা অবৈধ। তবে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ করার কথা ভিন্ন। এ জন্য যে, দু'আ করা শরী'আত সম্মত একটি উত্তম আমল। এটি উপকারীও বটে। আপনি কি জানেন না যে, বয়স বৃদ্ধির দু'আর মধ্যে যদি আখিরাতের কল্যাণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে বয়স বৃদ্ধির দু'আ করা জায়েয আছে।

---

১০২. হাদীছটির সনদ দুর্বল হলেও উহার অর্থ সঠিক। এ হাদীছের পক্ষে অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে। দেখুন: শাইখ আলবানীর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৮৯।

যেমন নাসায়ী শরীফে আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»

"হে আল্লাহ! অদৃশ্যের প্রতি তোমার ইলমের উসীলায় এবং সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতার উসীলায় আমি তোমার কাছে এ প্রার্থনা করছি যে, বেঁচে থাকা আমার জন্য যতদিন কল্যাণকর হয়, ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখো এবং মৃত্যু বরণ করা যখন আমার জন্য উপকারী হবে, তখনই আমাকে মৃত্যু দান করো"। এভাবে দু'আটি শেষ পর্যন্ত।[১০৩]

ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম হাকেম তার ছ্বহীহ গ্রন্থে এ মর্মে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তা উপরোক্ত বর্ণনাকে সমর্থন করে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»

"দু'আই কেবল তাক্বদীরের অকল্যাণকে প্রতিহত করতে পারে এবং সৎকাজ ছাড়া অন্য কিছুই বয়স বাড়াতে পারে না। আর মানুষ স্বীয় পাপের কারণে তার রিযিক থেকে মাহরুম হয়"।[১০৪]

এ হাদীছে ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা মনে করে মানত বালা-মুসীবত দূর করে এবং নিয়ামত আনয়ন করে। ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মানত করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, মানত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং তার মাধ্যমে কৃপণের মাল থেকে কিছু খরচ করা হয় মাত্র"। আর আল্লাহ তা'আলার এ বাণী:

﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"কোনো আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং তার আয়ু থেকে কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ"। *(সূরা ফাতির: ১১)*

এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণী: من عمره এর যমীর বা সর্বনামের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এটি হলো আরবদের এ কথার মতই عندي درهم ونصفه "আমার কাছে এক দিরহাম এবং তার অর্ধেক আছে। অর্থাৎ আরেক দিরহামের অর্ধেক আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে যে, কোনো আয়ু লাভকারীর আয়ু বাড়ানো হলে এবং অন্য কারো আয়ু কমানো হলে, অবশ্যই তা কিতাবে লেখা থাকে।

---

১০৩. হাদীছটি ছ্বহীহ: নাসাঈ ১৩০৬।

১০৪. হাদীছটি হাসান। দেখুন: শাইখ আলবানীর তাহকীকসহ শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ৯২।

কেউ কেউ বলেছেন, বয়স বাড়ানো বা কমানো ঐ কিতাবে হয়ে থাকে, যা ফেরেশতাদের হাতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

"প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি লিখিত কিতাব (সময়সীমা) রয়েছে। আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তার কাছেই রয়েছে"। *(সূরা রা'দ: ৩৮-৩৯)*

এখানে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং বহাল রাখার যে কথা বলা হয়েছে, তা কেবল ঐ কিতাবসমূহের মধ্যেই হয়ে থাকে, যা রয়েছে ফেরেশতাদের হাতে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

"উম্মুল কিতাব তার কাছেই রয়েছে" এর দ্বারা লাওহে মাহফুয উদ্দেশ্য। আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ এ কথাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

"প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি লিখিত কিতাব (সময়সীমা) রয়েছে"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾

"আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন"। অর্থাৎ সে কিতাব থেকে যা ইচ্ছা তিনি মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। আর মূল কিতাব তার নিকটেই রয়েছে। আর সেটি হলো লাওহে মাহফুয।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শরী'আত থেকে যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করেন ও রহিত করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন, তা রহিত করেন না। আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ প্রথম অর্থের চেয়ে এ অর্থের প্রতিই অধিক নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নিদর্শন এনে দেখাবার শক্তি কোন রাসূলেরও ছিল না। প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একটি কিতাব (সময়সীমা) রয়েছে"।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, রসূল নিজের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে আসতে পারেন না। বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ হতেই নিদর্শন আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি লিখিত কিতাব রয়েছে। আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন"।

অর্থাৎ আল্লাহর শরী'আত সমূহের জন্য এমন একটি সময়সীমা রয়েছে, যে পর্যন্ত গিয়ে তা শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর অন্য শরী'আত দ্বারা তাকে রহিত করে দেয়া হবে। সুতরাং শরী'আতের সময়সীমা শেষ হওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা রহিত করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো অনেক কথা রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

(২১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ

সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তার কাছে গোপন ছিল না। এমনি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

.....

ব্যাখ্যা: যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। আর যা সৃষ্টি হয়নি তা সৃষ্টি হলে কেমন হতো, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾

"তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে তারা আবার সে আমলই করবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল"। *(সূরা আল-আনআম: ২৮)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾

"যদি আল্লাহ জানতেন এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনার তাওফীক দিতেন। *(সূরা আল-আনফাল: ২৩)*

এ আয়াতগুলোর মধ্যে রাফেযী, মুতাযেলা এবং ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করা এবং অস্তিত্বে আনয়ন করার পূর্বে কোনো জিনিস সম্পর্কে জানতে পারেন না। এটি তাক্বদীরের মাস'আলাসমূহের শাখা বিশেষ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

(২২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِه

এবং তিনি তাদেরকে তার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তার নাফরমানী করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

.....

ব্যাখ্যা: সৃষ্টি করা ও নির্ধারণ করা সম্পর্কে আলোচনা করার পর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।"। *(সূরা যারিয়াত: ৫৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। *(সূরা মূলক: ২)*

(২৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

সবকিছু তার নির্ধারণ এবং ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়। তার ইচ্ছাই কার্যকর হয়, তার ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ"। *(সূরা দাহার: ৩১)* আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে কোনোই ইচ্ছা করতে পারো না"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ১১১ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾

"আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতরাও তাদের সাথে কথা বলতো এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও তাদের চোখের সামনে একসাথে তুলে ধরতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনয়ন করতো না। তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞ"। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"আর এভাবে আমি মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানদেরকে প্রত্যেক নাবীর দুশমনে পরিণত করেছি, তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো। তোমার রব ইচ্ছা করলে তারা এমনটি কখনো করতে পারতো না। কাজেই তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, তারা মিথ্যা রচনা করতে থাকুক" *(সূরা আন'আম ১১২)*।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসের ৯৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

"যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন, তাহলে যমীনের সবাই ঈমান আনয়ন করতো। তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের উপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১২৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾

"আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে"।

অর্থাৎ জোর খাটিয়ে যেমন আকাশের দিকে উঠা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ যার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন তার মধ্যে ঈমান ও তাওহীদের আলো ঢুকানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে না দেয়া পর্যন্ত তাতে ঈমান ও তাওহীদ প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা হুদের ৩৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"আমি তোমাদেরকে নসীহত করতে চাইলেও আমার নসীহত তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না যদি আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করেন। তিনিই তোমাদের রব এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"।[১০৫] আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন"। এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করার ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা করার ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তার রাজত্বের মধ্যে কিভাবে এমন কিছু হতে পারে, যা তিনি চান না!! ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট এবং

---

১০৫. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দাম্ভিকতা এবং সদাচারে আগ্রহ হীনতা দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও, সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না।

অধিক বড় কাফের আর কে হতে পারে, যে ধারণা করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরের পক্ষ হতে ঈমান সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু কাফের কুফুরী করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা জয়লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

তাক্বদীর দিয়ে দলীল গ্রহণ করে কুফুরী ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অযৌক্তিক

কেউ যদি বলে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই ঈমান বা কুফুরী সংঘটিত হলে কাফের-মুশরিকদেরকে দোষারোপ বা শাস্তি দেয়া হবে কেন?

যেমন তারা তাদের কুফুরী ও পাপাচারের পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছাকে দলীল হিসাবে খাড়া করার চেষ্টাও করেছে যুগে যুগে। তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১৪৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾

"মুশরিকরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না"। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾

"এ মুশরিকরা বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তার হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা যুখরুফের ২০ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾

"এরা বলে, দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা কখনো তাদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তাদের কোনো ইলম নেই। তারা কেবলই অনুমান করেই কথা বলে থাকে"।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলোতে ঐসব মুশরিকদের নিন্দা করেছেন, যারা তাদের নিজের পক্ষ হতে সংঘটিত শির্ককে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। এমনি

তিনি ইবলীসকেও দোষারোপ করেছেন, যেখানে সে নিজের গোমরাহীর সম্বন্ধ করেছিল আল্লাহ তা'আলার প্রতি। ইবলীস বলেছিল,

﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনি আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো"। *(সূরা হিজর: ৩৯)*

সুতরাং কাফের-মুশরিকরা বলার চেষ্টা করেছে যে, কুফরী, শির্ক ও পাপাচার যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, তাই আমাদের দোষ কোথায়?

এ প্রশ্নের একাধিক জবাব প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে তার পছন্দ ও ভালোবাসার পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা আরো বলেছে, আল্লাহ তা'আলা যদি কুফুরী, শির্ক ও পাপাচারকে অপছন্দ এবং ঘৃণা করতেন, তাহলে তিনি কখনোই তার ইচ্ছা করতেন না। সুতরাং তারা কোনো কাজের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছাকেই উক্ত কাজের প্রতি তার সন্তুষ্টি আছে বলে দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। সে সঙ্গে তিনি তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা তার আদেশ ও পছন্দের দলীল স্বরূপ। একই সঙ্গে তিনি নাবী-রসূলদের মাধ্যমে যে আদেশ ও শরী'আত প্রেরণ করেছেন এবং যা দিয়ে তিনি আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে সেগুলোর বিরোধিতা করার প্রতিবাদ করেছেন। সুতরাং তারা সবকিছু সৃষ্টির উপর আল্লাহর ইচ্ছাকে তার আদেশ-নিষেধ ও শরী'আত প্রত্যাখ্যান দলীল হিসাবে পেশ করেছে। সবকিছু তার ইচ্ছাতেই হওয়ার মধ্যে তাওহীদের যে দলীল রয়েছে, তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে সেভাবে মূল্যায়ন করেনি। তারা শুধু আদেশ-নিষেধ ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করতে গিয়েই তার ইচ্ছাকে উল্লেখ করেছে। যেমন করে থাকে নাস্তিক, মুনাফেক এবং অজ্ঞ লোকেরা। তাদেরকে যখন কোনো কাজের আদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে তা বাস্তবায়ন করা থেকে দূরে থাকে।

এক চোরকে আমীরুল মুমিনীন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দরবারে উপস্থিত করা হলো। তিনি যখন চোরের হাত কাটার ফায়ছালা প্রদান করলেন, তখন চোর বলতে লাগল, আপনি কি জানেন না সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে?

সুতরাং চুরি করা আমার তাকদীরে ছিল বলেই চুরি করেছি। চোর পাপ কাজের উপর তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, তুমি তাক্বদীর অনুযায়ী চুরি করেছো আর আমি আল্লাহর তাক্বদীরের ফায়ছালা অনুযায়ীই তোমার হাত কেটে ফেলবো। সুতরাং চোরের হাত কেটে ফেলা হলো। এতে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন যে, চোরের হাত কাটা হবে। তিনি যদি চোরের হাত কাটার ইচ্ছা না

করতেন (হাত কাটার আদেশ না দিতেন) তাহলে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কখনোই চোরের হাত কাটতেন না।

সুতরাং চুরি করা আল্লাহর নির্ধারণ অনুপাতেই হয়। হাত কাটাও তার ইচ্ছাতেই (হুকুমে) হয়। মূলত শরী'আত ও তাক্বদীরের মাঝে কোনো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। শরী'আতের নির্ধারিত হদ্দ বা শাস্তি কায়েম করা তাকদীদের পরিপন্থী নয়। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা ও কাজের মধ্যে ছাহাবীদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সূরা আনআমের ১৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

"এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল"। এতে জানা গেল তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা। এমনটি নয় যে, তারা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান রাখতো। তাদের এ কথা ও কাজ পূর্বযুগের কাফেরদের কথা ও কাজের মতই।

সুতরাং চোরের হাত কাটাও তাকদীরে নির্ধারিত রয়েছে। চোর যদি বলে চুরি করা নির্ধারিত রয়েছে। হাত কাটার কথা তাকদীরে নেই, তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি কিভাবে জানলে তা তাকদীরে নেই? তুমি কি গায়েব সম্পর্কে অবগত আছো? সুতরাং চুরি করার কারণে যেহেতু চোরের হাত কাটা হয়, তাই বুঝা গেলো ইহাও তাকদীরে নির্ধারিত। কেননা আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর তাক্বদীর ও ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় বলে বিশ্বাস করা কুফুরী।

যদি প্রশ্ন করা হয় আদম (আলাইহিস সালাম) তো মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বিতর্কের সময় তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। আদম (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিলেন, তুমি কি আমাকে এমন একটি কাজের কারণে দোষারোপ করছো, যা আল্লাহ তা'আলা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমি তা করবো বলে লিখে দিয়েছেন? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে আদম (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বিতর্কে পরাজিত করে দিলেন। অর্থাৎ দলীলের মাধ্যমে তিনি মূসা আলাইহিস সালামের উপর জয়লাভ করলেন।

এর জবাব হলো আমরা এ কথাকে অন্তর দিয়ে কবুল করে নিয়েছি, শ্রবণ করেছি এবং এর প্রতি অনুগত হয়েছি। কারণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি না এবং তাকে মিথ্যাও বলি না। যেমন করে থাকে মুতাযেলাগণ। আমরা এ বর্ণনার দুর্বল ব্যাখ্যাও করি না। সঠিক কথা হলো আদম (আলাইহিস সালাম) স্বীয় ভুলের উপর তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করেননি। তিনি তার রব সম্পর্কে এবং স্বীয় ভুল সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত ছিলেন। শুধু তাই নয়; বরং তার মুমিন সন্তানগণও তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হয় না। কেননা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে বা তাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাক্বদীরকে দলীল হিসাবে পেশ করা সম্পূর্ণ বাতিল।

মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তার পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) এবং তার ভুল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) আদম (আলাইহিস সালাম) কে এমন একটি পাপের কারণে দোষারোপ করবেন, যা থেকে তিনি তাওবা করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করে নিয়েছেন, তাকে নাবী হিসাবে নির্বাচন করেছেন ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, -এটি হতেই পারে না। দোষারোপ করা হয়েছে শুধু ঐ মুসীবতের কারণে, যা তার সন্তানদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। সুতরাং আদম (আলাইহিস সালাম) তার মুসীবতের পক্ষে তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, ভুল ও পাপ কাজের পক্ষে নয়। কেননা মুসীবতে পড়ে তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয আছে। পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে তা দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নয়। আদম ও মূসা আলাইহিস সালামের বিতর্কের হাদীছের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তার মধ্য থেকে উপরোক্ত ব্যাখ্যাই সর্বোত্তম।

সুতরাং তাক্বদীরের নির্ধারণ অনুযায়ী যত মুসীবতই আসুক না কেন, তা মেনে নেয়া আবশ্যক। কেননা এটি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ তা'আলাকে পরিপূর্ণরূপে রব হিসাবে মেনে নেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর গুনাহর ব্যাপারে কথা হলো, বান্দার জন্য তাতে লিপ্ত হওয়ার কোনো অধিকার নেই। যদি তার দ্বারা পাপ কাজ হয়েও যায়, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাওবা করা আবশ্যক। সুতরাং বান্দার পাপের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে তাওবা করবে এবং মুসীবতে পড়ে গেলে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

"হে নাবী! ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য মাফ চাও এবং সকাল সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো"। *(সূরা মুমিন: ৫৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

"তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন ষড়যন্ত্র ক্ষতিকর হবে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১২০)*

আর ইবলীসের কথা,

﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো",

এখানে ইবলীস তাক্বদীর দ্বারা যে দলীল পেশ করেছে, তার কারণে তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ জন্য দোষারোপ করা হয়নি যে, সে তাক্বদীরকে স্বীকার করে নিয়েছিল

এবং সাব্যস্ত করেছিল। তুমি কি নূহ আলাইহিস সালামের কথা শোননি যেখানে তিনি বলেছেন,

﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"এখন যদি আমি তোমাদের কিছু মঙ্গল করতে চাই তাহলে আমার মঙ্গল কামনা তোমাদের কোন কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছেন। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,

مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ... وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ

"হে আল্লাহ! তুমি যা ইচ্ছা করো, তাই হয়। যদিও তাতে আমার কোনো ইচ্ছা থাকে না। আর আমি যা ইচ্ছা করি, তুমি যদি তার ইচ্ছা না করো, তাহলে তা সংঘটিত হয় না।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি তাক্বদীরের মধ্যে গভীর দৃষ্টি দিয়ে হয়রান হয়েছি। আমি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিয়েও হয়রান হয়েছি। পরিশেষে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, তাক্বদীর সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিই বেশী অবগত, যে তার গভীরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে। আর তাক্বদীর সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, যে তা সম্পর্কে বেশী বেশী কথা বলে।

(২৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا

আল্লাহ অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা, তাকে হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে মুতাযেলাদের ঐ কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যেখানে তারা বলেছে যে, বান্দার জন্য যা কিছু কল্যাণকর ও উপকারী আল্লাহ তা'আলার উপর তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ মাস'আলাটি বান্দাকে সঠিক পথ দেখানো এবং বিপথগামী করার মাস'আলার সাথে সম্পৃক্ত। মুতাযেলারা বলেছে, আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাকে হিদায়াত করার অর্থ হলো, বান্দার জন্য সঠিক পথ বর্ণনা করে দেয়া। এর বাইরে তাকে হিদায়াত গ্রহণের তাওফীক দেয়া কিংবা সাহায্য করা তার কাজ নয়। আর তাকে গোমরাহ করার অর্থ হলো বান্দাকে কেবল গোমরাহ হিসাবে নামকরণ করা এবং বান্দা যখন নিজের জন্য গোমরাহী সৃষ্টি করে তখন তাকে গোমরাহ হিসাবে নাম দেয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহ বান্দাকে গোমরাহ করেন কিংবা বান্দার জন্য গোমরাহী সৃষ্টি করেন, এমনটি নয়। তারা তাদের বাতিল মূলনীতির উপরই এ কথার ভিত্তি রচনা করেছে। তাদের অন্যতম মূলনীতি হলো, বান্দারাই তাদের কাজ-কর্ম সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রকৃতপক্ষেই হিদায়াত করেন এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই কাউকে গোমরাহ করেন। এ বিষয়ে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে হিদায়াত করতে পারবে না[১০৬], তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের পথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত আছেন"। *(সূরা কাসাস: ৫৬)*

---

১০৬. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হিদায়াতের মালিক নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তা হচ্ছে হিদায়াতের তাওফীক দেয়া। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ এ প্রকার হিদায়াতের মালিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না"। (সূরা ইউনূস: ১০০) নূহ (আলাইহিস সালাম) তার পুত্রকে হিদায়াত করতে পারেননি, স্ত্রীকেও সৎ পথে আনতে পারেননি। ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম) তার পিতাকে দ্বীনের পথে আনয়ন করার চেষ্টা

সুতরাং হিদায়াত অর্থ যদি শুধু রাস্তা বলে দেয়া হতো, তাহলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হিদায়াতকে নাকোচ করা সঠিক হতো না। কেননা তিনি তার শত্রু-বন্ধু সকলের জন্যই পরিস্কারভাবে রাস্তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾

"আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সৎপথে আনয়ন করতাম"। *(সূরা সাজদাহ: ১৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন"। *(সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৩১)*

আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াতের অর্থ যদি কেবল রাস্তা বর্ণনা করাই হতো, তাহলে ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করা হতো না। কেননা তিনি সকল সৃষ্টির জন্যই সঠিক পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾

"আমার রবের মেহেরবাণী না হলে আমিও আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম"। *(সূরা সাফফাত: ৫৭)* আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন"। সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাদের শুধু হিদায়াতের পথ বর্ণনা করেন, তাই নয়; বরং তিনি হিদায়াতের তাওফীকও দান করেন।

করেও সফল হননি। লূত (আলাইহিস সালাম) এর ক্ষেত্রেও একই কথা। তার স্ত্রীকে সুপথে আনতে পারেননি। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও ইসহাক (আলাইহিমাস সালাম) এর ব্যাপারে বলেন,

﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾

"তাকে (ইবরাহীমকে) এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী। (সূরা সাফফাত: ১১৩)

আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রকার হিদায়াত করতে সক্ষম বলে কুরআন সাক্ষ্য দিয়েছে, তা হচ্ছে হিদায়াতের পথ দেখানো। তিনি এবং সকল নাবী-রসূলই মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আশ-শূরার ৫২ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন"।

(২৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ

আর সকলেই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে এবং সবাই তারই অনুগ্রহ ও এ ন্যায়বিচারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

.....

ব্যাখ্যা: মানুষের অবস্থা ঠিক তেমনই, যেমন আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন"। *(সূরা তাগাবুন: ২)*

সুতরাং তিনি যাকে ঈমানের প্রতি হিদায়াত করেছেন, তা কেবল তার অনুগ্রহের কারণেই। এতে তার প্রশংসা করা আবশ্যক। আর যাকে তিনি গোমরাহ করেছেন, তা কেবল তার ন্যায়বিচারের কারণেই।[১০৭] এতেও তার প্রশংসা করা আবশ্যক। এ অর্থে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশা-আল্লাহ। কেননা শাইখ একস্থানে তাক্বদীরের সকল মাস'আলা একত্র করেননি। বরং কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। তাই আমরাও তারই ধারায় তা আলোচনা করবো।

---

১০৭. এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষ ঈমান, হিদায়াত এবং অন্যান্য যেসব নিয়ামত লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে তারা তার হকদার নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ যতই তার ইবাদত বন্দেগী করুক না কেন, কোনো ক্রমেই তারা উহার হকদার হতে পারবে না। আর মানুষের উপর গোমরাহীসহ যত বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত আপতিত হয়, তাতে তাদের উপর বিন্দু মাত্র যুলুম করা হয় না। বরং তা তাদের পাপাচারের কারণে তাদের উপর ন্যায়বিচার স্বরূপই হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কারো উপর যুলম করেন না। কুরআনে এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতে নিপতিত ব্যক্তি যদি অমুসলিম হয়, তাহলে এ মুসীবত ঐ আযাবের নমুনা স্বরূপ, যা তার জন্য মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে অপেক্ষা করছে। সেখানে সে আরো ভয়াবহ শাস্তিতে নিপতিত হবে।

আর যদি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মুমিন হয়, তাহলে এ বিপদ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। অথবা তার জন্য ঈমানের পরীক্ষা হিসেবে ধরে নেয়া হবে, যা পরকালে তার মর্যাদা বৃদ্ধি ও নাজাতের উসীলা হবে।

(২৬) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ

তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার বহু উর্ধ্বে।

.....

ব্যাখ্যা: الضد অর্থ হলো প্রতিদ্বন্দ্বী। আর الند অর্থ সমকক্ষ। আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তার কোনো সমকক্ষও নেই। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ইখলাছে বলেন,

﴿قل هواللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"হে নাবী তুমি বলো! আল্লাহ একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তিনি কারো থেকে জন্ম নেন নি এবং তার সমকক্ষও কেউ নেই"।

এখানে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ নাকোচ করার মাধ্যমে মুতাযেলাদের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তাদের ধারণা হলো, বান্দাই তার কর্ম সৃষ্টি করে।

(২৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ

তার ফায়ছালার কোনো প্রতিহতকারী নেই। তার হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তার নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ কোনো প্রতিহতকারী আল্লাহর ফায়ছালাকে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তার হুকুমকে পিছনে ফেলার কেউ নেই। আল্লাহর আদেশকে পরাজিত করারও কেউ নেই। বরং তিনি এক, অদ্বিতীয়, প্রতাপশালী এবং অপরাজেয়।[১০৮]

(২৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ

উপরে উল্লেখিত সব কিছুর উপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি যে, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে আগত।

.....

ব্যাখ্যা: ঈমানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ। আর ইয়াকীন অর্থ সুদৃঢ় ও স্থির হওয়া। এ শব্দটি আরবদের কথা,

يَقِنَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ إِذَا اسْتَقَرَّ

---

১০৮. মাখলুক কোনো কোনো ফায়ছালা বা সিদ্ধান্ত নিলে তা কখনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে দেখা যায়। কেননা তার জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রভাবের স্বল্পতার কারণেই এমনটি করতে হয় কিংবা সে কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তার ক্ষমতা যেহেতু অসীম, তিনি যেহেতু মহাপরাক্রমশালী এবং তার সিদ্ধান্তে যেহেতু কোনো ভুল নেই, তাই তিনি কোনো মাখলুকের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা প্রতিহত করা, রদবদল করা কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোনো শক্তি নেই। বরং তার ঐ সিদ্ধান্ত অনড়-অটল থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করার ইচ্ছা করবেন এবং যে সময় উহা করতে চাইবেন, হুবহু সে কাজ নির্দিষ্ট সময়েই কার্যকর হবে। এক পলকের জন্যও উক্ত কাজ এদিক-সেদিক হবে না। আল্লাহ তা'আলা এতই শক্তিশালী ও প্রবল যে, তিনি যে কাজ করার ইচ্ছা করেন, সে কাজ হতে কেউ তাকে হটাতে কিংবা বাধা দিতে পারে না। সকল মাখলুক যেহেতু তার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাবের নিকট একেবারেই তুচ্ছ, তাই তার কাজে কেউ প্রভাব বিস্তার করতে বা ক্ষমতা প্রয়োগ করার কল্পনাও করতে পারে না।

"পানি জলাশয়ের মধ্যে স্থির হয়েছে" থেকে নেয়া হয়েছে।

كلا শব্দের মধ্যে যে তানবীন রয়েছে তা **بدل إضافي** অর্থাৎ مضاف إليه -এর পরিবর্তে এসেছে। মূল বাক্যটি ছিল এরূপ:

كُلُّ كَائِنٍ مُحْدَثٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

সব সৃষ্টিজগতের সকল বস্তুই আল্লাহর পক্ষ হতে।

অর্থাৎ তার আদেশ, নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে। যথাস্থানে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

(২৯) ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ المرتضى

নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নাবী এবং পছন্দনীয় রসূল।

.....

ব্যাখ্যা: ইস্তেফা-নির্বাচিত করা, ইজতেবা-মনোনীত করা এবং ইরতেযা-পছন্দ করা এ তিনটি শব্দের অর্থ প্রায় একই রকম। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণতা তৈরী হয়। বান্দার ইবাদত যতই বৃদ্ধি পাবে, তার পূর্ণতা তত বৃদ্ধি পাবে এবং তার মর্যাদা ততই উন্নীত হবে।

যে ব্যক্তি এ ধারণা করবে, কোনো কোনো মাখলুক বা অলী-আওলীয়া আল্লাহর ইবাদতের গন্ডির আওতামুক্ত এবং ইবাদতের শৃঙ্খল থেকে বের হয়ে আসার মাধ্যমে অধিকতর পূর্ণতা অর্জিত হয়, সে সর্বাধিক মুর্খ ও পথভ্রষ্ট।[১০৯] আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾

১০৯. সুফীবাদের দাবিদার এক শ্রেনীর অজ্ঞ লোক বলে থাকে যে, অলীগণের যখন মারেফত হাসিল হয়ে যায় এবং তিনি যখন 'ফানা ফিল্লাহ'র স্তরে পৌছে যান তখন তার উপর শরী'আতের বিধি-বিধান মানার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং তার নিকট হালাল-হারামেরও কোনো ব্যবধান থাকে না। (নাউযুবিল্লাহ)

"এরা বলে, করুণাময় আল্লাহ সন্তান গস্থহণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! তারা তো তার মর্যাদাশালী বান্দা"। (সূরা আম্বীয়া: ২৬) এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা অনেক ফযীলতপূর্ণ ঘঁনা ও স্থানে তার নাবীকে 'ধাবদ' নামে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মিরাজের ঘঁনায় বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতের কিয়দাংশে নিজের বান্দাকে মাসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়। যাতে আমি তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। সূরা বানী ইসরাঈল: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾

"ধার আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার নিকট ভিড় জমালো"। *(সূরা জিন: ১৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾

"তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা অহী করার ছিল তা অহী করলেন" *(সূরা নাযম: ১০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"ধার যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা, এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তাহলে তার মতো এশটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্টীকে ডেকে আনো আল্লাহকে ছাড়া। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৩)*

সুতরাং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সর্বাধিক ইবাদতশারী বান্দা ছিলেন বলেই তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাধিক মর্যাদাবান হওয়ার যোগ্য হয়েছেন। এ জন্যই কিয়ামতের দিন যখন লোকেরা নাবীদের কাছে শাফা'আতের আবেদন করার পর ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে তা কামনা করবে, তখন তিনি বলবেন, তোমরা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন একজন বান্দা, যার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ইবাদত করার মাধ্যমে এ মর্যাদা অর্জন করেছেন।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: وإن محمدا -এ বাক্যটিকে কিতাবের শুরুর দিকে উল্লেখিত إن الله واحد لاشريك له -এর উপর সম্পর্ক করে তার 'হামযাহ' -এর নীচে যের দিয়ে পড়া হয়েছে। আর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: نقول في توحيد الله থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সবগুলো বাক্যই قول এর معمول হয়েছে।

কালাম শাস্ত্রবিদ ও যুক্তিবিদদের থেকে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, মুজেযার মাধ্যমে নাবীদের নবুওয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের অনেকেই মুজেযার মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে নাবীদের নবুওয়াত সাব্যস্ত করতে সম্পূর্ণ নারাজ।[১১০]

তবে মুতাযেলাদের অনেকেই নাবী ছাড়া অন্যদের পক্ষ হতে অলৌকিক ঘঁনা প্রকাশিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে। এমনকি তারা অলীদের কারামত, যাদুর হাকীকত ও প্রভাব এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়কেও অস্বীকার করেছে।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজীব

নাবীদের মুজেযা নিঃসন্দেহে তাদের নবুওয়াতের পক্ষে এশটি শক্তিশালী দলীল। তবে তাদের নবুওয়াতের দলীলসমূহ কেবল মুজেযার মধ্যেই সীমিত নয়। কেননা সর্বাধিক সত্যবাদী অথবা সর্বাধিক মিথ্যুকরাই নবুওয়াতের দাবি করে থাকে। সত্য নবুওয়াত এবং তার মিথ্যা দাবি কখনো এক হতে পারে না। অপ্সরাই কেবল সত্যিকার নবুওয়াত এবং নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সত্যিকার নাবী ও ভন্ড নাবীর এমন অনেক আলামত রয়েছে, যা উভয়কে পরিষ্কার করে বর্ণনা করে দেয়। নবুওয়াতের দাবিদার ছাড়াও সাধারণ সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। সুতরাং যারা নবুওয়াতের দাবি করবে, তারা সত্যবাদী কি না, তার মাঝে পার্থক্য করা যাবে না কেন?

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব সুন্দর বলেছেন,

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ... كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تَأْتِيكَ بِالْخَبَرِ

১১০. তাদের এ কথা সঠিক নয়। কারণ নাবীদের নবুওয়াত সাব্যস্ত করার জন্য মুজিযা ছাড়াও আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে। যা থেকে শাইখ ইবনে আবীল ইয্ কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

"ার মধ্যে যদি নবুওয়াতের সুস্পষ্ট বাহ্যিক নিদর্শনগুলো নাও থাকতো, তাহলে তার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, স্বাভাবিক অবস্থা এবং আচার-আচরণই তোমাকে বলে দিবে যে তিনি একজন সত্য নাবী"।

এ পর্যন্ত যত মিথ্যুক নবুওয়াতের দাবি করেছে তাদের সকলের মূর্খতা, মিথ্যা ও পাপাচার সুস্পষ্ট হয়েছে। সে সঙ্গে তার মধ্যে শয়তানের গোলামি করার বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। যার মধ্যে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিমান লোকও নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারের চালবাজি ও ধোঁকাবাজি ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কেননা যিনি নাবী বা রসূল হবেন, তিনি মানুষকে অবশ্যই অনেক সংবাদ প্রদান করবেন, অনেক বিষয়ের আদেশ করবেন এবং এমন অনেক কাজ করবেন, যার মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশিত হবে। আর মিথ্যুক যে বিষয়ের আদেশ করবে, যে সংবাদ প্রদান করবে এবং সে যা করবে, তার মধ্যেই বিভিন্নভাবে মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাবে। সত্যবাদীর বিষয়টি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। শুধু তাই নয়; দুই জন লোক যদি এমন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দাবি করে, যাতে একজন সত্যবাদী এবং অন্যজন মিথ্যুক, তাতে সত্যবাদী থেকে মিথ্যুক অবশ্যই আলাদা হবে। যদিও তা প্রকাশ হতে কখনো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে সৎকাজের দিকে পরিচালিত করে এবং মিথ্যাবাদিতা মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়।

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»

"তোমরা অবশ্যই সত্য বলবে। কারণ সত্য মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে ও নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সদা সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকলে পরিশেষে আল্লাহর নিকট সে সিদ্দীক হিসাবে পরিগণিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ কাজের পথ দেখায় এবং পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সদা মিথ্যা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার অনুসন্ধান করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়"।[১১১] এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾

১১১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬০৭, তিরমিযী হা/১৯৭১।

"হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার উপর অবতীর্ণ হয়? তারা তো প্রত্যেক মিথ্যুক বদকারের উপর অবতীর্ণ হয়। শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং এর বেশির ভাগই হয় মিথ্যা। আর ভ্রান্তরাই কেবল কবিদের পেছনে চলে। তুমি কি দেখনা তারা উপত্যকায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায় এবং এমনসব কথা বলে যা তারা করে না"? *(সূরা শুআরা: ২১-২৬)*

সুতরাং গণক এবং তাদের অনুরূপ লোকেরা যদিও কখনো কখনো অদৃশ্যের কিছু কিছু খবর বলতে পারে এবং তা সত্যও হয়, তথাপিও তারা এত মিথ্যা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, যা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তারা যেসব খবর প্রদান করে, তা ফেরেশতাদের থেকে গৃহীত নয় এবং তারা স্বয়ং নাবীদেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সাইয়্যাদকে বলেছিলেন,

«إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»

"ধামি তোমার জন্য এশটি বিষয় গোপন করে রেখেছি। পারলে বলে দাও তো আমি কী গোপন করেছি? ইবনে সাইয়্যাদ বললো, সেটি হল الدخ (ধূয়া)। এ কথা শুনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও। তুমি নিজের সীমার বাইরে যেতে পারবে না"।[১১২]

ইবনে সাইয়্যাদ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই আগমন করে।[১১৩] সে আরো বলেছিল, أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ আমি পানির উপর এশটি আরশ দেখতে পাচ্ছি।[১১৪] পানির উপর সে যে আরশ দেখতো, তা ছিল শয়তানের আরশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ "গোমরাহ লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে চলে" *(সূরা আশ শুয়ারা ২৬:২২৪)*। الغاوي হলো ঐ ব্যক্তি যে, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। যদিও পরিণামে তা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

১১২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩০।
১১৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩০।
১১৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯২৫।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযা সম্পর্কে কিছু কথা

যে ব্যক্তি রাসূলের সত্যবাদিতা, ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করা এবং তার কথা ও কাজের মিল থাকার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করবে, সে নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে যে, তিনি কবি কিংবা গণক নন। লোকেরা মিথ্যুক থেকে সত্যবাদীকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে থাকে। যেমন তারা বিভিন্ন প্রকার পেশা যেমন লেখালেখি, কাপড় বুনানো, কৃষিকাজ, নাহুশাস্ত্র, ডাক্তারী, ফিকাহশাস্ত্র ইত্যাদির দাবিদারকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করে থাকে। নবুওয়াতের দাবিদারের মধ্যে ইলম ও আমল থাকতে হবে। রাসূলের মধ্যে অবশ্যই ইলম ও আমল থাকবে। তার মধ্যে থাকবে সর্বোত্তম ইলম ও সর্বোত্তম আমল।

সুতরাং সত্য নাবী ও মিথ্যাবাদী কিভাবে এক হতে পারে? গবেষক আলেমদের মতে একজন বা দুইজন বা তিনজনের খবরের সাথে কখনো এমন কিছু আলামত বিদ্যমান থাকে যার কারণে তা দ্বারাও অকাট্য ইলম অর্জিত হয়। যেমন কেউ অন্য কারো সন্তুষ্টি, ভালোবাসা, ক্রোধ, আনন্দ দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি অভ্যন্তরীন অবস্থা এমন আলামতের মাধ্যমে জানতে পারে, যা তার চেহারার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় এ আলামতগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝানো সম্ভব হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾

"আমি চাইলে তাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম। আর তুমি তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারতে। তবে বাচনভঙ্গি থেকে তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদের সব আমল ভালো করেই জানেন"। *(সূরা মুহাম্মাদ: ৩০)*

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কেউ অন্তরে কিছু গোপন করলে, আল্লাহ তা'আলা তা তার চেহারা এবং জবানের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। সুতরাং সংবাদ দাতার সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা যেহেতু আনুসাঙ্গিক বিভিন্ন আলামত দ্বারা প্রকাশিত হয়ে যায়, সেহেতু নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবিদারের দাবির সত্যতা প্রকাশিত হবে না কেন? সত্য নাবীর সত্যতার বিষয়টি কিভাবে গোপন থাকতে পারে? অসংখ্য দলীলের মাধ্যমে সত্য নাবীর সত্যতা এবং মিথ্যাবাদির মিথ্যাচারিতার মাঝে পার্থক্য হবে না কেন?

এ জন্যই খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেহেতু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ও ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই অহী অবতীর্ণ সূচনা হওয়ার পর তিনি যখন খাদীজাকে বললেন,

إِنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي" ، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُقِرِّي الضَّيْفَ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

"আমি আমার নিজের জীবন নাশের আশঙ্কা করছি, খাদীজা তখন বললেন, কখনোই নয়; আল্লাহ তা'আলা আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সদা সত্য কথা বলেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন। বঞ্চিত ও অভাবীগণের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। মেহমানদারী করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন।[১১৫]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজ থেকে মিথ্যাবাদি হওয়ার আশঙ্কা করেননি। কারণ তিনি নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন যে, তিনি মিথ্যা বলেন না। তিনি কেবল ভয় করেছেন যে, শত্রুরা তার বিরোধীতা শুরু করবে কি না এবং তারা তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে সাব্যস্ত করেন কি না। তাই খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার উপরোক্ত গুণাবলী উল্লেখ করে আশ্বস্ত করলেন যে, এমনটি হওয়া অসম্ভব। কারণ তাকে সর্বোত্তম চরিত্র ও সুমহান গুণাবলীসহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কিত নীতি হলো, তিনি যাকে প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুণাবলীসহ সৃষ্টি করেন, তাকে তিনি কখনো লাঞ্ছিত করেন না।

এমনি নাজ্জাশী ছাহাবীদের থেকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ জানার পর এবং তাদের নিকট থেকে কুরআন শ্রবণ করার পর বললেন,

إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ

নিশ্চয় এ বাণী এবং মূসা (আলাইহিস সালাম) যা নিয়ে এসেছেন, তা একই উৎস থেকে বের হয়েছে।[১১৬]

وَكَذَلِكَ وَرَقَةُ ابْنُ نَوْفَلٍ، لَمَّا أَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا رَآهُ، وَكَانَ وَرَقَةُ [قَدْ] تَنَصَّرَ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: "أَيْ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ مَا يَقُولُ، فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا رَأَى فَقَالَ: هَذَا [هُوَ] النَّامُوسُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى

এমনি যখন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তার চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যার নিকট গেলেন, তখন ওরাকাও অনুরূপ কথা বলেছেন। ওরাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীক অনুযায়ী তিনি ইঞ্জিলের অনেকাংশ ইবরানী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে তার ভাতিজা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে সব কথা শুনতে বললেন। ওরাকা তার ভাতিজার ঘটনা শুনতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

১১৫. ছ্বহীহ মুসলিম ১৬০, ছ্বহীহ বুখারী ৪৯৫৩।
১১৬. হাসান: সীরাতে ইবনে ইসহাক, (১/৩৫৭-৩৬৩), ইবনে হিশাম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে কাসীর।

সাল্লাম তাকে তার সব ঘটনা শুনালেন। ওরাকা তাকে বললেন, এ সে ফেরেশতা যাকে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট আল্লাহ নাযিল করেছিলেন।[১১৭]

وَكَذَلِكَ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، طَلَبَ مَنْ كَانَ هُنَاكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَدْ قَدِمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى الشَّامِ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ أَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ أَبَا سُفْيَانَ، وَأَمَرَ الْبَاقِينَ إِنْ كَذَبَ أَنْ يُكَذِّبُوهُ، فَصَارُوا بِسُكُوتِهِمْ مُوَافِقِينَ لَهُ فِي الْأَخْبَارِ، سَأَلَهُمْ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَقَالُوا: لَا، وَسَأَلَهُمْ: أَهْوَ ذُو نَسَبٍ فِيكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَسَأَلَهُمْ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَقَالُوا: لَا، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْهِ كَذِبًا، وَسَأَلَهُمْ: هَلِ اتَّبَعَهُ ضُعَفَاءُ النَّاسِ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَذَكَرُوا أَنَّ الضُّعَفَاءَ اتَّبَعُوهُ؟ وَسَأَلَهُمْ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَسَأَلَهُمْ: هل يرجع أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ سُخْطَةً لَهُ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَقَالُوا: لَا، وَسَأَلَهُمْ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ؟ فَقَالُوا: يُدَالُ عَلَيْنَا مَرَّةً وَنُدَالُ عَلَيْهِ أُخْرَى، وَسَأَلَهُمْ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَسَأَلَهُمْ: بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَقَالُوا: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. وَهَذِهِ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ مَسَائِلَ، ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمْ مَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْأَدِلَّةِ، فَقَالَ: سَأَلْتُكُمْ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَقُلْتُمْ: لَا، قُلْتُ: لَوْ كَانَ فِي آبَائِهِ [مِنْ] مَلِكٍ لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكُمْ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ [فِيكُمْ] أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَقُلْتُمْ: لَا، فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ [قَبْلَهُ] لَقُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكُمْ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَقُلْتُمْ: لَا، فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثم يذهب فيكذب على الله تعالى، وَسَأَلْتُكُمْ أَضُعَفَاءُ النَّاسِ يَتْبَعُونَهُ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتُمْ: ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، يَعْنِي فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: وَسَأَلْتُكُمْ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَقُلْتُمْ، بَلْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكُمْ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ سُخْطَةً لَهُ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَقُلْتُمْ: لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ

১১৭. ছহীহ বুখারী হা/৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৬০।

এমনি রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রোমের সম্রাটের কাছে চিঠি লিখলেন, তখন সে সময় সেখানে যে সমস্ত আরব লোক উপস্থিত ছিল, তাদেরকে ডাকলেন। তখন আবু সুফিয়ান এক বাণিজ্যিক কাফেলায় শরীক হয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রোমের সম্রাট তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে উপস্থিত আরবদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বাকীদেরকে বললেন, তারা যেন আবু সুফিয়ান মিথ্যা বললে সাথে সাথে তা ধরিয়ে দেয়। সুতরাং হিরাক্লিয়াস প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং আবু সুফিয়ান সেসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। বাকীরা চুপ থেকে তার সংবাদকে সমর্থন করে যাচ্ছিল। হিরাক্লিয়াস যেসব প্রশ্ন সেদিন করেছিলেন, তার মধ্যে নিম্নের প্রশ্নগুলো অন্যতম। তিনি আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলেন, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কি? আবু সুফিয়ান বললো না। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তার পূর্বে অন্য কেউ অনুরূপ কথা বলেছে কি? আবু সুফিয়ান বললো, না। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বংশের লোক? আবু সুফিয়ান বললো, হ্যাঁ। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি বর্তমানে যা বলছে, তোমরা কি এর পূর্বে কখনো তার প্রতি মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছো? আবু সুফিয়ান বলল, আমরা তার উপর কখনো মিথ্যা বলার অভিযোগ পেশ করতে পারিনি। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী লোকেরা তার অনুসরণ করেছে? না দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা? আবু সুফিয়ান বলল, দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে? আবু সুফিয়ান বললো তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ তার দীন গ্রহণ করার পর দোষ-ত্রুটি দেখে পুনরায় দীন পরিত্যাগ করে কি? আবু সুফিয়ান বলল, না। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তার সাথে কখনো যুদ্ধ করেছো? আবু সুফিয়ান বললো, হ্যাঁ। হিরাক্লিয়াস এবার তাদের মাঝে এবং তার মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আবু সুফিয়ান বললো, যুদ্ধের ফলাফল আমাদের ও তার মধ্যে ঘূর্ণায়মান। কখনও তিনি বিজয়ী হয়েছেন আবার কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি ওয়াদা ভঙ্গ করেন? আবু সুফিয়ান বললো, না। তবে বর্তমানে আমরা তার সাথে একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না তিনি এতে কি করবেন। আবু সুফিয়ান বলেন, এ কথাটি ব্যতীত আমি তার বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার সাহস পেলাম না। হিরাক্লিয়াস বললেন, তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? আবু সুফিয়ান বললো, তিনি আমাদেরকে বলেন, এক আল্লাহর ইবাদত করো। তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না। তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব বস্তুর উপাসনা করত তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদেরকে ছলাতের আদেশ দেন। তিনি আরো আদেশ দেন, তোমরা সত্য বলো, অন্যায় থেকে বিরত থাকো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। এভাবে হিরাক্লিয়াস দশাধিক প্রশ্ন করলেন। অতঃপর এগুলোর মধ্যে তার নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ রয়েছে, তাও উল্লেখ করলেন। সম্রাট আবু সুফিয়ানকে বললেন, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কি? তুমি বলেছো,

না। তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যদি কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি তার পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে অন্য কেউ এরূপ কথা বলেছে কি? তুমি বলেছো না। সুতরাং আমি বলছি, ইতিপূর্বে যদি কেউ এ ধরণের কথা বলত, তাহলে আমি বলতাম, তিনি তার পূর্বসূরি ব্যক্তির কথাই বলছেন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বর্তমানে তিনি যা বলছেন, ইতিপূর্বে তোমরা কি কখনও তার উপর মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছো? তুমি বলেছো, না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়ে তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, সম্মানিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তার অনুসরণ করেছে, না দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা? তুমি বলেছা, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তার অনুসরণ করছে। মূলত দুর্বল ও অসহায়গণই নাবী-রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ শুরুর দিকে দুর্বলরাই নাবী-রসূলদের দীন কবুল করে। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছো, তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নিশ্চয়ই ঈমানের বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে, যতক্ষণ না তা পূর্ণতায় রূপ নেয়। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার দ্বীনে দিক্ষীত হওয়ার পর নাখোশ হয়ে কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে কি? তুমি বলেছা, না। ঈমানের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন এরূপই হয়ে থাকে।[১১৮]

এগুলোই সত্যের সবচেয়ে বড় দলীল। বাতিল ও মিথ্যার মুখোশ পরিশেষে অবশ্যই উন্মুক্ত হয়। সত্যের সন্ধানীরা তখন মিথ্যা পরিহার করে। আর যারা সত্যের সন্ধানী নয়, তারা তা থেকে সবসময় দূরে থাকে। মূলত মিথ্যা সামান্য পরেই পরাভূত হয়। হিরাক্লিয়াস বলেন, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে? তুমি বলেছো, যুদ্ধের ফলাফল আমাদের ও তার মধ্যে ঘূর্ণায়মান। কখনও তিনি বিজয়ী হয়েছেন আবার কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি। রসূলগণের অবস্থা ঠিক এ রকম। তাদেরকে কখনো বিপদাপদ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করা হয়। অতঃপর তাদের পরিণাম ভালো হয়। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছো, না। প্রকৃতপক্ষে রসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তারা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। হিরাক্লিয়াসের এ কথা বলার কারণ হলো, তিনি রসূলদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে বিজয়ী করেন আবার কখনো তাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। আর তারা কখনোই গাদ্দারী করেন না। সুতরাং হিরাক্লিয়াস অবগত ছিলেন যে, এগুলো সত্য নাবীর আলামত। আর সত্য নাবী-রসূল ও মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সুন্নাত হলো, তিনি তাদেরকে সুখ-শান্তি ও বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধৈর্যধারণ করার মর্যাদা লাভ করেন।

---

১১৮. ছ্বহীহ বুখারী ৭।

ছ্বহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

"ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ফায়ছালাই করেন না কেন, তাই তার জন্য ভালো। মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি হয় না। মুমিন বান্দার কল্যাণ হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর মুমিন ব্যক্তির অকল্যাণ হলে ধৈর্যধারণ করে। এতেও তার জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে"।[১১৯]

উহুদ যুদ্ধে মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জয়লাভ করার মধ্যে কী হিকমতে ইলাহী রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৩৯-১৪১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

"লোকেরা কি মনে করেছে, আমরা ঈমান এনেছি কেবল এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরা আনকাবুত: ২) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও তার হিকমত সম্পর্কে অনুরূপ আরো অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, যা বিবেক-বুদ্ধিকে হয়রান করে দেয়।

---

১১৯. ছ্বহীহ মুসলিম, (৮/২২৭)

হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নের মধ্যে আরো রয়েছে যে, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? তুমি বলেছো যে, তিনি তোমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের আদেশ দেন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেন এবং মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করেন। তোমাদেরকে ছলাতের আদেশ দেন, সত্য বলতে, পবিত্র থাকতে এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ করেন। সে সঙ্গে তিনি তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ দ্বারা পূজিত বস্তুর পূজা করতে নিষেধ করেন। এগুলো নাবীদের গুণাবলী। আমি জানতাম যে, একজন নাবী আগমন করবেন। তবে আমি ধারণা করতাম না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি তার কাছে যাই। আমি যদি রোমের রাজত্বের মালিক না হতাম, তাহলে আমি অবশ্যই তার কাছে চলে যেতাম। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে অচিরেই তার রাজত্ব আমার এ দু'পা রাখার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

আবু সুফিয়ান বিন হারবকে উদ্দেশ্য করে হিরাক্লিয়াস উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। আবু সুফিয়ান তখনো ছিল কাফের। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সে তখনো কঠোর শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতো। আবু সুফিয়ান বলেন, হিরাক্লিয়াসের রাজ দরবার থেকে বের হওয়ার সময় আমি সঙ্গীদের সাথে বললাম, ইবনে আবী কাবশার (মুহাম্মাদের) ব্যাপারটি তো দেখছি অনেক বড় আকার ধারণ করেছে। রোমকদের সম্রাটও তাকে অনেক বড় করে দেখছে। আমি সবসময়ই বিশ্বাস করতাম যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন জয়লাভ করবে। পরিশেষে আল্লাহ আমাদের মধ্যে ইসলাম ঢুকিয়ে দিলেন। আমি তখনো ইসলামকে অপছন্দ করতাম।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষের অন্তরে অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে যে বিশ্বাস অর্জিত হয়, তা থেকে কতিপয় বিষয় দ্বারা সেই পরিমাণ বিশ্বাস অর্জিত হয় না। বরং মানুষ যে পরিতৃপ্তি, কৃতজ্ঞতা, খুশী ও দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, তা অনেকগুলো জিনিস একসাথে একত্রিত হওয়ার কারণেই অর্জিত হয়। তা থেকে কোনো কিছু বাদ পড়লে ঐ জিনিসগুলোর কতিপয়ের দ্বারা তা অর্জিত হয় না। বরং কতিপয়ের দ্বারা কেবল অপূর্ণ তৃপ্তি কিংবা আংশিক আনন্দ অথবা সামান্য দুঃখ-কষ্ট অনুভব হয়।

কোনো খবরের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের কথাটিও অনুরূপ। খবরে ওয়াহেদ বা একক ব্যক্তির সংবাদ দ্বারা এক প্রকার ধারণা অর্জিত হয়। অন্যজনের খবরের দ্বারা তা শক্তি অর্জন করে। পরিশেষে তা দ্বারা অকাট্য ইলম হাসিল হয়। এভাবে কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের ইলম বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয়। এমনি সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী হওয়ার দলীলগুলো শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তার নাবী-রসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে যে কারামত ও সম্মান প্রদান করেছেন, তার প্রভাব ও প্রমাণ চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। সে সঙ্গে কাফেরদের উপর যে আযাব ও শাস্তি নাযিল করেছেন, তাও চিরস্থায়ী হয়ে আছে। যেমন নূহ

আলাইহিস সালামের জাতিকে মহাপ্লাবন দ্বারা প্লাবিত করা, ফেরাউন ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে মারা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা শুআরায় পরপর একাধিক নাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা, নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং অন্যান্য নাবীদের ঘটনা। প্রত্যেক ঘটনার শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

"এ ঘটনার মধ্যে একটি বিরাট নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশ মুমিন নয়। নিশ্চয় তোমার রব পরাক্রমশালী ও দয়াময়?" *(সূরা শুআরা: ৬৭-৬৮)*

মোট কথা, পৃথিবীতে এমন লোক রয়েছে, যারা বলে থাকে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল! আরেক দল লোক তাদের অনুসরণ করেছে। আরেক দল লোক তাদের বিরোধীতা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ও মুমিনদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের পরিণাম ভালো করেছেন। তাদের শত্রুদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। এ কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নাবী-রসূলদের অনুসারীদেরকে পুরস্কৃত করা এবং তাদের বিরোধীদের শাস্তি প্রদানের খবরগুলো অতীতের পারস্য সম্রাট এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের খবরাদির চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবেই বর্ণনা করা হয়। যেমন বুকরাত, জালিনুস, বাতলাইমুস, সুকরাত, আফলাতুন, এরিষ্টেটোল এবং তাদের অনুসারীদের খবরাদির চেয়ে নাবী-রসূল ও তাদের অনুসারীদের খবরাদি অধিক সুস্পষ্ট।

বর্তমানে আমরা যখন মুতাওয়াতির সূত্রে নাবী-রসূলদের অনুসারী এবং তাদের শত্রুদের খবরসমূহ জানতে পেরেছি, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, নাবী-রসূলগণই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যবাদী ছিলেন। একাধিক মাধ্যম ও পদ্ধতিতেই আমরা এটি অবগত হতে পেরেছি।

(১) তারা তাদের জাতিকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের অনুসারীগণ বিজয়ী হবে, তাদের শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে এবং তাদের পরিণাম ভালো ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

(২) আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূল ও তার অনুসারীদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন। যে অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতে তা সংঘটিত হয়েছে যেমন ফেরাউনের ডুবে মরা, বন্যার মাধ্যমে নূহ আলাইহিস সালামের জাতি ধ্বংস হওয়া এবং তাদের অন্যান্য অবস্থা যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তা বুঝতে পারবে, সে রসূলদের সত্যতা সম্পর্কে অবশ্যই জানতে পারবে।

(৩) নাবী-রসূলদের শরী'আত এবং তার বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে যারা জানতে পারবে, তাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে, নাবী-রসূলগণই ছিলেন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। কোনো মিথ্যুক ও মূর্খদের দ্বারা এটি বুঝা সম্ভব নয়। নাবী-রসূলগণ যে মঙ্গল, রহমত, হিদায়াত, কল্যাণ এবং সৃষ্টির জন্য যেসব উপকারী উপদেশ নিয়ে এসেছেন ও তাদেরকে

ক্ষতিকর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সে সম্পর্কে যারা জানতে পারবে তারা জানতে সক্ষম হবে যে, তা এমন একজন দয়াবান, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভব, যিনি সৃষ্টির জন্য কল্যাণ ও উপকার ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেন না।

নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের যেসব মুজেযা ও প্রমাণ রয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার স্থান এটি নয়। অন্যস্থানে তা আলোচনা করা হয়েছে। অনেক আলেম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী এবং অন্যান্য আলেমগণ এ বিষয়ে একটি মূল্যবান কিতাব লিখেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াতের মধ্যে আপত্তির শামিল। সে সঙ্গে তার প্রতি যুলুম ও অজ্ঞতার সম্বন্ধ করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ কথার বিস্তারিত বিবরণ এ যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এক শ্রেণীর মানুষের নিকট সত্য নাবী না হয়ে থাকেন; বরং তারা যদি তাকে একজন যালেম শাসক মনে করে থাকে, তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমন সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল, যার কারণে তিনি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করেছেন, কোনো কোনো জিনিসকে হালাল ও কোনো কোনো জিনিসকে হারাম করেছেন, ফরযসমূহ নির্ধারণ করেছেন, শরীয়তের বিধি-বিধান চালু করেছেন, পূর্বের শরীয়তসমূহ বাতিল করেছেন, বিরোধীদের গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, হত্যা করেছেন, তাদের নারীদেরকে দাসীতে পরিণত করেছেন, তাদের ধন-সম্পদকে গণীমত হিসাবে ব্যবহার করেছেন, শিশুদের গোলাম বানিয়েছেন এবং বাড়িঘর দখল করেছেন। এভাবেই তার জন্য পৃথিবীর বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ের সবগুলোই তিনি আল্লাহর হুকুম ও পছন্দ অনুযায়ী করেছেন বলে চালিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা একটানা ২৩ বছর পর্যন্ত হকপন্থীদের উপর তার এরূপ অপকর্ম দেখেছেন, তার সমস্ত কাজ-কর্ম সমর্থন করেছেন, তাকে সাহায্য করেছেন, তার কাজকর্মকে সমুন্নত করেছেন এবং অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে তার জন্য বিজয়ের পথ সহজ করে দিয়েছেন। এমনটি হতেই পারে না। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তা'আলা তার অন্যায় দু'আ কবুল করেছেন, তার শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করেছেন। এ রকম ধারণা তাদের পক্ষ হতে চরম মিথ্যাচার, আল্লাহর নামে অপবাদ ও যুলুম ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, নাবীদের শরী'আতকে বাতিল ও পরিবর্তন করে এবং আল্লাহর বন্ধুদেরকে হত্যা করে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নাবী হিসাবে বিশ্বাস না করার অর্থ এও দাড়ায় যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত সত্যের পথিকদের বিরুদ্ধে তার জন্য আল্লাহর সাহায্য অব্যাহত ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার কাজের সমর্থন করেছেন, ডান হাত দিয়ে তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেননি এবং তার ঘাড়ের রগ কেটে দেননি। এমন ধারণার ফলাফল এ দাড়ায় যে, এ সৃষ্টিজগতের কোনো স্রষ্টা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক নেই। নাউযুবিল্লাহ।

যদি এর কোনো প্রজ্ঞাবান ও ক্ষমতাবান ব্যবস্থাপক থাকতেন, তাহলে তাকে প্রতিহত করতেন, তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন এবং সৎকর্মশীলদের জন্য তাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বানাতেন। যালেম রাজা-বাদশাহদের জন্য এ ছাড়া অন্য কিছু শোভনীয় নয়। সুতরাং যিনি রাজাধিরাজ এবং যিনি সর্বাধিক ন্যায় বিচারক, তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়তে পারেন না।

মূলকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন, তার দাওয়াতকে বিজয়ী করেছেন এবং সত্য নাবী হিসাবে সকল দেশের সকল মানুষের নিকট তার সাক্ষ্যকে প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে আমরা অস্বীকার করিনা যে, পৃথিবীতে অনেকেই নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেছিল। এমনকি অনেকের শক্তিও অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি এবং তারা দীর্ঘকাল নবুওয়াতের দাবির উপর টিকেও থাকতে পারেনি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তার রসূল এবং রাসূলের অনুসারীদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তারা তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দিয়েছেন। নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে চলে আসা আল্লাহ তা'আলার নীতি এটিই। কাফেররাও এ নীতি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾

"এসব লোক কি বলে যে, এ ব্যক্তি কবি, যার ব্যাপারে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি। তাদেরকে বলো, ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি"। *(সূরা তূর: ৩০-৩১)*

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতা, হিকমত ও কুদরতের দাবি হলো, যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, তিনি তাদেরকে দীর্ঘ দিন অবকাশ দিবেন না। তাদেরকে ধ্বংস করে তিনি তার মুমিন বান্দাদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিবেন। আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনাকারীদের ব্যাপারে এ নীতি বহু আগে থেকেই চলে হয়ে আসছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"এ লোকেরা কি বলে, এ ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ তৈরী করেছে? আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার দিলের উপর মোহর মেরে দিতেন। তিনি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং নিজের আদেশে সত্যকে প্রমাণ করে দেখান। তিনি অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন"। *(সূরা আশ-শূরা: ২৪)*

"তোমার দিলের উপর মোহর মেরে দিতেন" এ বাক্যের মর্মার্থ বাস্তবায়ন হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন সুদৃঢ় সংবাদ প্রদান করেছেন, যার

সাথে কোনো শর্ত জড়িয়ে দেননি। তা হলো তিনি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾

"তারা আল্লাহর যথাযথ বড়ত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি, যখন তারা বলল, আল্লাহ কোনো মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি"। *(সূরা আল-আনআম: ৯১)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ তা'আলা কাউকে রসূল হিসাবে পাঠাননি এবং কারো সাথে কথা বলেননি, তারা আল্লাহ তা'আলার যথাযথা বড়ত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি।

নাবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য

আলেমগণ নাবী ও রাসূলের মধ্যে একাধিক পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে সর্বোত্তম কথা হলো, যার নিকট আল্লাহ তা'আলা আকাশের খবর পাঠিয়েছেন, তাকে যদি অন্যের নিকট সে খবর পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়, তাহলে তিনি হবেন নাবী ও রসূল। আর তাকে যদি অন্যের নিকট সে খবর পৌঁছানোর আদেশ না দেয়া হয়, তাহলে তিনি হবেন নাবী; রসূল নন।[১২০] সুতরাং রসূল নাবীর চেয়ে অধিকতর খাস। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা নাবীদের সংখ্যার চেয়ে কম। সে হিসেবে প্রত্যেক রসূলই নাবী, কিন্তু প্রত্যেক নাবী রসূল নন। যাদের

---

১২০. কোনো কোনো আলেম নাবী ও রাসূলের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করাকে সমর্থন করেন না। তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা কাউকে নাবী বানিয়ে পাঠাবেন এবং তাকে তাবলীগ করার আদেশ দিবেন না, -এটি কিভাবে সম্ভব? এমনটি হতেই পারে না। কেননা কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল প্রমাণ করে যে, নাবীগণও তাবলীগ করেছেন। যেই হাদীছে ৭০ হাজার লোক ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে বলে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি দেখলাম, কোনো কোনো নাবীর সাথে মাত্র একজন অনুসারী রয়েছে। আবার কোনো কোনো নাবীর সাথে রয়েছে দুইজন। সেই সঙ্গে এমন নাবীও দেখলাম, যার সাথে কোনো অনুসারী নেই"। সুতরাং তাবলীগ করা ব্যতীত অনুসারী হয় কিভাবে? এতে বুঝা গেল যারা নাবী ও রাসূলের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য করেছেন, তাদের কথা সঠিক নয়। শাইখ ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ নাবী ও রাসূলের মধ্যে যে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন, এটি অপ্রাধান্য প্রাপ্ত মত।

অতএব, নাবী ও রাসূলের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, যাকে আল্লাহ তাআলা নতুন শরী'আত দিয়ে কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছেন এবং তার মাঝে ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে তিনি হলেন রসূল। আর যাকে পূর্ববর্তী রাসূলের শরী'আতকে নবায়ন ও সংশোধন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, তিনিই হলেন নাবী। সে হিসাবে নাবী ও রসূল উভয়কেই তাবলীগ করার আদেশ করা হয়েছে এবং তারা উভয়েই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিকট রসূল পাঠানো হয়েছে, তাদের দিক থেকে রেসালাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। কারণ নাবী ও সাধারণ মানুষগণ তাদের দাওয়াতের আওতাধীন। নবুওয়াত রিসালাতের অংশ বিশেষ। রিসালাতের বাহকগণ অধিকতর খাস বিশেষত্বের অধিকারী। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা নাবীদের তুলনায় কম এবং রেসালাত ও রাসূলের মর্যাদা নবুওয়াত ও নাবীর মর্যাদার চেয়ে বেশী।

সৃষ্টির জন্য রসূল পাঠানো আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বিরাট নেয়ামত স্বরূপ। বিশেষ করে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো আমাদের জন্য সর্ববৃহৎ নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি তাদেরই মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়ে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তার আয়াত তাদেরকে পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৬৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সৃষ্টিজগতের জন্য আমার রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি"। *(সূরা আল আম্বীয়া: ১০৭)*

(৩০) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তিনি সর্বশেষ নাবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রসূলগণের নেতা এবং সৃষ্টিকুলের রবের হাবীব।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত"। *(সূরা আহযাব: ৪০)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لايعيبون سواها فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ»

"আমার ও আমার পূর্ববর্তী নাবীদের উপমা হচ্ছে যেমন একটি প্রাসাদ, যা অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে মাত্র একটি ইটের স্থান খালী রাখা হয়েছে। লোকেরা ঐ একটি ইটের স্থান ব্যতীত প্রাসাদটির সুন্দর নির্মাণ শৈলীর প্রশংসা করতে লাগল। এ ছাড়া তারা আর কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছিল না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি সে এক ইট পরিমাণ খালী জায়গা পূর্ণ করে দিয়েছি। আমার দ্বারা প্রাসাদটির নির্মাণ কাজ পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। আমার মাধ্যমে রিসালাতের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১২১]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি আল-মাহী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফুরীকে মিটিয়ে দিবেন। আমি আল হাশির। আমার দু'পায়ের নিকট সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে। আমি আল আকিব। আকিব হলেন সর্বশেষ নাবী, যার পরে আর কোনো নাবী নেই"।[১২২]

ছ্বহীহ মুসলিমে ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

১২১. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি ছ্বহীহ। তবে ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে তা নেই। দেখুন, শাইখের তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ্ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ১১৯।

১২২. ইমাম বুখারী ও মুসলিম জুবাইর বিন মুতইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

«وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أمتي بَعْدِي ثَلَاثُونَ كذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزعم أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

"আমার উম্মতের মধ্যে আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। তারা সকলেই নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমি সর্বশেষ নাবী। আমার পর কিয়ামতের পূর্বে আর কোনো নাবী নেই"।[১২৩]

ছ্বহীহ মুসলিমে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ أُعْطِيتُ جوامع الكلم ونُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ»

"আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্যান্য নাবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। (১) আমাকে এমন সংক্ষিপ্ত বাণী প্রদান করা হয়েছে, যার মর্মার্থ খুবই ব্যাপক। (২) শত্রু পক্ষের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারো জন্য তা হালাল করা হয়নি। (৪) সমগ্র যমীনের মাটি আমার জন্য পবিত্র এবং মসজিদ স্বরূপ করা হয়েছে। (৫) আমার পূর্বেকার নাবীগণ প্রেরিত হতেন তাদের গোত্রের লোকদের নিকট। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য" (৫) আমার মাধ্যমে নবুওয়াত খতম করা হয়েছে"।[১২৪]

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি হলেন, মুত্তাকীদের ইমাম। যার অনুসরণ করা হয়, তিনি হলেন ইমাম। অর্থাৎ যাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

"হে নাবী! তুমি বলো: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৩১)*

সুতরাং যারাই তার অনুসরণ করবে এবং তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে, তারাই মুত্তাকী হিসাবে পরিগণিত হবে। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসূলদের নেতা। তিনি বলেন,

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ وأول شافع وأول مشفع»

---

১২৩. আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান। ইমাম আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/৫৪০৬।

১২৪. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫২৩, তিরমিযী হা/১৫৫৩।

"আমি আদম সন্তানের নেতা। তবে এটি কোন অহংকারের বিষয় নয়। আমি সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে"। ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১২৫] শাফা'আতের দীর্ঘ হাদীছের শুরুর দিকে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

« أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"আমি কিয়ামতের দিন সকল মানুষের নেতা হবো"[১২৬]।

নাবীদের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে কিছু কথা

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী ওয়াছেলা বিন আসকা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের বংশধর থেকে বনী কেনানাকে নির্বাচন করেছেন। বনী কেনানা থেকে বাছাই করেছেন কুরাইশকে। কুরাইশ থেকে নির্বাচন করেছেন হাশেমকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বনী হাশেম থেকে বাছাই করেছেন।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, উপরোক্ত কথা তো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার বিরোধী যেখানে তিনি বলেছেন,

«لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِسَاقِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي هَلْ أَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ؟»

"তোমরা আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবো। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি দেখতে পাবো, মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানি না, তিনি কি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন? না কি আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐসব সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা সংজ্ঞাহীন হবে না?"[১২৭] সুতরাং এ হাদীছ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১২৫. তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুত তাফসীর, হাদীছ নং- ৩১৪৮। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: কিতাবুশ শাফাআহ, হাদীছ নং- ৪৩৬৩। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি ছ্বহীহ।

১২৬. ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৪, ছ্বহীহ বুখারী ৪৭১২।

১২৭. ছ্বহীহ বুখারী, হা/২২৩৪।

সাল্লামের বাণী, আমি আদম সন্তানের নেতা। তবে এটি কোন অহংকারের বিষয় নয়' এর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা হবে?

এর জবাব হলো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অন্য নাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, দু'ব্যক্তি পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হল। তাদের একজন ছিল মুসলিম এবং অপরজন ছিল ইহুদী। মুসলিম বলল, ঐ সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মাদকে সৃষ্টিজগতের জন্য নির্বাচন করেছেন। ইহুদী বলল, ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি মূসাকে সৃষ্টিজগতের জন্য নির্বাচন করেছেন। এতে মুসলিম হাত উঠিয়ে ইহুদীর চেহারায় চপেটাঘাত করল এবং বলল, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে জীবিত থাকতেই তুমি এ কথা বলছো? ইহুদী তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে ঐ মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা লোকেরা কিয়ামতের দিন বেহুশ হয়ে পড়বে। আমিও তাদের সাথে বেহুশ হয়ে পড়ব। এরপর আমি সবার আগে চেতনা ফিরে পাবো। আমি তখন দেখতে পাবো যে মূসা আরশের এক পাশ ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার পূর্বেই চেতনা ফিরে পেয়েছেন? না তিনি তাদের একজন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেহুশ হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন।[১২৮]

অহমিকা ও গোঁড়ামি করে এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যদি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যান্য নাবী-রাসূলের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে তা নিন্দনীয়। ঠিক এমনি কোনো মানুষ ক্রোধান্বিত হয়ে এবং গোত্রপ্রীতির কারণে জিহাদের ময়দানে যখন অহমিকা প্রদর্শন করবে, তখন সে বীরত্ব প্রদর্শন প্রশংসনীয় হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এহেন অহমিকা প্রদর্শন করা হারাম করেছেন। মূলত আল্লাহ তা'আলা নাবীদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾

"আমি কতক নাবীকে কতক নাবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

"এ রসূলদের একজনকে আরেকজনের উপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৩)*

---

১২৮. ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৪১১।

সুতরাং জানা গেল, অহংকার করে অথবা কারো মর্যাদা কমানোর জন্য একজন নাবীকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া নিন্দনীয়। এ অর্থেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীও এসেছে, যেখানে তিনি বলেছেন,

«لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»

"তোমরা নাবীদের কাউকে অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না"।

তবে প্রশ্ন হলো এ হাদীছটি ছ্বহীহ কি না?[১২৯] যে হাদীছে মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা এসেছে, সেখানেও এ কথাটি এসেছে। আর তা বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিছ বলেছেন, হাদীছটির মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তবে মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছেও এ অংশটি রয়েছে। সে হাদীছটি ছ্বহীহ । সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে তা ছ্বহীহ।

অন্যান্য আলেমগণ উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে অন্য একটি জবাব দিয়েছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বলেছেন,

لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى

"তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিও না" এবং যেখানে তিনি বলেছেন, "তোমরা নাবীদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না" সেখানে নির্দিষ্টভাবে কোনো নাবীকে অন্য কোনো নাবীর উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং খাসভাবে কতক রসূলকে অন্য কতকের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ وأول شافع وأول مشفع»

"আমি আদম সন্তানের নেতা। তবে এটি কোন অহংকারের বিষয় নয়। আমি সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে" এতে সকল নাবী-রাসূলের উপর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাধান্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাধান্য বর্ণনা করাতে কোনো দোষ নেই। যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি শহরের মধ্যে সর্বোত্তম, তাহলে এতে নির্দিষ্ট করে কারো উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয় না। কিন্তু এটি ঐ কথার বিপরীত যখন শহরের কাউকে নির্দিষ্ট করে বলা হবে, অমুক তোমার চেয়ে উত্তম। শাইখ ইবনে আবীল ইয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি দেখেছি

১২৯. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: শাইখের তাখরীজসহ শারহুল আকীদাহ, আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ১২৮।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) শারহু মা'আনীল আছারে উভয় হাদীছের মধ্যে এভাবেই সমন্বয় করেছেন।

আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, «لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى» "তোমরা আমাকে ইউনূস বিন মাত্তার উপর প্রাধান্য দিও না"।

কোনো কোনো আলেমের কাছে যখন এ হাদীছের ব্যাখ্যা চাওয়া হলো, তখন তিনি বলেছেন, প্রচুর মাল না দিলে তাদের জন্য এর ব্যাখ্যা করা হবে না। যখন তাকে প্রচুর মাল দেয়া হলো, তখন তিনি বললেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যেন তাকে ইউনুস বিন মাত্তার উপর প্রাধান্য না দেয়, কারণ মাছের পেটে থাকা অবস্থায় তিনি আল্লাহর ততটুকু নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেমন তিনি মিরাজের রাতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন। লোকেরা এ ব্যাখ্যাকে একটি বিরাট ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য করেছে।

যারা এটিকে হাদীছ মনে করেছে এবং এর ব্যাখ্যাকে বিরাট কিছু মনে করেছে, তারা আল্লাহর কালাম এবং রাসূলের কালামের শব্দ ও অর্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ হাদীছটি উপরোক্ত শব্দে নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের কোনো লেখক উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে ছ্বহীহ বুখারীর হাদীছের শব্দ হলো,

«لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»

"কোনো বান্দা যেন এ কথা না বলে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম"।

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি বলল, আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম সে মিথ্যা কথা বলল"। এটি সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো মানুষের জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে নিজেকে ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে। তবে হাদীছের মধ্যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইউনুস বিন মাত্তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি মাছ তাকে গিলেছিল, তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ এমন কাজ করেছিলেন, যার কারণে তাকে দোষারোপ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"আর মাছ ওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি"। *(সূরা আম্বীয়া: ৮৭)*

কারো মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সে ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর প্রতি তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা সে এমন কাজ করে না, যার কারণে তাকে দোষারোপ করা যায়। যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করবে, সে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক বান্দাই ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ করে থাকে। তারা সকলেই

﴿لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ বলে থাকে। সর্বপ্রথম নাবী এবং সর্বশেষ নাবীও অনুরূপ দু'আ করেছেন। সর্বপ্রথম নাবী আদম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো"। *(সূরা আল-আরাফ: ২৩)*

সর্বশেষ নাবী, সর্বোত্তম নাবী এবং নাবীদের নেতা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছে বলেছেন,

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

"আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখমন্ডল ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার ছ্বলাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি এমন বাদশাহ যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি আমার প্রভু। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো। তুমি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি আমার থেকে খারাপ চরিত্রগুলো দূর করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার থেকে খারাপ চরিত্রগুলো দূর করতে সক্ষম নয়। হে আমার প্রভু! আমি তোমার হুকুম পালন

করতে প্রস্তুত ও উপস্থিত আছি। আমি তোমার আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার উভয় হস্তেই নিহিত। অকল্যাণকে তোমার দিকে সম্বোধিত করা শোভনীয় নয়। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার দিকে মুখাপেক্ষী ও নিজেকে তোমার উপর সোপর্দকারী এবং তোমার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তনকারী। তুমি বরকমতময় ও মহিমান্বিত। তোমার কাছেই আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটই তাওবা করছি।[১৩০]

আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ছ্বলাত শুরু করার সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ পাঠ করতেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তার দু'আয় বলেছেন,

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"হে আমার রব! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান"। *(সূরা কাসাস: ১৬)*

ইউনুস আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾

"অতএব তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়ছালা পর্যন্ত ধৈর্যসহ অপেক্ষা করো এবং মাছ ওয়ালার মতো হয়ো না"। *(সূরা কালাম: ৪৮)*

এখানে আমাদের নাবীকে ইউনুস আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাকে উলুল আযম রসূলদের অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা আহকাফের ৩৫ নং আয়াতে তিনি বলেন,

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

"অতএব, তুমি সবর করো, যেমন সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী রসূলগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবে না"।

সুতরাং কেউ বলতে পারে যে, আমি ইউনুসের চেয়ে ভালো। তবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, উত্তম ব্যক্তির জন্য এটি জায়েয নয় যে, সে তার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর অহংকার করবে। আর সে যদি প্রকৃতপক্ষে উত্তম না হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে তার জন্য অহমিকা প্রদর্শন করা বৈধ হবে? কেননা যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করেন না।

---

১৩০. ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: রাতের ছ্বলাতের দু'আ।

ছ্বহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

«أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»

"আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমরা বিনয়ী হও। কেউ যেন অন্য কারো উপর গর্ব না করে এবং তাদের কেউ যেন অন্যের উপর যুলুম না করে"। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সাধারণ মুমিনদের উপর অহংকার করতে নিষেধ করেছেন, তাই একজন মর্যাদাবান নাবীর উপর অহংকার করা কিভাবে নিষেধ হবে না? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» "কোনো বান্দা যেন এ কথা না বলে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম"। এ নিষেধাজ্ঞা সকলের জন্য। কেউ যেন নিজেকে ইউনুস আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে না করে এবং তার উপর যেন অহংকার না করে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«مَنْ قَالَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ»

যে ব্যক্তি বলল, আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ, সে মিথ্যা বলল"। সুতরাং যদি ধরেও নেয়া হয় সে ইউনুস (আলাইহিস সালাম) থেকে উত্তম, তাহলে তার এ কথার মাধ্যমে একজন মর্যাদাবান নাবীর মর্যাদা কমানো হবে। তাই সে মিথ্যাবাদী হিসাবে গণ্য হবে।[১৩১]

কোনো নাবী এ কথা বলতে পারে না। কোনো ব্যক্তি এ কথা বলেছে, এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে সাধারণভাবে এটি বলা হয়েছে যে, কেউ যদি বলে। যদিও কোনো নাবীর পক্ষে এ ধরণের কথা বলা অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করো, তবে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। *(সূরা আয-যুমার: ৬৫)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা শির্ক হওয়া অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বলা হয়েছে। কুরআন ও হাদীছে আমলগুলো নির্ধারণ ও বর্ণনা করার সাথে সাথে সৎ আমলের

---

১৩১. এখন প্রশ্ন হলো কেউ কি এই কথা বলেছে যে, সে নাবীদের থেকে উত্তম? এর জবাব হলো এ রকম মানুষ রয়েছে, যারা নাবীদের চেয়ে তাদের অলীদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তারা বলে অলীগণ এমন সাগরে সাতার কাটেন, যার কিনারায় স্বয়ং নাবীগণ দাঁড়িয়ে থাকেন। শিয়া-রাফেযীরা বলে থাকে, তাদের ইমামদের এমন মর্যাদা রয়েছে, যে পর্যন্ত কোনো কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নাবী-রসূলগণও পৌঁছতে পারে না।

বিনিময়ে ছাওয়াবের ওয়াদা ও পাপ কাজ করলে শাস্তির ভয় দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। আসমানী কিতাবসমূহে নাবী-রসূলদেরকে সম্বোধন করে বেশ কিছু কথা বলা হলেও তা দ্বারা মূলত তাদের উম্মত উদ্দেশ্য।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সমস্ত আদম সন্তানের নেতা। তিনি যদি এ সংবাদ না দিতেন, তাহলে আমরা এ কথা জানতে পারতাম না। কেননা তার পরে আর এমন কোনো নাবী নেই, যিনি আমাদেরকে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন। অনুরূপ তিনি তার পূর্বের নাবীদের ফযীলত সম্পর্কেও আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বলেছেন, আমি আদম সন্তানের নেতা, তার পরেই তিনি এক বর্ণনায় বলেছেন, এতে আমার অহংকার করার কিছুই নেই।

সুতরাং আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো মুসলিম কি এ কথা বলতে পারে, যাকে মিরাজের রাত্রিতে তার রবের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যিনি আল্লাহর নৈকট্যশীল সম্মানিত বান্দা হিসাবে স্বীকৃত তার মর্যাদা ঐ বান্দার মতই, যাকে মাছ গিলে ফেলেছিল ও যার কাজের কারণে দোষারোপ করা হয়েছিল? সম্মানিত নৈকট্যশীল বান্দার মর্যাদা আর পরীক্ষায় নিপতিত দোষারোপকৃত বান্দার মর্যাদা সমান হয় কিভাবে? মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা হয়েছে ও তাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে নৈকট্য প্রদান করা হয়েছে এবং ইউনুস আলাইহিস সাল্লামকে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং পানির নিচে মাছের পেটে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং হে পাঠক আপনি এ বানোয়াট হাদীছটির প্রতি খেয়াল করুন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

«لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى» "তোমরা আমাকে ইউনূস বিন মাত্তার উপর প্রাধান্য দিও না"। যেই বিকৃত অর্থে এ হাদীছের শব্দগুলো রচনা করা হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা বলেননি। এর ব্যাখ্যায় এক শ্রেণীর লোক বলেছে, এখানে ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে নিষেধ করার কারণ হলো, ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাছের পেটে ঢুকে আল্লাহ তা'আলার সে পরিমাণ নিকটে চলে গেছেন, যে পরিমাণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন মিরাজের রাতে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহন করে স্বয়ং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের এ ব্যাখ্যা বাতিল। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি নাকোচ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১৩২]

---

১৩২. আশায়েরাদের ইমাম জুওয়াইনী উপরোক্ত বানোয়াট হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলার চেষ্টা করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে নন এবং তিনি তার বান্দাদেরও উপরে নন। তিনি হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর সমুদ্রের পানির নীচে থাকা এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে সাত আসমানের উপরে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যাওয়া একই রকম। অর্থাৎ উভয় অবস্থার মাধ্যমে

আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে। এ অর্থে আলেমগণ একহাজারেরও বেশী দলীল

তারা উভয়েই আল্লাহর একই রকম নৈকট্য লাভ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, তোমরা আমাকে ইউনুস আলাইহিস সালামের উপর প্রাধান্য দিও না। সুতরাং যে সৃষ্টি গভীর সমুদ্রের পানির নীচে অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে আর যে সৃষ্টি সাত আসমানের উপরে রয়েছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে কিংবা তার নিকটে থাকার দিক দিয়ে তারা উভয়ে সমান। জুওয়াইনীর এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ বিবেক-বুদ্ধির দলীল দাবি করে যে, উর্ধ্বজগতের সৃষ্টি এবং নিম্নজগতের সৃষ্টি আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে সমান নয়, মাটির নীচের এবং সমুদ্রের গভীর পানির নীচের সৃষ্টি আর উর্ধ্বাকাশের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ একই রকম মর্যাদার অধিকারী নয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে বিরাট নৈকট্য ও সম্মান দান করেছেন। ঐদিকে আল্লাহ তাআলা ইউনুস (আলাইহিস সালাম) কে দোষারোপ করে মাছের পেটে ঢুকিয়ে সাগরের গভীর পানির নীচে নামিয়েছেন। ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সেখানে অবস্থানকালে ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলেও উভয়ের নৈকট্য এক সমান নয়। মোটকথা, জুওয়াইনী বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে নন, সাত আসমানের উপরেও নন; বরং إن الله في كل مكان "আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান"। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে।

ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত হাদীছ রচনাকারী এবং হাদীছটি ব্যাখ্যায় সুফীরা যে বাতিল ব্যাখ্যা করেছে, তার কড়া প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, «لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى» "তোমরা আমাকে ইউনূস বিন মাত্তার উপর প্রাধান্য দিও না"। এ শব্দে হাদীছটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে ছ্বহীহ বুখারীর হাদীছের শব্দ হলো, «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» "কোনো বান্দা যেন এ কথা না বলে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম"। এ শেষোক্ত ছ্বহীহ হাদীছটি বলার কারণ হলো, কেউ বলতে পারে আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম। কারণ তিনি রাগ করে পালিয়ে গেছেন। আল্লাহর অনুমতি নেননি। তিনি মনে করেছিলেন, আল্লাহ তাকে ধরবেন না কিংবা দুনিয়াকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দিবেন না। পরিশেষে তাকে ময়দানে নিক্ষেপ করা হলো। এর আগে তাকে একটি মাছ গিলেছিল। তাই আমি তার চেয়ে উত্তম। কেননা আমি এ রকম কিছু করিনি। কেউ এ রকম ধারণা পোষণ করতে পারে। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। ইউনুস (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলার নাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে বিরাট নিদর্শন ও মুজেযা প্রকাশ করেছেন। মাছ তাকে নিজের পেটে নিয়ে গভীর পানির অন্ধকারে চলে যাওয়ার পরও তিনি মারা যাননি। মাছ তাকে হজমও করতে পারেনি। নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত তিনি মাছের পেটেই থাকলেন। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার আদেশে মাছ তাকে সমুদ্র সৈকতে নিক্ষেপ করল। তিনি তার উপর একটি লাউ গাছ উদ্গত করলেন। অতঃপর তিনি সুস্থ হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠালেন। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ বা তার চেয়ে বেশী। তারা এবার ঈমান আনল। সুতরাং ইউনুস আলাইহিস সালামের যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। যদিও তিনি ভুল করেছেন। এ ভুল তার মর্যাদাকে কমিয়ে দেয়নি। কারণ তিনি ভুল স্বীকার করেছেন। আদম (আলাইহিস সালাম) ভুল করার পর নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنكون من الخاسرين﴾ "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং আমাদের উপর রহম না করো, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। আমাদের নাবীও একাধিকবার নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। এতে তার মর্যাদা কমে যায়নি।

সুতরাং সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে নাকোচ করার জন্য জুওয়াইনী মাওযু হাদীছের যে ব্যাখ্যা করেছে তা বাতিল। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে নন, -এ কথা বুঝানোর জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইউনুস আলাইহিস সালামের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করা হয়নি। কী কারণে নিষেধ করা হয়েছে, তা উপরে বলা হয়েছে। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, জুওয়াইনী বলেছেন, ইউনুস আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত নন; তিনি সকল সৃষ্টির উপরেও নন। কথিত আছে যে, জুওয়াইনী বলেছিল, আমাকে প্রচুর মাল না দিলে এ হাদীছের ব্যাখ্যা করবো না। লোকেরা যখন তাকে প্রচুর মাল দিল, তখন তিনি তাদেরকে এ বানোয়াট ব্যাখ্যা শুনালেন। এটিকে মূর্খরা বিরাট ব্যাখ্যা মনে করলো। অথচ তা সম্পূর্ণ বাতিল। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ "তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং তিনি সবকিছুর উপরে" এ কথার ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হাবীব

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ তিনি হলেন সৃষ্টিকুলের রবের হাবীব। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর সাব্যস্ত। আর এটি হলো খুল্লাত বা একান্ত বন্ধুত্বের স্তর। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»

আল্লাহ তা'আলা আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে"।[১৩৩] তিনি আরো বলেন,

«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ»

"আমি যদি পৃথিবীর অধিবাসীদের থেকে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম। তবে তোমাদের সাথী আল্লাহর বন্ধু"।[১৩৪]

এ হাদীছ দু'টি ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে। হাদীছ দু'টি ঐসব লোকের কথাকে বাতিল করেছে, যারা বলে বন্ধুত্বের-খুল্লাতের স্তর ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামের জন্য খাস এবং মুহাব্বতের স্তর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। সুতরাং ইবরাহীম আল্লাহর খলীল এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হাবীব।

ছ্বহীহ মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ "আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব পরিহার করে কেবল আল্লাহ তা'আলার বন্ধুত্ব গ্রহণ করছি"। আল্লাহর ভালোবাসা নাবী

১৩৩. ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৮২৭।

১৩৪. ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪৩৯৪।

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যদের জন্য অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"আল্লাহ সৎলোকদের অত্যন্ত ভালোবাসেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৩৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

"যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৭৬)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারার ২২২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

"যারা তাওবা করে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন"।

সুতরাং ঐ সমস্ত লোকদের কথা বাতিল প্রমাণিত হলো, যারা বলে খুল্লাত (একান্ত বন্ধুত্ব) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য এবং ভালোবাসা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। বরং একান্ত বন্ধুত্ব ইবরাহীম খলীল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের জন্যই। আর ভালোবাসা সকল মুমিনের জন্যই। আর তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যেই হাদীছে বলা হয়েছে,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ»

"ইবরাহীম আল্লাহর খলীল আর আমি আল্লাহর হাবীব। এতে আমার জন্য অহংকারের কিছুই নেই" [১৩৫]-এ হাদীছ ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

১৩৫. যঈফ।

ভালোবাসার স্তরসমূহ

(১) العلاقة। সম্পর্ক: অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে মনের যে সম্পর্ক তৈরী হয়, তা ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সর্বনিম্ন স্তর।

(২) الإرادة। ইচ্ছা: প্রিয় বস্তু পাওয়ার জন্য অন্তর দিয়ে ইচ্ছা করা। এ স্তরে পৌঁছে মানুষের অন্তর প্রিয়বস্তুর দিকে ঝুকে পড়ে এবং তাকে পাওয়ার চেষ্টা করে।

(৩) الصبابة। তীব্র আকাঙ্খা: এ স্তরে পৌঁছে বান্দার অন্তর প্রিয় বস্তুর দিকে এমনভাবে ঝুকে পড়ে যে, সে তার অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। উপর থেকে নীচু স্থানে পানি যেমন গড়িয়ে পরে ঠিক সেভাবেই বান্দার অন্তর কাম্য বস্তুর দিকে ধাবিত হয়।

(৪) الغرام। অনুরাগ ও আসক্তি: এটি এমন ভালোবাসা, যা অন্তরের সাথে সম্পূর্ণ গেঁথে যায় এবং অন্তরকে তার বন্ধনে বেঁধে ফেলে। এখান থেকে الغريم। (ঋণগ্রস্ত) শব্দটি গঠন করা হয়েছে। কেননা পাওনাদার যেভাবে ঋণগ্রস্তের পিছনে লেগে থাকে, সে কখনো তার পিছু ছাড়েনা ভালোবাসার এ স্তরে পৌঁছে বান্দাও তার প্রিয় বস্তুকে ছাড়ে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

নিশ্চয়ই জাহান্নামের আযাব তো তার অধিবাসীকে আকঁড়ে ধরবে। (*সূরা আল-ফুরকান ২৫:৬৫*)

(৫) المودة। স্নেহ-মমতা: খাঁটি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালোবাসাকে **الود।** বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

"নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে শীঘ্রই রাহমান তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন"। *(সূরা মারইয়াম: ৯৬)*

(৬) الشغف। আকৃষ্ট করা: যে ভালোবাসা হৃৎপিন্ডের আবরণ ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাকে শাগাফ বলা হয়।

(৭) العشق। প্রেম: ইশ্‌ক বলা হয় এমন অতিরিক্ত ভালোবাসাকে যাতে লিপ্ত ব্যক্তি পাগল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভালোবাসার এ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। বান্দার অন্তরে তার রবের প্রতি যে ভালোবাসা থাকে, তাকেও ইশক নাম দেয়া

যাবে না।

যদিও কোনো কোনো সুফী আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে যে ভালোবাসা তৈরী হয়ে থাকে, তাকে ইশ্‌ক বলে থাকে। ইশক শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে একাধিক কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ শব্দটি শরীয়াতে বর্ণিত হয়নি। অন্যরা অন্যান্য কথা বলেছেন। ইশ্‌ক শব্দটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, কামোত্তেজনার সাথে যে ভালোবাসা হয়ে থাকে তাকে ইশক বলা হয়।

(৮) التيم। দাসে পরিণত করা বা বশীভূত করা।

(৯) التعبد। দাসত্ব করা:

(১০) الخلة। বন্ধুত্ব: এটি এমন ভালোবাসা, যা বান্দার অন্তরের সাথে মিশে যায়। ভালোবাসার স্তরগুলোকে অন্যভাবেও বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে এভাবে বিন্যস্ত করাকে অনেকেই সুন্দর বলেছেন। স্তরগুলোর অর্থের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করা ব্যতীত কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবে না।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলাকে মুহাব্বত বা ভালোবাসা ও খুল্লাত বা বন্ধুত্ব দ্বারা সেভাবেই বিশেষিত করা হবে, যেভাবে বিশেষিত করলে তার বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য ছিফাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। ভালোবাসার উপরোক্ত স্তরগুলো থেকে দলীল অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার জন্য কেবল ইচ্ছা, স্নেহ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বই সাব্যস্ত করা হবে। আরো জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যকার ভালোবাসাকে التعلق, العلاقة, الصبابة, العشق, الغرام ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা অশোভনীয় হলেও সুফীরা তাদের কথা-বার্তায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।

ভালোবাসার সীমা ও সংজ্ঞা নির্ধারণে আলেমগণ প্রায় ত্রিশটি মত প্রকাশ করেছেন। তবে ভালোবাসা শব্দটি উচ্চারণ করতেই তা থেকে যা বুঝায়, তার চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট আর কোনো সংজ্ঞা নেই। সুতরাং এর যত সংজ্ঞা দেয়া হবে, তাকে আরো অস্পষ্ট করে দিবে। এরূপ সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর কোনো সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত, মূর্খ এমনকি শিশুরাও ভালোবাসা কথাটির অর্থ বুঝে। পানি, বাতাস, মাটি, পিপাসা ইত্যাদি সুস্পষ্ট জিনিসের মতই ভালোবাসা শব্দটি খুবই সুস্পষ্ট।

(৩১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًى

তার পরে যেসব লোক নবুওয়াতের দাবি করবে, তাদের প্রত্যেকের দাবি ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

.....

ব্যাখ্যা: যখন সাব্যস্ত হলো যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী, তখন জানা গেল, তার পরে যে কেউ নবুওয়াত দাবী করবে, সে মিথ্যুক হিসাবে গণ্য হবে। এ কথা বলা যাবে না যে, নবুওয়াতের দাবিদার যদি অলৌকিক মুজেযা এবং উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ দেখায়, তাহলে কিভাবে তাকে মিথ্যুক বলা হবে?

এর জবাবে আমরা বলবো যে, এমনটি অকল্পনীয় এবং অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন সংবাদ দিয়েছেন, তিনিই সর্বশেষ নাবী তখন এটি অসম্ভব যে, নবুওয়াতের কোনো দাবিদার আসবে; কিন্তু তার দাবিতে মিথ্যাবাদিতা প্রকাশিত হবে না। الغي শব্দটি الرشاد এর বিপরীত। নফ্সের প্রবৃত্তিকে الهوى বলা হয়। অর্থাৎ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যারা নবুওয়াতের দাবি করেছে, তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই তা করেছে। কোনো দলীলের উপর ভিত্তি করে তারা তা করেনি। সুতরাং তাদের নবুওয়াতের দাবি সম্পূর্ণ বাতিল।[১৩৬]

---

১৩৬. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবুওয়াতের দাবিদার ত্রিশজন মিথ্যুক আত্মপ্রকাশ না করা পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তার এই ভবিষ্যৎ বাণী হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পর্যন্ত মিথ্যুকদের দাবিদারের সংখ্যা ত্রিশ পার হয়ে গেছে। তবে সাময়িকের জন্য যাদের অনুসারী ও শক্তি অর্জিত হয়েছিল, তাদের সংখ্যা হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী ত্রিশের বেশী নয়। এ ত্রিশজনের মধ্যে মুসায়লামা কাজ্জাব অন্যতম। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শেষ বয়সের দিকে মুসায়লামা কায্যাব নবুওয়াতের দাবী করেছিল। তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ইয়ামামার যুদ্ধে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এর খেলাফতকালে ছাহাবীগণ এ ফিতনার অবসান ঘটান। এমনিভাবে যুগে যুগে আরো অনেকেই নবুওয়াতের দাবী করেছে। তাদের মধ্যে আসওয়াদ আনাসী, সাজা নামক জনৈক মহিলা, মুখতার আছ-ছাকাফী ও হারিছ আল-কায্যাব অন্যতম। প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানের তাবেদারী করতে গিয়েই এরা নবুওয়াত এবং তাদের উপর অহী অবতীর্ণের দাবি করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকেই লাঞ্ছিত করেছেন।

নিকটবর্তী অতিতে ভারতবর্ষের মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবুওয়াতের দাবী করেছিল। তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভারত বর্ষের অনেক আলেম তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত ভন্ড এবং মিথ্যুক নাবী থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন সে তাদেরই একজন। আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন। এতে মিথ্যুক কাদিয়ানী শাইখ ছানাউল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করলে উভয় পক্ষের মাঝে ১৩২৬ হিজরী সালে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এ মর্মে পরস্পরে অভিশাপ করা হয় যে, দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অল্প সময়ের মধ্যে এবং সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯০৮ সালের ২৬ মে ধ্বংস যায়। আল্লাহ

তা'আলা শায়খ ছানাউল্লাহর দু'আ কবুল করলেন। এ ঘটনার এক বছর এক মাস দশদিন পর মিথ্যুক কাদীয়ানী ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর দিকে সম্বন্ধ করে এ ফির্কাকে কাদিয়ানী ফির্কা বলা হয়। সে সঙ্গে তাদের আসল চেহারা লুকানোর জন্য তারা নিজেদেরকে আহমাদিয়া মুসলিম জামা'আত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে মির্জা গোলাম আহমাদ জন্মগ্রহণ করে। গবেষকগণ এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, তার পিতা ইংরেজদের গুপ্তচর ছিল। ইংরেজরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ গোলাম আহমাদকে ব্যবহার করেছে। ইতিহাস প্রমাণ করে, যে সময় আরব উপদ্বীপে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতই ভারতেও শাইখের তাওহীদী দাওয়াত ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সে সময় গোলাম আহমাদকে লন্ডনের তরফ থেকে নাবী বানানো হয়। কারণ ভারতবর্ষের মুসলিমগণ শাইখের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে এবং স্থানীয় আলেমদের আহবানে সাড়া দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে। ইংরেজরা এটি বুঝতে পেরে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা ও বিভক্তি সৃষ্টি করার জন্য এবং সে জিহাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য চিন্তা করতে থাকে। এ জন্য তারা বিচক্ষণ যুবক গোলাম আহমাদকে নির্বাচন করে তার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

গোলাম আহমাদ প্রথমেই নবুওয়াত দাবি করেনি। কারণ প্রথমেই নবুওয়াত দাবি করলে লোকদের পক্ষ থেকে কঠোর প্রতিবাদ উঠার ও তাকে সরাসরি মিথ্যুক হিসাবে সাব্যস্ত করার আশঙ্কা ছিল। তাই মুসলিমদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য এবং নিজেকে দ্বীনের একজন সৈনিক হিসাবে দেখানোর জন্য সর্বপ্রথম সে ইহুদী-খৃষ্ঠান মুসলিমদের প্রতিবাদে البراهين الأحمدية নামে একটি কিতাব রচনা করে। কিছুদিন পরে সে নিজেকে শতাব্দির মুজাদ্দেদ হিসাবে দাবি করে। এর কিছুদিন পর সে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলে প্রচার করতে থাকে। অতঃপর সে নিজেকে ঈসা মাসীহ বলে দাবি করে। পরিশেষে সে সরাসরি ও প্রকাশ্যে নবুওয়াতের দাবি করে।

গোলাম আহমাদের মৃত্যুর পর যখন তার লিখিত কিতাবগুলো উদ্ধার হল, তখন সেখানে ইংরেজদের বরাবর লিখিত একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তার হাতেই চিঠিতে লিখা ছিল, আমি ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা, সমর্থন ও ভারত বর্ষের মুসলিমদেরকে ইংরেজদের অনুগত থাকার প্রতি উৎসাহিত করে পঞ্চাশাধিক কিতাব লিখেছি। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই আমি মুসলিমদেরকে জিহাদের পথ পরিহার করা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকার আহবান জানিয়েছি। সুতরাং তার লেখনির মাধ্যমেই প্রমাণিত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে নয়; বরং লন্ডন থেকে তার কাছে অহী প্রেরিত হতো। ইংরেজ পর্যটকদের থেকেও সে অহী গ্রহণ করতো। এ অহীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ থেকে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের দাওয়াতের প্রভাবকে মুছে ফেলা এবং মুসলিমদের জিহাদী চেতনাকে বিলীন করাা।

কাদিয়ানীদের শরী'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো, জিহাদকে চিরতরে বাতিল করে দেয়া। ভারতবর্ষে যখন ইংরেজ হটাও আন্দোলন চলছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল, তখন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা শরী'আত সম্মত নয়। অতঃপর সে শরী'আতের অনেক হারাম জিনিসও হালাল করেছে এবং নিজের পক্ষ হতে নতুন নতুন হুকুম-আহকাম যাহির করা শুরু করেছে। ভারতবর্ষের বাইরে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই কাদিয়ানী মতবাদের প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে ক্ষুধা ও দারিদ্রকে কাজে লাগিয়ে কাদিয়ানীরা আফ্রিকা মহাদেশেও তাদের বিভ্রান্তি প্রচার করে যাচ্ছে।

গোলাম আহমাদের মৃত্যুর পর কাদীয়ানীরা একাধিক লোককে তাদের খলীফা নির্বাচন করে। তাদের বর্তমান খলীফা হলো মির্জা মাসরুর আহমাদ। সে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বসবাস করছে।

পরিশেষে জেনে রাখা আবশ্যক যে কুরআন-সুন্নাহর অনেক দলীল ও মুসলিমদের সকল মাযহাবের আলেমদের ঐকমত্যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী হলেও কাদিয়ানীরা খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। আমরা তাদের কুফুরী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৩২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ

তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতি সহকারে সমস্ত জিন ও মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

.....

ব্যাখ্যা: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন জাতির প্রতিও প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা জিনদের উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"হে আমাদের কওমের লোকেরা, আল্লাহর প্রতি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন"। *(সূরা আহকাফ: ৩১)*

এমনি সূরা জিনে আল্লাহ বলেছেন যে, তাদের কাছেও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। মুকাতিল বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে কোনো রসূলকেই জিন ও ইনসানের জন্য পাঠাননি। এ কথা সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সর্তক করতো?" *(সূরা আল-আনআম: ১৩০)*

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, রসূল পাঠানো হয়েছে শুধু বনী আদম থেকে। জিনদের মধ্যে কোনো রসূল ছিল না। মুজাহিদ এবং অন্যান্য সালাফ ও খালাফ-পরবর্তী থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, বনী আদম থেকে হয়েছে রসূল এবং জিনদের থেকে হয়েছেন সতর্ককারী। জিনদের উক্তি উল্লেখ করে বলেন, তারা বলেছিল,

يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ

"হে আমাদের কওমের লোকজন! আমরা এমন কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে"। *(সূরা আহকাফ: ৩০)*

এ আয়াতও প্রমাণ করে যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) ও জিনদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

যাহ্হাক থেকে ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জিনদের মধ্যেও রসূল রয়েছে। তিনি এ আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলেরা আসেনি? এ আয়াত দিয়ে জিনদের মধ্য থেকে রসূল থাকার দলীল গ্রহণ করার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। কেননা এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সম্ভব; কিন্তু এটি অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল নয়। এটি সূরা আর রাহমানের ২২ নং আয়াতের মতই। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾

"এ উভয় সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়"। এখানে উদ্দেশ্য হলো উভয়টিই এক।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেসালাত বিশ্বজনীন

আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূল হিসাবে প্রেরিত হওয়ার দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আর আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না"। *(সূরা সাবা: ২৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"বলে দাও, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৫৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾

"আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং যাদের কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি"। *(সূরা আল-আনআম: ১৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

"হে নাবী! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এরপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট"। *(সূরা আন-নিসা: ৭৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ﴾

"মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা ঈমান আনয়ন করবে তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান?"। *(সূরা ইউনুস: ২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন এ ফুরকান। যাতে তিনি সারা সমগ্র সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হন"। *(সূরা আল-ফুরকান: ১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

"হে নাবী! তুমি কিতাব ওয়ালা এবং কিতাব বিহীন উভয়কে জিজ্ঞাসা করো, তোমরাও কি তার নিকট আত্মসমর্পন করেছো? যদি করে থাকে তাহলে তারা সত্যের পথ লাভ করেছে। আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার উপর কেবল পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ২০)*

রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ من الأنبياء قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)

"আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে, যা পূর্বের কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ভয়ের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) সমগ্র যমীনের মাটি আমার জন্য পবিত্র এবং মসজিদ স্বরূপ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির নিকট যদি ছলাতের সময় উপস্থিত হয়, তবে সে যেন তা আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারো জন্য তা

হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে শাফাআতের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) আমার পূর্বেকার নাবীগণ প্রেরিত হতেন তাদের গোত্রের লোকদের নিকট। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য"।[১৩৭] ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

(لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لا يُؤْمِنُ بِي إِلاَّ دخل النَّارِ)

"এ উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি আমার ব্যাপারে শুনবে, চাই সে ইহুদী হোক বা নাসারা হোক, অতঃপর সে যদি আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[১৩৮] ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য তার প্রেরিত হওয়ার বিষয়টি কারো অজানা নয়।

আর খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যারা বলে থাকে, তিনি কেবল আরবদের জন্য রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা তারা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতে ঈমান আনয়ন করেছে, তখন তাদের উপর আবশ্যক হলো, তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটি সংবাদই বিশ্বাস করবে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি সমগ্র মানব জাতির প্রতি রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। আর রসূলগণ কখনো মিথ্যা বলেন না। সুতরাং রসূলদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দূত এবং পত্র পাঠিয়েছেন। তিনি পারস্য সম্রাট কেসরা, রোমক সম্রাট কায়সার, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, মুকাওকিস এবং তৎকালীন সকল অঞ্চলের রাজা-বাদশাহদের নিকটই পত্র পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

আর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা وكافة الورى এর মধ্যকার كافة শব্দটিতে জের পড়া সঠিক নয়। কারণ আরবদের ভাষায় كافة শব্দটি শুধু حال হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। তার উপর যবর দিয়ে পড়া উচিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾

"আর আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য-এর মধ্যকার كافة এর ইরাব সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) এটি أرسلناك-এর كاف থেকে হাল হয়েছে। আর كافة শব্দটি اسم فاعل। অর্থের আধিক্য বুঝানোর জন্য ইহাতে ة যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে ভুল পথ থেকে

১৩৭. ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুস্ সালাত, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ।

১৩৮. ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

ফেরানোর জন্যই আপনাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন كافة শব্দটি كف এর মাসদার كفا হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে এরূপ, إلا أن تكف الناس كفا। আরবী ভাষায় মাসদার বা ক্রিয়ামূল হাল হিসাবে অহরহ ব্যবহার হয়ে থাকে।

(২) كافة শব্দটি الناس থেকে হাল হয়েছে। এ মতের প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ নাহুবিদদের মতে মাজরুরের হাল তার পূর্বে আনয়ন করা ঠিক নয়। এ কথার জবাবে বলা হয়েছে যে, আরবদের থেকে মাজরুরের হালকে তার পূর্বে উল্লেখ করার বহু নযীর রয়েছে। সুতরাং তা মেনে নেয়া আবশ্যক। নাহুবিদ ইবনে মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এ মতকেই পছন্দ করেছেন। মূল বাক্যটি এরূপ হবে, **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِلنَّاسِ كَافَّةً**

(৩) এটি একটি উহ্য মাসদারের ছিফাত। মূল বাক্যটি হবে এরূপ: إِرْسَالَةً كَافَّةً। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, তা কেবল حال (হাল্) হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, **بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاء** "তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতি সহকারে প্রেরিত হয়েছেন"।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন-সুন্নাহর উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত যে দীন ও শরী'আত নিয়ে এসেছেন, এগুলো হচ্ছে সে শরী'আতের বৈশিষ্ট্য। الضياء (জ্যোতি) النور (আলো) থেকে অধিক পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

তিনিই সূর্যকে করেছেন জ্যোতির্ময় ও চন্দ্রকে করেছেন আলোকময় *(সূরা ইউনুস: ৫)*।

(৩৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ. فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: سَأُصْلِيهِ سَقَرَ فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ

নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়েছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না। এ কালামকে তিনি তার রাসূলের প্রতি অহী হিসাবে নাযিল করেছেন। আর ঈমানদারগণ তাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এটি সত্যিই আল্লাহর কালাম, কোনো সৃষ্টির কথার মত সৃষ্টি নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরআন শুনে তাকে মানুষের কালাম বলে ধারণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দা করেছেন, তাকে দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ "শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো"। (সূরা মুদ্দাস্সির: ২৬) সুতরাং যে বলে ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ "এটাতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়" আল্লাহ তা'আলা তাকে সাকার নামক জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। অতএব, আমরা জেনে নিলাম ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তার কালাম। আর তা কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।

.....

ব্যাখ্যা: এটি একটি মূল্যবান মূলনীতি এবং দীনের একটি বিরাট মূলভিত্তি। অনেক লোক এ মাস'আলায় পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম ত্বহাবী যা উল্লেখ করেছেন, তাই সঠিক। যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীছ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, এ কথাই সত্য ও সঠিক। কোনো প্রকার সন্দেহ ও বাতিল মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে ফিতরাত (সৃষ্টিগত স্বভাব) পরিবর্তিত হয়ে যায়নি, তাও সাক্ষ্য প্রদান করে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম।

আল্লাহর কালাম সম্পর্কিত মাস'আলায় আলেমদের মতভেদ

আল্লাহর কালাম বা কথা বলা বিশেষণের মাস'আলায় আলেমদের নয়টি মত রয়েছে।

(১) আল্লাহর কালাম বলতে এমন অর্থ উদ্দেশ্য, যা সক্রিয় সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) বা অন্য কারো পক্ষ হতে মানুষের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। এটি নাস্তিক, বে-দীন ও দার্শনিকদের মত।

(২) কুরআন আল্লাহর কালাম নয়; বরং এটি মাখলুক। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার বাইরে একে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। এটি মুতাযেলাদের মত।[১৩৯]

(৩) আল্লাহর কালাম এমন একটি অর্থ, যা আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। এটিকেই আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও সংবাদ বলা হয়। আরবীতে আল্লাহর এ কালামকে প্রকাশ করা হলে তাকে কুরআন বলা হয়। ইবরানী ভাষায় ব্যাখ্যা করা হলে তাকে তাওরাত বলা হয়। ইবনে কুল্লাব এবং আশআরীদের মধ্য থেকে যারা তার অনুসরণ করেছে, এটি তাদেরই মত।

(৪) কালামের অক্ষর ও শব্দ রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে অনাদিতেই একত্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। যুক্তিবাদীদের এক শ্রেণী এবং একদল আহলে হাদীছও এ কথা বলেছেন।

(৫) আল্লাহর কালামের অক্ষর, শব্দ ও আওয়াজ রয়েছে। তবে প্রথমে তিনি কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন না; অতঃপর তিনি নিজের সাথে তাকে মিলিয়েছেন এবং কথা বলেছেন। কার্‌রামিয়া সম্প্রদায় এবং অন্যরা এ কথা বলেছে।

(৬) আল্লাহর কালাম দ্বারা তার ঐ ইলম উদ্দেশ্য, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ ইচ্ছা উদ্দেশ্য, যা তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মু'তাবার গ্রন্থকার এ কথা বলেছেন। ফখরুদ্দীন রাযিও তার অন্যতম গ্রন্থ মাতালেবে আলীয়াতে এ মতকে সমর্থন করেছেন।

(৭) আল্লাহর কালাম এমন অর্থ বহন করে, যা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে যুক্ত রয়েছে এবং তিনি এটি অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আবু মানসুর আল-মাতুরীদি এ কথা বলেছেন।

(৮) আল্লাহর কালাম এমন একটি যৌগিক বিষয়, যা তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত অনাদি অর্থ এবং তিনি অন্যের মধ্যে যে আওয়াজ সৃষ্টি করেন তার সমন্বয়ে গঠিত। এটিই আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী এবং তার অনুসারীদের মত।

(৯) আল্লাহ তা'আলা অনাদি থেকেই যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা কথা বলার বিশেষণে

---

১৩৯. তাদের মতে কালামকে কেবল সম্মানার্থেই আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন সম্মানার্থে বলা হয়, بيت الله, ناقة الله ইত্যাদি।

বিশেষিত। তিনি এ বিশেষণের মাধ্যমে এমন আওয়াজের সাথে কথা বলেন, যা শুনা যায়। কথা বলা বিশেষণ আল্লাহ তা'আলার অনাদি ছিফাতের মধ্যে গণ্য। যদিও নির্দিষ্ট শব্দে কথা বলা কাদীম বা অনাদি নয়।[১৪০] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামদের থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

শাইখের উক্তি, وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ এখানে إن এর হামযার নীচে জের দিয়ে পড়তে হবে। কারণ এ বাক্যটিকে إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ বাক্যের উপর সম্পর্ক করা হয়েছে। অতঃপর শাইখ বলেছেন, وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى এখানেও হামযাহর নীচে জের দিয়ে পড়া হয়েছে। উপরোক্ত তিন স্থানেই হামযাহর নীচে জের দিয়ে পড়া হয়েছে। কারণ এ সবগুলো বাক্যই কাউলের মা'মুল। অর্থাৎ কিতাবের শুরুতে তার উক্তি: نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ إِنَّ .....الله এর আওতাধীন।

অতঃপর শাইখ বলেছেন, كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا "আল্লাহর কালাম তার নিকট থেকেই কথা হিসেবে শুরু হয়েছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না"। এতে মুতাযেলা এবং অন্যদের মতবাদের জবাব দেয়া হয়েছে। কেননা মুতাযেলারা মনে করে কুরআন আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আসেনি। যেমন উপরে তাদের কথা আলোচিত হয়েছে। তারা বলে থাকে, কালামকে তার দিকে কেবল সম্মানার্থেই সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে বাইতুল্লাহ, নাকাতুল্লাহ ইত্যাদি। তারা আল্লাহর কালামকে যথাস্থান থেকে সরিয়েছে। তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার দিকে যাকিছু সম্বন্ধ করা হয়, তা দু'প্রকার। (১) অনুভবযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসসমূহ (২) অর্থ, গুণাবলী ও বিশেষণসমূহ।

অনুভবযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেসব বস্তু আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা কেবল সম্মানার্থেই তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এগুলোর সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। যেমন بَيْتِ اللَّهِ، وَنَاقَةِ اللَّهِ (আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উটনী) ইত্যাদি। কিন্তু যেসব গুণাবলী আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, এর বিপরীত। অর্থাৎ তা সৃষ্টি নয়। যেমন আল্লাহর ইলম, আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর ইজ্জত, আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহর অহংকার, আল্লাহর কালাম, আল্লাহর হায়াত, আল্লাহর উলু (সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়া), আল্লাহর প্রতাপ ইত্যাদি। এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ছিফাত। এখান থেকে কোনো কিছুই সৃষ্টি নয়।

---

১৪০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কালাম একদিক থেকে কাদীম এবং অন্যদিক থেকে কাদীম নয়। তিনি অনাদি থেকেই কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত, তার কালামের কোনো শুরু ও শেষ নেই। যেমন তার সত্তার কোনো শুরু ও শেষ নেই। তিনি সর্বদাই কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত। এ দিক থেকে তার কালাম কাদীম বা অনাদি ছিফাত। কিন্তু নির্দিষ্ট শব্দ ও আওয়াজের মাধ্যমে তার কথা কাদীম নয়। অর্থাৎ এটি তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তিনি কথা বলেন।

কথা বলা পূর্ণতার অন্যতম বিশেষণ। আর এটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত না করা তার ছিফাতের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সাব্যস্ত করার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾

"মূসার অনুপস্থিতিতে তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকার দিয়ে বাছুরের মূর্তি তৈরী করলো। তার মুখ দিয়ে গরুর মত হাম্বা হাম্বা আওয়াজ বের হতো। তারা কি দেখতে পেতো না যে, ঐ বাছুর তাদের সাথে কথা বলে না আর তাদেরকে কোনো পথও দেখায় না? এরপর ও তাকে মাবুদে পরিণত করলো। বস্তুত তারা ছিল বড়ই যালেম"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৪৮)*

সুতরাং বাছুর পূজাকারীরা কুফুরী করলেও তারা আল্লাহ সম্পর্কে মুতাযেলাদের চেয়ে অধিক জানতো। তারা মূসাকে বলেনি যে, তোমার রবও কথা বলতে পারে না। বাছুর ও বাছুর পূজাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾

"তারা কি দেখছিল না যে, সে তাদের কথারও জবাব দেয় না এবং তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও রাখে না?" *(সূরা ত্বহা: ৮৯)*

এতে বুঝা গেল কথার জবাব না দিতে পারা এবং কথা বলার ক্ষমতা না রাখা এমন ত্রুটি, যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় যে, বাছুর কখনো ইলাহ হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলার কালাম নাকোচ করার ব্যাপারে তাদের সর্বোচ্চ দলীল হলো, তারা বলে থাকে, যদি বলা হয় যে, তিনি কথা বলেন, তাহলে তার জন্য মানুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং তাদের মত দেহ ধারণ করা আবশ্যক হয়।[১৪১]

---

১৪১. অর্থাৎ তাদের মতে যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন, তাহলে তার জন্য মানুষের মত জিহবা, দাঁত, ঠোঁট কণ্ঠণালী থাকা আবশ্যক হয়। শাইখ ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ তাদের এ কথার যে জবাব দিয়েছেন, তাদের প্রতিবাদের জন্য উহাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহ অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বিদ'আতীরা একই কথা বারবার বলে থাকে। তারা এমন কিছু আকলী যুক্তি পেশ করে থাকে, যা তারা তাদের ত্রুটিযুক্ত বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই তৈরী করেছে। তারা বলে থাকে, আল্লাহর জন্য এ ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে এটি আবশ্যক হয়, ওটি আবশ্যক হয়.....ইত্যাদি।

এখানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল বিজেতা সুলতান মাহমুদ বিন সুবক্তগীনের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার দরবারে একদা আশায়েরা আলেম ইবনে ফাওরাক প্রবেশ করলেন। তিনি একবার সুলতানের দরবারে আলোচনা করছিলেন। সে সময় সুলতানের দরবারে একজনু সুন্নী আলেমও ছিলেন। তখন ইবনে ফাওরাককে আল্লাহ তা'আলার উলু (সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উহা অস্বীকার করলেন। তিনি সুলতানকে যুক্তি দেখিয়ে বললেন, আপনি যদি আল্লাহর জন্য উপর সাব্যস্ত করেন, তাহলে তার জন্য নীচ সাব্যস্ত করাও আবশ্যক হয়। সুলতান ইলমে কালাম এবং আকলী যুক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি তার কথার স্বভাব প্রসূত ও সহজ-সরল

তাদের জবাবে বলা হবে যে, আমরা যখন বলবো আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে কথা বলা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই কথা বলেন, তখনই তাদের এ সন্দেহ বিদূরিত হয়ে যাবে। আপনি কি দেখেন না আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"সেদিন আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিবো, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে"। *(সূরা ইয়াসীন: ৬৫)*

আমরা বিশ্বাস করি কিয়ামতের দিন মানুষের হাত-পা কথা বলবে। তবে আমরা জানি না কিভাবে বলবে। এমনি আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

"তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দেবে, আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন"। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ: ২১)*

এমনি পাথরের তাসবীহ পাঠ, খাবারের কথা, তাসবীহ পাঠ, পাথরের সালাম দেয়া ইত্যাদি। এগুলোর কথা বলা ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মুখ, জিহবা, দাঁত, অক্ষর উচ্চারণের মাখরাজ ছাড়াই কথা বলেছে। যে শ্বাসনালী থেকে আওয়াজ বের হয়, তা ছাড়াই কথা বলেছে। তবে এগুলোর কথা বনী আদমের নিকট পরিচিত কথা ছিল না।

এ দিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا "আল্লাহর কালাম তার নিকট থেকেই কথা হিসেবে শুরু হয়ে এসেছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না"। অর্থাৎ তার কাছ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমরা জানি না, তিনি কিভাবে তার মাধ্যমে কথা বলেছেন। قولا কথার মাধ্যমে শাইখ এ অর্থকেই শক্তিশালী

জবাব প্রদান করতে গিয়ে বললেন, আমার উপর কিছুই আবশ্যক হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি উপরে। এ ব্যাপারে আমি তাই বলবো, যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে আমার উপর যদি আবশ্যক কিছু থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার জন্যও উহা আবশ্যক হয়। কারণ তিনিই উহা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার উপর কিছু আবশ্যক করার কেউ আছে কি? কেউ কি বলতে পারবে, হে আমার রব! তুমি তোমার নিজের জন্য উপর সাব্যস্ত করেছো, সুতরাং তোমার উপর তোমার সত্তার জন্য নীচ সাব্যস্ত করাও আবশ্যক? নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং সুলতান মাহমুদ যে ফিতরাতী জবাব দিয়েছেন আল্লাহর ছ্বিফাত নাকোচকারী বিদ'আতীদের সকল সন্দেহের সেটিই সঠিক জবাব। সুতরাং আমরা যখন বলবো, এটি হলো আল্লাহর কথা ও তার রাসূলের কথা, তখন আমাদের এ কথার সামনে তাদের বিবেক-বুদ্ধির আবশ্যকীয় যুক্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর কিছু আবশ্যক করতে চায়, তারা তা করুক। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর কালাম ও রাসূলের কালামের উপর ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত অন্য কিছুই আবশ্যক নয়।

করেছেন। তিনি قولا কে এমন মাসদার হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যা প্রকৃত অর্থকেই নির্দিষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: كلم الله موسى تكليما এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার কথা বলাকে এমন মাসদারের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন, যা রূপক অর্থকে নাকোচ করে দেয়। এভাবে সত্যকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করার পরও যারা তা থেকে দূরে থাকবে, তাদের জন্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

জনৈক মুতাযেলী আলেম সুপ্রসিদ্ধ সাত কারীর অন্যতম কারী আবু আমর ইবনুল আলা (রহিমাহুল্লাহ) কে বললেন, আমি চাই, তুমি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيْماً﴾ এর মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দের শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে পাঠ করবে। যাতে করে অর্থ হয় যে, মূসা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন", আল্লাহ তা'আলা নন।[১৪২] তখন আমর বললেন, ঠিক আছে আমি তোমার চাহিদা মোতাবেক এ আয়াত পড়ে দেবো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এ বাণী কিভাবে পাঠ করবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

"অতঃপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৪৩)*

এতে সে মুতাযেলী আলেম হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অর্থাৎ আমর (রহিমাহুল্লাহ) মুতাযেলীকে দেখিয়ে দিলেন যে, ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيْماً﴾ এর মধ্যে আল্লাহ শব্দের উপর যবর দিয়ে পাঠ করে আয়াতটি বিকৃতি করে আরবী ব্যকরণের কোনো পদ্ধতিকে দলীল হিসাবে দাড়া করা সম্ভব হলেও ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ আয়াতাংশকে কোনোভাবেই বিকৃতি করা সম্ভব নয়। কেননা আরবী ব্যকরণে এমন কোনো নিয়ম নেই যে, ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ এর মধ্যে ربه এর মধ্যকার 'বা' অক্ষরের উপর যবর দিয়ে পড়া যেতে পারে। যাতে করে এখানেও এ অর্থ হয় যে, মূসা তার রবের সাথে কথা বলেছেন, তার রব তার সাথে কথা বলেননি।

১৪২. আল্লাহ তা'আলার কথা বলা বিশেষণকে অস্বীকার করার জন্যই মুতাযেলী আলেম এ কৌশল অবলম্বন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুন্নী কারী ও আলেমের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সামনে বিদ'আতীর অপকৌশল ধরা পড়ে।

জান্নাতবাসীদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এমন অনেক দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসী এবং অন্যান্যদের সাথে কথা বলবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾

"দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হবে"। *(সূরা ইয়াসীন: ৫৮)*

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখন নেয়ামতের মধ্যে থাকবে, তখন তাদের জন্য একটি নূর প্রকাশিত হবে। তারা দৃষ্টি উঠাবে। দৃষ্টি উঠিয়ে তারা দেখবে যে, তাদের মহান প্রভু উপর থেকে তাদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। তখন তাদের প্রভু বলবেন, السلام عليكم يا أهل الجنة এটিই হলো আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা। এরপর তারা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে থাকবে, ততক্ষণ জান্নাতের আর কোনো নেয়ামতের দিকে তাকিয়েই দেখবে না। এমনকি আল্লাহ তা'আলার নূর তাদের থেকে আড়াল হওয়ার পরও তার বরকত ও নূর অবশিষ্ট থাকবে"।[১৪৩]

ইমাম ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার জন্য কথা বলা বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সে সঙ্গে আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। এখান থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে।

সুতরাং এত দলীল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার সকল বাণী মিলে মূলত একটিই। অর্থাৎ তিনি কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত এবং তার কথা তার সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত। এমনটি নয় যে, তিনি একাধিকবার একাধিক নাবী-রাসূলের সাথে কথা বলেছেন কিংবা কিয়ামতের দিন মুমিনদের সাথে কথা বলবেন। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

১৪৩. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ১৪১।

"যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আর তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব"। *(সূরা আলে ইমরান: ৭৭)*

সুতরাং যারা সামান্য মূল্যে আল্লাহর অঙ্গিকার বিক্রি করে, তাদের সাথে কথা না বলার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন। এখানে উদ্দেশ্য হলো, তাদের সাথে এমন কথা বলবেন না, যার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করা হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যাই সঠিক। কেননা অন্য আয়াতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে বলবেন,

﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾

"তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না"। *(সূরা মুমিনুন: ১০৮)*

আল্লাহ তা'আলা যদি তার মুমিন বান্দাদের সাথে কথা না বলেন, তাহলে এতে মুমিনগণ ও তার শত্রুগণ সমান হয়ে যাবে এবং তার শত্রুদের সাথে কথা বলা বর্জন করার মধ্যে কোনো ফায়দা থাকে না। ইমাম বুখারী তার ছ্বহীহ গ্রন্থে বলেন,

باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة "অধ্যায়: জান্নাতবাসীদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা বলা"। এ অধ্যায়ে তিনি একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। জান্নাতবাসীদের সর্বোত্তম নেয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা এবং মুমিনদের সাথে তার কথা বলা। সুতরাং এটিকে অস্বীকার করা জান্নাতের মূল, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম নেয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর। যা ব্যতীত জান্নাতবাসীদের জীবন পরিপূর্ণ হবে না।

যারা কুরআনকে মাখলুক বলে তাদের জবাবঃ

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ" এ কথার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করে মুতাযেলা বলেছে যে, كل شيئ এর মধ্যে যে عموم (ব্যাপকতা) রয়েছে কুরআনও তার অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআনও সৃষ্টি। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। মুতাযেলারা كل (প্রত্যেক) শব্দের ব্যাপকতার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কালাম বা কুরআনকে ঢুকিয়ে দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তারা বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা তাকে كل (প্রত্যেক) শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা এ ব্যাপারে বলে যে, বান্দারাই তাদের সকল কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেন না। তারা كل (প্রত্যেক) শব্দের ব্যাপকতা থেকে বান্দার আমলসমূহ বের করে দিয়ে আল্লাহর কালামকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহর কালাম আল্লাহর ছিফাত সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলার কালাম ও কথা বলা বিশেষণের মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি হয় এবং তার আদেশেই সবকিছু সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন। সবাই তার নির্দেশের আনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তার। আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী। তিনি সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও প্রতিপালক"। *(সূরা আল-আরাফ: ৫৩)*

এখানে আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আল্লাহর আদেশ যদি তার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে অন্য একটি আদেশের মাধ্যমে তা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়। তা আবার আরেকটি আদেশ দ্বারা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়। এভাবে আবশ্যক হতেই থাকবে, যার কোনো শেষ নেই। এতে তাসালসুল বা সূচনাহীন সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা আবশ্যক হয়। আর এটি সম্পূর্ণ বাতিল। তাদের এ বাতিল কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলার সকল ছিফাতই মাখলুক। তার ইলম, কুদরত ইত্যাদি সকল ছিফাতই মাখলুক। এরূপ বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট কুফুরী।

সুতরাং اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ" এ কথার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করে যদি বলা হয় আল্লাহর ইলম একটি জিনিস, তার কুদরত একটি জিনিস

এবং তার হায়াতও একটি জিনিস। এগুলো كل (প্রত্যেক) শব্দের ব্যাপকতার মধ্যে শামিল। অতএব এক সময় এগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। পরে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার বহু উর্ধ্বে।

যে কালাম অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় কিংবা তা থেকে যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত, তা কিভাবে আল্লাহর কালাম হতে পারে? যদি তা আল্লাহরই কালাম হয়ে থাকে, তাহলে তিনি জড়বস্তুর মধ্যে যে কালাম সৃষ্টি করেছেন, তাও আল্লাহর কালাম হওয়া আবশ্যক হয়। অনুরূপ প্রাণীজগতের মধ্যে যে কালাম সৃষ্টি করেছেন, তাও আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়া আবশ্যক হয়। তখন نطق এবং أنطق এর মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। অথচ কিয়ামতের দিন মানুষের চামড়া বলবে,

أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ "তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দেবে, আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন"। এখানে বলা হয়নি যে, نطق الله (আল্লাহ কথা বলেছেন)।

সুতরাং যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম বলতে ঐ কালাম উদ্দেশ্য, যা তিনি অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তিনি সৃষ্টির মধ্যে যেসব কালাম সৃষ্টি করেছেন, তা সবই আল্লাহর কালাম। চাই সেটি মিথ্যা অথবা কুফুরী কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রুপের কথা হোক। আল্লাহ তা'আলা এর বহু উর্ধ্বে। সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী লোকেরা সবকিছুর কথাকেই আল্লাহর কথা মনে করে। ইবনে আরাবী বলেন,

وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ... سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَثْرُهُ وَنِظَامُهُ!

"সৃষ্টির মধ্যে যত কালাম রয়েছে, তা সবই আল্লাহর কালাম। মানুষ গদ্য আকারে কিংবা পদ্য আকারে যা কিছু বলে, সবই আমাদের নিকট এক রকম। অর্থাৎ সবই আল্লাহর কালাম। (নাউযুবিল্লাহ)

ইবনে আরাবীর এ কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, যে সৃষ্টি কথা বলে এবং যা বলে তার কথাই আল্লাহর কথা এবং সেই আল্লাহ। সে হিসাবে ফেরাউনের কথাও আল্লাহর কথা এবং ফেরাউন নিজেও আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ)

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাফের ইবনে আরাবীর এ কথার মধ্যে গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু নেই। সঠিক কথা হলো কালাম দু'প্রকার। সৃষ্টির কালাম ও স্রষ্টার কালাম। সৃষ্টির সমস্ত কালাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে গণ্য। আর স্রষ্টার কালাম সৃষ্টি নয়; বরং তা তার ছিফাত।

কাউকে যদি এমন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, যা অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত, তাহলে চোখ ওয়ালা মানুষকে অন্ধ বলা ঠিক আছে। কেননা অন্যের মধ্যে অন্ধত্ব বিদ্যমান রয়েছে

এবং অন্ধকেও চোখ ওয়ালা বলা সঠিক। কারণ অন্যের মধ্যে তো দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলাকে ঐসব গুণে গুণান্বিত করাও সঠিক হবে, যা তিনি অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন রং, গন্ধ, স্বাদ, লম্বা, খাটো ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এগুলো যেহেতু সৃষ্টির বিশেষণ তাই আল্লাহর মধ্যেও তা থাকা আবশ্যক। কারণ তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। নাউযুবিল্লাহ

অনুরূপ জবাবের মাধ্যমে ইমাম আব্দুল আযীয মক্কী মুতাযেলা ইমাম বিশর আল মুরাইসীকে মামুনের সামনে অনুষ্ঠিত বিতর্কে পরাজিত করেছেন। আব্দুল আযীয মক্কী প্রথমে শর্ত করেছিলেন যে, কুরআনের আয়াত দ্বারাই কেবল দলীল পেশ করা হবে। বিশর খলীফা মামুনকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার নিকট থেকে কুরআনের দলীল পেশ করার দাবি প্রত্যাহার করা হোক। কুরআনের দলীল বাদ দিয়ে অন্যান্য দলীল দ্বারা বিতর্ক করা হোক। বিশর দৃঢ়তার সাথে আরো বলল, ইমাম আব্দুল আযীয যদি কুরআনের দলীল পেশের দাবি পরিত্যাগ না করেন, তাহলে পরাজয় স্বীকার করে এখনই কুরআনকে মাখলুক বলে স্বীকার করুক। অন্যথায় আমার রক্ত হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর আব্দুল আযীয বললেন, আমার পক্ষে কুরআনকে মাখলুক বলা অসম্ভব এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বিতর্ক করতে অক্ষমতা প্রকাশ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি তোমাকে প্রথম প্রশ্ন করবো? না কি তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে? সে বলল, তুমি প্রথমে প্রশ্ন করো। আব্দুল আযীয বলেন, বিশর মনে করেছিল, আমি তাকে কোনো প্রশ্নই করতে পারবো না। যাই হোক আমি বললাম, এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা স্বীকার করতে হবে।

(১) তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের মধ্যে কুরআন সৃষ্টি করেছেন (অথচ আমি মনে করি এটি আল্লাহর কালাম) অথবা

(২) তিনি এটিকে স্বনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন অথবা

(৩) তিনি এটিকে অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। বিশর এ কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে পাশ কেটে গেল এবং বলল, আমি বলছি, আল্লাহ তা'আলা অন্যসব বস্তুর মতই এটি সৃষ্টি করেছেন।

এবার মামুন আব্দুল আযীযকে বললেন, তুমি এ মাস'আলার ব্যাখ্যা করো এবং বিশরকে ছাড়ো। কারণ তার জবাব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আব্দুল আযীয বললেন, সে যদি বলে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের মধ্যে কালাম সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এটি অসম্ভব। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো সৃষ্ট বস্তুর মহল বা স্থান হতে পারেন না। অর্থাৎ সৃষ্টি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না এবং আল্লাহর সত্তার মধ্যে কোনো সৃষ্ট জিনিস নেই। আর যদি বলে আল্লাহ তা'আলা অন্যের মধ্যে কালাম সৃষ্টি করেছেন, তাহলে বিবেক-বুদ্ধির যুক্তির দাবিতে আবশ্যক হয় যে, তিনি সৃষ্টির মধ্যে যেসব কালাম সৃষ্টি করেছেন, তা সবই তার কালাম। এটিও অসম্ভব। কেননা এ কথা যে বলবে, তার উপর এটি স্বীকার করাও আবশ্যক যে, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যেসব কালাম সৃষ্টি করেছেন, তা আল্লাহরই কালাম। আর যদি

বলে যে, কালাম একটি স্বনির্ভর বস্তু এবং এটি নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, তাহলে তাও অসম্ভব। কেননা কথক ছাড়া কথার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ইচ্ছুক ছাড়া ইচ্ছার কোনো অস্তিত্ব নেই এবং আলেম ছাড়া ইলমের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এমন কোনো স্বনির্ভর কালাম নেই, যা নিজে নিজেই কথা বলে। যখন উপরোক্ত সকল দিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, আল্লাহর কালাম সৃষ্টি নয়, তখন জানা গেল যে, তা আল্লাহর ছিফাত। আব্দুল আযীয আলমক্কী (রাহিমাহুল্লাহ) তার কিতাব আলহায়দাতে এ বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন, সংক্ষিপ্তভাবে তা এখানেই শেষ হলো।

كل (প্রত্যেক) শব্দের মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা প্রত্যেক স্থান অনুপাতেই মূল্যায়ন হবে এবং বিভিন্ন আলামত দ্বারা তা জানা যাবে। আপনি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করেন নি,

﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾

"বাতাস তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেললো। অবশেষে তাদের এ অবস্থা দাঁড়ালো যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি"। *(সূরা আহকাফ: ২৫)*

এখানে তাদের বাড়িঘরগুলো প্রত্যেক জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা كل شيئ এর ব্যাপকতার আওতাভুক্ত হয়নি, যেগুলোকে বাতাস ধ্বংস করে দিয়েছিল। সাধারণত বাতাসের মাধ্যমে যা ধ্বংস করা সম্ভব এবং যা ধ্বংস করা দরকার كل شيئ দ্বারা কেবল তা ধ্বংস করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা সাবার রাণী বিলকিস সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ "তাকে সবকিছুই দান করা হয়েছে" (সূরা নামল:২৩)। রাজাদের যা কিছু প্রয়োজন হয় এখানে كُلِّ شَيْءٍ দ্বারা তা উদ্দেশ্য। ব্যাপকার্থ বোধক শব্দগুলো যে ব্যাপকার্থ প্রকাশ করে, কথার আলামত ও বর্ণনা প্রসঙ্গ দ্বারা উক্ত ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এখানে হুদহুদ পাখির উদ্দেশ্য হলো, রাজ্য পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সাবার রাণীর কাছে তা পরিপূর্ণ রূপেই ছিল এবং তার রাজত্বকে পরিপূর্ণ করার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন ছিল না। এ রকম দৃষ্টান্ত আরো অনেক রয়েছে।

সুতরাং اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ" (সূরা রাদ:১৬) এ কথার অর্থ হলো প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টা। আল্লাহ ছাড়া যেসব বস্তু রয়েছে, তা সবই সৃষ্টি। বান্দাদের কর্মসমূহও নিঃসন্দেহে এর মধ্যে শামিল। এ ব্যাপকতার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সত্তা শামিল নয়। আর তার ছিফাতসমূহও তার সত্তার বাহিরের আলাদা কোনো জিনিস নয়। কেননা তিনিই পূর্ণ গুণ দ্বারা বিশেষিত। এ ছিফাতগুলো তার পবিত্র সত্তার সাথেই যুক্ত। ছিফাতগুলো তার সত্তা থেকে আলাদা হিসাবে কল্পনা করা অসম্ভব। ইতিপূর্বে শাইখের উক্তি:

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلِقِهِ

"সৃষ্টি করার বহু পূর্ব থেকেই তিনি তার অনাদি গুণাবলীসহ শ্বাশ্বত সত্তা হিসাবে বিদ্যমান রয়েছেন, -এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় উক্ত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনকি কুরআনকে সৃষ্টি হিসাবে সাব্যস্ত করার জন্য তারা যে আয়াত দিয়ে দলীল দিয়েছে, তাই তাদের কথার বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে পেশযোগ্য। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ বাণী:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ। "প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ" যদি মাখলুক হয়, তাহলে তা কুরআন মাখলুক হওয়ার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কুরআনকে মাখলুক বলার পক্ষে তাদের আরেকটি দলীল হলো,

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"আমি এ কিতাবকে অবতীর্ণ করেছি কুরআন রূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো"। *(সূরা যুখরুফ: ৩)*

এভাবে দলীল গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা جعل শব্দটি যখন সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি মাত্র মাফউল একটি চায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾

"তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন"। *(সূরা আল-আনআম: ১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে। এরপরও কি তারা ঈমান আনয়ন করবেনা?"। *(সূরা আম্বীয়া: ৩০)* একই সূরায় এর পরের আয়াতে দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾

"আর আমি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তার মধ্যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েছি, হয়তো লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নেবে। আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টিই দেয় না"। *(সূরা আম্বীয়া: ৩১-৩২)*

আর جعل শব্দটি যখন দু'টি مفعول চায় তখন তা সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾

"এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো"। *(সূরা নাহাল: ৯১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ﴾

"তোমরা শপথ বাক্য উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না"। *(সূরা আল-বাকারা: ২২৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾

"যারা কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে"। *(সূরা হিজির: ৯১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

"নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ২৯)* আল্লাহ তা'আলা একই সূরার ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾

"এরা দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে। এদের সৃষ্টির সময় কি তারা উপস্থিত ছিল? এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে"। *(সূরা যুখরুফ: ১৯)* অনুরূপ আয়াত আরো অনেক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

"আমি এ কিতাবকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, *(সূরা যুখরুফ: ৩)* -এর ক্ষেত্রেও একই কথা। তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"পবিত্র ভূখন্ডে মূসার ডান দিকের একটি বৃক্ষ থেকে আহ্বান এলো, হে মূসা! আমি আল্লাহ, সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রভু", *(সূরা কাসাস:৩০)* -এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা গাছের মধ্যে কালাম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মূসা (আলাইহিস সালাম) তা শুনেছেন। কিন্তু তারা আয়াতের শুরু ও শেষের কথাগুলো থেকে অন্ধ হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুরুতে বলেছেন,

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾

"মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন সেখানে আসলেন তখন মূসার ডান দিকের উপত্যকার কিনারা থেকে আহবান এলো" *(সূরা কাসাস:৩০)*। দূর থেকে যে আহবান আসে তাকে কালাম বলা হয়। উপত্যকার কিনারা থেকে মূসা (আলাইহিস সালাম) আহবান শুনতে পেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ "পবিত্র ভূখণ্ডের বৃক্ষ থেকে" *(সূরা কাসাস:৩০)*। অর্থাৎ পবিত্র ভূখণ্ডের গাছের নিকট থেকে আহবান এসেছিল। যেমন বলা হয়, سمعت كلام زيد من البيت "ঘর থেকে যায়েদের কথা শুনেছি"। অর্থাৎ ঘর থেকে কথার সূচনা হয়েছে। এমন নয় যে, ঘর কথা বলেছে। মূসা (আলাইহিস সালাম) গাছ থেকে যে আহবান শুনেছেন, তা যদি গাছের মধ্যে সৃষ্টি করা কথা হয়ে থাকে, তাহলে গাছই এ কথা বলেছে হিসাবে ধরে নেয়া আবশ্যক হবে যে,

﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"হে মূসা! আমি আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রভু" *(সূরা কাসাস:৩০)*। সৃষ্টিজগতের প্রভু ছাড়া অন্য কারো কি এ কথা বলার অধিকার আছে যে, আমি আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির প্রভু? এ কথা যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে বের হতো, তাহলে ফেরাউনের এ কথাও সত্য হওয়া আবশ্যক হয়,

﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ "আমি তোমাদের মহান প্রভু" *(সূরা নাযিয়াত:২৪)*। কেননা তাদের মতে উভয় কথার প্রত্যেকটিই সৃষ্টি এবং তার কায়েল (বক্তা) আল্লাহ নন। তবে তারা তাদের বাতিল মূলনীতির ভিত্তিতে উভয় কথার মধ্যে পার্থক্য করেছে। মূসা যা শুনেছেন, তা আল্লাহ তা'আলা গাছের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরাউন যা বলেছে, তা সে নিজেই সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং তারা আল্লাহর কালামের বিকৃতি করেছে, তাকে পরিবর্তন করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য স্রষ্টা রয়েছে। বান্দাদের কাজ-কর্মের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾

"এটা একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী"। *(সূরা হাক্কাহ:৪০, সূরা তাকবীর: ১৯)*

এখান থেকে বুঝা যায় যে, একজন রসূলই কুরআন তৈরী করেছে। তিনি সম্ভবত জিবরীল অথবা মুহাম্মাদ। এর জবাব হলো, রসূল শব্দটি পরিচিত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত রিসালাতের প্রচারক ছিলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেননি যে, এটি একজন ফেরেশতার বাণী কিংবা একজন নাবীর বাণী।

সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা যে রেসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি তা প্রচার করেছেন। এমনটি নয় যে, তিনি নিজের পক্ষ হতে কুর'আন তৈরী করেছেন। এক আয়াতে রসূল দ্বারা জিবরীল উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জিবরীলের দিকে রিসালাতের সম্বন্ধ করার কারণে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, রসূলগণের দায়িত্ব ছিল কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া। কেননা একজন ইহা তৈরী করার অর্থ হলো অন্যের দ্বারা তা তৈরী হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যেহেতু উভয়ের দিকে রিসালাতের সম্বন্ধ করা হয়েছে, তাতে বুঝা গেল, কারো দ্বারাই তা তৈরী হয়নি। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী: رسول أمين "আমানতদার রসূল" এটি প্রমাণ করে যে, তাকে যে কালামের তাবলীগ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, তিনি তাতে বৃদ্ধি করেন না কিংবা তা থেকে কোনো কিছু কমান না। বরং তাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তিনি তাতে বিশ্বস্ত। প্রেরকের পক্ষ হতে তিনি তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

যারা বলে, কুরআন মানুষের কালাম, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কাফের বলেছেন। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ। সুতরাং যারা কুরআনকে মুহাম্মাদের কালাম বলবে কিংবা এ কথা বলবে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি তৈরী করেছেন, সে কুফুরী করল। যারা বলবে কুরআন মানুষের কালাম অথবা জিনের কালাম কিংবা ফেরেশতার কথা তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তারা সকলেই কাফের। যে কথা বলে তা তারই কালাম হয়। যে ব্যক্তি বক্তার কাছ থেকে শুনে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তাকে উক্ত কালামের প্রবক্তা বলা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি কাউকে যখন বলতে শুনবে,

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمُنْزِلِ "হে বন্ধুদ্বয়! থামো, আমার প্রেমিক ও তার বাড়িঘরের কথা স্মরণ করে আমরা একটু কেঁদে নেই" তখন সে বলবে, এটি হলো ইমরুল কায়েসের কবিতা। এমনি যে ব্যক্তি কাউকে যখন বলতে শুনবে,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"প্রতিটি আমল কবুল হওয়া বা না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যার নিয়ত সে করে" তখন সে বলবে, এটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালাম। ঠিক তেমনি সে যখন কাউকে বলতে শুনবে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

তখন বলবে এটি আল্লাহর কালাম। যখন তার জানা থাকবে, সে এ কথাই বলবে। আর যদি জানা না থাকে, তাহলে বলবে, আমি জানি না এটি কার কালাম? কেউ যদি তার কথার প্রতিবাদ করে, তাহলে সে মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। এ জন্যই কেউ যদি অন্যকে কোনো কবিতার ছন্দ কিংবা পদ্যাংশ পাঠ করতে শুনে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, এটি কার কথা? এটি কি তোমার রচিত কথা? না অন্য কারো?....ইত্যাদি।

আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব এবং বিরোধীদের জবাবঃ

মোট কথা, আহলে সুন্নাতের চার মাযহাবের সকল মাযহাব এবং সালাফ ও খালাফ-পরবর্তীদের অন্যান্য আলেমের মতে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম; সৃষ্টি নয়। কিন্তু পরবর্তীরা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে। কেউ বলেছে, আল্লাহর কালাম তার সাথে প্রতিষ্ঠিত মাত্র একটি কথার নাম।[১৪৪]

আওয়াজ ও অক্ষরের মাধ্যমে তা তার সত্তা থেকে বের হয় না। কেউ কেউ বলেছেন, এর অক্ষর ও আওয়াজ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। অথচ তিনি এর পূর্বে কথা বলেননি। আবার আরেক শ্রেণীর আলেম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা অনাদি থেকেই কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত, তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। কেননা কথা

১৪৪. এটি একটি বাতিল কথা। আল্লাহর কালাম বা কথা একটি মাত্র নয়; বরং তার অনেক কথা রয়েছে। কুরআনে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা। রয়েছে আদেশ ও নিষেধ। তিনি তার কালামের মাধ্যমে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন এবং তার রহমতের আশা ও আশ্বাস দিয়েছেন। তার কথা যদি মাত্র একটি হয়, তাহলে আল্লাহর আযাবের আয়াত ও তার রহমতের আয়াতের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

বলা আল্লাহ তা'আলার কাদীম বা অনাদি বিশেষণ। কোনো কোনো মুতাযেলী আলেম বলে থাকে কুরআন মাখলুক নয়। তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, এটি মিথ্যা ও বানোয়াট নয়; বরং এটি সত্য ও সঠিক। কুরআন সত্য ও সঠিক; এটি বানোয়াট নয়। নিঃসন্দেহে মুসলিমদের ঐকমত্যে মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়ার ধারণা বাতিল।

আহলে কিবলার লোকদের মতভেদ শুধু এ ব্যাপারে যে, এটি কি সৃষ্টি, যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন? না এটি আল্লাহর এমন কালাম, যার মাধ্যমে তিনি কথা বলেছেন এবং এটি তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত আছে? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে খালকে কুরআনের ফিতনার সময় এ প্রশ্নই করা হয়েছিল। অন্যথায় কুরআন মিথ্যা রচনা ও বানোয়াট হওয়ার অভিযোগটি সম্পূর্ণ বাতিল ছিল, তাতে কোনো মুসলিম সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

মুতাযেলাদের শাইখরা এবং অন্যান্য বিদআতীরা স্বীকার করেছে যে, তাওহীদ, আল্লাহর ছিফাত ও তাক্বদীরের ব্যাপারে তারা তাদের আক্বীদাহ ও মাযহাব কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করে না। এমনকি তারা ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈদের থেকেও গ্রহণ করেনি। তারা ধারণা করে যে, তাদের বিবেক-বুদ্ধিই তাদের পথ আলোকিত করেছে। তাদের ধারণা, তারা শরী'আতের ইমামদের থেকেই শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল গ্রহণ করে থাকে।

মানুষকে যদি অবিকৃত ফিতরাত এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদের মাঝে তাওহীদ, আল্লাহর ছিফাত ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মতভেদ হবে না। কিন্তু শয়তান তার নিজের ভুল-ভ্রান্তি থেকে কতিপয় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে বনী আদমকে দীনের ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾

"আল্লাহ যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছেন। কিন্তু যারা কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করেছে, তারা সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৭৬)*

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা অনাদি থেকেই যখন ইচ্ছা কথা বলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কালাম কাদীম অনাদি শ্রেণীর ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। ফিকহুল আকবারে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন, তা থেকেও সুস্পষ্ট এটি বুঝা যাচ্ছে। তিনি বলেন, কুরআন মুসহাফে লিখিত রয়েছে, হাফেযদের বক্ষে সংরক্ষিত আছে, মানুষের জবান দিয়ে তা পাঠ করা হচ্ছে, এটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, জবান দ্বারা আমাদের কুরআন পাঠ করা মাখলুক, কিন্তু কুরআন মাখলুক নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও অন্যান্য নাবীদের ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন এবং ফেরাউন ও ইবলীস সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, তাও আল্লাহর কালাম।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যান্য সৃষ্টির কালামও সৃষ্টি। কুরআন আল্লাহর কালাম; সৃষ্টির কালাম নয়। মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনেছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, তখন তিনি তার সে অনাদি ছিফাতের মাধ্যমে কথা বলেছেন। তার সমস্ত ছিফাত সৃষ্টির ছিফাতের মতো নয়। আল্লাহ তা'আলার ইলম রয়েছে, কিন্তু তার ইলম আমাদের ইলমের মত নয়, তার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়, তিনি দেখেন, কিন্তু তার দেখা আমাদের দেখার মত নয়, তিনি কথা বলেন, কিন্তু তার কথা আমাদের কথার মত নয়.....। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ।

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: "আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, তখন তিনি তার সে অনাদি ছিফাতের মাধ্যমে কথা বলেছেন" -এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন তুর পাহাড়ে আসলেন তখন কথা বলেছেন, এমনটি নয় যে তিনি অনাদি-অবিনশ্বর ছিফাতের মাধ্যমে সবসময় ইয়া মূসা ইয়া মূসা বলে ডেকেই যাচ্ছেন। কোনো বিবেকবান এ কথা বলতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

"অতঃপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন" (*সূরা আল-আরাফ*:১৪৩)

এ আয়াত থেকে এ কথাই বুঝা যায়। এতে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর সেসব অনুসারীর প্রতিবাদ রয়েছে, যারা বলে আল্লাহর মাত্র একটি, যা তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং তা শ্রবণ করার ধারণাই করা যায় না। তিনি কেবল বাতাসের মধ্যে শব্দ সৃষ্টি করেন। আবু মানসুর আল-মাতুরীদি এবং অন্যরা এ কথাই বলেছে।

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ। "যা তার ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তা অনাদি-চিরন্তন ও অবিনশ্বর", এতে ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কথা বলার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন না। অতঃপর তার জন্য এ বিশেষণ তৈরী হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কোনো বাতিল কথার সাথে মিশ্রিত সত্যে অংশকে বাতিলের সাথে প্রত্যাখ্যান করে না; বরং তারা সত্যটুকু রেখে শুধু বাতিলকেই প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং মুতাযেলাদের যে দলীল প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কালাম তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন ও এক কথার পর অন্য কথা বলেন, তাদের এ কথা সত্য। এটি কবুল করা আবশ্যক। কিন্তু তাদের এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, তা আল্লাহর সৃষ্টি, যখন ইচ্ছা তিনি তা সৃষ্টি করেন এবং একটি কালামের পর অন্যটি সৃষ্টি করেন।

ঠিক এমনটি যারা বলেছে, আল্লাহর কালাম তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, এটি তার অন্যতম ছিফাত এবং সত্তা ব্যতীত ছিফাত কায়েম হয় না[১৪৫] তাদের কথাও সমর্থন করা আবশ্যক। সুতরাং উপরোক্ত উভয় ফির্কার কথার মধ্যে সত্যের যে অংশ রয়েছে, তা কবুল করে নেয়া আবশ্যক এবং তাদের প্রত্যেকের কথা থেকে শরী'আত ও বিবেক-বুদ্ধির দলীল যা প্রত্যাখ্যান করে তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

এখন বিরোধীরা যদি আমাদেরকে বলে, উপরোক্ত অর্থে আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করলে তার সত্তার সাথে حوادث (সৃষ্ট বস্তু) সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়, তাহলে তাদের জবাবে আমরা বলবো যে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত কথা। আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করলে তার সত্তার সাথে حوادث সৃষ্ট বস্তু যুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়, তোমাদের পূর্বে মুসলিমদের কোনো ইমাম কি এ কথা বলেছে? কুরআন ও সুন্নাতের অনেক দলীল আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করেছে। ইমামদের উক্তি এবং বিবেক-বুদ্ধির সুস্পষ্ট দলীল তা সাব্যস্ত করে।

রসূলগণ যখন তাদের জাতির লোকদেরকে এভাবে সম্বোধন করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আহবান করেছেন, চুপিসারে কথা বলেছেন, তখন তারা নিঃসন্দেহে জাতির লোকদেরকে এটি বুঝাননি যে, এ কথাগুলো তিনি তার সত্তা থেকে আলাদা করে অন্যস্থানে সৃষ্টি করেছেন। বরং তারা বুঝিয়েছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই কথাগুলো বলেছেন। তার সত্তার সাথেই এ কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত, অন্যের সাথে নয়। তিনিই তা বলেছেন।

যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় বলেন, আমি নিজেকে এত ছোট মনে করতাম যে, আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এমন অহীর মাধ্যমে কথা বলবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে, এমনটি ভাবতেই পারিনি।[১৪৬]

এ থেকে যা বুঝা যাচ্ছে, এর বিপরীত উদ্দেশ্য হলে তা বর্ণনা করা আবশ্যক হতো। কেননা যখন যা বর্ণনা করা আবশ্যক, তা যথা সময়ের পরে বর্ণনা করা অবৈধ। কেননা কোনো ভাষাতেই এমনটি পাওয়া যাবে না যে, বক্তা ও কথকের কথা তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে না; বরং তার কথা অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও এটি সমর্থন করে না।

---

১৪৫. যেমন আলেম ছাড়া ইলমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সাদা জিনিস থেকে সাদা রং আলাদা করে এক স্থানে রেখে এবং জিনিসটিকে অন্যস্থানে রেখে বুঝার কোনো সুযোগ নেই। দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের দৃষ্টিকে একস্থানে রেখে এবং মানুষটিকে অন্য জায়গায় রেখে বুঝার যেমন কোনো উপায় নেই। সুতরাং আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। তার পবিত্র যাত থেকে ছিফাতকে আলাদা করে বুঝা অকল্পনীয়।

১৪৬. তার ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে স্বপ্ন বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দিবেন।

তারা যদি বলে যে, সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই কেবল তারা আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য কতিপয় ছিফাত ছাড়া অন্যান্য ছিফাত সাব্যস্ত করে না।

তাদের জবাব হলো, তারা যখন বলবে আল্লাহ তা'আলার ইলম রয়েছে, কিন্তু তার ইলম আমাদের ইলমের মত নয়, তখন আমরা বলবো, তিনি কথা বলেন, কিন্তু আমাদের কথা বলার মত নয়। সমস্ত ছিফাতের ক্ষেত্রে একই কথা। এমন কোনো ক্ষমতাবানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় কি যার সাথে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং এমন কোনো জীবন্ত প্রাণী আছে কি যার মধ্যে হায়াত থাকে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলতেন,

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সমস্ত কালেমার উসীলা দিয়ে তার মাখলুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যেগুলো কোনো নেককার কিংবা বদকারের পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়"।[১৪৭]

বিবেকবান কোনো মানুষের পক্ষে কি এ কথা বলা সম্ভব যে, তিনি মাখলুকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় আরো বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِرِضَاك مِنْ سَخَطك وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتك وأعوذبك منك»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার ক্ষমা গুণের উসীলায় তোমার শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করছি এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার নিকটই আশ্রয় চাচ্ছি"।[১৪৮]

তিনি তার দু'আয় আরো বলেছেন,

«أَعُوذُ بِعزة اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

"আমি নিজের মধ্যে যে ব্যথা অনুভব করছি এবং অন্যান্য যেসব রোগ-ব্যাধির আশঙ্কা করছি, তার ক্ষতি থেকে আমি আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার আশ্রয় কামনা করছি"[১৪৯]। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

«وَنعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ نغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا»

---

১৪৭. ছ্বহীহ: ইমাম আহমাদ ছ্বহীহ সনদে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

১৪৮. ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪৮৬।

১৪৯. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ ৩৫২২, আবূ দাউদ ৩৮৯১।

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার মহত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধ্বসে আমাদের আকস্মিক মৃত্যু হতে"[১৫০]।

এভাবে তিনি যেসব বস্তুর উসীলা দিয়েছেন, তার সবগুলোই আল্লাহর ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার যেসব ছিফাতের উসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন, যথাস্থানে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে তার দিকে ইশারা করা হলো।

পরবর্তীকালের অনেক হানাফী মনে করে আল্লাহর কালাম মাত্র একটি।[১৫১] তার কথা একাধিক্যতা, বহুত্ব, বিভক্তিকরণ হয় শুধু বাক্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে; মূল অর্থ কেবল একটিই। কালামের এ ভাষাগুলো সৃষ্টি। এগুলো যেহেতু আল্লাহর মাত্র একটি কালামের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাই এগুলোকে আল্লাহর কালাম বলা হয়েছে। তার কালামকে যখন ইবরানী ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তাকে তাওরাত বলা হয় আর যখন আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তাকে কুরআন বলা হয়। সুতরাং কালামের ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা ও ভাষা বিভিন্ন হয়; মূল কালাম বিভিন্ন হয় না। তারা আরো বলেছে, এ ভাষাগুলোকে কেবল রূপকার্থেই আল্লাহর কালাম হিসাবে নামকরণ করা হয়।

এটি একটি বাতিল কথা। এ কথা থেকে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا "তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না" (সূরা বনী ইসরাঈল:৩২), -এর অর্থ আর আল্লাহর বাণী: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ছ্বলাত কায়েম করো *(সূরা আল-বাকারা:৪৩)* এর অর্থ একই।[১৫২] আয়াতুল কুরসীর যে অর্থ আয়াত দু'টিরও সে অর্থ। সূরাতুল ইখলাছ্বের যে অর্থ, সূরা লাহাবেরও সে একই অর্থ। তাদের কথার মধ্যে মানুষ যতই চিন্তা করবে, ততই তাদের কথার বিভ্রান্তি পরিষ্কার হবে এবং জানতে পারবে যে, তাদের কথা সালাফদের কথার পরিপন্থী এবং সত্য থেকে বহু দূরে।

আসল কথা হলো, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম অপরিসীম। এর কোনো শেষ নেই। তিনি যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। সবসময়ই তিনি এ বিশেষণে বিশেষিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

১৫০. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ ৫০৭৪।

১৫১. এখানে লেখক হানাফীদের যে গ্রুপের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তারা ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহর অনুসরণ করলেও আকীদাহর ক্ষেত্রে তারা আশ'আরী ও মাতুরীদি মাযহাবের অনুসারী।

১৫২. কেননা তাদের মতে আল্লাহর কালাম মাত্র একটি; একাধিক নয়।

"হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না"। *(সূরা কাহাফ: ১০৯)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং এ সমুদ্রের সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর কালাম লিখে শেষ করা যাবে না। অবশ্যই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী"। *(সূরা লোকমান: ২৭)*

মুসহাফের মধ্যে যা আছে, তা যদি হুবহু আল্লাহর কালাম না হয়ে তার কালামের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য হতো, অপবিত্র মানুষের জন্য তা স্পর্শ ও পাঠ করা হারাম হতো না। আসল কথা হলো, আল্লাহর কালাম হাফেযদের বক্ষে সংরক্ষিত রয়েছে, জবানের মাধ্যমে তা পঠিত হচ্ছে এবং মুসহাফে তা লিখিত রয়েছে। যেমন ফিকহুল আকবারে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) সুস্পষ্ট করেই বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তা সবই প্রকৃত ও সত্য। কেউ যদি বলে, **في المصحف كلام الله** "মুসহাফের মধ্যে আল্লাহর কালাম লিখিত আছে", তা থেকে প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে, তাতে প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর কালাম লিখিত আছে। যদি বলা হয়, **فيه خط فلان وكتابته** "মুসহাফে অমুকের হাতের লেখা রয়েছে", এ কথাও প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে। আরো যদি বলা হয়, **فيه مداد قد كتب به** "মুসহাফের মধ্যে কালি রয়েছে। তা দ্বারা আল্লাহর কালাম লেখা হয়েছে এবং তাতে অমুক লেখকের হাতের লেখা রয়েছে। উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে في হারফে জার্ থেকে যে যারফিয়াত (স্থান বা পাত্র) বুঝা যায় এবং فيه السموات والأرض "তাতে রয়েছে আসমান যমীন", فيه محمد وعيسى "তাতে রয়েছে মুহাম্মাদ ও ঈসা" অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত في হারফে জার্ থেকে একই যারফিয়াত (স্থান) বুঝা যায় না। অর্থাৎ কুরআনে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, জান্নাত, জাহান্নাম, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যান্য সৃষ্টির আলোচনা রয়েছে। অথচ এসব বস্তুর অস্তিত্ব মুসহাফের বাইরে। ঐদিকে মুসহাফে কালি রয়েছে এবং অমুক লেখকের হাতের লেখা রয়েছে, এ কথার অর্থ হলো বাস্তবেই কুরআনে নির্দিষ্ট এক প্রকার কালি রয়েছে, যা দ্বারা তা লেখা হয়েছে। কিন্তু যখন বলা হবে **فيه كلام الله** "মুসহাফে আল্লাহর কালাম রয়েছে" তখন উপরোক্ত যারফিয়াতের অর্থ থেকে এ বাক্যের যারফিয়াতের অর্থ হবে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ মুসহাফের মধ্যে আল্লাহর কালাম রয়েছে, এ কথা বলা হলেই আবশ্যক হয়

না যে, তা আল্লাহর সৃষ্টি। যেমন মুসহাফের মধ্যে কালি রয়েছে এ কথা থেকে আমরা বুঝি যে, তাতে এমন কালি রয়েছে, যা সৃষ্টি। কিন্তু কুরআনে জান্নাত, জাহান্নাম, আসমান-যমীন ইত্যাদি রয়েছে, -এ কথা বলা হলে আবশ্যক হয় না যে, কুরআনের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবে তা রয়েছে। বরং এ সৃষ্টিগুলো রয়েছে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। আর কুরআনে রয়েছে কেবল এগুলোর আলোচনা। ঠিক তেমনি মুসহাফে আল্লাহর কালাম রয়েছে বলা হলেই আবশ্যক হয় না যে তাতে আল্লাহর কালাম প্রবেশ করেছে এবং তা সৃষ্টি। কেননা সৃষ্টির মধ্যে যা প্রবেশ করে তাও সৃষ্টি!!

উপরোক্ত অর্থগুলোর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে যে ব্যক্তি অক্ষম হবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। এমনকি সঠিক পথের সন্ধানও পাবে না। সে সঙ্গে কুরআন পাঠ করা, যা কারীর কাজ এবং পঠিত কুরআন যা আল্লাহর কালাম, এ কথা দু'টির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কেও বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি এটি বুঝবে না, সে গোমরাহ হবে। কোনো লোক যদি একখণ্ড কাগজ দেখতে পায়, যাতে সুপ্রসিদ্ধ কোনো লেখকের হাতে লেখা রয়েছে, ألا كل شيئ ما خلا الله باطل..... "আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক জিনিসই বাতিল বা ধ্বংস হবে", তখন সে বলবে এটি প্রকৃতপক্ষে জাহেলী কবি লাবীদ বিন রাবিআর কবিতাংশ এবং প্রকৃতপক্ষেই অমুকের হাতের লেখা। كل شيئ "প্রত্যেক জিনিস" যা কাগজে উল্লেখ করা হয়েছে তাও প্রকৃত এবং বাস্তব, এখানে যে কালি দ্বারা কাগজে লাবীদের কথা লেখা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই কালি। এ প্রকৃত ও বাস্তব বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিই যে ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত, তাতে কোনে সন্দেহ নেই এবং এগুলো পরস্পর মিশ্রিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।

القرآن শব্দটি মূলত মাসদার বা ক্রিয়ামূল। কখনো কখনো এটি উল্লেখ করে পাঠ উদ্দেশ্য করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

"ছ্বলাত কায়েম করো সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পাঠ করো। কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে" (সূরা বনী ইসরাঈল:৭৮)।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

তোমরা তোমাদের আওয়াজের মাধ্যমে কুরআন পাঠকে সুন্দর করো"[১৫৩] কখনো কখনো কুরআন উল্লেখ করে পঠিত কুরআনকে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

"তারপর যখন তোমরা কুরআন পড়ো তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো" *(সূরা নাহল:৯৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"যখন কুরআন, তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে"। *(সূরা আল-আরাফ: ২০৪)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ»

"এ কুরআন সাতটি পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে"।[১৫৪]

এ রকম আরো অনেক আয়াত ও হাদীছ প্রমাণ উপরোক্ত দু'টি অর্থই বহন করে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষেই কুরআনের অক্ষরসমূহ ও তার অর্থসমূহ আল্লাহরই কালাম এবং তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের তৈরী কালি দিয়েই মানুষের হাতের মাধ্যমে লেখা হয়েছে। তাতে সৃষ্ট বস্তুর আলোচনাও রয়েছে। তাই বলে এটি মাখলুক বা সৃষ্টি হয়ে যায়নি। অস্তিত্বশীল বাস্তব বস্তুগুলোর একাধিক হাকীকত থাকে। সত্তাগত অস্তিত্ব, এ ও মস্তিস্কের মধ্যকার কল্পনাগত অস্তিত্ব, শব্দগত অস্তিত্ব ও লেখা সম্পর্কিত অস্তিত্ব।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা পাহাড়ের কথা বলতে পারি। পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলা যায় যে, এটি একটি পাহাড়। আমরা যখন নির্দিষ্ট কোনো পাহাড় সম্পর্কে কল্পনা করি, তখন আমাদের মাথার মধ্যেই পাহাড়ের অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ পাহাড় সম্পর্কে কল্পনা ও ধারণা থাকে। এমনি যখন পাহাড় কথাটি উচ্চারণ করি, তখনো কথা বা শব্দের মাধ্যমেও পাহাড়ই বলি; গাছ বলি না। আবার যখন আমরা অক্ষর দ্বারা পাহাড় শব্দটি লিখি তখনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলি, هذا جبل এটি একটি পাহাড়। পাহাড় লিখতে যে অক্ষরগুলোর প্রয়োজন হয়েছে, এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে; পাহাড়ের সত্তার দিকে নয়। সুতরাং বস্তুগুলো প্রথমত জানা হয়, তারপর উল্লেখ করা হয়, তারপর লেখা হয়। মুসহাফে প্রকৃতপক্ষেই কুরআন লেখার বিষয়টি চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৫৩. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ

১৫৪. ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৪৯৯২।

আল্লাহর কালামের ব্যাপারে কথা হলো, এর মাঝে এবং মুসহাফের মাঝে কোনো যোগসূত্র ও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ হুবহু আল্লাহর কালাম মুসহাফে লেখা হয়েছে। কালাম অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর মত নয়, যা প্রথমত জানা যায় বা নির্দিষ্ট একটি স্থান দখল করে অস্তিত্বশীল হয়েছে। অতঃপর জবানের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়, অতঃপর তা কাগজে লেখা হয়। এক কথায় মুসহাফের কাগজে কালি দিয়ে হুবহু আল্লাহর কালাম লেখা হয়েছে। এটি এমন কোনো বস্তুর মত নয়, যার নাম কাগজে লেখা হয়, কিন্তু তার অস্তিত্ব থাকে অন্য স্থানে। মোট কথা কাগজ, কলম কালি এবং জবান সৃষ্টি হলেও কাগজ ও কালির মাধ্যমে লিখিত কালাম এবং জবানের মাধ্যমে পঠিত কালাম তার সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন থাকা এবং সুক্ষ্ম চামড়া বা কাগজের উপর লিখিত থাকা অথবা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত থাকা কিংবা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾

"আর আগের লোকদের কিতাবেও এ কথা আছে"। *(সূরা শুআরা: ১৯৬)*

অর্থাৎ কুরআনে যে উপদেশ রয়েছে, তার আলোচনা, গুণাগুণ এবং সংবাদ পূর্বের কিতাবসমূহেও ছিল। এমনটি নয় যে, কুরআন হুবহু পূর্বেও নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতির লোকদের কিতাবসমূহে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম লেখা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কেবল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরই কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো উপর এটি নাযিল করা হয়নি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা في الزبر (লিখিত গ্রন্থসমূহে) বলেছেন; في الصحف (পুস্তিকায়) বলেননি এবং في الرق বলেননি। কেননা الزبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। الزَّبْر শব্দের অর্থ হলো লিপিবদ্ধ করা ও একত্র করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾

"আর আগের লোকদের কিতাবেও এ কথা লেখা আছে" *(সূরা শুআরা: ১৯৬)* ।

অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহেও কুরআনের খবর ও গুণাগুণ লিপিবদ্ধ রয়েছে; হুবহু এ কুরআনটি লেখা নেই। الزبر শব্দ এবং তা থেকে নির্গত শব্দের মধ্যেই এমন অর্থ রয়েছে, যা উদ্দিষ্ট অর্থকে সুস্পষ্ট করে দেয়। সে সঙ্গে আরো বর্ণনা করে দেয় যে, কুরআনের বর্ণনা খুবই পরিপূর্ণ এবং সন্দেহ ও অস্পষ্টতা মুক্ত। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও কুরআনের আলোচনা রয়েছে, এ কথাটির অনুরূপ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ﴾

"যার উল্লেখ তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত অবস্থায় পায়"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৫৬)* অর্থাৎ তার আলোচনা পায়। এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ "পাতলা চামড়ার উপর তা লিখিত আছে"। *(সূরা তূর: ৩)*, আল্লাহর বাণী:

﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ "তা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে"। *(সূরা বুরুজ: ২২)* এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ "এটি একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে"। (সূরা ওয়াকিয়া: ৭৮) এর বিপরীত। কেননা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যে হরফে জার্ في রয়েছে, তাতে যে عامل এর প্রয়োজন, তা কখনো সাধারণ فعل (ক্রিয়া) হয়। যেমন كون, استقرار, حصول ইত্যাদি। অথবা উহ্য শিবহে ফেল, مكتوب শব্দটি নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ উহ্য রূপটি এমন হতে পারে, مكتوب في لوح محفوظ, مكتوب في كتاب مكنون, مكتوب في رق منشور।

كتاب শব্দটি ব্যবহার করে কখনো এর দ্বারা লেখার স্থান উদ্দেশ্য করা হয়। আবার কখনো লিখিত কালামও উদ্দেশ্য হয়। কিতাবের মধ্যে কালাম লেখা এবং কিতাবের বাইরে অস্তিত্বশীল জিনিসগুলো কিতাবের মধ্যে লেখার মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। কিতাবের বাইরে অস্তিত্বশীল জিনিসগুলো কিতাবে লেখার সময় কেবল তার আলোচনাই লেখা হয়। আর কালাম লিখলে হুবহু তাই লেখা হয় এবং তা যার কালাম তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। মানুষ যতই এ অর্থটি নিয়ে চিন্তা করবে, ততই তার জন্য পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

আল্লাহ তা'আলার সত্তা থেকে যে কালাম বের হয়, তার প্রকৃত অবস্থা হলো, তা কখনো তার থেকে সরাসরি শুনা যায়, যেমন শুনেছিলেন মূসা (আলাইহিস সালাম) অথবা আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রচারকারী থেকে শুনা যায়। শ্রবণকারী যখন তা শুনে, তখন তিনি তা জেনে নেন এবং সংরক্ষণ করেন। সুতরাং আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা যায়, সংরক্ষণ করা যায়। শ্রোতাগণ যখন তা পাঠ করে, তখন তারই পাঠ ও তেলাওয়াত হয়। যখন সে তা লিখে তখন তারই লেখা ও অঙ্কন বলে গণ্য করা হয়। এসব ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হবে। এটিকে নাকোচ করা অবৈধ। কিন্তু কোনো রূপকার্থকে নাকোচ করা বৈধ। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, মুসহাফের মধ্যে যা আছে, তা আল্লাহর কালাম নয় এবং কারীগণ যা পাঠ করে, তাও আল্লাহর কালাম নয়।

আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾

"আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও"।

এখানে আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনার জন্য যাকে আশ্রয় দেয়ার কথা বলা হয়েছে, সে কখনোই সরাসরি আল্লাহ তা'আলা থেকে কালাম শুনবে না। বরং সে আল্লাহর বাণী প্রচারকারী থেকেই তা শুনবে। যারা বলে শ্রুত কালাম আল্লাহর সরাসরি কালাম নয়; বরং তা আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা, উক্ত আয়াত তাদের কথার প্রতিবাদ করছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ "যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়"। এমনটি বলা হয়নি, যাতে সে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা শুনতে পায়। ভাষার ক্ষেত্রে আসল হলো এতে শব্দগুলো প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে, মুসহাফসমূহে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা আল্লাহর কালামের বর্ণনা রয়েছে; তাতে আল্লাহর কালাম নেই, সে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং উম্মতের সালাফদের ইজমার বিরোধিতা করবে। তার গোমরাহীর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

যারা বলে আল্লাহর কালাম মাত্র একটিই, আল্লাহর পক্ষ হতে তা শ্রবণ করার কল্পনাই করা যাবে না এবং নাযিলকৃত, শ্রুত, পঠিত ও লিখিত কালাম আল্লাহর কালাম নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার কালামের ব্যাখ্যা মাত্র, ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্য তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা তিনি বলেছেন, مِنْهُ بَدَا وَإِلَيْهِ يَعُودُ "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এর সূচনা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকেই এটি ফিরে যাবে"।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ছাড়াও অন্যান্য সালাফগণ একই কথা বলেছেন। তারা আরো বলেছেন, আল্লাহর নিকট থেকেই এটি এসেছে এবং তার নিকটই ফিরে যাবে। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এ জন্য منه بدا বলেছেন, আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী মুতাযেলারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো একটি মহলে বা স্থানে কালাম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই মহল থেকে কালাম বের হয়েছে। এ জন্যই সালাফগণ তাদের প্রতিবাদে বলেছেন, منه بدا অর্থাৎ তিনিই এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। সুতরাং তার নিকট থেকে তা এসেছে; কোনো কোনো সৃষ্টির পক্ষ হতে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

"এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত" *(সূরা আয-যুমার:১)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

"কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো"। *(সূরা সাজদাহ: ১৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾

"এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুছ ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে"। *(সূরা আল নাহাল: ১০২)*

আলেমদের কথা, إليه يعود "তার দিকেই কালাম ফিরে যাবে", এর অর্থ হলো মানুষের বক্ষসমূহ থেকে এবং মুসহাফসমূহ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর মানুষের অন্তরে কিংবা মুসহাফে কোনো আয়াতই অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক হাদীছে এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ত্বহাবীর উক্তি: بلا كيفية "এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না"।[১৫৫] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে কিভাবে কথা বলেছেন, তার ধরণ আমরা জানি না। আল্লাহ কথা বলেছেন, -এ কথা রূপকার্থেও বলা হয়নি। তিনি অহী আকারে এটি তার রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতার মাধ্যমে তার রাসূলের নিকট তা পাঠিয়েছেন। জিবরীল ফেরেশতা তা আল্লাহর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনেছেন জিবরীল ফেরেশতার নিকট থেকে। অতঃপর তিনি মানুষের জন্য তা পাঠ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾

"আর এ কুরআনকে আমি অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং এটি আমি যথাযথভাবেই নাযিল করেছি"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ১০৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

"এটি রব্বুল আলামীনের নাযিল করা কিতাব। একে নিয়ে আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। পরিষ্কার আরবী ভাষায়"। *(সূরা শুআরা: ১৯২-১৯৫)*

---

১৫৫. উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কথা বলার কোনো ধরণ নেই এটা বলা হয়নি, বরং কোনো ধরণ জানা নেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কথা বলার ধরণ আমাদের জানা না থাকলেও উহার একটা ধরণ তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সে ধরণ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানেন।

এ আয়াতগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য উলু তথা সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত হয়।[১৫৬] এ কথার উপর কেউ আপত্তি করে বলতে পারে যে, উপর থেকে কুরআন নাযিল হওয়া, বৃষ্টি নাযিল হওয়া, লোহা নাযিল করা এবং চতুষ্পদ জন্তুর আটজোড়া নর-মাদি নাযিল করার মতই।[১৫৭]

কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক স্থানেই বলেছেন যে, তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে তিনি বলেছেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾

"আমি লোহা নাযিল করেছি এবং সূরা যুমারের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন,

﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আটজোড়া নাযিল করেছেন"। সুতরাং উপর থেকে কুরআন নাযিল হওয়ার অর্থ এ নয় যে আল্লাহ তা'আলা উপরে এবং কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে।

উপরোক্ত আপত্তির জবাব হলো, কুরআন নাযিলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। আর উপরোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তা বলা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনের ২ নং আয়াতে বলেন,

﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

"এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞাত"। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ১ নং আয়াতে বলেন,

﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

"এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে"। সূরা ফুস্‌সিলাতের ২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾

১৫৬. কেননা নাযিল সাধারণত উপর থেকে নীচের দিকেই হয়ে থাকে।

১৫৭. মুতাযেলারা বলে থাকে, বৃষ্টি নাযিল করা, লোহা নাযিল করা, চতুষ্পদ জন্তু নাযিল করার অর্থ যেমন সৃষ্টি করা, ঠিক তেমনি কুরআন নাযিল করা মানে তা সৃষ্টি করা। এটি নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের পক্ষ হতে কুরআন নাযিল করেছেন।

"এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে"। সূরা হামীম সাজদার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

"কোনো বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, অগ্র হতেও না, পশ্চাত হতেও না। এটা প্রজ্ঞাবান ও পরম প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে হয়েছে"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা দুখানের ৩-৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾

"আমি এটি এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ফায়ছালা করা হয়। আমার নির্দেশেক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণকারী"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসের ৪৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"হে নাবী! তাদেরকে বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি যা এ দু'টির চেয়ে বেশী হিদায়াত দানকারী; আমি তারই অনুসরণ করবো"। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

"আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না"। *(সূরা আল-আনআম: ১১৪)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নাহালের ১০২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾

"এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুছ সত্যসহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে"। আর বৃষ্টি নাযিলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তা আসমান থেকে নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফুরকানের ৪৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

"আমি আসমান থেকে নাযিল করি পবিত্র পানি"।

এখানে আসমান থেকে নাযিল করার অর্থ হলো উপর থেকে নাযিল করা। অন্য স্থানে বলা হয়েছে যে, বৃষ্টি নাযিল হয় মেঘ থেকে।

সূরা নাবার ১৪ নং আয়াতেও মেঘমালা থেকে বৃষ্টি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর লোহা ও চতুষ্পদ জন্তু নাযিল হওয়ার বিষয়টি কোনো কিছুর দিকে সম্বন্ধ না করেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন নাযিল হওয়াকে কিভাবে সৃষ্ট বস্তু নাযিল হওয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে? লোহা সাধারণত পাহাড়ের খনি থেকে বের হয়। আর পাহাড় সমতল ভূমি থেকে উঁচু থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, লোহার খনি যতই উঁচু স্থানে হয়, সেখান থেকে উৎপাদিত লোহার মানও ভালো হয়।

সুতরাং লোহা যেহেতু উপর থেকে পাওয়া যায়, তাই লোহার ক্ষেত্রে নাযিল কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর চতুষ্পদ জন্তু বংশানুক্রমে সৃষ্টি করা হয়। এতে নরপশুর পৃষ্ঠদেশ থেকে নির্গত পানি মাদিপশুর গর্ভাশয়ে অবতরণ করা আবশ্যক। এ জন্যই এ ক্ষেত্রে أنْزل বলা হয়েছে نزّل বলা হয়নি। কেননা উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। إنزال অর্থ হলো একসাথে নাযিল করা। تنزيل অর্থ হলো ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে অবতীর্ণ করা।

এখানে আরেকটি ধর্তব্য বিষয় হলো, নবজাতক শিশু বা পশুর বাচ্চারা তাদের মায়ের পেট থেকে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে। আরেকটি জানা কথা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ষাঁড়গুলো প্রজনন কর্ম সম্পাদন করার সময় মাদিপশুর উপর উঠে। এ সময় পাঠা বা ষাঁড়ের পানি উপর থেকেই মাদির গর্ভাশয়ে অবতীর্ণ হয়। এমনি সে যখন বাচ্চা প্রসব করে, তখন উপর থেকে নীচের দিকেই বাচ্চাকে নিক্ষেপ করে। এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে,

﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আটজোড়া নাযিল করেছেন" *(সূরা আয-যুমার:৬)*। এখানে من হারফে জার্ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) جنس الأنعام তথা সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা

(২) সূচনার সীমা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾

"যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীব জন্তুর প্রজাতি থেকেও তাদের জোড়া বানিয়েছেন" *(সূরা আশ-শূরা:১১)*, এখানেও মিন্ হারফ জার্টি উপরোক্ত দু'টি অর্থই প্রদান করার সম্ভাবনা রাখে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا "আর ঈমানদারগণ তাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন এবং কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। এটিই ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈদের উক্তি। তারাই হলেন সালাফে সালেহীন। আর এ কথাই সত্য ও সঠিক। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ

তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষেই কুরআন আল্লাহর কালাম, কোনো সৃষ্টির কথার মত সৃষ্টি নয়। এখানে শাইখ সুস্পষ্টভাবেই মুতাযেলা এবং অন্যদের প্রতিবাদ করেছেন। 'প্রকৃতপক্ষেই কুরআন আল্লাহর কালাম' এ কথার মাধ্যমে শাইখ ঐসব লোকের প্রতিবাদ করেছেন, যারা বলে আল্লাহর কালাম মাত্র একটি, তা তার সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং তা শুনা যায় না। তা কেবল কালামে নাফসানী বা আত্মিক কালাম। কেননা যার নফসের সাথে কালাম প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু সে তার মাধ্যমে কথা বলেনি, তার নফসের সাথে যুক্ত কালামকে প্রকৃত কালাম বলা হয় না। তার কথাকে কালাম বলা হলে বোবাকে মুতাকাল্লিম বলা যথার্থ হবে।[১৫৮]

কেননা তার নফসের সাথেও কালাম যুক্ত আছে। যেহেতু বোবাকে মুতাকাল্লিম বলা ঠিক নয়, সে হিসাবে মুসহাফের মধ্যে বিদ্যমান কালামকে কুরআন বলা কিংবা আল্লাহর কালাম বলা ঠিক হবে না। কিন্তু বলা হবে যে, তা আল্লাহর কালামের অর্থ মাত্র; তা হুবহু আল্লাহর কালাম নয়। যেমন বোবা কারো প্রতি ইশারা করলো। ইশারার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে সে লোকটি তা লিখে নিল, যার প্রতি সে ইঙ্গিত করেছে। এ ব্যক্তি যা লিখেছে তা ঐ অর্থের নাম মাত্র। আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর কালামের ব্যাপারে যা বলে, তার জন্য এ দৃষ্টান্ত হুবহু প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে তাদের কেউ বোবা হিসাবে নামকরণ করে না। তবে তারা বলে জিবরীল ফেরেশতা আল্লাহর নফসের সাথে যুক্ত কালামকে বুঝে নিয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলা থেকে একটি অক্ষর বা একটি আওয়াজও শুনেনি। বরং তিনি শুধু অর্থকেই বুঝেছেন। অতঃপর তিনি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং জিবরীল ফেরেশতাই নিজস্ব ভাষায় কুরআনের শব্দমালা ও আরবী গ্রন্থনা তৈরী করেছেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো জিসিম যেমন বাতাস বা অন্য কিছুর মধ্যে এ কালামের অর্থটি সৃষ্টি করেছেন।

---

১৫৮. এটি আশায়েরা এবং অন্যদের যুক্তি।

আর যারা বলে আল্লাহর কালাম বলতে মাত্র একটি অর্থকেই বুঝায়, তাদের জবাবে বলা হবে, তাহলে মূসা (আলাইহিস সালাম) কি পূর্ণ অর্থটি শুনেছেন? না কি তার আংশিক শুনেছিলেন? তারা যদি বলে তিনি সমস্ত কালাম শুনেছেন, তাহলে আসলে এ ধারণাই করল যে, তিনি আল্লাহর সমস্ত কালাম শুনেছেন! এ কথা যে ভুল, তা সুস্পষ্ট। আর যদি বলে, তিনি আংশিক কালাম শুনেছেন, তাহলে তার জন্য এটি বলা আবশ্যক হবে যে, আল্লাহর কালামের অংশ ও শ্রেণী বিন্যাস হয়। এমনি আল্লাহ তা'আলা যার সাথে কথা বলেছেন কিংবা যার নিকট তার কালাম থেকে কিছু নাযিল করেছেন, তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন,

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

"আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো" *(সূরা আল-বাকারা: ৩০)* আর যখন তিনি তাদেরকে বললেন,

﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾

"তোমরা আদমকে সিজদাহ করো" ইত্যাদি সব মিলে অনুরূপ কথা কি আল্লাহর সমস্ত কালাম অথবা তা কি তার কালামের অংশ বিশেষ? তারা যদি বলে এটিই আল্লাহর সমস্ত কালাম, তাহলে এটি অহংকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর যদি বলে, আংশিক শুনেছেন, তাহলে তাদের মতেও আল্লাহর কালামের আধিক্যতা, বিভিন্নতা ও বহুত্ব প্রমাণিত হয়। লোকেরা সাধারণভাবে[১৫৯] কালামের ব্যাপারে চারটি কথা বলেছে।

(১) শব্দ এবং তার অর্থ মিলেই কালাম হয়। উভয়ের একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে বুঝার কোনো সুযোগ নেই। যেমন দেহ ও রূহের মিলিত রূপকেই মানুষ বলা হয়। এটিই সালাফদের কথা।

(২) শুধু শব্দকেই কালাম বলা হয়। অর্থ শব্দের অংশ নয়। বরং অর্থ হলো তাই, যা কালাম থেকে বুঝা যায়। এটি একদল মুতাযেলা এবং অন্যদের মত।

(৩) শুধু অর্থকেই কালাম বলা হয়। আর মানুষের মুখ থেকে যে শব্দ ও আওয়াজ বের হয় তাকে কালাম বলা হয় কেবল রূপকার্থে। কেননা শব্দই অর্থের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। এটি ইবনে কুল্লাব এবং তার অনুসারীদের কথা।

(৪) কালাম শব্দ ও অর্থের যৌথ নাম বিশেষ। অর্থাৎ কখনো শুধু শব্দকে কালাম বলা হয়। আবার কখনো শুধু অর্থকেই কালাম বলা হয়। এটি পরবর্তী যুগের কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় লোকের মত। কুল্লাবীয়াদের পঞ্চম আরেকটি মত রয়েছে। আবুল হাসান আশ'আরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও এ কথা বর্ণনা করা হয়। তা এ যে, রূপকার্থেই কেবল আল্লাহর কালামকে

১৫৯. চাই তা মানুষের কালাম বা কথা হোক কিংবা আল্লাহ তাআলার কালাম হোক।

কালাম হিসাবে নামকরণ করা হয়। আর বনী আদমের কালাম হলো প্রকৃত কালাম। কেননা বনী আদম কথা বলার সময় যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করে, তা তাদের সাথেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে কথা বলে, সে ব্যতীত অন্য কারো সাথে তার কালাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে আল্লাহর কালাম এর ব্যতিক্রম। কুল্লাবীয়াদের মতে কালাম আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া অসম্ভব। এ বিষয়টি যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

যারা বলে আল্লাহর কালামের মাত্র একটি অর্থ, যা তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তারা আখতালের এ কবিতা দিয়ে দলীল পেশ করেছে।

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا... جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلَا

নিশ্চয়ই প্রকৃত কালাম কেবল অন্তরেই থাকে। অন্তরের মধ্যে যে কালাম বা তার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে জবান কেবল তাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। এ কবিতার দ্বারা কুরআন আল্লাহর কালাম না হওয়ার দলীল পেশ করা ভুল। কোনো দলীল গ্রহণকারী যদি বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে, তাহলে এরা বলে, এটি হলো খবরে ওয়াহেদ বা একক ব্যক্তির বর্ণনা। যদিও আলেমগণ তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সত্যায়ন করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাকে কবুল করে নিয়েছেন।

সুতরাং একজন কবির কবিতা দলীল হিসাবে পেশ করে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত কালাম হলো যা অন্তরের সাথে লাগানো থাকে; জবান থেকে যে কালাম বের হয় তা প্রকৃত কালাম নয়! আরো বলা হয়েছে যে, এটি মূলত আখতালের কবিতা নয়। বিদ'আতীরা এটি তৈরী করে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে। তার কাব্যগ্রন্থে এটি পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত শব্দে কবিতাটি সঠিক নয়; বরং সঠিক রূপ হলো এ রকম, إِنَّ الْبَيَانَ لَفِي الْفُؤَادِ নিশ্চয় প্রকৃত বর্ণনা হলো, যা অন্তরে থাকে। এটিই সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে এটি আখতালের কবিতা, তাহলেও তার কথা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নেই। কেননা সে ছিল খৃষ্টান। কালামের মাস'আলায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মনে করেছে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) স্বয়ং আল্লাহর কালাম। তারা বলেছে লাহুত নাসুতের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে।[১৬০]

উলুহীয়াতের কিছু অংশ মানুষের কিছু অংশের সাথে মিশে গেছে। সুতরাং যে নাসরানী স্বয়ং কালামের মাস'আলায় গোমরা হয়েছে, কালামের সংজ্ঞা বর্ণনায় কিভাবে তার কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যেতে পারে এবং আরবদের ভাষায় কালামের সর্বজন বিদিত অর্থকে পরিহার করা যেতে পারে? আরো বলা যেতে পারে যে, এ কবিতার অর্থ সঠিক নয়। কেননা এর দাবি হলো বোবাকেও মুতাকাল্লিম বলা আবশ্যক। কেননা তার অন্তরেও কালাম যুক্ত

১৬০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও ঈসা (আলাইহিস সালাম) মিলে গেছে।

আছে। যদিও সে কথা বলেনি এবং তার থেকে কোনো কথা শুনা যায়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে। এখানে শুধু ইঙ্গিত করা হলো।

এখানে একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেসব নাসারা বলে লাহুত এবং নাসুত মিলে গেছে এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কথা বলেছেন, তাদের কথার সাথে আশায়েরাদের কথার খুব মিল রয়েছে। কেননা আশায়েরাগণ বলে থাকে যে, আল্লাহর কালাম বলতে ঐ অর্থ উদ্দেশ্য, যা তার সত্তার সাথে যুক্ত আছে এবং যা শ্রবণ করা সম্ভব নয়। আর মুসহাফের মধ্যে যে শব্দমালা রয়েছে, তা সৃষ্টি। সুতরাং সেই অনাদি-অবিনশ্বর ও চিরন্তন অর্থকে সৃজিত শব্দমালার সাথে মিলিয়ে দেয়া লাহুতকে নাসুতের সাথে মিশিয়ে দেয়ার মতই। ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে খৃষ্টানরা এ কথাই বলেছে। প্রিয় পাঠক! আপনি নাসারাদের সাথে তাদের সাদৃশ্যের এ বিষয়টির প্রতি ভালো করে খেয়াল করুন। এতে আপনি দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর সত্তার সাথে কালাম প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কুরআনকে মাখলুক বলার ধারণা ইসলামের বাইরে থেকে এসেছে।

যারা বলে কালাম এমন অর্থের নাম, যা নফসের সাথেই প্রতিষ্ঠিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি বলেছেন,

إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

"নিশ্চয়ই আমাদের এ ছলাতের মধ্যে মানুষের কথা বলার কোনো স্থান নেই"।[১৬১] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ

"আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা আদেশ করেন, তিনি যেসব আদেশ করেছেন, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, তোমরা ছ্বলাতের মধ্যে কথা বলো না"।[১৬২]

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে ছ্বলাত আদায়কারী যদি ছ্বলাতরত অবস্থায় কথা বলে, তাহলে তার ছ্বলাত বাতিল হয়ে যাবে। তারা আরো একমত হয়েছেন যে, ছ্বলাত অবস্থায় ছ্বলাত আদায়কারীর অন্তরে দুনিয়াবী বিষয়াদির প্রতি যেসব চিন্তা ও কল্পনা থাকে যেমন কোনো কিছুকে সত্যায়ন করা কিংবা তা থেকে কোনো কিছু কামনা করা, তা ছ্বলাত বাতিল করে দেয় না। তবে জবানের মাধ্যমে ঐগুলো উচ্চারণ করলে ছ্বলাত বাতিল হবে। সুতরাং মুসলিমদের ঐকমত্যে মনের কল্পনা-জল্পনাকে কালাম বা কথা বলা হয় না।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

---

১৬১. ছ্বহীহ: মুসলিম, নাসাঈ ১২১৮, ছ্বহীহ আবু দাউদ, হাদীছ নং- ৮৬২, ইরওয়া ৩৯০।
১৬২. হাসান সনদে ইমাম নাসাঈ এবং অন্যরা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন শাইখ আলবানীর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ১৫৫।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মনের কল্পনা বা ধারণাগুলো মাফ করে দিয়েছেন। যে পর্যন্ত না সে কাজে পরিণত করবে অথবা বাক্যে ব্যবহার করবে"।[১৬৩]

এতে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মনের কল্পনাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যতক্ষণ না কথা বলা হয় অথবা মনে কল্পনাকে কার্যে পরিণত করা না হয়। সুতরাং মনের কল্পনা এবং প্রকৃত কালামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, কথা বলা না হলে মনের কল্পনার কারণে শাস্তি দেয়া হবে না অর্থাৎ জবানের মাধ্যমে তা উচ্চারণ না করা হলে, এটি আলেমদের ঐক্যবদ্ধ মত। সুতরাং জানা গেল যে, আরবী ভাষায় এটিকেই কালাম বলা হয়। কেননা শরী'আত প্রবর্তক আমাদেরকে কেবল আরবদের ভাষায় সম্বোধন করেছেন। সুনানের কিতাবসমূহে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

«يا رسول الله! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»

"ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যেসব কথা বলি, তার কারণেও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, মানুষকে কেবল তাদের জবানের অসংযত কথা-বার্তার কারণেই নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"।[১৬৪]

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, জবানের উচ্চারণের মাধ্যমে কেবল মানুষের কালাম হয়। القول এবং الكلام শব্দ দু'টি এবং তা থেকে فعل ماضي (অতীত কালের অর্থপ্রদানকারী ক্রিয়া), فعل مضارع (বর্তমান-ভবিষ্যৎকালের অর্থপ্রদানকারী ক্রিয়া) فعل أمر (আদেশ সূচক ক্রিয়া এবং اسم فاعل (কর্তাবাচক বিশেষ্য) এবং আরো যেসব শব্দ নির্গত হয়, সেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ এবং আরবদের পরিভাষায় তখনই কালাম বলা হবে, যখন তার শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীদের মধ্যে কালাম সম্পর্কে কোনো মতভেদই ছিল না। পরবর্তীকালের বিদ'আতী আলেমদের মধ্যেই এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং কথা, কালাম এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে কবির কবিতা দিয়ে দলীল পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো এমন বিষয়, যেগুলো পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের কথা-বার্তায় অহরহ উচ্চারণ করে থাকে। এগুলোর অর্থ তারা জানতে পেরেছে।

---

১৬৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ইরওয়া ২০৬২
১৬৪. তিরমিযী। দেখুন মূল কিতাবের টিকা নং- ১৫৭।

যেমন তারা মাথা, হাত, পা, আসমান, যমীন, পানি, পাহাড় এবং অনুরূপ ইত্যাদির অর্থ জানতে পেরেছে। সুতরাং এগুলোর নতুন এবং যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিতে গেলে সহজ বিষয়গুলো আরো জটিল হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কালামের অর্থ মাত্র একটি, তা তার পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত রয়েছে এবং কারীর কণ্ঠে মুসহাফে লিখিত ও সংরক্ষিত কুরআনের যে তেলাওয়াত শুনা যায়, সেটি কেবল আল্লাহর কালামের হেকায়াত মাত্র এবং এটি সৃজিত জিনিস, সে মূলত কুরআনকে মাখলুকই বলল। অথচ সে এটি জানতেই পারেনি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"হে নাবী তুমি ঘোষণা করে দাও, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না"। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)

আপনি কি মনে করেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা সে কালামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা তার নফসের সাথে প্রতিষ্ঠিত আছে? না কি এমন কালামের দিকে যা মানুষ পাঠ করছে এবং যা শুনা যাচ্ছে? কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে এ তেলাওয়াতকৃত ও শ্রুত কালামের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর নফসের সাথে যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তার দিকে ইঙ্গিত করা অসম্ভব, তা নাযিলও হয়নি, তা তেলাওয়াত করা হয়নি এবং তা শুনাও যায়নি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ "তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না"। আপনি কি মনে করেন আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন যে, আমার নফসের মধ্যে যে কালাম আছে এবং যা তারা শুনেনি ও জানেনি তা তারা কখনো রচনা করতে পারবে না? আসল কথা হলো আল্লাহর নফসের মধ্যে যা আছে, সে পর্যন্ত পৌঁছা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা জানাও কারো পক্ষে অসম্ভব।[১৬৫]

এখন তারা যদি বলে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কেবল তার নাফ্সের মধ্যকার কালামের বিবরণ ও ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা কারীগণ লিখিত মুসহাফ থেকে তেলাওয়াত করছে এবং যা শুনা যাচ্ছে। আর তার সত্তার সাথে যে কালাম যুক্ত আছে, তার

---

১৬৫. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য যে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, তা কেবল শ্রুত ও পঠিত কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরী করে আনার জন্যই। তার সত্তার মধ্যে যা আছে, তার অনুরূপ কিছু তৈরী করে আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ করেছেন, কোনো বিবেকবান মানুষ এ কথা বলতে পারে না। সুতরাং মানুষ যে কুরআন পাঠ করছে, তাই আল্লাহর কালাম এবং এর অনুরূপ কিছু তৈরী করে আনার জন্যই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এটি যদি আল্লাহর কালামের বিবরণ হতো, যা কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে, তাহলে অবশ্যই সে সময়ের কবি ও সাহিত্যিকরা অনুরূপ কুরআন তৈরী করে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারতো। তারা যেহেতু তা করতে পারেনি, তাই বুঝা গেল যে, এটিই সরাসরি আল্লাহর কালাম; তার সত্তার মধ্যে যেই কালাম রয়েছে উহার ব্যাখ্যা বা বিবরণ নয়।

দিকে ইশারা করা সম্ভব নয়। যারা এ কথা বলল, তারা আসলে সুস্পষ্টভাবেই কুরআনকে মাখলুক বলল। শুধু তাই নয়; এ কথা বলার কারণে তারা মুতাযেলাদের চেয়ে বড় কাফের হিসাবে গণ্য হবে।[১৬৬] আল্লাহর কালামকে তার অনুরূপ ও সদৃশ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা করা হয়েছে, এ কথা বলার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ঘোষণা হয়ে যায় যে, আল্লাহর সমস্ত ছিফাতই কেবল হেকায়াত (বর্ণনা করা) স্বরূপ।

কুরআনের এ তেলাওয়াতগুলো যদি আল্লাহর কালামের বর্ণনা হয়ে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর কালামের অনুরূপ কালাম রচনা করতে পারতো। সুতরাং এর অনুরূপ একটি কুরআন রচনা করাতে তাদের দুর্বলতা কোথায়? তাদের কথা মতে আরো আবশ্যক হয় যে, আল্লাহর কালাম এমন আওয়াজ ও অক্ষরের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার আদৌ কোনো আওয়াজ ও অক্ষর নেই।

আসল কথা হলো পবিত্র গ্রন্থে লিখিত এ সূরা এবং আয়াতগুলোই কুরআন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তুমি চ্যালেঞ্জ করে বলে দাও যে, তাহলে কুরআনের ন্যায় দশটি সূরা তৈরী করে আনয়ন করো এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে ইচ্ছা এ কাজে সাহায্য করার জন্য ডেকে নাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো"। *(সূরা হুদ: ১৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ﴾

"বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। যালিমরা ব্যতীত কেউ আমার নিদর্শন অস্বীকার করে না"। *(সূরা আনকাবূত: ৪৯)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

১৬৬. কেননা মুতাযেলারা কুরআনকে অন্যান্য সৃষ্টির মতই একটি সৃষ্টি বলেছে। আর এরা বলে যে, আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত এমন একটি ছিফাত রয়েছে, যার নাম কালাম। কুরআন হচ্ছে সে কালামের ব্যাখ্যা অথবা তার হেকায়াত স্বরূপ অথবা রূপকার্থেই কুরআনকে কালাম বলা হয়েছে। উহা আল্লাহর প্রকৃত কালাম নয়। আর আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলছে যে, আল্লাহর এমন ছিফাতও রয়েছে, যা হুবহু বর্ণনা করা হয় এবং উহার সাদৃশ্য পেশ করা যায়। কোনো জিনিসের হেকায়াত করা কেবল উহার অনুরূপ বস্তু দ্বারাই অথবা উহার সদৃশ বস্তু দ্বারাই হয়ে থাকে। কে আছে যে, আল্লাহর কালাম বর্ণনা করবে অথবা উহার হুবহু নমুনা পেশ করবে? জিবরীলের কিংবা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কারো পক্ষে আল্লাহর কালামের হুবহু বিবরণ দেয়া অথবা উহার সাদৃশ্য ও নুমনা পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআন যদি হুবহু আল্লাহর কালাম না হয়ে উহার হেকায়াত, ব্যাখ্যা কিংব উহার সদৃশ হতো তাহলে চ্যালেঞ্জ করার কোনো গুরুত্ব ছিলনা। কেননা জিবরীল ও মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি। আর এক সৃষ্টির দ্বারা তৈরী কোনো জিনিসের অনুরূপ জিনিস অন্য সৃষ্টির দ্বারা তৈরী করা মোটেই অসম্ভব নয়।

﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾

"এটি এমনসব পুস্তকে লিখিত আছে, যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র"। *(সূরা আবাসা: ১৩-১৪)*

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে দশটি নেকী লেখা হবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ (الم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»

"আমি এ কথা বলছি না যে, আলিফ লাম মীম মিলে একটি হরফ। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম আলাদা অক্ষর এবং মীম আলাদা অক্ষর"।[১৬৭] এ কুরআন হাফেযদের অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তেলাওয়াত কারীদের জবানের মাধ্যমে তেলাওয়াত হচ্ছে।

শাইখ হাফিযুদ্দীন আন নাসাফী (রহিমাহুল্লাহ) তার (المنار) নামক কিতাবে বলেন, إِنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى "শব্দমালা ও অর্থের সমন্বয়কে কুরআন বলা হয়"। অন্যান্য উসূলবিদগণ একই কথা বলেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি ছ্বলাতের মধ্যে ফারসীতে কিরাআত পাঠ করবে, তার ছ্বলাত বিশুদ্ধ হবে।[১৬৮]

---

১৬৭. ইমাম তিরমিযী হাদীছটি ছ্বহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন তুহফাতুল আহওয়াযী, হাদীছ নং- ২৮৩৫।

১৬৮. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহর পুরাতন মত অনুযায়ী কেউ যদি ছ্বলাতে কুরআনের অনুবাদ পড়ে নেয় সে আরবীতে কুরআন পড়তে সক্ষম হলেও বা না হলেও, তার ছ্বলাত হয়ে যায়। আল্লামা আবু বকর আলজাস্সাস ইমামের এ মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, এ কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যেও ছিল। আর এ কথা সুস্পষ্ট, সে কিতাবগুলোতে কুরআন আরবী ভাষার শব্দ সমন্বয়ে ছিল না। অন্য ভাষায় কুরআনের বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে দেয়া সত্ত্বেও তা কুরআনই থাকে। কুরআন হওয়াকে বাতিল করে দেয় না। (আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড) কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা একেবারেই সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদ বা অন্য কোন আসমানী কিতাব নাযিল হবার ধরণ এমন ছিল না যে, আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর অন্তরে কেবল অর্থই সঞ্চার করে দিয়েছেন। তারপর নাবী তাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বরং প্রত্যেকটি কিতাব যে ভাষায় এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শব্দ ও বিষয় উভয়টি সহকারেই এসেছে। পূর্ববর্তী যেসব কিতাবে কুরআনের শিক্ষা ছিল। সেগুলোর কোনটির অনুবাদকে আল্লাহর কিতাব বলা যেতে পারে না এবং তাকে আসলের ছ্বলাভিষিক্ত করাও সম্ভব নয়। আর কুরআন সম্পর্কে বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে তার প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় হুবহু নাযিল হয়েছে: ﴿ انّا انْزَلناه قُرانًا عَرَبيًّا ﴾ "নিশ্চিতভাবে আমি তা নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআন আকারে"। (সূরা ইউসুফ: ২) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وكذالك انزلناه حكمًا عَرَبيًّا﴾

"আর এভাবে আমি তা নাযিল করেছি একটি নির্দেশ আরবী ভাষায়"। (সূরা রা'দ: ৩৭) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ "আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত করে নাযিল করেছি। যাতে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে"। (সূরা আয-যুমার: ২৮) এখন কুরআন সম্পর্কে কেমন করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কোনো মানুষ অন্য ভাষায় তার যে অনুবাদ করেছে তাও কুরআনই হবে এবং তার শব্দাবলী আল্লাহর শব্দাবলীর ছ্বলাভিষিক্ত হবে। মনে হচ্ছে যুক্তির এ দুর্বলতাটি মহান ইমাম পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করে থাকতে পারেন। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ বিষয়ে নিজের অভিমত পরিবর্তন করে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও

কিন্তু তার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফের সাথে মত বিনিময়ের পর তিনি এ মত পরিবর্তন করেছেন এবং বলেছেন আরবী পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ফারসীতে কিরাআত পাঠ করবে, তার ছ্বলাত হবে না।

আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য ভাষায় কুরআন পড়বে, সে এমন পাগল বলে গণ্য হবে, যার চিকিৎসা করা দরকার অথবা নাস্তিক-মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে, যাকে হত্যা করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ ভাষায় কথা বলেছেন। কুরআনের শব্দমালা ও অর্থ মিলেই চিরন্তন মুজেযার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কুরআনকে যারা মাখলুক বলে, তারা কাফেরঃ

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَـــرِ فَقَدْ كَفَرَ অতএব যে ব্যক্তি কুরআন শুনে তাকে মানুষের কালাম বলে ধারণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। কুরআন আল্লাহর কালাম। এ কথা যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি যে বলল, কুরআন মুহাম্মাদের কালাম অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির কালাম সেও কুফুরী করল। সে সৃষ্টি চাই মানুষ হোক কিংবা ফেরেশতা হোক।

আর কেউ যখন স্বীকার করলো যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, অতঃপর সে তার তাবীল করলো এবং তার শব্দ ও অর্থের মধ্যে বিকৃত করলো, সে ঐ ব্যক্তির কিছু কুফুরী কথাকে সমর্থন করলো, যে বলেছিল ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَـــرِ﴾ "এটাতো মানুষের কথা বৈ আর কিছুই নয়"। *(সূরা মুদ্দাস্সির: ২৫)* তারা ঐসব লোক যাদেরকে শয়তানই কেবল পদস্খলন ঘটিয়েছে।

শাইখের উক্তি: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يســـتحله আহলে কিবলার কেউ কোন গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফের বলি না, যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সেই গুনাহয় লিপ্ত হয়, এ কথার ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা জেনে নিলাম ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তারই কালাম। তা কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কথা সর্বোত্তম, সর্বাধিক সুস্পষ্ট এবং সর্বাধিক সত্য।

ইমাম মুহাম্মাদের মত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় ক্বিরাত তথা কুরআন পড়তে সক্ষম নয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত ছ্বলাতে কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে যতক্ষণ না সে আরবী শব্দ উচ্চারণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবীতে কুরআন পড়তে পারে সে যদি কুরআনের অনুবাদ পড়ে তাহলে তার ছ্বলাত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

"আর আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কার কথা হতে পারে?" *(সূরা আন-নিসা: ৮৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"হে নাবী! বলো, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না"। *(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُوَرٍ مِثْلِهِ﴾

"তুমি বলে দাও যে, তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় একটি সূরা তৈরী করে আনয়ন করো"। *(সূরা ইউনুস: ৩৮)*

তৎকালীন মক্কার কাফেররা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কঠোর শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করতে পারল না। অথচ তারা ছিল আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী। এতে বুঝা গেল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য নাবী। কুরআনের শব্দমালা এবং তার গ্রন্থনা উভয়ের মধ্যেই মুজেযা রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির মধ্যেই যে মুজেযা রয়েছে, তা নয়। আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত এবং সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় এটি নাযিল হয়েছে। কুরআনের অনুরূপ কোনো কালাম থাকার যে নফী বা নাকোচ এসেছে, তা কেবল কথার ধরণ, তার মাধ্যমে কথা বলা এবং গ্রন্থনা ও অর্থের দিক থেকেই; শব্দ ও অক্ষরের দিক মূল্যায়ন করে তার সদৃশ হওয়ার নফী করা হয়নি। অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে যে শব্দমালা ও অক্ষরসমূহ রয়েছে, আরবদের কাছেও তা রয়েছে। তারা কেবল ২৯টি অক্ষর দ্বারাই কথা বলতো। কুরআনেও এ ২৯টি অক্ষরই রয়েছে।[১৬৯]

সূরার প্রথমে উল্লেখিত হরফে মুকাত্তাআ তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মাধ্যমে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের কথা-বার্তায় যে পদ্ধতি ব্যবহার করতো এবং যে ভাষায় তারা পরস্পর সম্বোধন করতো তাতেও তারা হরফে মুকাত্তাআ ব্যবহার করতো। আপনি কি দেখেন না যে, সূরার শুরুত হরফে মুকাত্তাআ ব্যবহার করার পরই কুরআনের আলোচনা এসেছে? যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারার শুরুতে বলেন,

১৬৯. আলিফ ও হামযাকে একটি ধরলে ২৮টি হয়।

﴿الٓمٓ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ "আলিফ লাম মীম। এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত" *(সূরা আল-বাকারা:১-২)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের শুরুতে আরো বলেন,

﴿الٓمٓ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾

"আলিফ লাম মীম। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তিনি তোমার উপর সত্য সহকারে এ কিতাব নাযিল করেছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের শুরুতে বলেন,

﴿المٓصٓ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾

"আলিফ লাম মীম সোয়াদ। এ কিতাব তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসের শুরুতে বলেন,

﴿الٓرٰ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾

"আলিফ -লাম -রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ"।

এমনি অন্যান্য সূরার প্রথমে কাটা কাটা বর্ণ উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, হে মক্কাবাসীগণ! রাসূলে করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের জন্য এমন বিষয় নিয়ে আসেননি, যা তোমাদের কাছে অপরিচিত। বরং তিনি তোমাদের ভাষাতেই সম্বোধন করেছেন।

কিন্তু পঁচা মতবাদের প্রবক্তারা এরূপ বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার কথা বলা এবং জিবরীল কর্তৃক তা শ্রবণ করার ঘটনাকে নাকোচ করার অযুহাত বানিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ মানুষ যেহেতু বাক্য, অক্ষর ও আওয়াজের মাধ্যমে কথা বলে, তাই মানুষের কালামের সাথে আল্লাহ তা'আলার কালামের সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা অক্ষর ও আওয়াজের মাধ্যমে কথা বলেন না।

এমনি তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই", এ কথাকে আল্লাহর ছ্বিফাতকে নাকোচ করার অযুহাত বানিয়েছে। অথচ এ আয়াতের পরের অংশই তাদের কথার প্রতিবাদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা"। *(সূরা শূরা: ১১)* এমনি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ বলো, তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় একটি সূরা তৈরী করে আনয়ন করো। *(সূরা ইউনুস: ৩৮)*

আল্লাহ তা'আলা এটি বলেননি যে, তোমরা একটি হরফ তৈরী করে আনো কিংবা একটি শব্দ রচনা করে নিয়ে আসো। এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। কেননা কুরআনের হরফের মত হরফ বা শব্দ তাদের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। কারণ ২৯টি হরফ এবং এগুলো দ্বারা গঠিত শব্দগুলোই তারা তাদের কথা-বার্তায় ব্যাবহার করতো। তারা কুরআনের শব্দগুলো দ্বারা কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কথা বলতো এবং এগুলোর অর্থও জানতো।

তাই কুরআনের সূরার মত একটি সূরা কিংবা দশটি আয়াত রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কুরআনের সর্বাধিক ছোট সূরার মধ্যেও তিন আয়াতের কম নেই। এ জন্যই ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন, ছ্বলাতে কমপক্ষে তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পাঠ করতে হবে। অন্যথায় ছ্বলাত বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এর চেয়ে কম পরিমাণের মাধ্যমে তাদেরকে অক্ষম ও অপারগ করা হয়নি। অর্থাৎ এর চেয়ে কম রচনা করার জন্য তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

(৩৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ، فَقَدْ كَفَرَ مَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ. وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মানবীয় কোনো বিশেষণে বিশেষিত করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরের চোখ দিয়ে এতে গভীর দৃষ্টি প্রদান করবে সে সঠিক শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর কাফেরদের মত কুরআনকে মানুষের কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে জানতে পারবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার গুণাবলীতে মানুষের মত নন।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখ ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কালাম। অতঃপর এখানে সতর্ক করেছেন যে, কথা বলা বা অন্যান্য ছিফাতের মাধ্যমে বিশেষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের মত নন। শাইখ আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করার পরপরই এখানে সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্যতা নাকোচ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে যদিও কথা বলা বিশেষণের মাধ্যমে বিশেষিত করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে তাকে ঐসব বিশেষণসমূহের কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না, যার মাধ্যমে মানুষ কথা বলে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"তার সদৃশ আর কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা"। *(সূরা শূরা: ১১)*

যে ব্যক্তি সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য করা এবং আল্লাহর কোনো গুণ বা ছিফাতকে নাকোচ করা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার জন্য সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করে, তার দৃষ্টান্ত কতইনা সুন্দর! তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ খাঁটি দুধের সাথে, যা পানকারীদেরকে পরিতৃপ্ত করে, তা বের হয় তা'তীল এর গোবর এবং তাশবীহ'এর রক্ত থেকে।[১৭০]

---

১৭০. সূরা নাহালের ৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুধের এই দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾ "আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর"।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের আক্বীদাহ হলো পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর খাঁটি দুধের মত, যা আল্লাহর ছিফাতকে বাতিল করার গোবর এবং উহাকে সৃষ্টির সিফাতের সমতুল্য মনে করার রক্ত থেকে বের হয়। সুতরাং আল্লাহর ছিফাতকে বাতিল করা গোবরের মত এবং উহাকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে সদৃশ করা রক্তের মত। সুতরাং আহলে সুন্নাতের লোকেরা স্রষ্টার ছিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের সমতুল্য মনে করে না। তারা এ কথা বলে

আল্লাহর ছিফাতকে যে বাতিল করে, সে কোনো কিছুরই ইবাদত করে না। আর যে আল্লাহকে সৃষ্টির সমতুল্য মনে করে, সে মূর্তিপূজা করে।[১৭১]

শাইখের উক্তি, من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه "যে ব্যক্তি রবের প্রতি সম্বোধিত গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তার সাদৃশ্য বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে এবং সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে", -এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এমনি শাইখের উক্তি, وَهُوَ بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ "আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তার অবস্থান তাশবীহ ও তা'তীলের মাঝখানে", এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর ছিফাত বাতিল করা তার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ দেয়ার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কী কারণে তা'তীল তাশবীহ এর চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট, সে ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই। বরং স্রষ্টার ছিফাত শুধু স্রষ্টার জন্যই শোভনীয় এবং সৃষ্টির গুণাবলী কেবল তার জন্যই শোভনীয়। শাইখের উক্তি: مَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ -এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে এবং সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য নাকোচ করতে গিয়ে শাইখ যা বলেছেন ও আল্লাহর কালাম ও অন্যান্য ছিফাতকে যে মানুষের ছিফাতের সমতুল্য মনে করবে তার শাস্তির যে ধমক রয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরের চক্ষু দিয়ে তার প্রতি গভীর দৃষ্টি প্রদান করবে, সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং কাফেরদের অনুরূপ কথা বলা থেকে বিরত থাকবে।

না যে, তার হাত আমাদের হাতের মত। সে সঙ্গে তারা আল্লাহর কোনো ছিফাতকে অস্বীকারও করে না। যেমন করে থাকে জাহমীয়া, মুতাযেলা এবং আশায়েরাগণ। তারা সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আল্লাহর সকল ছিফাতকেই অস্বীকার করে।

১৭১. যেমন আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার জাতির লোকেরা নিজ হাতে পাথর দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তার ইবাদত করতো। তারা মূর্তির হাত, পা এবং চোখ বানাতো। অতঃপর সেগুলোর ইবাদত করতো এবং বলতো, এগুলো আমাদের মাবুদ। সামেরী বনী ইসরাঈলের লোকদের জন্যও তাদের অলঙ্কারাদি দিয়ে বাছুর বানিয়েছিল। বাছুর গরুর মত হাম্বা হাম্বা করার সময় সামেরী বলেছিল এটিই তোমাদের মাবুদ এবং মুসারও মাবুদ। তারা সামেরীকে বিশ্বাস করে বাছুর পূজা শুরু করে দিল। সুতরাং যারা বলে, আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মতই, তার কথা সৃষ্টির কথার মতই, তার চেহারা সৃষ্টির চেহারার মতই অথবা তিনি হলেন ঈসা অথবা আলী, তারা ঐসব লোকের মত যারা কাঠের বা পাথরের নির্মিত মূর্তির পূজা করে, যা দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায়। আর যারা বলে আল্লাহর কোনো ছিফাত নেই। তারা আসলে কোনো কিছুরই ইবাদত করে না। কারণ ছিফাত, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোনো জিনিস খুজে পাওয়া যাবে না। ছিফাত ও বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই।

(৩৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ

আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। তবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নয়, তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। যেমনটি আমাদের রবের কিতাব ঘোষণা করেছে, ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হবে, সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"। (সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২) এ দেখার ব্যাখ্যা হলো, একমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সেভাবেই এটি অর্জিত হবে এবং এ সম্পর্কে যা কিছু ছ্বহীহ হাদীছে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তা যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবেই গৃহীত হবে এবং তিনি যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটিই ধর্তব্য হবে। এতে আমরা আমাদের নিজস্ব মতের উপর নির্ভর করে কোনো অপব্যাখ্যা করবো না এবং আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাড়িত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না। কারণ কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই তার দীনকে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে, যখন সে মহান আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে এবং সংশয়ের ব্যাপারসমূহকে আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দিবে।

.....

ব্যাখ্যা: আখিরাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার মাস'আলায় জাহমিয়া, মুতাযেলা এবং তাদের অনুসারী খারেজী ও শিয়াদের ইমামীয়া সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলের মাধ্যমে তাদের কথা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। ছাহাবী, তাবেঈ, ইসলামের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণ, আহলে হাদীছ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কালাম শাস্ত্রবিদগণও পরকালে মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত করেছেন।

এটি দীনের মূলনীতি সম্পর্কিত একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা। এটি অর্জনের জন্যই মুমিনগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন এবং প্রতিযোগিতায় মাশগুল থাকেন। যাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের রবের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখা হবে এবং তার দরজা

থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, তারাই এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। মুমিনগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবেন। এর দলীল হিসাবে ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) সূরা কিয়ামাহএর ২২ ও ২৩ নং আয়াতের দলীল পেশ করেছেন। এটিই এ বিষয়ে সর্বাধিক সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

সেদিন অনেক মুখমন্ডল আনন্দোজ্জল হবে, সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু যারা তাবীলের নাম দিয়ে এ আয়াতের তাহরীফ বা বিকৃতি করার পথকেই বেছে নিয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্পর্কিত এ আয়াতটির তাবীল-অপব্যাখ্যা করার চেয়ে পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম এবং হিসাব সম্পর্কিত আয়াতগুলোর তাবীল করা অধিক সহজ। বাতিলপন্থীরা কুরআনের আয়াতগুলোর যথাযথ অর্থ পরিবর্তন করতে চাইলে সে ঐ পথেই অগ্রসর হয়, যে পথে অগ্রসর হয় এ আয়াতগুলোর তাবীলকারীগণ।

তাবীলই দীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইহুদী-খৃষ্টানরা এভাবেই তাওরাত ও ইঞ্জিলের আয়াতগুলো পাল্টিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের অনুরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বাতিলপন্থীরা তাদের পথেই চলেছে। ভ্রান্ত তাবীল ইসলাম ও মুসলিমদের উপর সীমাহীন মুছীবত টেনে এনেছে। ভ্রান্ত তাবীলের কারণেই উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হয়েছে। জঙ্গে জামালা ও জঙ্গে সিফ্ফীনও সংঘটিত হয়েছে তাবীলের কারণেই। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হয়েছেন এ তাবীলের কারণেই। মদীনাতে হার্আর ঘটনার দিন যা কিছু ঘটেছিল, তাও তাবীলের কারণে। খারেজী, মুতাযেলা এবং রাফেযী সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও হয়েছে তাবীল থেকেই। ভ্রান্ত তাবীলের কারণেই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে النظر বা তাকানোকে চেহারার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। চেহারাই হলো দৃষ্টির স্থান। সেই সঙ্গে إلى হরফে জার্ এর মাধ্যমে النظر কে মুতাআদ্দী করা হলে এর দ্বারা চোখের দেখা ছাড়া অন্য কিছু বুঝানো হয় না। সুতরাং النظر এখানে প্রকৃতপক্ষে চোখের দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এমন কোনো আলামত নেই যা প্রমাণ করে যে, প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং সুস্পষ্টভাবেই জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা এখানে চেহারার মধ্যকার চোখের দেখা উদ্দেশ্য করেছেন। আর চেহারাগুলো আল্লাহ তা'আলার দিকেই তাকিয়ে থাকবে।

النظر শব্দটি সরাসরি কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে মুতাআদ্দী হওয়ার দিক থেকে কয়েকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি যদি নিজে নিজেই মুতাআদ্দী হয়, তাহলে এর অর্থ হয় অপেক্ষা করা। কিয়ামতের দিন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে,

﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ﴾

"আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি"। *(সূরা হাদীদ: ১৩)*

فِي হরফে জারের মাধ্যমে মুতাআদ্দী হলে তার অর্থ হয়, চিন্তা-গবেষণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾

"তারা কি কখনো আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিসের দিকে চোখ মেলে তাকায়নি?" *(সূরা আল-আরাফ: ১৮৫)* আর যদি إِلَى হারফে জারের মাধ্যমে মুতাআদ্দী হয়, তাহলে অর্থ হয় চোখ দিয়ে দেখা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দাও। এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে"। *(সূরা আন'আম ৬:৯৯)*

সুতরাং চোখের স্থান চেহারার দিকে যখন النظر কে সম্বন্ধ করা হবে, তখন তার দ্বারা চোখের দেখা উদ্দেশ্য হবে না কেন?

ইবনে মারদুওয়াই স্বীয় সনদের আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ "সেদিন অনেক মুখণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হবে"। উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যের কারণে চকচক করবে। সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"। অর্থাৎ فِي وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ তারা আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে।[১৭২]

হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা তাদের রবের দিকে তাকাবে। এতে করে তাদের রবের নূরে তাদের চেহারাও উজ্জ্বল হবে।

আবু সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের রবের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

১৭২. খুবই দুর্বল।

ইকরিমা আয়াত দু'টির ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিন নেয়ামত পেয়ে অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে যথাযথভাবেই তাকিয়ে থাকবে।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা এসেছে। এটিই আহলে সুন্নাত এবং মুফাসসিরে কেরামদের অভিমত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ "সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে" *(সূরা ক্বফ: ৩৫)*

ইমাম তাবারী বলেন, আলী ইবনে আবু তালেব এবং আনাস বিন মালেক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে অতিরিক্ত জিনিস বলতে আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ "যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বস্তু এবং আরো অতিরিক্ত জিনিস"। *(সূরা ইউনুস: ২৬)* এখানে হুসনা বলতে জান্নাত উদ্দেশ্য এবং যিয়াদাহ বলতে আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত চেহারার দিকে তাকানো উদ্দেশ্য। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরবর্তীতে তার ছাহাবীগণ থেকে এ ব্যাখ্যাই এসেছে।

যেমন ছ্বহীহ মুসলিম সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾

"যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বস্তু এবং আরো অতিরিক্ত জিনিস" *(সূরা ইউনুস: ২৬)*। অতঃপর বললেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীগণ যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষক এ বলে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার একটি ওয়াদা রয়েছে। তিনি তা পূরণ করতে চাচ্ছেন। জান্নাতবাসীগণ বলবেন, তা কী? আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মীযানের পাল্লা ভাড়ি করেননি? আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করেননি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেননি? অতঃপর পর্দা উঠানো হবে। তারা তখন আল্লাহর দিকে তাকাবে। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অধিক প্রিয় তাদেরকে আর কিছুই দেয়া হবে না। এটিই হলো কুরআনে তাদের জন্য ওয়াদাকৃত অতিরিক্ত জিনিস। ইমাম মুসলিম ছাড়াও অন্যরা বিভিন্ন সনদে ও বিভিন্ন শব্দে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছগুলোতে যে الزيادة শব্দটি এসেছে, তার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা। ছাহাবীগণ এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর একদল ছাহাবী থেকে

এ ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হুযায়ফা, আবু মূসা আশআরী এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾

"কখনো নয়, নিশ্চিয়ই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে"। *(সূরা মুতাফফিফীন: ১৫)*

এ আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেঈ এবং অন্যরা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কাফেরদেরকে যেহেতু আল্লাহর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত রাখার কথা বলা হয়েছে, তাই বুঝা গেল যে, তা কেবল মুমিনদের জন্য সাব্যস্ত। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী ইমাম শাফেঈর ছাত্র মুযানী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আলহাকেম বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আসাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন রুবাই ইবনে সুলায়মান, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন মিশরের গ্রামাঞ্চল থেকে তার নিকট একটি পত্র আসল। তাতে ইমামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾

"কখনো নয়, নিশ্চিয়ই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে" *(সূরা মুতাফফিফীন: ১৫)* সম্পর্কে আপনি কী বলেন? জবাবে তিনি বললেন, তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলা তার দিদার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, তার অলীগণ সন্তুষ্ট অবস্থায় তাকে দেখতে পাবেন।

আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকারকারীদের দলীল ও তার জবাব

মুতাযেলা এবং আল্লাহর দিদার অস্বীকারকারী অন্যান্য সম্প্রদায় দলীল হিসাবে আল্লাহর বাণী: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ "তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না" *(সূরা আল-আরাফ : ১৪৩)*- এবং আল্লাহর বাণী, ﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾"দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করে নেন" *(সূরা আন'আম : ১০৩)*-এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ আয়াত দু'টি তাদের কথার পক্ষের দলীল নয়; বরং তাদের কথার বিপক্ষের দলীল।

প্রথম আয়াত দ্বারা একাধিক পদ্ধতিতেই আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত করা যায়।

(১) আল্লাহর সম্মানিত রসূল মূসা কালীমুল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা করা অসম্ভব যে, তিনি আল্লাহর কাছে এমন জিনিস প্রার্থনা করবেন, যা তার জন্য অবৈধ। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সে যামানার সর্বাধিক জ্ঞানী। মুতাযেলাদের নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

(২) আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাৎ প্রার্থনার ক্ষেত্রে মূসা আলাইহিস সালামের প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু নূহ আলাইহিস সাল্লাম যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট তার পুত্রের মুক্তির-নাজাতের ব্যাপারে প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি নূহ আলাইহিস সালামের প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন,

﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

"আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে অজ্ঞদের মতো বানিয়ে ফেলো না"। *(সূরা হুদ: ৪৬)*

(৩) আল্লাহ বলেছেন, ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ "তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না"। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমাকে দেখা সম্ভব নয় অথবা এটি বলেননি যে, আমাকে দেখা বৈধ নয় কিংবা বলেননি যে, আমাকে দেখা যায় না। উভয় প্রকার জবাবের মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। আপনি কি লক্ষ্য করেন না, কারো জামার আস্তিনে পাথর থাকলে কেউ যদি তাকে খাবার মনে করে এবং বলে আমাকে তা থেকে খাবার দাও, তখন সঠিক জবাব হলো এগুলো খাওয়া যায় না। কিন্তু যদি সেগুলো আসলেই খাদ্য-দ্রব্য হয়ে থাকে তাহলে এ কথা বলা জায়েয আছে যে, إنك لن تأكله "তুমি তা খেতে পারবে না"। এতে প্রমাণ মিলে যে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে মূসার শক্তি তার দিদার বরদাশত করতে সক্ষম নয়। কেননা দুনিয়ার জীবনে মানুষের শক্তি কম থাকার কারণে আল্লাহর দিদার

বরদাশত করতে অক্ষম।[১৭৩]

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾

"তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও। পাহাড়টি যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকতে পারে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। *(সূরা আল-আরাফ: ১৪৩)*

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে জানিয়ে দিলেন যে, পাহাড় অত্যন্ত মজবুত ও শক্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে আল্লাহর জ্যোতি বরদাশত করতে পারে না। তাহলে যে মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে সে ইহ জগতে আল্লাহর দিদার বরদাশত করবে কিভাবে?

(৫) আল্লাহ তা'আলা পাহাড়কে ঠিক রাখতে সক্ষম। তার জন্য এটি মোটেই অসম্ভব নয়। আল্লাহর দিদারকে পাহাড় স্থির থাকার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, পাহাড় যদি স্বীয় স্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে দেখতে পাবে।

আল্লাহকে দেখা যদি অসম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহর কথাটি এরূপ হতো, إِنِ اسْتَقَرَّ الْجَبَلُ فَسَوْفَ آكُلُ وَأَشْرَبُ وَأَنَامُ "অর্থাৎ পাহাড় স্থির থাকে, তাহলে অচিরেই আমি খাবো, পান করবো এবং ঘুমাবো। সুতরাং আমার জন্য যেমন খাওয়া, পান করা ও ঘুমানো সম্ভব নয়, তাই পাহাড় স্থির থাকাও অসম্ভব। এক কথায় পাহাড় স্থির থাকা সম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখাও সম্ভব। মুতাযেলাদের মতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা বৈধ হওয়া তার জন্য পানাহার গ্রহণকরা বৈধ হওয়ার মতই।

(৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ "তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল" *(সূরা আল-আরাফ :১৪৩)।*

পাহাড়ের জন্য যখন আল্লাহর নূর ছাড়া বৈধ হলো, অথচ পাহাড় হলো জড়বস্তু, তার কোনো শাস্তি বা পুরস্কার নেই, তখন সম্মানের ঘর জান্নাতে তার রসূল ও অলীদের জন্য

---

১৭৩. দুনিয়াতে মানুষের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় তৈরী করা হয়নি। পাহাড়ের গঠন মানুষ গঠনের চেয়ে অধিক মজবুত ও শক্ত হওয়ার পরও যেহেতু পাহাড় আল্লাহর নূরের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাই বুঝা গেল যে মানুষ চর্ম চক্ষু দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

কিভাবে তা অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে মূসাকে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ইহ জগতে পাহাড় যেহেতু আল্লাহর দিদারের জন্য টিকে থাকতে পারেনি, তাই মানুষ পাহাড়ের চেয়ে অধিক দুর্বল বিধায় তার পক্ষে টিকে থাকা মোটেও সম্ভব নয়।

(৭) আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেছেন, তাকে ডাক দিয়েছেন এবং চুপিসারে বাক্যালাপ করেছেন। যার জন্য বিনা মাধ্যমে কথা বলা জায়েয এবং যার সম্বোধন অন্যকে শুনানো বৈধ তাকে দেখা আরো উত্তমভাবেই বৈধ হবে। এ জন্যই আল্লাহর কথা বলা বিশেষণকে অস্বীকার না করলে, তার দিদার অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর তারা উভয়টিকেই অস্বীকার করেছে।

তারা দাবি করে থাকে যে, لن تراني এর মধ্যকার لن অব্যয়টি تأبيد النفي অর্থাৎ চিরস্থায়ী নাকোচ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আখিরাতেও আল্লাহর দিদারকে নফী বা নাকোচ করা হয়েছে। তাদের এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা যদি ধরেও নেয়া হয় যে, لن অব্যয়টি চিরস্থায়ী নফী বা নাকোচ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপিও যেহেতু এটি দ্বারা আখিরাতে আল্লাহর দিদারের নফী বা নাকোচ বুঝা যায় না, তাহলে তাবীদসহ নফী না করা হলে তো আরো উত্তমভাবেই চিরস্থায়ী নফী করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারার ৯৫ নং আয়াতে বলেন, ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ "তারা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না"। অথচ জাহান্নামীরা যে আখিরাতে মৃত্যু কামনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ﴾

"তারা চিৎকার করে বলবে হে মালেক! তোমার রব যেন আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন। তিনি জবাবে বলবেন, তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে"। *(সূরা আয-যুখরুফ: ৭৭)*

সুতরাং لن যদি চিরস্থায়ী নফী অর্থে ব্যবহৃত হতো, তাহলে তার পরে এমন ফেল বা ক্রিয়া আসতো না, যা দ্বারা ব্যতিক্রম বুঝা যায়। অথচ কুরআনে لَنْ দ্বারা চিরস্থায়ী নফীর ব্যতিক্রম অর্থও বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফের ৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾

"আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবো না যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন"। এতে প্রমাণিত হলো যে, لن দ্বারা চিরস্থায়ী নাকচ করা হয় না। নাহুশাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ইবনে মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا ... فَقَوْلُهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا

"যে ব্যক্তি মনে করবে, لن দ্বারা চিরস্থায়ী নফী করা হয়, তার কথা প্রত্যাখ্যান করো এবং তার কথার বিপরীত অর্থকেই শক্তিশালী করো"। আল্লাহর বাণী:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾

"দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করে নেন" *(সূরা আল-আনআম:১০৩)*

এ আয়াত দ্বারাও অতি সুক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রংশসা প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি জানা কথা যে, প্রংশসা কেবল উত্তম গুণাবলী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কারো মধ্যে কোনো নিকৃষ্ট স্বভাব না থাকা তার পূর্ণতা বুঝায় না। সুতরাং কোনো ছিফাত নাকোচ করার মাধ্যমে প্রশংসা হয় না।[১৭৪]

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা হয়ে থাকে এমন নাকচ করার মাধ্যমে, যাতে উত্তম গুণাবলীও সাব্যস্ত হয়। যেমন তন্দ্রা ও নিদ্রা নফী করার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা তা নাকচ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ চিরন্তনতা ও অবিনশ্বরতা সাব্যস্ত হয়। আর তার থেকে মৃত্যু নফী বা নাকোচ করার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ হায়াত বা জীবন সাব্যস্ত হয়। ক্লান্তি-ক্লেশ দূর করার মাধ্যমে তার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা থেকে শরীক, সঙ্গিনী, সন্তান ও সাহায্যকারী নাকোচ করার মাধ্যমে তার জন্য পরিপূর্ণ রুবুবীয়াত, উলুহীয়াত ও পরাক্রমশালীতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার থেকে পানাহার নফী করার মাধ্যমে তার জন্য পরিপূর্ণ অমূখাপেক্ষীতা ও ধনাঢ্যতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিনা অনুমতিতে কেউ তার নিকট সুপারিশ করতে পারবে না, -এ কথা বলার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ তাওহীদ এবং সৃষ্টি থেকে তার পরিপূর্ণ অমূখাপেক্ষীতা বুঝানো হয়েছে। তার থেকে যুলুম নফী করার মাধ্যমে তার জন্য পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার সাব্যস্ত করা হয়েছে, ভুলে যাওয়া, গাফেল হওয়া ইত্যাদি নাকোচ করার মাধ্যমে তার জন্য পরিপূর্ণ ইলম ও সকল জিনিসকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে রাখার বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তার সদৃশ নাকোচ করার মাধ্যমে তার সত্তা ও ছিফাতের কামালিয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ জন্যই শুধু এমন নাকোচের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করেননি, যা পূর্ণতার গুণাবলীকে আবশ্যক করে না। কেননা অস্তিত্বহীন ছিফাতের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে বিশেষিত করা যায়না।

সুতরাং যার অস্তিত্ব পরিপূর্ণ তাকে কিভাবে অস্তিত্বহীন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা যেতে পারে? অস্তিত্বহীন বিশেষণ কেবল অস্তিত্বহীন জিনিসের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। বাস্তবে

---

১৭৪. অর্থাৎ আপনি যদি কারো প্রশংসা করতে গিয়ে তার থেকে নিকৃষ্ট স্বভাবগুলো নাকোচ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, আপনি চোর নন, ডাকাত নন, মিথ্যাবাদী নন, কৃপণ নন....তাহলে কখনোই সে আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না; বরং আপনার উপর ক্রোধান্বিত হবে ও প্রতিবাদ করবে। প্রশংসা কেবল সুকুমার বৃত্তিগুলো বর্ণনা করার মাধ্যমেই হতে পারে। তবে যে নাকোচের সাথে ইছবাত-সাব্যস্তও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তার কথা ভিন্ন।

যার কোনো অস্তিত্বই নেই। কোনো কামেল বা পূর্ণ জিনিসকে এমন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না, যাতে করে তা এবং অস্তিত্বহীন জিনিস একই রকম হয়ে যায়।

আসল অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে, তবে তাকে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত ও বেষ্টন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ "দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না" *(সূরা আল-আনআম:১০৩)*, এটি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ বড়ত্বের প্রমাণ। তিনি সবকিছু থেকে বড় ও মহান। তার পরিপূর্ণ বড়ত্বের কারণেই কেউ তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে না। কেননা الإدراك অর্থ হলো কোনো জিনিসকে সকল দিক থেকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও পরিবেষ্টন করা। এটি শুধু দেখা নয়; বরং তার চেয়েও বেশী অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

"দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে উঠলো, আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম। মূসা বললেন, কখনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন"। *(সূরা শুআরা: ৬২)।*

এখানে মূসা (আলাইহিস সালাম) দেখা নাকোচ করেননি। পরিপূর্ণরূপে তাদেরকে আক্রমণ, ঘেরাও এবং পাকড়াওকে নফী বা নাকোচ করেছেন। দেখা ও বেষ্টন করা উভয়টিই একসঙ্গে অর্জিত হয়। পরিবেষ্টন করা ব্যতীতও দেখা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে, কিন্তু পরিবেষ্টন করা অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলার পরিচয় অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু ইলমের মাধ্যমে তাকে পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয়। ছাহাবী এবং ইমামগণ আয়াত থেকে এ অর্থই বুঝেছেন। যেমন তাদের কথাগুলো এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি এ সূর্যকে মানুষ দেখে, কিন্তু এটি যে অবস্থায় রয়েছে হুবহু সে অবস্থায় দর্শকের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীদের থেকে আল্লাহর দিদার সম্পর্কিত হাদীছগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ছ্বহীহ, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থকারগণ এ হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«أَنَّ ناسا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ»

"একদল লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে

দেখতে পাবো? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না কোন অসুবিধা হয় না। তিনি আবার বললেন, আকাশে মেঘ না থাকলে সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বলল, না কোন অসুবিধা হয় না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কিয়ামতের দিন এরকম পরিষ্কারভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে"।[১৭৫] হাদীছটি ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছটিও ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। জারীর বিন আব্দুল্লাহ আলবাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছটিও অনুরূপ। তিনি বলেন,

«كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ اأربع عشرة فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عيانا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»

"একদা পূর্ণিমার রাত্রিতে আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা অচিরেই স্বচক্ষে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ"।[১৭৬] ইতিপূর্বে সুহাইবের হাদীছটিও অতিক্রান্ত হয়েছে। ইমাম মুসলিম এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ»

"দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্যের তৈরী। তার সমস্ত থালা-বাসন এবং অন্যান্য বস্তুও হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণের। তার সমস্ত থালা-বাসন এবং অন্যান্য বস্তু হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনের মধ্যে তাদের এবং তাদের প্রভুর মাঝে গৌরব ও অহঙ্কারের একটি চাদর ব্যতীত অন্য কোন ব্যবধান থাকবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র চেহারার উপর থাকবে।[১৭৭] ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আদী বিন হাতিমের হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

১৭৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৪৮৫১, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮২।

১৭৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৮০৬, ছ্বহীহ মুসলিম ৬৩৩।

১৭৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৪৮৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮০।

«وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَلَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ، بَلَى يَا رَبِّ»

“কিয়ামতের দিন তোমাদের কেউ যখন আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আল্লাহর মাঝে এবং তার মাঝে কোনো পর্দা থাকবেনা এবং বান্দার কথা আল্লাহকে অনুবাদ করে বুঝানোর জন্য কোনো দোভাষীরও প্রয়োজন পড়বেনা। আল্লাহ তা‘আলা তখন বলবেন, আমি কি তোমার কাছে রসূল পাঠাইনি, যিনি তোমার কাছে আমার দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন? বান্দা তখন বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব! আল্লাহ তা‘আলা আবারো বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি এবং তোমার উপর অনুগ্রহ করিনি? বান্দা বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব! ইমাম বুখারী (৩৫৯৫) তার ছহীতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

প্রায় ত্রিশজন ছাহাবী আল্লাহর দিদার সম্পর্কিত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি ভালোভাবে হাদীছগুলো বুঝতে সক্ষম হবে, সে জোর দিয়েই বলবে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলেছেন।[১৭৮] আমি যদি কিতাবটি সংক্ষিপ্ত আকারে লেখার ইচ্ছা না করতাম, তাহলে এ ব্যাপারে সকল হাদীছই উল্লেখ করতাম।

যে ব্যক্তি হাদীছগুলো সম্পর্কে অবগত হতে চায়, সে যেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছগুলো পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়। কেননা সেখানে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে আরো সাব্যস্ত হয় যে, তিনি যখন ইচ্ছা, যার সাথে ইচ্ছা কথা বলবেন। আর আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করার জন্য আগমন করবেন। একই সঙ্গে হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলা রয়েছেন সকল সৃষ্টির উপরে। আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন এমন আওয়াজের মাধ্যমে সৃষ্টিকে ডাক দিবেন, যা নিকটের ও দূরের সকলেই শ্রবণ করবে, তিনি সৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হবেন এবং তিনি হাসবেন। এমনি আরো যেসব ছ্বিফাত রয়েছে, যা জাহমিয়াদের জন্য বজ্রপাতের মত।

কুরআন ও সুন্নাহর তরীকা বাদ দিয়ে দীনের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার অন্য কোনো তরীকা আছে কি? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কিভাবেই আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? অথচ কুরআন ছাহাবীদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

১৭৮. মুমিনগণ আল্লাহকে দেখবে, এ মর্মে আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

"যে ব্যক্তি নিজের মত দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করলো, সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল"।[১৭৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»

"যে ব্যক্তি ইলম ছাড়াই কুরআনের তাফসীর করলো, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়"।[১৮০]

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী, ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ "নানা জাতের ফল ও ঘাস"। *(সূরা আবাসা: ৩১)* অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আব্ব' কাকে বলা হয়? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে না জেনে কথা বললে, কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দিবে? কোন্ যমীন আমাকে আশ্রয় দিবে?

আল্লাহ তা'আলার দিদারকে সূর্য ও চন্দ্র দেখার সাথে তুলনা করার অর্থ এ নয় যে, চন্দ্র ও সূর্যকে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে। বরং এখানে মেঘহীন আকাশে দিনের বেলা সূর্য ও রাতে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্র দেখার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিদারের তুলনা করা হয়েছে। মেঘহীন আকাশে সূর্য দেখতে এবং পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে যেমন কোনো অসুবিধা হয় না, ঠিক তেমনি আল্লাহকে দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না। এক দৃশ্যের সাথে অন্য দৃশ্যের সাথে তুলনা করা হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে চন্দ্র-সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়নি। কারণ আল্লাহ তা'আলার কোনো তুলনা নেই। এখান থেকে সৃষ্টির উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। সাএা সামনি ও মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া দৃষ্টিপাত করার ধারণা অসম্ভব। আর যারা বলে, আল্লাহকে দেখা যাবে, তবে কোনো দিকে নয়, সে যেন তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে সংশোধন করে নেয়। সে সম্ভবত নিজের জ্ঞানকেই বড় মনে করেছে এবং আত্ম অহমিকায় লিপ্ত। অথবা তার বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তির মধ্যে সমস্যা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে, তবে দর্শক আল্লাহকে সামনেও দেখবে না, পিছনেও না, ডানেও না, বামেও না, উপরেও না এবং নীচেও না, প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি ও বুঝশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই তার এ কথার প্রতিবাদ করবে।

এ জন্যই মুতাযেলারা আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছে, তোমরা যেহেতু আল্লাহর সত্তাগত সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করেছো, তাই তোমাদের উপর আল্লাহর দিদারকেও অস্বীকার করা আবশ্যক। কেননা মুখোমুখী হওয়া ব্যতীত ও দিক সাব্যস্ত করা ছাড়া তো দেখা সম্ভব নয়।

---

১৭৯. তিরমিযী। তবে হাদীছটি যঈফ। দেখুন: শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর টিকাসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ১৬৬।

১৮০. ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, হাসান ছ্বহীহ। তবে শাইখ আলবানী উহাকে যঈফ বলেছেন, দেখুন পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র, টিকা নং- ১৬৬।

প্রকৃত কথা হলো আমাদের দৃষ্টিশক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে অক্ষম বলেই আমরা দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখিনি। এ জন্য নয় যে, আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। এ সূর্যের প্রখর আলোর দিকে যখন কেউ দৃষ্টি দেয়, তখন তার দৃষ্টি দুর্বল ও নত হয়ে যায়। সূর্য দেখা অসম্ভব, এ কারণে নয়; বরং দর্শকের দুর্বলতার কারণে। আল্লাহ তা'আলা যখন আখিরাতে বনী আদমকে শক্তিশালী ও পূর্ণ করে সৃষ্টি করবেন, তখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে সক্ষম হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা যখন তুর পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তার নূর তুর পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললেন,

{خَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الْأَعْرَافِ: ١٤٣]

মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুস আসল তখন সে বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।' *(সূরা আল-আরাফ:১৪৩)*

একটি হাদীছে কুদুসীতে এসেছে, মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন আল্লাহর দর্শন প্রার্থনা করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يا موسى لن ترانى انه لن يرانى حى الا مات ولا يابس الاتدهده

হে মূসা! তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। জীবিত কোনো প্রাণী আমাকে দেখা মাত্রই মারা যাবে এবং কোনো শুকনো বস্তুর উপর আমার জ্যোতি পড়লেই তাতে প্রকম্পন সৃষ্টি হবে।

সুতরাং মানুষ ফেরেশতাদেরকেও তাদের আসল আকৃতিতে দেখতে অক্ষম। তবে আল্লাহ যাকে শক্তিশালী করেছেন, তিনিই কেবল তাদেরকে তাদের আসল আকৃতিতে দেখার ক্ষমতা রাখেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শক্তিশালী করার কারণেই তিনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে তার আসল আকৃতিতে দু'বার দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾

"তারা বলে, এ নাবীর কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে ফায়সালা হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হতো না"। *(সূরা আল-আনআম: ৮)*

অনেক সালাফ বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে তাদের আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যদি তাদের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম, তাহলে মানুষের আকৃতিতেই অবতীর্ণ করতাম। এতে তারা সন্দেহে পড়ে যেতো। তারা বলতো, তিনি কি মানুষ? না ফেরেশতা? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেসব নেয়ামত

দান করেছেন, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন।

মুতাযেলারা আশায়েরা সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিদার অস্বীকারে বাধ্য করতে চাচ্ছে এ কারণে যে, তারা এবং মুতাযেলারা এ মাস'আলায় একমত যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরে নন, বাইরেও নন, ডানেও নন, বামেও নন, সামনেও নন, পিছনেও নন উপরেও নন এবং নীচেও নন।[১৮১]

যে ব্যক্তি এমন কিছুর অস্থিত্বে বিশ্বাস করবে, যা দেখা যায়, কিন্তু কোনো দিকে নয়, বিবেকবান লোকের মতে তার কথা ঐ ব্যক্তির কথার মতই, যে স্বনির্ভর এমন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলো, যা দেখা যায় না এবং তা কোনো দিকেও নয়।

আল্লাহ তা'আলা কোনো দিকে নয়, -এ অযুহাত দেখিয়ে যারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে, তাদেরকে বলা হবে, তুমি কি 'দিক' দ্বারা কোনো অস্বিত্বশীল জিনিস বুঝাতে চাচ্ছো? না কি অস্তিত্বহীন কোনো বস্তু বুঝাতে চাচ্ছো? তারা যদি অস্তিত্বশীল কোনো জিনিস বুঝাতে চায়, তাহলে উহ্য বিবরণটি হবে এমন: كُلُّ مَا لَيْسَ فِي شَـــيْءٍ مَوْجُود لَا يُرَى "যে জিনিস অন্য জিনিসের মধ্যে প্রবিষ্ট নয়, তা দেখা যায় না"। এ ভূমিকাটি সঠিক নয়। কোনো কিছু দেখার জন্য তাকে অস্থিত্বশীল অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়েই দেখতে হবে, তা জরুরী নয়। কারণ এর পক্ষে কোনো দলীল নেই। বরং তা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা সৃষ্টিজগতের ছাদ দেখা সম্ভব। আর সৃষ্টিজগৎ অন্য সৃষ্টিজগতের মধ্যে প্রবিষ্টও নয়। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের ছাদকে অন্য সৃষ্টির মধ্যে না ঢুকিয়ে সরাসরি দেখা সম্ভব।

আর যদি বলা হয় দিক একটি অস্তিত্বহীন বিষয়, আর এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত। তারা বলেছেন, দিক একটি আপেক্ষিক বিষয়; এটি স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর কোনো সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ অন্যের দিকে সম্বন্ধ করা ব্যতীত দিক শব্দটি কোনো অর্থ প্রদান করে না। পীপড়া যখন হাটে তখন সে অন্যান্য কীট-পতঙ্গের তুলনায় নীচেই থাকে। পীপড়া এবং অন্যান্য পোকা-মাকড়ের চেয়ে আমরা উপরে।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শুধু ডান, শুধু বাম, কিংবা শুধু উপর বললে কিছুই বুঝা যাবে না। যতক্ষণ না আপনি উল্লেখ করেবেন যে, যায়েদের ডান, করীমের বাম, গাছের উপর, ছাদের নীচ ইত্যাদি। সুতরাং দিক বলতে কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল

---

১৮১. অর্থাৎ মুতাযেলারা আশায়েরাদেরকে বলতে চাচ্ছে যে, হে আশায়েরাগণ! তোমরাও যেহেতু আমাদের মতই সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে থাকো, তাই আমাদের ন্যায় আল্লাহর সাক্ষাৎকেও অস্বীকার করো। কারণ সৃষ্টির উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া এবং তাকে দেখা, -এ দু'টি মাসআলা একই সূত্রে গাঁথা। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহকে দেখা যাবে, মুমিনগণ আল্লাহকে দেখবে, তাদের উপর এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে বা উপরের দিকে রয়েছেন। উপর থেকেই তিনি মুমিনদেরকে জান্নাতে তার চেহারা মোবারকের দিদার প্রদান করবেন। যা দেখে মুমিনগণ পরিতৃপ্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার দিদার থেকে মাহরুম করোনা। আমীন।

জিনিস নেই। ডান বলতে কোনো জিনিস নেই, বাম বলতে কিছুই নেই, উপর বলতে কোন সৃষ্টি নেই এবং নীচ বলতেও কিছুই নেই। এ সবগুলো আপেক্ষিক ও তুলনামূলক বিষয়। সুতরাং এটি অমুকের ডান দিকে, ঐটি অমুকের বাম দিকে, এটি আমার উপরে এবং এটি তার নীচে। দিক শব্দটি সাধারণত এভাবেই ব্যবহার হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে এবং সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সুসাব্যস্ত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের এটি সাব্যস্ত করা থেকে আবশ্যক হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল কোনো পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন, যাকে দিক বলা হয়। তবে এ কথা সঠিক যে তিনি সকল মাখলুক থেকে উপরের দিকে। অথচ দিক এমন কোনো অনুভবযোগ্য স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বাস্তব জিনিস নয়, যেখান থেকে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে।

মুতাযেলাদের কথা হলো, যদি বলা হয় মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে তাহলে তার জন্য দিক সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা দিক একটি আপেক্ষিক বিষয়। আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে এবং তাকে দেখা সম্ভব। শরীয়তের দলীল ও বিবেক-বুদ্ধির দলীলের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়েছে। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন, তার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম নেয়ামত। কোনো মাখলুক যখন অন্য কোনো জিনিস দেখে, সে অবশ্যই কোনো না কোনো দিকেই দেখে। আল্লাহ তা'আলাকে কিয়ামতের দিন মুমিনগণ কোন্ দিকে দেখবে? সহজ কথা হলো, আল্লাহর কাছে দুআ করার সময় যে দিকে হাত উঠানো হয়, সেদিকেই তাকে দেখা যাবে। অর্থাৎ উপরে দেখা যাবে। জান্নাতের অধিবাসী মুমিনগণ উপরের দিকে আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। তবে তিনি কোনো দিক দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ হওয়ার বহু উর্ধ্বে। উপরে আমরা বলেছি, দিক বলতে স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর কোনো সৃষ্টি নেই। সুতরাং যারা বলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হলে তিনি কোনো একটি দিক ও সীমার মধ্যে সীমায়িত হয়ে যান, তাদের কথা বাতিল। জাহমিয়া, মুতাযেলা, আশায়েরা ও মাতুরিদী আক্বীদাহর অনুসারীরা তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা থেকেই এহেন কথা বলে থাকে।

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে যারা দীনের মূলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করে না, তারা কিভাবে দীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কথা বলে?! তারা কেবল অমুক অমুকের কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তারা কুরআনকে জ্ঞান অর্জনের উৎস মনে করলেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ থেকে তারা তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না এবং তাতে দৃষ্টিও প্রদান করে না। এমনকি মুহাদ্দিছদের দ্বারা চয়নকৃত নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেঈদের থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তারা তাতেও দৃষ্টি দেয় না। আর যাদের মাধ্যমে কুরআন বর্ণনা করা হয়েছে, তারা শুধু কুরআনের শব্দ বর্ণনা করেনি; বরং তারা শব্দ ও অর্থ উভয়ই বর্ণনা করেছেন। শিশুরা যেমনভাবে শিখে তারা সেভাবে কুরআন শিখতেন না। বরং তারা অর্থসহ কুরআন শিখতেন। যে ব্যক্তি ছাহাবীদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে, সে কুরআনের তাফসীর

করতে গিয়ে শুধু নিজের এগড়া কথাই বলবে। যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন না করেই নিজের এগড়া কথা বলবে এবং তাকে দীনের অংশ মনে করবে, তার কথা সঠিক হলেও সে গুনাহগার হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে, তার কথা ভুল হলেও সে নেকী পাবে। তবে এ ব্যক্তির কথা যদি সঠিক হয়, তাহলে তার নেকী বহুগুণ বৃদ্ধি করা হবে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ "আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। এখানে বিশেষভাবে মুমিনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কেবল মুমিনরাই আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। অন্যরা দেখবে না। কোনো সন্দেহ নেই যে, জান্নাতবাসীগণ তাদের প্রভুকে জান্নাতে দেখবে। ঠিক তেমনি জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে তারা হাশরের ময়দানেও আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মধ্যে উক্ত কথার প্রমাণ মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾

"যেদিন তারা তার সাথে সাক্ষাত করবে, তাদের অভ্যর্থনা হবে সালামের মাধ্যমে"। *(সূরা আহযাব: ৪৪)*

হাশরের ময়দানের সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে কি না, এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে।

(১) হাশরের ময়দানে অবস্থানকারীদের মধ্যে শুধু মুমিনরাই আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে।

(২) মুমিন-কাফের সকলেই দেখবে। অতঃপর কাফেরদের সামনে পর্দা পড়ে যাবে। এরপর তারা আর আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না।

(৩) কাফেররা ব্যতীত মুমিন ও মুনাফিকরা দেখতে পাবে। এমনি হাশরের মাঠের সকলের সাথেই আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন কি না, সে ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল লোকই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, দুনিয়াতে স্বীয় চোখ দিয়ে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারেই কেবল আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, তিনি স্বীয় চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখেননি। আবার কেউ বলেছেন, তিনি দেখেছেন। কাযী ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাব আশ্ শিফার মধ্যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি না এ ব্যাপারে ছাহাবী এবং তাদের পরবর্তী যামানার আলেমদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুকে কপালের চোখ দিয়ে দেখার কথাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। মাসরুক যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম কি তার প্রভুকে দেখেছেন? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন বললেন, তোমার কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে, মুহাম্মাদ তার প্রভুকে দেখেছে, সে মিথ্যুক। অতঃপর কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এক দল লোক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর অনুরূপ কথা বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেই এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। তবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে দুই ধরণের কথা এসেছে। একদল মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ এবং মুতাকাল্লিম মিরাজের রাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আল্লাহর দিদার হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। তারা আরো বলেছেন যে, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা অসম্ভব।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুকে কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন।[১৮২] তবে আতা (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেছেন। অতঃপর কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে আরো অনেক মতামত ও উপকারী বিষয় বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তার প্রভুর দিদার আবশ্যক হওয়া এবং এ কথা বলা যে, তিনি তাকে নিজ চোখে দেখেছেন, এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল নেই। সূরা নাজমের আয়াত দু'টিই হলো এ মতের মূলভিত্তি। কিন্তু আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় রয়েছে আলেমদের অনেক মতভেদ। তবে আয়াত দু'টির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে দেখা সম্ভব।

সুতরাং কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে যা বলেছেন, তাই সত্য ও সঠিক। দুনিয়াতেও আল্লাহকে দেখা সম্ভব।[১৮৩] কেননা দুনিয়াতে যদি আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব না হতো, তাহলে মূসা (আলাইহিস সালাম) কখনই আল্লাহকে দেখার আবদার করতেন না।[১৮৪] তবে এমন কোনো দলীল পাওয়া যায় না যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন। বরং ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুকে দেখেননি। ছ্বহীহ মুসলিমে আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম,

«هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»

---

১৮২. যঈফ, ইবনে খুযাইমাহ

১৮৩. আলেমগণ এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তবে কেও দেখেনি। আল্লামা ড. সালেহ ফাওয়ান বলেন, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তবে কেউ তাকে দেখার ক্ষমতা রাখে না।

১৮৪. কেননা কোনো নাবীর জন্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে অসম্ভব বস্তু চাওয়া জায়েয নেই। আর নাবীগণ ভালো করেই জানতেন, আল্লাহ তাআলার কাছে অসম্ভব বস্তু চাওয়া অবৈধ।

"আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নূর দেখেছি। তাকে দেখবো কিভাবে?[১৮৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি একটি নূর দেখেছি"।

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে,

«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

"একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না। নিদ্রা যাওয়া তার জন্য সমিচীন নয়। তিনি ন্যায় দন্ডের পাল্লা নামান এবং উঠান। দিবসের আমলের পূর্বেই তার নিকট রাতের আমলসমূহ উঠানো হয় এবং রাতের আমলের পূর্বেই দিনের আমল উঠানো হয়। তার পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি যদি তা উন্মুক্ত করেন তার চোখের দৃষ্টি যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত সকল মাখলুক তার চেহারার আলোতে জ্বলে যাবে"।[১৮৬]

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যার্কে উদ্দেশ্য করে যেখানে বলেছেন, আমি নূর দেখেছি, তার অর্থ হলো তিনি নূরের পর্দা দেখেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ "আমি আল্লাহর নূর দেখেছি, তাকে দেখবো কিভাবে? অর্থাৎ যে নূরটি পর্দা স্বরূপ ছিল, আল্লাহ তা'আলার দিদার থেকে তাই আমাকে বাধা প্রদান করেছে। আরো খোলাসা করে এভাবে বলা যেতে পারে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে কিভাবে দেখতে পাবো? আমার মাঝে এবং তার মাঝে একটি নূরের পর্দার অন্তরায় ছিল। এটিই আমাকে আল্লাহর দিদার থেকে বাধা প্রদান করেছে। এ কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ইমাম উছমান সাঈদ আদ দারামী রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে ছাহাবীদের ইজমা হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন, এ কথা সাব্যস্ত করার চেয়ে জিবরীলকে দেখা সাব্যস্ত করার প্রতি আমাদের প্রয়োজন বেশী। যদি আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়টি আরো মহান ও বৃহত্তম। কিন্তু মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে দেখা আবশ্যক নয়।

---

১৮৫. ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ১৭৮।

১৮৬. ছ্বহীহ মুসলিম ১৭৯।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর উক্তি: بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ "অর্থাৎ আমরা মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত করি, তবে তাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নয়। আমরা সেই দিদারের কোনো ধরণও সাব্যস্ত করি না। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ বড়ত্ব এবং তার নূরের উজ্জ্বলতার কারণে কোনো সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করা এবং তার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং দৃষ্টিসমূহ তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾

"দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করে নেন" *(সূরা আল-আনআম: ১০৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

"তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে পারে না"। *(সূরা ত্বহা: ১১০)* আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে"। *(সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫:২২-২৩)* এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে মুমিনগণ দেখবে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তার ব্যাপারে ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর উক্তি: وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ "আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাখ্যা হলো, একমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সেভাবেই এটি অর্জিত হবে।

এ সম্পর্কে যা কিছু ছ্বহীহ হাদীছে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তা যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবেই গৃহীত হবে এবং তিনি যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটিই ধর্তব্য হবে। তিনি আরো বলেন, এতে আমরা আমাদের মতের উপর নির্ভর করে কোনো অপব্যাখ্যা করবো না এবং আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিপতিত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না।

আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্যগুলোকে মুতাযেলারা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, আমরা সেগুলোকে ঐভাবে ব্যাখ্যা করবো না। কেননা তাদের ব্যাখ্যায় আল্লাহর কালাম ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর আসল অর্থ পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। কুরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা সুন্নাতের অনুরূপ হয়, তাই হলো সঠিক ব্যাখ্যা। আর যে ব্যাখ্যা সুন্নাতের বিপরীত হয়, তা বাতিল ব্যাখ্যা।

বর্ণনা প্রসঙ্গ যে ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না এবং যার পক্ষে কোনো আলামতও থাকে না, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাণীর মাধ্যমে সেটা উদ্দেশ্য করেননি। কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য থেকে যদি প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য না হয়ে অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে অবশ্যই বাক্যের সাথে এমন কিছু আলামত যুক্ত হতো, যা প্রমাণ করতো যে এখানে সুস্পষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য। যাতে করে শ্রোতাগণ সন্দেহ ও ভুলের মধ্যে নিপতিত না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট করেই তার কালাম নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকেন এবং সেই অর্থটি বুঝানোর জন্য এমন কোনো ইঙ্গিত না করে থাকেন, যা বাহ্যিক অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ প্রত্যেক লোকের বোধশক্তির মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে কুরআনকে সুস্পষ্ট বর্ণনা হিসাবে নাম দেয়া ঠিক হতো না। এবং এটি মানুষের জন্য হিদায়াতও হতোনা। সুতরাং বক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়াকে তাবীল বলা হয়। এতে নতুন করে কিছু তৈরী হয় না।

এ স্থানে অনেকেই ভুল করে থাকে। বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝানোর নাএ তাবীল। যখন বলা হয়, এ শব্দটির অর্থ হলো এটি, তখন এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খবর দেয়া হয়। খবরটি যদি বাস্তব অবস্থার সাথে না মিলে, তাহলে বক্তার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়ে যায়। বক্তা তার বক্তৃতার মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য করেছেন, তা বুঝার পদ্ধতি একাধিক।

(১) অনেক সময় বক্তা নিজেই তার বক্তৃতার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে বলে দেয়।

(২) বক্তা তার উদ্দেশ্য বুঝাতে এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যা উক্ত অর্থের জন্যই গঠন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বক্তা যদি তার বক্তব্যের মধ্যে এমন কোনো আলামত উল্লেখ না করেন, যাতে বুঝা যাবে যে, তিনি প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য করেননি, তখন যে অর্থের জন্য শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা তাই বুঝাবে। সুতরাং বক্তা যখন তার কালামের আসল অর্থ উদ্দেশ্য করবেন, যে অর্থের জন্য কালামটি গঠন করা হয়েছে তাই বুঝাবেন এবং সেই সঙ্গে বাক্যটি আসল অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে আলামতও থাকবে, তখন অন্য কালামকে অর্থে ব্যবহার করার কোনো সুযোগই থাকে না।

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী: ﴿وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيْماً﴾ "আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে সুস্পষ্ট কথা বলেছেন" *(সূরা আন-নিসা:১৬৩)*। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عيانا كَمَا تَرَوْنَ الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»

"নিশ্চয় তোমরা অচিরেই স্বচক্ষে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন মেঘহীন আকাশে দুপুর বেলা কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই সূর্য দেখতে পাও"।[১৮৭]

১৮৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৪ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৩৩।

এ রকম সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রোতা বক্তার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝতে পারে। আর বক্তা যখন তার কথার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করবে, যাকে ঐ অর্থের জন্যই গঠন করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার কথার মধ্যে উক্ত অর্থটি উদ্দেশ্য হওয়ার কারণও পাওয়া যাবে, তখন বক্তা তার কথার মধ্যে সত্যবাদী হবে। আর যখন কোনো বক্তব্যের এমন তাবীল করা হবে, যা বক্তব্য থেকে বুঝা যায় না এবং বক্তব্যের সাথে উক্ত তাবীলের পক্ষে কোনো আলামতও থাকে না, তখন যদি বলা হয় এ তাবীল হলো বক্তার উদ্দেশ্য, তাহলে এটি বক্তার উপর মিথ্যাচারের পর্যায়ে পড়বে। এটি হবে এগড়া ব্যাখ্যা এবং প্রবৃত্তির ধারণা মাত্র।

প্রকৃত বিষয় হলো, যারা বলে আমরা এ আয়াতকে এ অর্থে ব্যাখ্যা করবো অথবা এর মাধ্যমে তাবীল করবো, তাদের কথার মাধ্যমে আসলে শব্দকে তার অর্থ থেকে পরিবর্তন করা হয় মাত্র। কেননা কুরআন-হাদীছের বাণী দ্বারা যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয়, তখন যদি সে সেটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে আমরা এটিকে বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা করবো।

আর যদি বলে আয়াতের আরেকটি অর্থ রয়েছে, আপনারা তা উল্লেখ করেননি, তাহলে শব্দটি প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা অসম্ভব এবং তাকে বাতিল করাও সম্ভব নয়। সুতরাং শব্দটি যেহেতু কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এবং তার বাহ্যিক অর্থ যেহেতু উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়, তাই বলবো যে, এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। রূপক অর্থে গ্রহণ করবো, যদিও তাকে প্রথমত রূপক অর্থে গঠন করা হয়নি।

তাদের জবাবে বলা হবে, বক্তার কথার অর্থ সম্পর্কে এ খবর দেয়া যে, তিনি তার কথার মাধ্যমে এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, এ সংবাদটি সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটি অসম্ভব যে, বক্তার কথার বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য হবে, অথচ তিনি শ্রোতাদের জন্য ঐ অর্থ বর্ণনা করবেন না। বরং বক্তার কথার মাধ্যএে জানা যায় যে, তিনি তার কথার দ্বারা প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। তবে বক্তার কথার অর্থ কখনো কখনো তার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হয়ে থাকে। আমরা এটি অস্বীকার করি না। বক্তা যখন শ্রোতার নিকট আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে চায়, তখন সে তার কথার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকতে পারে। তবে বক্তা যখন কোনো বিষয়কে সুস্পষ্ট করে বুঝাতে চাইবে এবং তার উদ্দেশ্য অন্যদেরকে বুঝাতে চাইবে, তখন সে তার কথার বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের বিপরীত উদ্দেশ্য করবে, এটি অগ্রহণযোগ্য। এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে? অথচ বক্তা তার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু উল্লেখ করে, যা রূপক অর্থের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে দেয়। সেই সঙ্গে সে তার কথাকে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করে এবং তার কথাকে সুস্পষ্ট করার জন্য বহু উদাহরণ ও উপমাও পেশ করে থাকে।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই তার দীনকে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে, যখন আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে এবং সংশয়ের ব্যাপার সমূহকে আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দিবে। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং সেগুলোর বাতিল ব্যাখ্যাও করা যাবে না। এমনকি কারো এ কথার মাধ্যমেও শরীয়তের কুরআন-সুন্নাহর দলীলের বিরোধিতা করা যাবে না যে, বোধশক্তি তো এ দলীলের বিরোধী এবং বোধশক্তির দলীলই হলো আসল দলীল। এ কথাও বলা যাবে না যে, শরী'আতের দলীল বুঝশক্তির দলীলের বিরোধী হলে বুঝশক্তির দলীলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এটি কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ শরীয়তের দলীল ও বোধশক্তির দলীল কখনো পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হতে পারে না। তবে কখনো কখনো এ রকম সন্দেহ হয়ে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের ছ্বহীহ দলীল ও বোধশক্তির দলীল পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হয়, সেখানে যারা বুঝশক্তির দলীলকে জ্ঞাত বিষয় বলে দাবি করে, তাদের কথা ঠিক নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তা জ্ঞাত নয়; বরং অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি গভীর দৃষ্টি দিবে তার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

আর যে হাদীছ ছ্বহীহ নয়, তা বোধশক্তির দলীলের বিরোধি হওয়ার উপযোগী নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা এবং পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি কখনো পরস্পর বিরোধী হয় না। যে ব্যক্তি বুঝশক্তির দলীলের মাধ্যমে শরীয়তের দলীলের বিরোধিতা করবে, তাকে বলা হবে, তোমার কথাকেই বিবেক-বুদ্ধির দলীল প্রত্যাখ্যান করে। তাকে বলা হবে, বোধশক্তির দলীল শরীয়তের দলীলের বিরোধী হলে শরীয়তের দলীলকে বিবেক-বুদ্ধির দলীলের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা পরস্পর বিরোধী উভয় দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত বিষয়কে একসাথে মেনে নেয়া হলে পরস্পর অসংগতিপূর্ণ দু'টি জিনিসকে এক সাথে একত্রিত করা আবশ্যক হয় এবং উভয় প্রকার দলীলকে পরিত্যাগ করলে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'ই বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা আবশ্যক হয়। তাই বিবেক-বুদ্ধির দাবিকে শরীয়তের দলীলের উপর প্রাধান্য দেয়া অসম্ভব। কেননা বিবেক-বুদ্ধির দলীল কুরআন-সুন্নাহর দলীল সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সংবাদ প্রদান করেছেন, তা কবুল করে নেয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং আমরা যদি শরীয়তের এ দলীলকে বাতিল করে দেই, তাহলে বিবেক-বুদ্ধির দলীলকেও বাতিল করে দেয়া আবশ্যক হবে। আর বিবেক-বুদ্ধির দলীল যদি বাতিল হয়, তাহলে তা শরীয়তের দলীলের বিরোধী হওয়ার উপযোগী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা যে জিনিস নিজেই দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়, সে অন্যান্য দলীলের বিরোধী হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। সুতরাং ফলাফল এ দাড়ালো যে, বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের চিন্তা প্রসূত দলীলকে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর প্রাধান্য না দেয়া আবশ্যক। তাই একে প্রাধান্য দেয়া অবৈধ। এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয়।

বিবেক-বুদ্ধির দলীল প্রমাণ করে যে, কুরআন-সুন্নাহর দলীল সত্য, বিশুদ্ধ এবং তার সংবাদ বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। সুতরাং শরীয়তের যে দলীলকে বিবেক-বুদ্ধি সমর্থন করেছে, তা বাতিল হওয়ার কারণে যদি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বস্তুও বাতিল হয়, তাহলে আবশ্যক হয় যে, মানুষের বুঝশক্তি বিশুদ্ধ ও নির্ভুল কোনো দলীল নয়। আর বুঝশক্তি যদি

বিশুদ্ধ কোনো দলীল না হয়, তাহলে তাকে শরীয়তের দলীলের উপর প্রাধান্য দেয়া তো দূরের কথা, কখনোই তার অনুসরণ করা জায়েয নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিবেক-বুদ্ধির দলীলকে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর প্রাধান্য দেয়া হলে বুঝশক্তির দলীলই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়।

প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের সামনে নিজেকে সোপর্দ করবে, তার আদেশের সামনে নত হবে এবং তার সংবাদকে সত্য বলে মেনে নিবে। আমাদের জন্য কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় যে, ভ্রান্ত কল্পনার মাধ্যমে আমরা তার বিরোধীতা করবো। ভ্রান্ত কল্পনাকে বিবেক-বুদ্ধির দলীল নাম দিয়ে তাকে শরীয়তের দলীলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো বৈধ নয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্য বৈধ নয় কিংবা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া এবং মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত মতবাদকে শরীয়তের অকাট্য দলীলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া আমাদের জন্য মোটেই সমিচীন নয়। সুতরাং একমাত্র রসূলকেই ফায়ছালাকারী হিসাবে মানবো এবং একমাত্র তার সুন্নাতের সামনেই নিজেদেরকে সোপর্দ করবো ও তার সামনে নত হবো। মোটকথা আমরা একমাত্র রাসূলের সুন্নাতকে ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করবো যেভাবে আমরা একমাত্র রসূল প্রেরণকারীর ইবাদত করে থাকি, তার জন্য নত হই, বিনীত হই, তার দিকেই ফিরে যাই এবং তার উপরই ভরসা করি।

সুতরাং দু'টি তাওহীদ বাস্তবায়ন করা জরুরী। এ দু'টি তাওহীদ বাস্তবায়ন করা ব্যতীত কোনো বান্দা আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাবে না। রসূল প্রেরণ কারীর তাওহীদ এবং প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের তাওহীদ। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং একমাত্র রাসূলের সুন্নাতের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কারো সুন্নাতের ফায়ছালা গ্রহণ করবো না এবং তার হুকুম ব্যতীত অন্য কারো হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট হবো না। সেই সঙ্গে তার আদেশ বাস্তবায়ন করা এবং তার খবরকে সত্যায়ন করার ক্ষেত্রে আমরা কোনো শাইখের কথা, কোনো ইমামের মতামত, মাযহাবের অনুসারীর সমর্থন, কোনো ফির্কার ইমাম এবং মর্যাদাবান ব্যক্তির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করবো না। কিছু কিছু মানুষ রয়েছে, যারা তাদের শাইখ ও ইমামের অনুমতি ছাড়া রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে বাস্তবায়ন করে না এবং তার খবরকেও সত্যায়ন করে না। আর কোনো হাদীছ বা আয়াতের ব্যাপারে ইমামের কথা পাওয়া না গেলে তারা বলে, আমরা যেহেতু ইমামের অনুসরণ করি, আর ইমামদের কাছে এ হাদীছটি যেহেতু অবশ্যই পৌঁছে থাকবে, তাই তারা যা বলেছেন, আমার কথাও তাই। তারা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলকে ইমামদের উপর সোপর্দ করে দেয় এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে বাস্তবায়ন ও তার হাদীছকে সত্যায়ন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এমনটি করা অসম্ভব হলে কুরআন-হাদীছের বক্তব্যকে তারা পরিবর্তন করে ফেলে। তারা এ

পরিবর্তনকে তাবীল বা ব্যাখ্যা এবং অন্য অর্থে প্রয়োগ করে বলে নাম দিয়ে থাকে। তারা বলে থাকে আমরা এ আয়াত বা হাদীছের ব্যাখ্যা করছি এবং এ অর্থে ব্যবহার করছি।

আসল কথা হলো কোনো বান্দা তার রবের সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করার চেয়ে শির্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল গুনাসহ সাক্ষাৎ করা অনেক ভালো। বান্দার অবস্থা এমন হওয়া উচিত, যখন তার কাছে রাসূলের কোনো ছ্বহীহ হাদীছ পৌঁছাবে, তখন নিজেকে এরূপ ভাববে যে, সে স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেই হাদীছটি শুনেছে। তার জন্য কি এটি বৈধ হবে যে, রাসূলের হাদীছ তার কাছে আসবে আর সে তা কবুল করে নেয়ার আগে কারো কথা, মত বা মাজহাবের বক্তব্য আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? বরং তার উপর আবশ্যক হলো, সে রাসূলের হাদীছ বাস্তবায়ন করবে। অন্য কারো কথার প্রতি দৃষ্টি দিবে না। অন্য কারো কথার সাথে রাসূলের কথা সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে সে রাসূলের কথাকে বাতিল মনে করবেনা। বরং মানুষের যে মতামত হাদীছের বিরোধী হবে, সে ক্ষেত্রে মানুষের মতামতকেই বাতিল করবে। কিয়াসের মাধ্যমে কুরআন-হাদীছের দলীলের বিরোধিতা করবে না। যেমন কোনো কোনো মাজহাবের লোকেরা মূসার্‌রাতের হাদীছকে কিয়াসের বিরোধী হওয়ার কারণে বর্জন করে থাকে। মূসার্‌রাতের হাদীছটি হলো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, কেউ যদি এমন উটনী, গাভী, কিংবা বকরী খরীদ করে, বেশী দামে বিক্রি করার জন্য যার স্তনে দুধ আটকানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি দুধ কম পায়, তাহলে তার অধিকার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে উক্ত পশুটি ফেরত দিতে পারবে। ফেরত দেয়ার সময় পশুটির সাথে একসা পরিমাণ খেজুর দিয়ে দিবে। এ হাদীছটি ছ্বহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিয়াসের অনুসারীরা বলেছে, এ হাদীছটি মেনে নেয়া কঠিন। কেননা এটি কিয়াসের বিরোধী। তাই তারা এ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে তাহারাত অধ্যায় থেকে শুরু করে লেন-দেনের অধ্যায় পর্যন্ত এ ধরণের উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে।

হাদীছের সাথে মানুষের কিয়াসসমূহ যখন সাংঘর্ষিক হবে তখন কিয়াস বাদ দিয়ে হাদীছ কবুল করে নেয়া আবশ্যক। আমাদের উচিত শরীয়তের দলীলকে স্বীয় স্থান থেকে মস্তিষ্ক প্রসূত এমন কল্পনার কারণে সরিয়ে না দেয়া, যাকে তার উদ্ভাবকগণ বোধশক্তি দ্বারা জ্ঞাত দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে তা জ্ঞাত বিষয় তো নয়ই; বরং তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি বিষয় এবং সত্য থেকে বহু দূরে। মোটকথা, কোনো ইমামের কথা না আসা পর্যন্ত রাসূলের কথাকে কবুল করে নেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। সে যে-ই হোক না কেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে আনাস বিন ইয়ায বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হাযেম থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেছেন আমর বিন শুআইব থেকে, আমর বিন শুআইব বর্ণনা করেছেন, তার পিতা থেকে, তার পিতা বর্ণনা করেছেন, তার দাদা থেকে। তার দাদা বলেন, একদা আমি এবং আমার ভাই এমন একটি উত্তম মজলিসে বসলাম, যা আমার দৃষ্টিতে লাল উট পাওয়ার চেয়ে উত্তম। আমি এবং আমার ভাই সেখানে গমণ করলাম। তখন দেখলাম একদল বিজ্ঞ ছাহাবী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের কোনো একটি ঘরের দরজায় বসে রয়েছেন। আমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া অপছন্দ করলাম। তাই একটু দূরেই বসে পড়লাম। তখন তারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার এক পর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু হলো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন রাগান্বিত অবস্থায় তাদের নিকট আসলেন। তার চেহারা তখন ক্রোধে লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের প্রতি মাটি নিক্ষেপ করছিলেন এবং বলছিলেন, হে লোক সকল থামো! এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নাবীর সাথে মতভেদ করার কারণে এবং কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এ জন্য নাযিল হয়নি যে, তার এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যায়ন করবে। বরং এ জন্য নাযিল হয়েছে যে, তার এক অংশ অন্য অংশকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে। কুরআনের যে অংশ তোমরা বুঝ, সে অনুযায়ী আমল করো এবং তার যে অংশ তোমাদের অজানা থাকে, তা আলেমদের নিকট পেশ করো।[১৮৮]

আল্লাহ তা'আলা তার নামে বিনা ইলমে কথা বলা হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْـــرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾

"তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ্, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোনো দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না"। *(সূরা আল-আরাফ: ৩৩)*
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৬)*

সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলা তার নাবী-রসূলদেরকে যাসহ প্রেরণ করেছেন, এবং তিনি যেসব কিতাব নাযিল করেছেন সে কেবল ঐ বিষয়কেই সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে ও বিশ্বাস করবে। কেবল তার অনুসরণ করাই তার জন্য আবশ্যক। সে সত্যায়ন করবে যে, তা সত্য ও সঠিক। তা ছাড়া মানুষের যত কথা আছে, তাকে তার সামনে পেশ করবে। মানুষের যে কথা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত অহীর সাথে মিলবে, তাও সত্য। আর যা তার সাথে মিলবে না, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যেসব কথা সম্পর্কে জানা যাবে না যে, তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীছের সাথে মিলেছে কি না, সে ক্ষেত্রে

---

১৮৮. ছ্বহীহ: শারহুস সুন্নাহ ১২১।

চুপ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ কথা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বক্তার কথা বুঝা না গেলে কিংবা কথাটি বুঝা গেলেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কথাটিকে সত্যায়ন করেছেন? না কি তিনি তাকে বাতিল করেছেন? তা অজ্ঞাত থাকার কারণেই তা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের বিরোধী কি না, তা বুঝা সম্ভব হয়ে উঠে না। আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সংক্ষিপ্ত কিংবা অস্পষ্ট কথাকে সমর্থন কিংবা বর্জন না করে নিরব থাকা বাঞ্চনীয়। বিনা ইলমে কথা বলা অন্যায়। যে কথার পক্ষে কুরআন ও হাদীছের দলীল আছে, সেটিই প্রকৃত ইলম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যবাণী নিয়ে এসেছেন, তাই আমাদের জন্য উপকারী।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যদের কথার মধ্যেও ইলম রয়েছে। তবে তা দীনী বিষয়ের ইলম নয়; বরং তা পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির ইলম। যেমন ডাক্তারী বিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান এবং কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দীনী বিষয়াদির ব্যাপারে কথা হলো তা কেবল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

(৩৬) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِالتَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ব্যতীত কারও পা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকতে পারে না।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখ ইঙ্গিতসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা মানুষের পা সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের উপরই পতিত হয়। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের সামনে যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করবে না এবং তার সামনে মস্তক অবনত করবে না, সে ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারবে না। মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, সে স্বীয় রায়, মতামত, বিবেক-বুদ্ধি এবং কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে কুরআন-হাদীছের দলীলের বিরোধিতা করবে না ও তার ফায়ছালার উপর আপত্তি উত্থাপন করবে না।

ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইসলামের বাণী এসেছে আল্লাহর পক্ষ হতে, রাসূলের দায়িত্ব হলো পৌঁছিয়ে দেয়া এবং আমাদের উপর আবশ্যক হলো তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীর এ কথাটি খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং উপকারী। শরী'আতের দলীলের সাথে বোধশক্তির দলীলের দৃষ্টান্ত হলো মুর্খ মুকাল্লিদ লোকের সাথে মুজতাহিদ আলেমের দৃষ্টান্তের অনুরূপ। শুধু তাই নয়; মুজতাহিদ আলেমের তুলনায় একজন সাধারণ মুসলিমের মর্যাদার চেয়ে শরীয়তের দলীলের তুলনায় বিবেক-বুদ্ধির দলীলের মর্যাদা আরো নগণ্য। কেননা মুর্খ লোকের পক্ষে আলেম হওয়া সম্ভব, কিন্তু আলেমের পক্ষে নাবী কিংবা রসূল হওয়া অসম্ভব।

কোনো মুর্খ মুকাল্লিদ (দলিলবিহীন অনুসরণকারী) যখন কোনো আলেম সম্পর্কে জানতে পেরে অন্য একজন মূর্খ লোককে সে আলেমের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসিত মাস'আলায় মুফতী এবং পথ প্রদর্শনকারী যদি পরস্পর মতভেদ করে তখন মুফতীর কথাই কবুল করে নেয়া আবশ্যক; পথ প্রদর্শকের কথা নয়। এ ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক যদি বলে, আমার কথাই ঠিক; মুফতীর কথা নয়। কেননা আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, সে মুফতী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি মূল। তুমি যদি আমার কথার উপর তার কথাকে প্রাধান্য দাও, তাহলে তুমি সে মূলকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দিবে, যার মাধ্যমে তুমি জানতে পেরেছো যে, সে মুফতী। এতে করে মূল বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে শাখাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে। এখন মুফতীকে ফতোয়া জিজ্ঞেসকারী যদি পথ প্রদর্শনকারীকে বলে, তুমি যখন সাক্ষী দিয়েছো যে, সে মুফতী এবং তাকে দেখিয়ে দিয়েছো, তখন তোমাকে বাদ দিয়ে তার তাকলীদ করাই আবশ্যক হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছো। সুতরাং তোমার কথা মেনে নিয়ে মুফতীর

কাছে ফতোয়া নিতে আসার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক মাস'আলাতেই আমার উপর তোমার কথা সমর্থন করা আবশ্যক হবে। যে মুফতী তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী তার সাথে মতভেদ করার সময় তোমার ভুল সিদ্বান্ত আবশ্যক করে না যে, তুমি মুফতীকে দেখিয়ে দিতেও ভুল করেছো। যদিও সে জানে যে উক্ত মুফতী কখনো কখনো ভুল ফতোয়া দিয়ে থাকে।

প্রত্যেক বিবেকবান মুসলিএ জানে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খবর দিয়েছেন, তাতে তিনি ভুলের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। তার পক্ষে ভুল করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিবেকবান প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো সে রাসূলের কথার সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করবে এবং তার সামনে নত হবে। দীন ইসলামের একটি জানা বিষয় হলো, কোনো মানুষ যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনি আমাদের জন্য যে কুরআন পাঠ করছেন এবং যে হিকমত আমাদের জন্য বর্ণনা করছেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যার অনেকাংশই আমাদের বোধশক্তির বিরোধী। অথচ আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সুতরাং আমাদের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার সমস্ত কথা মেনে নেই, তাহলে যার মাধ্যমে আমরা আপনার সত্যতা জানতে পেরেছি, তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং আপনার বাহ্যিক কথা থেকে যা আমাদের বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা বিবেক-বুদ্ধির দলীলকেই প্রাধান্য দিবো। আপনার সেই কথা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকবো, তা থেকে আমরা ইলম ও হিদায়াত গ্রহণ করবো না। যেব্যক্তি এ ধরণের কথা বলবে, তার ব্যাপারে কথা হলো, সে রাসূলের নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।

শুধু তাই নয়; প্রত্যেক বিবেকবান মুসলিম অবশ্যই অবগত রয়েছে যে, এটি যদি জায়েয হয় তাহলে প্রত্যেক লোকই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক আদেশ ও খবরের ক্ষেত্রেই একই কথা বলার সুযোগ পেয়ে যাবে। কেননা বিভিন্ন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাদের সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ নেই। ঐদিকে শয়তান তো মানুষের অন্তরে সবসময় কুমন্ত্রনা দিয়েই চলছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"পরিষ্কার ভাষায় শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই"। *(সূরা আন নূর: ৫৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"তাহলে কি রসূলদের উপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আছে?" *(সূরা আন নাহল: ৩৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিস্কারভাবে বর্ণনা করবার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা ইবরাহীম: ৪)* আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾

"তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং এসেছে একটি সমুজ্জ্বল কিতাব"। *(সূরা মায়েদা: ১৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

"হা-মীম, সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ"। *(সূরা দুখান: ১-২, যুখরুফ:১-২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

"এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত"। *(সূরা ইউসুফ:১)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফের ১১১ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআন মিথ্যা বাণী নয়; বরং এটি পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৮৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

"আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ স্বরূপ এবং মুসলিমদের পথ নির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ"। কুরআনে এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে কথা হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ ব্যাপারে এমন দলীল-প্রমাণসহ কথা বলেছেন, যা প্রমাণ করে যে, তা সত্য? না এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণসহ কথা বলেননি? দ্বিতীয় কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল। তিনি যদি এমন সংক্ষিপ্ত শব্দমালা দ্বারা কথা বলতেন, যা সম্ভাব্য সত্যের প্রমাণ করে, তাহলে এ কথা বলা আবশ্যক হয় যে, তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। অথচ সর্বোত্তম যুগের মর্যাদাবান মুসলিমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের নিকট দীনের সমস্ত হুকুম-আহকাম সুস্পষ্ট করেই বর্ণনা করেছেন। তাদের এ সাক্ষ্যের উপর বিদায় হজ্জের বছর আরাফা দিবসে আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষ্য রেখেছেন। সুতরাং যারা বলবে, তিনি দীনের মূলনীতিগুলো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি, সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করল।

(৩৭) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ

যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফত-পরিচয় ও ছহীহ ঈমান হতে দূরে সরিয়ে রাখবে।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে পুর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। দীনের মূলনীতির ব্যাপারে কথা বলতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিনা ইলমে কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার হুকুম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

"এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾

"কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। অথচ তার ব্যাপারে তো এটা নির্ধারিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু বানাবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে"। *(সূরা আল হজ্জ: ৩-৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

"আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো জ্ঞান পথ নির্দেশনা ও দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে। সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়। এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং

কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো"। *(সূরা আল হজ্জ: ৮-৯)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসের ৫০ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"আল্লাহ্‌র হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না"।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾

"তারা শুধু ধারণা এবং তাদের এ যা চায় তারই অনুসরণ করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ হতে হিদায়াত আগমন করেছে। *(সূরা আন নাযম: ২৩)* এ অর্থে এমন আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

আবু উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿مَا ضَلَّ قَوْم بَعْد هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَل ثُمَّ تَلَا تِلْكَ الْآيَة مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْم خَصِمُونَ﴾

"হিদায়াত পাওয়ার পর কোনো জাতি কেবল তখনই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, যখন তারা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْم خَصِمُونَ﴾

"এরা শুধু তর্কের উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়"। *(সূরা যুখরুফ: ৫৮)*

ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাসান ছ্বহীহ।[১৮৯] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ»

"ঝগড়াটে লোকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১৯০]

---

১৮৯. হাসান: তিরমিযী ৩২৫৩, মিশকাতুল মাসাবিহ ১৮০, ছ্বহীহ তারগিব ১৩৭।
১৯০. ছ্বহীহ আল বুখারী ২৪৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৬৮।

যে ব্যক্তি নিজেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের কাছে সোপর্দ না করবে, তার তাওহীদ নষ্ট হবে। কেননা যে ব্যক্তি হাদীছ দিয়ে কথা না বলবে, সে কেবল নিজস্ব মত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই কথা বলবে। সে সঙ্গে সে এমন লোকের তাকলীদ (দলিলবিহীন অনুসরণ)ও করবে, যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সুস্পষ্ট হিদায়াতের উপর নেই। এতে করে রাসূলের সুন্নাত থেকে সরে যাওয়া অনুপাতে তার তাওহীদ কমে যাবে। কেননা সে অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾

"তুমি কি তাকে দেখো নি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? *(সূরা আল-ফুরকান:৪৩)*" অর্থাৎ তার এ যার ইবাদত করতে চায়, তারই ইবাদত করে। মূলত তিনটি বাতিল ফির্কার কারণেই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন,

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ... وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ... وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ... وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا

(১) আমি অবশ্যই অবগত আছি যে, পাপাচার মানুষের অন্তর মেরে ফেলে। আর গুনাহর কাজে আসক্তি অপমান ও লাঞ্ছনা ডেকে আনে।

(২) পাপাচার ছেড়ে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে অন্তরের জীবন। নফসের অবাধ্য হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তোমার কল্যাণ।

(৩) রাজা-বাদশারাই দীনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে চরিত্রহীন পাদ্রী ও সন্ন্যাসীর দল।

যালেম শাসকরা তাদের নিকৃষ্ট রাজনীতির মাধ্যমে শরীয়তের উপর আপত্তি করে ও শরীয়তের বিরোধীতা করে এবং তাদের রাজনীতিকে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর প্রাধান্য দেয়। নিকৃষ্ট সন্ন্যাসীর স্থলাভিষিক্ত ঐসমস্ত আলেম-উলামা, যারা তাদের রায় ও বাতিল কিয়াসসমূহের আশ্রয় নিয়ে শরীয়তের দলীল-প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে। তাদের রায় ও কিয়াসগুলো আল্লাহ তা'আলার হারামকে হালাল করেছে এবং তার হালালকে করেছে হারাম, আল্লাহ যা বাতিল করেছেন, তারা তাকে মূল্যায়ন করেছে, আল্লাহ ও তার রসূল যা সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন, তারা তাকে খাস করে নিয়েছে এবং এমনি আরো অনেক অন্যায় করেছে।

এ উম্মতের মুর্খ সুফীরাই খৃষ্টানদের ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের আসন দখল করে নিয়েছে। এরাই প্রকৃত ঈমান ও শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এরা যাওক-রুচি, প্রেম-প্রীতি, আবেগ-অনুভূতি, মনের কল্পনা, আল্লাহর প্রেমের পাগল এবং শয়তানের ভ্রান্ত কাশফের আশ্রয় নিয়ে এমন নতুন দীন তৈরী করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তাদেরকে দেননি। আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর মাধ্যমে যে দীন প্রেরণ করেছেন এগুলোর মাধ্যমে তারা তাকে বাতিল করে দিয়েছে। ঈমানের হাকীকতগুলো বাস্তবায়ন করা হতে কেবল শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণাই মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে।

পূর্বেকার কিছু লোক বলেছে, যখন শাসকের আদেশ আল্লাহর শরীয়তের পরিপন্থী হবে, তখন শাসকের আদেশকে শরীয়তের আদেশের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আরেক শ্রেণীর লোক বলেছে, আমাদের বিবেক-বুদ্ধির যুক্তি যখন কুরআন-হাদীছের দলীলের বিপরীত হবে, তখন বিবেক-বুদ্ধির যুক্তিকেই প্রাধান্য দিবো। আর সুফী সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে, যখন আমাদের 'যাওক বা রুচি' এবং কাশফ শরীয়তের বাহ্যিক কোনো বিষয়ের পরিপন্থী হবে, তখন আমরা কাশফ[১৯১] ও যাওককেই প্রাধান্য দিবো।

---

১৯১. বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সুফীদের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হচ্ছে কাশফ। সুফীদের বিশ্বাস হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে একজন সুফী সাধকের হৃদয়ের পর্দা উঠে যায় এবং তাদের সামনে সৃষ্টি জগতের সকল রহস্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাদের পরিভাষায় একেই বলা হয় কাশফ। সুফীরা কাশফের সংজ্ঞায় বলেছে,

بأنه: الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً

পর্দার অন্তরালে যে সমস্ত গায়েবী তথ্য ও প্রকৃত রহস্য লুকায়িত আছে তা পাওয়া ও দেখার নামই হলো কাশফ। কাশফ হাসিল হয়ে গেলে আল্লাহ এবং সুফী সাধকের মাঝে কোন অন্তরায় থাকেনা। তখন তারা জান্নাত, জাহান্নাম, সাত আসমান, যমীন, আল্লাহর আরশ, লাওহে মাহফুয পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারে। তারা গায়েবের সকল খবর, মানুষের অন্তরের অবস্থা এবং সাত আসমানে ও যমীনে যা আছে তার সবই জানতে পারে। এমনকি তাদের অবগতি ব্যতীত গাছের একটি পাতাও ঝড়ে না, এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না, আসমান-যমীনের কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। এমনকি লাওহে মাহফুযে যা আছে, তাও তারা অবগত হতে পারে, তাতে কিছু বাড়াতে পারে, কমাতেও পারে। এমনি আরো অসংখ্য ক্ষমতা অর্জনের দাবী করে থাকে, যা একমাত্র মহান আল্লাহর গুণ।

কাশফের একটি উদাহরণ:

তাবলীগি নেসাব ফাযায়েলে আমাল নামক বইয়ের মধ্যে কাশফের একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পাঠকদের জন্য আমরা এখানে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহি.) বলেন: আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে সে দোযখের আগুন হতে নাজাত পায়। আমি এ খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়লাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখিরাতের সম্বল করে রাখলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকতো। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশ্‌ফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখতে পায়। তার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সে যুবক আমাদের সহিত খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে বলল, **আমার মা দোযখে জ্বলছে, আমি তার অবস্থা দেখতে পেয়েছি।** কুরতুবী (রহি.) বলেন: আমি তার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করছিলাম। আমার খেয়াল হল যে, একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশাইয়া দেই। যা দ্বারা তার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাহার কাশ্‌ফ হওয়ার ব্যাপারটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ তার অন্যতম মূল্যবান কিতাব إحياء علوم الدين -এ বলেন, প্রশ্ন হলো মানতেক ও তর্কশাস্ত্র কি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত নিন্দনীয়? না কি এটি মুবাহ?

এর জবাবে আমি বলবো, মানুষেরা এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে চরম বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইলমুল কালাম ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বিদআত ও হারাম। শির্ক ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার পাপাচার নিয়ে আল্লাহর কাছে হাযির হওয়া ইলমে কালাম নিয়ে তার নিকট হাযির হওয়ার চেয়ে উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মানতেক, ইলমে কালাম ও তর্ক শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। কেউ বলেছেন, ফরযে কেফায়া আবার কেউ বলেছেন, ফরযে আইন। শুধু তাই নয়; তারা আরো বলেছেন, এটি সর্বোত্তম আমল এবং সর্বোচ্চ আনুগত্য। এর মাধ্যএে তাওহীদের জ্ঞান পুর্ণরূপে অর্জিত হয় এবং এটিই আল্লাহর দীনের পথে সংগ্রামের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, ইলমে মানতেক ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এটিই ইমাম শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বাল, সুফিয়ান সাওরী এবং সালাফদের মুহাদ্দিছদের মত। তাদের মতামতকে ইমাম গাজ্জালী স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সালাফদের সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে এটি হারাম। তাদের থেকে এ বিষয়ে যত উক্তি এসেছে তা উপরোক্ত কথার মধ্যেই সীমিত নয়।

আলেমগণ বলেছেন, ছাহাবীগণ ইলমে কালাম, মানতেক ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে চুপ থাকার কারণ হলো, তারা তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন এবং অন্যদের তুলনায় ইলমে কালামের পরিভাষা ও শব্দ চয়ন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। এ জন্যই তাদের থেকে দীনের ক্ষেত্রে কোনো বিদআত ও ক্ষতিকর জিনিস বের হয়নি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا

যারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, তারা ধ্বংস হোক। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।[১৯২] অর্থাৎ দীনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার সময় বেশী বেশী ঘাটাঘাটি করা ও গভীরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্র যদি দীনের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে আদেশ দিতেন এবং কালাম শাস্ত্রবিদদের প্রশংসা করতেন। অতঃপর ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ আরো অনেক দলীল-

---

হাজারের নেছাবসমূহ হতে একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশাইয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষনাৎ বলতে লাগল চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেয়েছে।

কুরতুবী (রহি.) বলেন: এ ঘটনা হতে আমার দু'টি ফায়দা হল। এক. সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনেছি তার অভিজ্ঞতা। দুই. যুবকটির সত্যতার (তার কাশ্‌ফ হওয়ার) একীন হইয়া গেল। দেখুন: ফাযায়েলে আমাল, ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০১ ইং। দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত)

১৯২. ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৭০, মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা।

প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি অন্য পক্ষের দলীল উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য মত কোন্‌টি? এ প্রশ্নের জবাব ইমাম গাজ্জালী বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাতে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই রয়েছে। এর যে অংশের মধ্যে উপকার রয়েছে, তা আমাদের জন্য অবস্থাভেদে হালাল অথবা মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিব হতে পারে।

আর ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রের যে অংশ ক্ষতিকর হবে, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য হারাম। ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রে ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, তা সন্দেহ ছড়ায়, মানুষের আক্বীদাহ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এতে দীনের উপর মানুষের দৃঢ়তা কমে যায়।

ইলমুল কালাম ও মানতেক-যুক্তিবিদ্যা শাস্ত্রে প্রবেশ করার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদাহ এত দুর্বল হয়ে যায় যে সে ধীরে ধীরে সন্দেহপূর্ণ দলীলের দিকে ফিরে যায় এবং এতে লোকেরা মতভেদ করে থাকে। সুতরাং সত্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করার ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এটি বিদ'আতী আক্বীদাহকে শক্তিশালী করে এবং মানুষের অন্তরে একে ছাবেত করে দেয়। আর ইলমে কালাম, মানতেক ও তর্কশাস্ত্রের পিছনে লেগে থাকার প্রতি তাদের মনের টান ও আগ্রহ প্রবল হয়ে থাকে। তর্ক-বিতর্ক করার কারণে যে গোড়ামি শুরু হয়, তা থেকেই এ ক্ষতির সূত্রপাত হয়।

কালামশাস্ত্রের অসারতা সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীর স্বীকারোক্তি

অতঃপর ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রের উপকারীতা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, এর মাধ্যমে সকল বিষয়ের হাকীকত ও আসল অবস্থা জানা যায়। আসলে ইলমে কালামের মধ্যে এ পবিত্র উদ্দেশ্যটি আশানুরূপ বাস্তবায়ন হয় না। বিভিন্ন বিষয়ের যে পরিমাণ রহস্য পরিচয় এর মাধ্যমে উদঘাটিত হয়, তার চেয়ে এতে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী হয় বেশি। ইমাম গাজ্জালী আরো বলেন, আপনি যখন কোনো মুহাদ্দিছ অথবা যাহেরী মাজহাবের লোকের নিকট এ কথা শুনবেন, তখন আপনার মনের মধ্যে এ কথা উদিত হবে যে, মূর্খতাই মানুষের বিরাট শত্রু। অর্থাৎ এরা যেহেতু ইলমে কালাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তাই তারা কখনো ইলমে কালামের প্রশংসা করবে না; বরং তারা এর নিন্দা করবেই।

সুতরাং হে ভাই! আপনি এ কথা এমন এক লোকের নিকট থেকে শুনতে পাচ্ছেন, যিনি ইলমে কালাম বা তর্কশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করেছে। অতঃপর কালামশাস্ত্রের হাকীকত জানার পর এবং মুতাকাল্লিমীনদের-কালাম শাস্ত্রবিদদের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার পরই তিনি উপরোক্ত

মন্তব্য করেছেন। তিনি যে শুধু কালাম শাস্ত্র সম্পর্কেই পান্ডিত্য অর্জন করেছেন, তা নয়; বরং জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ছিল তার অসাধারণ অভিজ্ঞতা। বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইলমে কালামের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান ও সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিশ্বাস অর্জন করা অসম্ভব। ইলমে কালাম বা মানতেক ও তর্কশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ফায়দা হলো এর মাধ্যমে কিছু কিছু বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, পরিচয় এবং প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। তবে তা খুবই বিরল।[১৯৩] ইমাম গাজ্জালীর কথা এখানেই শেষ।

সুতরাং ইলমে কালামের মধ্যে তেএ কোনো উপকার নাই বলে তিনি যে কথা বলেছেন, এটি উপস্থাপিত বিষয়ে চূড়ান্ত একটি দলীল। সালাফগণ এটিকে এ জন্য পছন্দ করেননি যে, তা এমন একটি নতুন পরিভাষা মাত্র, যা সঠিক অর্থে গঠন করা হয়েছে। যেমন অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষার জন্য সঠিক শব্দ রয়েছে। বাতিলপন্থীদের সাথে তর্ক করার সময় এ নতুন পরিভাষাগুলো যে সঠিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, সালাফগণ সেই সঠিক অর্থকে অপছন্দ করেননি; বরং তারা কালামশাস্ত্রের শব্দগুলোকে শুধু এ জন্য অপছন্দ করেছেন যে, তার মধ্যে রয়েছে অনেক মিথ্যা কথা এবং সত্যের পরিপন্থী বিষয়। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা এবং তাতে যেসব উপকারী ও সত্য-সঠিক জ্ঞান রয়েছে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইলমে কালাম ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা এটি অর্জনের জন্য অনেক কষ্টকর পথ অতিক্রম করেছে এবং এর উপকার খুবই সামান্য হওয়া সত্ত্বেও এটিকে সাব্যস্ত করার জন্য অনেক লম্বা কথা বলেছে। আসলে ইলমে কালাম হলো ঐ শুকনো উটের গোশতের ন্যায়, যা পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে। সেখানে উঠতে খুব কষ্ট হয়। সেখানে উঠার রাস্তা সহজ নয় যে, অতি সহজেই তাতে উঠা যাবে। কষ্ট করে তাতে উঠেও তেএ কোনো লাভ নেই। কারণ সেখানে প্রচুর গোশত পাওয়া যাবে না যে, তা থেকে বাছাই করে কিছু সংগ্রহ করা যাবে।

তাদের নিকট সবচেয়ে সুন্দর যা পাওয়া যাবে, তার ব্যাখ্যা কুরআনেই বিশুদ্ধভাবে করা হয়েছে। তাদের কাছে যা আছে তা অর্জন করাতে অযথা কষ্ট করা, দীর্ঘ সময় নষ্ট করা এবং সহজ বিষয়কে আরো জটিল করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কবি বলেন,

لَوْلَا التَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا لَمَا وُضِعَتْ... كُتُبُ التَّنَاظُرِ لَا الْمُغْنِي وَلَا الْعُمَدُ

يُحَلِّلُونَ بِزَعْمٍ مِنْهُمُ عُقَدًا... وَبِالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ الْعُقَدُ

"যদি দুনিয়ার সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্য না থাকতো, তাহলে ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রের কিতাবগুলো রচিত হতো না। 'আল-মুগনী' এবং 'আমাদ' নামক কিতাবও রচিত হতো না।

১৯৩. ইমাম গাজ্জালীর এ কথা থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ইলমে কালাম, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃত সত্য ও মারেফতে ইলাহী অর্জন করা মোটেই সম্ভব নয়।

তারা মনে করে এর মাধ্যমে দীনের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ হবে। অথচ তাদের রচিত কিতাবগুলো দীনের বিষয়গুলোকে আরো দুর্বোধ্য করেছে"।

তারা মনে করেছে, ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রের উপর বড় বড় কিতাব লিখে দীনের মধ্যকার বিভিন্ন সন্দেহ দূর করবে।

তবে প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এর মাধ্যমে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে অন্তরের আরোগ্য, হিদায়াত, ইলম ও ইয়াকীন অর্জিত না হলে ইলমে কালামের মাধ্যমে তা অর্জন করা অসম্ভব। বরং আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তাকেই মূল হিসাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, তা বোধগম্য করা এবং তার আকলী ও শরঈ দলীল-প্রমাণগুলো জানা আবশ্যক। শরঈ দলীলগুলোর উভয় প্রকার দলীলগুলোর দালালত সম্পর্কেও জানবে। সেই সঙ্গে মানুষের যেসব কথা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণ হয় এবং যেসব কথা তার বিরোধী হয়, সেগুলোকে মুতাশাবেহা ও সংক্ষিপ্ত মনে করবে এবং কথাগুলোর প্রবর্তকদেরকে বলা হবে, এ শব্দগুলোর এ অর্থ হতে পারে। এর মাধ্যমে যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদের সমর্থন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। আর যদি তারা তার খবরের বিরোধীতা করতে চায়, তাহলে তাদের শব্দগুলো প্রত্যাখ্যাত হবে।

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও ছ্বিফাতের ক্ষেত্রে কালামশাস্ত্র বিদদের التركيب (যুক্ত করণ), الجسم (দেহ), التحيز (স্থান দখল করা), الجوهر (মূলবস্তু), الجهة (দিক), الحيز (পরিমন্ডল), العرض (অবস্থা) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কালাম শাস্ত্রবিদগণ যে অর্থে এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে, সে অর্থে কুরআন-হাদীছে এ শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি আরবী ভাষাতেও উক্ত অর্থে শব্দগুলো আসেনি। বরং তারা এমন অর্থকে ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দগুলো ব্যবহার করে, যে অর্থে অন্যরা শব্দগুলো ব্যবহার করেনি। তাই উক্ত অর্থগুলো অন্যান্য শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে। দেখতে হবে কুরআন-সুন্নাহর কোন্ আকলী ও নকলী দলীলগুলো উক্ত অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহর সত্তা ও ছ্বিফাত সম্পর্কে যেসব সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চাইলে বাতিল থেকে হক সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ التركيب শব্দটির কথা বলা যেতে পারে। এর অনেক অর্থ রয়েছে।

(১) দুই বা ততোধিক বিষয়ের মাধ্যমে কোনো কিছু গঠন করাকে তারকীব বলা হয়। পরস্পর বিপরীতমুখী একাধিক জিনিসের সংমিশ্রণের মাধ্যমে কোনো বস্তু গঠিত হওয়াকে তারকীবে মাযজী বলা হয়। যেমন চারটি স্বভাব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষ বা অন্যান্য

প্রাণীর গঠন। আল্লাহ তা'আলা এসব অংশ দ্বারা বিশেষিত হওয়ার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। উপরে সমুন্নত হওয়া এবং পূর্ণতার অন্যান্য গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি উপরোক্ত স্বভাবগুলো দ্বারা গঠিত।

(২) تركيب الجوار বা পাশাপাশি দু'টি জিনিসের দ্বারা কোনো জিনিস গঠিত হওয়াকে তারকীবুল জিওয়ার বলা হয়। যেমন দরজার দুই কপাট এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিস। আল্লাহ তা'আলার জন্য একাধিক ছিফাত সাব্যস্ত করা দ্বারা আবশ্যক হয় না যে, দরজার দুই কপাটের ন্যায় আল্লাহর ছিফাতগুলো তার সাথে যুক্ত রয়েছে।

(৩) সমপর্যায়ের বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে কোনো জিনিস গঠিত হওয়াকে الجواهر المفردة বা একক পদার্থ বলা হয়।

(৪) আদি ও মৌলিক বস্তু এবং আকৃতি দ্বারাও কোনো কোনো জিনিস গঠিত হয়। যেমন একটি আংটির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এর মৌলিক উপাদান হলো রোপা এবং এর আকৃতি সকলেরই জানা। কালামশাস্ত্র বিদরা বলেছে, দেহ সাধারণত একক পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে তাদের আরো অনেক কথা রয়েছে। এতে কোনো লাভ নেই। তারা বলেছে, দু'টি মৌলিক জিনিস দ্বারা দেহ গঠিত হতে পারে, চারটি দিয়েও হতে পারে, ছয়টি দিয়ে, আটটি এবং ষোলটি দিয়েও গঠিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের ছিফাত এবং সৃষ্টির উপরে তার সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য এ ধরণের তারকীব জরুরী নয়। প্রকৃত কথা হলো এ সকল জিনিস দ্বারা দেহ গঠিত নয়। তাদের কথা শুধু দলীল বিহীন দাবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) সত্তা এবং ছিফাত দ্বারাও তারকীব হয়ে থাকে। কালাম শাস্ত্রবিদরা এটিকে তারকীব নাম দিয়েছে। কারণ তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতকে অস্বীকার করতে চায়। এটি তাদের নিজস্ব পরিভাষা। আরবী ভাষায় এর কোনো অস্তিত্ব নেই। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটি ব্যবহার করেননি। আমরা এদের পরিভাষার সাথে সম্মতি প্রদান করি না। তারা যদি আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করাকে তারকীব বলে, তাহলে আমরা তাদেরকে বলবো যে, ছিফাতের অর্থগুলোই মূল উদ্দেশ্য। শব্দগুলো ধর্তব্য নয়। তোমরা আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করাকে যে কোনো নামে নামকরণ করতে পারো। অর্থ ছাড়া নামের উপর কোনো হুকুম প্রয়োগ হয় না। কেউ যদি দুধকে অন্য নামে নামকরণ করে, তাহলে এ নাম দেয়া হারাম নয়।

(৬) মাহিয়াত এবং এর অস্তিত্বের তারকীব। অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু এবং তার অস্তিত্ব একসাথে যুক্ত কি না? মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পারে যে এ দু'টি বস্তু পরস্পর আলাদা। কিন্তু এ ও মস্তিষ্কের কল্পনার বাইরে অস্তিত্বহীন কোনো সত্তা থাকতে পারে কি? এমনি সত্তা ছাড়া কোনো অস্তিত্ব আছে কি? এটি অসম্ভব। আপনি দেখবেন যে, কালামবিদগণ বলে থাকে যে, রবের সত্তাই কি তার অস্তিত্ব? না কি তার সত্তা অস্তিত্বের বাইরে অন্য একটি জিনিস? এ জাতিয় কথায়

তারা মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছে এবং কোনো একটি কথাকে প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত রয়েছে, তাদের মতটিই সর্বোত্তম। আসলে এ সব বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া এবং বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে বহু বিভ্রান্তি ও বাতিল কথার অবসান হয়ে থাকে।

আক্বীদাহর ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিভ্রান্তির কারণ

আসলে আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে গ্রীক দর্শন এবং বিভিন্ন মানুষের মতাদর্শ নিয়ে ব্যস্ত থাকাই আক্বীদাহর ক্ষেত্রে মুসলিমদের গোমরাহীর মূল কারণ। এ শ্রেণীর গোমরাহ লোকদেরকে আহলে কালাম এ জন্য বলা হয় যে, তারা নতুন কোনো ইলম নিয়ে আসেনি। বরং তারা এমন কিছু বাড়তি কথা-বার্তা বলেছে, যাতে কোনো উপকার নেই। তারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহকে অধিকতর সুস্পষ্ট করার জন্য কিছু উপমা-উদাহরণ পেশ করেছে। যদিও কিয়াস ও উপমা পেশ করে আক্বীদাহর বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দীনের অন্যান্য মাস'আলায় উপকৃত হওয়া যায়। সেই সঙ্গে যারা বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতির দলীলকে অস্বীকার করে তাদের সামনে কিয়াস ও উপমার মাধ্যমে দলীলও পেশ করা যায়।

আসল কথা হলো কোনো বিষয়ে কুরআন-হাদীছের দলীল থাকার পরও যে ব্যক্তি স্বীয় রায়, রুচি এবং মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে কথা বলল অথবা নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করল সে কেবল ইবলীসেরই সাদৃশ্য অবলম্বন করলো। ইবলীস আল্লাহর আদেশের সামনে বশীভূত না হয়ে সে বলেছিল,

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

"আমি আদমের চেয়ে ভালো। তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। আর আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে"। *(সূরা আল-আরাফ: ১২)* আল্লাহ আরো বলেন,

﴿مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

"যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করল সে আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে, আমি তাদের জন্য আপনাকে সংরক্ষণশারী হিসাবে প্রেরণ করিনি"। *(সূরা আন-নিসা: ৮০)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।" *(সূরা আলে-ইমরান: ৩১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"অতএব তোমার পালকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেয়। অঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ না থাকে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। *(সূরা আন নিসা: ৬৫)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার শপথ করে বলেছেন যে, তারা তার নাবীকে ফায়ছালাকারী না বানালে, তার ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট না থাকলে এবং তার ফায়ছালাকে মাথা পেতে মেনে না নিলে মুমিন হতে পারবে না।

(৩৮) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُوَسْوِسًا تَائِهًا، شَاكًّا، لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا

ফলে সে কুফুরী ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যায়ন, স্বীকৃতি প্রদান ও অস্বীকৃতি, সন্দেহ-পেরেশান এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনিশ্চয়তার বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে না সত্যবাদী মুমিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবে।

.....

ব্যাখ্যা: يتذبذب অর্থ হলো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও দোদুল্যমান থাকা। যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে সরে গিয়ে ইলমে কালামের দিকে ঝুকে পড়ে, তাদের অবস্থা ঠিক এরকম হয়ে থাকে। ইমাম ত্বহাবী উপরোক্ত বাক্যের মধ্যে তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর দলীল যখন তাদের বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী হয়, তখন তারা কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের নিজস্ব রায় এবং বিভিন্ন মতাদর্শের দিকে ঝুকে পড়ে। এতে করে তারা পেরেশানী, গোমরাহী এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়। দার্শনিকদের মতাদর্শ সম্পর্কে সর্বাধিক পারদর্শী ইবনে রুশদ রহিমাহুল্লাহ তার অন্যতম কিতাব تهافت التهافت (দার্শনিকদের) অধঃপতন নামক কিতাবে বলেন, এমন কোনো দার্শনিক আছে কি যে আল্লাহ তা'আলা ও তার উলুহীয়াত সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য কথা বলেছে? অনরূপ ইমাম আবুল হাসান আল-আমেদীও তার যামানায় ইলমে কালামে সর্বাধিক পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও শেষ যামানায় দিশেহারা হয়েছেন। এমনি ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ শেষ জীবনে উপনীত হয়ে ইলমে কালামের মাসআলাসমূহে দিশেহারা হয়েছেন। অতঃপর তিনি তার সকল পথ পরিহার করে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের দিকে ঝুকে পড়েছেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ছ্বহীহ বুখারী বুকের উপর নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। অনুরূপ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন উমার ফখরুদ্দীন রাযী স্বীয় কিতাব أقسام اللذات -এ বলেছেন,

نِهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالُ..... وَغَايَةُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالُ

وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا..... وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا... سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ: قِيلَ وَقَالُوا

فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ..... فَبَادُوا جَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَزَالُوا

وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتِهَا..... رِجَالٌ فَزَالُوا وَالْجِبَالُ جِبَالُ

১) আমাদের বিবেক-বুদ্ধি যখন অনর্থক কাজে অগ্রসর হলো এবং তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা বাদ দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হলো, তখন তা দিশেহারা ও অনুতপ্ত হলো। আর তা অর্জনের সকল চেষ্টা গোমরাহীতে পরিণত হলো।

২) আমাদের রূহগুলো সর্বদাই দেহের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গতা অনুভব করছে।[১৯৪] দুনিয়াতে আমরা যে সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছি, তাই আমাদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদা-পদের কারণ হয়েছে।

৩) আমাদের জীবনের দীর্ঘ সময় দর্শন ও ইলমে কালাম চর্চা করে শেষ করলাম। এতে শুধু অযথা ও অহেতুক কথা-বার্তা জমা করা ব্যতীত আর কিছুই করতে পারিনি।

৪) আমরা বহু পুরুষ ও জাতি দেখেছি। তারা সকলেই চলে গেছে ও নিঃশেষ হয়েছে।

৫) বহু লোক পাহাড়ের চেয়ে উচু মর্যাদা লাভ করেছে। তাদের পতন ঘটেছে, কিন্তু পাহাড় স্বস্থানে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ফখরুদ্দীন রাযি আরো বলেন, আমি সত্যের সন্ধানে ইলমে কালামের সকল মাযহাব নিয়েই চিন্তা-গবেষণা করেছি এবং দার্শনিকদের সমস্ত মানহাজেই দৃষ্টি দিয়েছি। এতে কোনো

---

১৯৪. এখানে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের দেহ ও রূহের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং দেহের সাথে রূহ যুক্ত থেকেও রূহ যে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে, তার কারণ একাধিক। আসলে মানুষের দেহ পৃথিবীতে চলাচল করে আল্লাহর সে সৃষ্টিগত নিয়ম-কানুন মোতাবেক, যা আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর রূহের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন আরেকটি বিধান ও কানুন। যার নাম শরীয়াতে ইলাহী। যার দেহ সে শরীয়াতে ইলাহীর অনুগামী হয় এবং মনে-প্রাণে সে শরী'আতকে অনুসরণ করে, তখন মানুষের দেহ এবং রূহের মধ্যে গভীর বন্ধন ও সুসম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে দেহ ও মনের মাঝে কোনো দূরত্ব থাকে না এবং রূহ কোনো প্রকার নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব অনুভব করে না।

কিন্তু মানুষের শরীর যখন প্রকৃতির নিয়মে অন্যান্য জীব-জন্তুর মত স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী চলে, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও শরী'আতের বিধান পরিহার করে রূহের জন্য অন্য কোনো নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে, তখনই দেহ এবং রূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। রূহ তখন একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা ও কষ্ট অনুভব করে। এ জন্যই আপনি দেখবেন যে, যারা সর্বোচ্চ দৈহিক ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকে, তাদের মধ্যেই আত্মহত্যা সংঘটিত হয় সবচেয়ে বেশী। তারা তাদের রূহকে আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী চালায় না বলেই তাদের দেহ এবং রূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তাদের রূহ নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব অনুভব করে বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ কথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইউরোপের সুইডেন এমন একটি রাষ্ট্র, যাতে রয়েছে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দর নদ-নদী ও এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা ইউরোপের অন্য কোনো দেশে পাওয়া দুষ্কর। নাগরিকদের মাথা পিছু গড় আয় পৃথিবীর অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের মাথা পিছু গড় আয়ের চেয়ে বেশী। ভোগবিলাস ও যেনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এমনকি পুরুষে পুরুষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের সংসদে আইন রাখা হয়েছে। এত কিছুর পরও সবচেয়ে বেশী আত্ম হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয় সুইডেনে। এটি কি দেহ ও রূহের মধ্যে দূরত্ব এবং রূহের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের উজ্জল দৃষ্টান্ত নয়?

সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে শান্তি ও সৌভাগ্য লাভের মূলেই রয়েছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। এর মাধ্যমেই মানুষের দেহ ও শরীরের সার্বিক চাহিদা পূরণ হয়। এতেই রূহ এবং দেহের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়। সেই সঙ্গে সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সমগ্র মানবের সাথে প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টির সাথেও সুসম্পর্ক তৈরী হয়। এতে করে সকল সৃষ্টিই এক ও অভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়।

রোগের চিকিৎসা হয়না এবং এটি কারো পিপাসা নিবারণ করে না। পরিশেষে আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম উৎস।[১৯৫]

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতসমূহ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আপনি এ আয়াতটি পাঠ করুন,

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন" *(সূরা ত্বহা:৫)*। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

"পবিত্র বাক্যসমূহ তারই দিকেই উঠে এবং সৎকর্মকে তিনি উন্নীত করেন"। *(সূরা ফাতির: ১০)*

আর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে ত্রুটি এবং অপূর্ণতার গুণাবলী নাকোচ করার ক্ষেত্রে আপনি পাঠ করুন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"তার সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা আশ-শূরা:১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾

"তারা তাদের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না"। *(সূরা ত্বহা: ১১০)*

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম শাহরাস্তানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমীনদের নিকট দিশেহারা হওয়া এবং অনুশোচনা ছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি আরো বলেন,

---

১৯৫. বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী একদা পথ চলছিলেন। তার সাথে তখন শতাধিক ছাত্র ছিল। তারা যখন একজন বৃদ্ধ মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন বৃদ্ধ মহিলা ইমামের শান-শওকত দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, ইনি কে? ছাত্ররা বলল, ইনি হলেন প্রখ্যাত আলেম আবু আব্দুল্লাহ ফখরুদ্দীন রাযী। ছাত্ররা ইমামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে একহাজার সংশয়ের উত্তর জানেন। বৃদ্ধ মহিলাটি তখন বলল, আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে কি? যার জন্য একহাজার দলীল দিয়ে সে সন্দেহ দূর করতে হবে? সুতরাং বৃদ্ধ মহিলাটি তার স্বভাব প্রসূত জবাবের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিল, যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এত দলীল সংগ্রহ করেছে, তার অন্তরে যদি আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ নাই থাকতো, তাহলে তিনি এত দলীল সংগ্রহ করতে যাবেন কেন?

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا. وَسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ

فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ... عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِمِ

আমার জীবনের শপথ! আমি পৃথিবীর সমস্ত ইলমে কালাম ও দর্শনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিভ্রমণ করেছি এবং সেগুলোতে চোখ রেখেছি। আমি সেখানকার সকলকেই দিশেহারা হয়ে স্বীয় গালে হাত রাখতে দেখেছি অথবা শেষ বয়সে উপনীত হয়ে অনুশোচনা করতে দেখেছি।

এমনি ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হে বন্ধুগণ! তোমরা ইলমে কালামের পিছে পড়ো না। আমি যদি জানতাম, ইলমে কালাম আমাকে এতদূর নিয়ে যাবে, তাহলে আমি এ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম না। মৃত্যুর সময় তিনি বলেছেন, আমি এক সুবিশাল মহাসাগরে ডুব দিয়েছি, মুসলিমদেরকে বর্জন করেছি এবং তাদের ইলম থেকেও বহু দূরে সরে এসেছি। এর মাধ্যমে আমি ঐ জিনিসের মধ্যেই ঢুকে পরেছি, যাতে প্রবেশ করতে তারা আমাকে নিষেধ করেছে। এখন আল্লাহ তা'আলা যদি তার অপার কৃপায় আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে ইবনুল জুওয়াইনীর জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

অতঃপর ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ তো আমি এখন আমার মায়ের আকীদার উপরই মৃত্যু বরণ করছি অথবা তিনি বলেছেন, আমি নিসাপুরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আকীদার উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিষ্য শামসুদ্দিন খুসরাওশাহীও অনুরূপ কথা বলেছেন। তার কাছে একদা যখন একজন জ্ঞানী লোক প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আল্লাহর ব্যাপারে কী আক্বীদাহ পোষণ করো? সেই জ্ঞানী লোক বললেন, সাধারণ মুসলিমগণ যে আক্বীদাহ পোষণ করে, আমিও তা পোষণ করি। খুসরাওশাহী তখন বললেন, তুমি কি প্রশস্ত মনে নিশ্চিতভাবে অন্তরের গভীর থেকে তা বিশ্বাস করে থাকো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এ কথা শুনে খুসরাওশাহী বললেন, তুমি এর কারণে আল্লাহর শোকর আদায় করো। আর আমার অবস্থা হলো, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ব্যাপারে কী আক্বীদাহ পোষণ করি, তা আমি নিজেই জানি না। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ব্যাপারে কী আক্বীদাহ পোষণ করি, তা আমি নিজেই জানি না। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ব্যাপারে কী আক্বীদাহ পোষণ করি, তা আমি নিজেই জানি না। এ কথা বলে তিনি কাদতে লাগলেন। ক্রন্দনের কারণে তার দাড়ি ভিজে গেল।

ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ইবনে আবীল হাদীদ বলেছেন,

فِيكَ يَا أُغْلُوطَةَ الْفِكَرِ... حَارَ أَمْرِي وَانْقَضَى عُمُرِي

سَافَرَتْ فِيكَ الْعُقُولُ فَمَا... رَبِحَتْ إِلَّا أَذَى السَّفَرِ

فَلَحَى اللَّهُ الْأُلَى زَعَمُوا... أَنَّكَ الْمَعْرُوفُ بِالنَّظَرِ

كَذَبُوا إِنَّ الَّذِي ذَكَرُوا..... خَارِجٌ عَنْ قُوَّةِ الْبَشَرِ

(১) বিবেক-বুদ্ধি খাঁটিয়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে ও তর্ক-বিতর্ক করে আল্লাহর মারেফত ও ইয়াকীন অর্জনের চেষ্টা করে আমি মারাত্মক ভুল করেছি। এর পিছনে ছুটে আমার আয়ু শেষ হয়ে গেলো। অথচ আমি এখনো দিশেহারা হয়ে পড়ে আছি।

(২) ওহে মহা সত্যের মারেফত! আমার বিবেক-বুদ্ধি তোমাকে অর্জন করার জন্য বহু দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেছে। কিন্তু সফরের ক্লান্তি-কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি।

(৩) আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকদেরকে ধ্বংস করুন, যারা মনে করেছে চিন্তা-ফিকির ও বুদ্ধির মাধ্যমে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(৪) তারা যা বলেছে তাতে তারা মিথ্যুক। কারণ মানুষের বোধশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রভুর মারেফত হাসিল করা অসম্ভব।[১৯৬]

কালাম শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ বিন নামাউর আল-খাওয়ানজী (মৃত: ৬৪৬) মৃত্যুর সময় বলেছেন, সারা জীবন ইলমে কালাম চর্চা করে কিছুই অর্জন করতে পারিনি। শুধু এতটুকু অর্জন করতে পেরেছি যে, যার অস্তিত্ব সম্ভব, অস্তিত্ব লাভের জন্য তা একটি শক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী। অতঃপর তিনি বলেন, এ মুখাপেক্ষীতা একটি নেতিবাচক বিশেষণ। মোট কথা, আমি এখন মারা যাচ্ছি, অথচ ইলমে কালামের পিছনে সারা জীবন পরিশ্রম করে আল্লাহর মারেফত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি।

অন্য একজন কালামবিদ বলেছেন, আমি বিছনায় শুয়ে থাকি এবং আমার চেহারাকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে রাখি। এমতাবস্থায় আমি দীনের মূলনীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহে বিতর্ককারী পক্ষগুলোর দলীলগুলো যাচাই-বাছাই ও তুলনা করে দেখি। ফজর হয়ে যায়, তবুও আমি কোনো পক্ষের কথার উপর অন্য পক্ষের কথাকে প্রাধান্য দিতে পারি না।

প্রিয় ভাইগণ! উপরে যেসব আলেমদের কথা আলোচনা করা হলো, তাদের অবস্থা আপনি অবগত হলেন। যার অবস্থা এ রকম হবে, তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল না হলে সে নাস্তিকে পরিণত হবে। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলমে কালাম বা তর্কশাস্ত্র-মানতেক-দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের জ্ঞান অর্জন করতে যাবে সে

১৯৬. তিনি ঠিক বলেছেন। মানুষের নিজস্ব বোধশক্তি, চিন্তা-গবেষণা করে এবং মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। গায়েবী ইলম ও অহীর উপর নির্ভর করেই মারেফতে ইলাহী হাসিল করা যাবে। যারাই কুরআন-সুন্নাহর পথ পরিহার করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী ও পরিচয় হাসিল করার চেষ্টা করেছে, শেষ জীবনে উপনীত হয়ে তারা সকলেই আফসোস করেছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি, ইমাম গাজ্জালী, ইমামুল হারামাইন এবং কালাম শাস্ত্রের আরো অনেক ইমামই শেষ জীবনে এসে আফসোস করেছেন। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, যে উদ্দেশ্যে তারা ইলমুল কালাম ও তর্কশাস্ত্রের সাগরে ডুব দিয়েছিলেন, তাতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

নাস্তিকে পরিণত হবে, যে ব্যক্তি মাটিকে সোনা বানিয়ে ধনী হওয়ার চেষ্টা করবে, সে সর্বহারা হবে এবং দুর্লভ হাদীছের সন্ধানে বের হবে, সে মিথ্যাবাদীতে পরিণত হবে।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আহলে কালাম বা তর্কশাস্ত্র চর্চাকারীদের ব্যাপারে আমার ফায়ছালা হলো তাদেরকে খেজুর গাছের শাখা এবং জুতা দিয়ে পেটানো হবে। তাদেরকে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরানো হবে এবং বলা হবে যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত বাদ দিয়ে কালামশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে, এটিই তাদের শাস্তি। ইমাম শাফেঈ আরো বলেন, আমি আহলে কালামদের এমন এমন কথা জানতে পেরেছি, যা কোনো মুসলিমের কথা হতে পারে না। কোনো মুসলিম শির্ক ছাড়া অন্যান্য সকল পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ইলমে কালাম চর্চা করার অপরাধ আরো বেশী।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, কালামশাস্ত্রের পন্ডিতদের কেউ কেউ মৃত্যুর সময় তাদের মাজহাব পরিত্যাগ করে সাধারণ মুসলিম ও বৃদ্ধ অশিক্ষিত মানুষের সহজ-সরল ইসলামী আকীদার দিকে ফিরে এসেছেন। তারা সাধারণ মুসলিমদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসকেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং কুরআন-সুন্নাহবিরোধী তাদের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলোকে পরিহার করেছেন। অথচ এ বিষয়গুলোকে তারা এক সময় অকাট্য মনে করতেন। অতঃপর যখন তাদের নিকট তা ভ্রান্ত হিসাবে ধরা পড়লো অথবা তার বিশুদ্ধতা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হলো না তখন তারা শেষ বয়সে উপনীত হয়ে বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে হলে শিশু, বৃদ্ধ নারী ও গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের আকীদার দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

যেসব লোক আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম, সুউচ্চ গুণাবলী এবং দীনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে সন্দেহে পতিত হবে, তার উক্ত রোগের উপকারী চিকিৎসা কেবল তাই, যা অন্তরের রোগসমূহের সর্বোত্তম চিকিৎসক মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তিনি রাতে ঘুম থেকে উঠে যখন ছ্বলাত শুরু করতেন, তখন বলতেন,

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

“হে আল্লাহ্! তুমি জিবরীল, মিকাঈল এবং ইসরাফীলের প্রভু, আসমান-যমিন সৃষ্টিকারী, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত, তুমি তোমার বান্দাদের মতভেদের বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী। যে হকের ব্যাপারে লোকেরা মতভেদে লিপ্ত রয়েছে, তোমার

তাওফীকে আমাকে তাতে দৃঢ়পদ রাখো। তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকো”।[১৯৭]

ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল, মিকাঈল এবং ইসরাফীলের রবের উসীলায় দু'আ করেছেন যে, তিনি যেন স্বীয় ইচ্ছায় তাকে ঐ মহা সত্যের হিদায়াত প্রদান করেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। কেননা হিদায়াত ছাড়া অন্তর জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত তিন ফেরেশতাকে সমস্ত সৃষ্টিকে জীবিত রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন। জিবরীলকে যমীনবাসীর নিকট অহী নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ অহীর মাধ্যমে মানুষের অন্তর জীবিত থাকে। মিকাঈলকে বৃষ্টি বর্ষণ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের শরীর জীবিত ও সতেজ থাকে এবং বাকীসব জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ বেচে থাকে। ইসরাফীলকে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুর পর পুনঃজীব ফিরে পাবে এবং রূহসমূহ নিজ নিজ দেহে ফিরে যাবে। সুতরাং সৃষ্টির জীবন প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব বড় বড় ফেরেশতার রবের উসীলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা উদ্দেশ্য হাসিল করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আল্লাহ সহায়।

(৩৯) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ، وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومَ التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ

জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভের উপর ঐ ব্যক্তির ঈমান আনয়ন বিশুদ্ধ হবে না, যে কোনো ধারণার বশবর্তী হবে, অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সাক্ষাতের তাবীল করবে বা ভুল ব্যাখ্যা দিবে। কারণ আল্লাহকে দেখার বিষয়টি এবং রবের অন্যান্য গুণাবলীর বিষয়ের ব্যাপারে প্রকৃত কথা হচ্ছে ঐগুলোর কোনোরূপ তাবীল করার অপচেষ্টা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবেই অবিকৃতভাবে মেনে নিতে। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দীন। যে ব্যক্তি রবের জন্য সুসাব্যস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তার সাদৃশ্য বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে।

---

১৯৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭০, অধ্যায়: রাতের ছ্বলাতের দু'আ।

.....

ব্যাখ্যা: মুতাযেলা এবং তাদের মত অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে, শাইখ এখানে তাদের প্রতিবাদ করেছেন। সে সঙ্গে যারা আল্লাহকে সৃষ্টির কোনো বিষয়ের সাথে তুলনা করে, তাদেরও প্রতিবাদ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القمر ليلة البدر»

"তোমরা অচিরেই স্বচক্ষে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই পূর্ণিমার রাতে তোমরা চন্দ্রকে দেখতে পাও"।[১৯৮]

এখানে তাশবীহ এর জন্য ব্যবহৃত كاف-বর্ণকে মাসদার অথবা মাওসুলের অর্থ প্রদানকারী ما-এর সাথে যুক্ত করে ترون ফেলকে মাসদারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ترون ফেলকে الرؤية মাসদারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে। এতে করে তাশবীহ তথা আল্লাহর দিদারকে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য হবে। এখানে আল্লাহর দিদারকে পূর্ণিমার রাতের মেঘহীন আকাশে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলার সদৃশ আর কিছুই নেই। জোর দিয়ে আল্লাহর প্রকৃত দিদারকে সত্য হিসাবে সাব্যস্ত করা এবং তার দ্বারা রূপকার্থের সন্দেহ দূর করার বিষয়টি এখানে খুবই সুস্পষ্ট। এত সুস্পষ্ট বিবরণ আসার পরও যারা সত্য কবুল করা থেকে দূরে থাকে, তাদের নসীবে গোমরাহী ছাড়া আর কিছু জোটবে কি?

এ ধরণের সুস্পষ্ট কথার সুস্পষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে যদি অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এমন কোনো দলীল খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যার ব্যাপারে আমরা বলতে পারবো যে এটি একটি অকাট্য দলীল, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই? সুতরাং যেখানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেখানে কিভাবে এ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, তোমরা তোমাদের রবকে সেভাবেই জানতে পারবে, যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে জানতে পারো? মোট কথা মুতাযেলারা 'আল্লাহকে দেখা যাবে' এ কথার ব্যাখ্যায় বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে। এ অপব্যাখ্যার পক্ষে তারা কুরআন মজীদের সূরা ফীলের ১নং আয়াতকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

১৯৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৩৩, অধ্যায়: কিতাবুল মাসাজিদ।

হে নাবী! তুমি কি দেখোনি যে, তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? এরূপ অন্যান্য যেসব আয়াতে رأى শব্দ এসেছে, তা দ্বারা দলীল পেশ করে তারা বলে থাকে যে, এসব رأى আফআলে কুলুবের অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেখা কখনো কখনো কপালের চোখ দিয়ে হয়ে থাকে, কখনো কখনো অন্তরের চোখ দিয়ে হয়ে থাকে আবার কখনো স্বপ্নের মাধ্যমেও হয় এবং অন্যান্য অর্থেও দেখা কথাটি ব্যবহৃত হয়। তবে মানুষের সব ধরণের কথার মধ্যেই এমন আলামত থাকে, যা বক্তব্যের একাধিক অর্থের মধ্য থেকে যে কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আর বক্তার কথার একাধিক অর্থ থেকে কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্টকারী আলামত না থাকলে তার সমস্ত কথাই অস্পষ্ট থেকে যাবে; তার কোনো কথার অর্থই সুস্পষ্ট হবে না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عيانا كَمَا تَرَوْنَ الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»

"নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই স্বচক্ষে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন মেঘহীন আকাশে দুপুর বেলা কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই সূর্য দেখতে পাও"।[১৯৯]

এ সুস্পষ্ট বাণীর চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে কি? এ সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কি চোখের দেখা সাব্যস্ত হয়? না কি এর মাধ্যমে অন্তরের দেখা সাব্যস্ত হয়? যার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা অন্ধ করে দিয়েছেন, সে ব্যতীত এ রকম দলীল আর কার নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে?

মুতাযেলারা যদি বলে, বিবেক-বুদ্ধির দলীল আমাদেরকে এ তাবীল করতে বাধ্য করেছে। তারা বলেছে, বিবেক ও বোধশক্তির দাবি হলো, আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। এটি বাস্তবায়ন হওয়া অসম্ভব।

তাদের কথার জবাব হলো, এটি তোমাদের মুখের দাবি মাত্র। অধিকাংশ বিবেকবান লোক তোমাদের সাথে একমত নয়। বিবেক ও বোধশক্তি আল্লাহর দিদারকে অসম্ভবও মনে করে না। বরং বিবেক-বুদ্ধির কাছে যখন এমন অস্তিত্বশীল স্বয়ং সম্পূর্ণ জিনিস পেশ করা হয়, যা দেখা যায় না, তখন বিবেকের ফায়ছালাতেই তার অস্তিত্ব অসম্ভব বলে সাব্যস্ত হয়।

১৯৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৪ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৩৩।

আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে অনুমান ও ধারণা করে কথা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক:

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর কথা, لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ যে ব্যক্তি ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দিদারকে কল্পনা করবে। অর্থাৎ এ ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলাকে এভাবে দেখা যাবে, এ ভেবে তার জন্য কোনো একটি সাদৃশ্য নির্ধারণ করবে, সে আল্লাহ তা'আলার জন্য সদৃশ নির্ধারণকারী হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আল্লাহর দিদারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকারকারী এবং বাতিলকারী হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে ধারণার বশবতী হয়ে কথা বলা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। আল্লাহর সদৃশ নফী করতে গিয়ে সে যেন হক ও বাতিল উভয়কেই নাকোচ না করে দেয়। এতে করে বাতিলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হকও নাকোচ হয়ে যায়। বরং আবশ্যক হলো আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর মধ্যে বাতিল কিছু সাব্যস্ত করার প্রতিবাদ করা এবং তাতে যা কিছু সত্য তা সাব্যস্ত করা।

শাইখ এ দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন, وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ যে ব্যক্তি রবের জন্য সুসাব্যস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তার সাদৃশ্য বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে।

মুতাযেলারা মনে করে, আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতসমূহ নাকোচ করার মাধ্যমে তারা তাকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, যেসব গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে, তা নাকোচ করার মাধ্যমে কিভাবে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত হবে? আল্লাহর দিদারকে নফী করার মাধ্যমে তার কামালিয়াত সাব্যস্ত হয় না। কেননা অস্তিত্বহীন জিনিসই কেবল দেখা যায় না। যার অস্তিত্ব রয়েছে, তাকে দেখা সম্ভব। বরং আল্লাহ তা'আলার দিদার সাব্যস্ত করার মধ্যেই এবং দর্শকের দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে পরিপূর্ণ আয়ত্ত করা নাকোচ করার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ কামালিয়াত সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বান্দার ইলমের ব্যাপারেও একই কথা। তার সম্পর্কে ইলম নাকোচ করার মাধ্যমে কামালিয়াত সাব্যস্ত হয় না। বরং ইলম সাব্যস্ত করা এবং ইলমের মাধ্যমে তঁকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত ও পরিবেষ্টন করা নাকোচ করার মধ্যেই তার কামালিয়াত সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি ইলমের মাধ্যমে তাকে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত ও পরিবেষ্টন করা অসম্ভব।[২০০]

---

২০০. কোনো জিনিসকে সামনে দেখা এবং তাকে পরিপূর্ণরূপে সকল দিক থেকে আয়ত্ত ও বেষ্টন করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আমরা যখন বিশাল একটি পাহাড়কে সামনে নিয়ে দাড়াই, তখন কেবল পাহাড়ের সামান্য অংশই দেখি। সুদর্শন মানুষকে যখন আমরা সামনে দেখি, তখন কেবল আমরা তার চেহারার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখি। আমরা

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সেই দিদারের তাবীল করবে বা ভুল ব্যাখ্যা দিবে। অর্থাৎ সে দাবি করলো যে, সে শরীয়তের দলীলের এমন একটি তাবীল বা ব্যাখ্যা জানতে পেরেছে, যা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী প্রত্যেক লোক সে সম্পর্কে অবগত নয়। আর পরবর্তী যুগের আলেমদের পরিভাষায় তাবীলের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে সম্ভাব্য অন্য অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেয়া। এ অযুহাতেই তাহরীফকারীরা শরীয়তের দলীলের উপর আক্রমণ করেছে। তারা বলেছে, যেসব আয়াত আমাদের মতের বিপরীত হবে, সেগুলোকে আমরা তাবীল করবো। এর মাধ্যমে তারা তাহরীফকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে ও সুন্দর করে তাবীল হিসাবে নামকরণ করেছে। যাতে করে লোকেরা এটিকে সহজেই গ্রহণ করে নেয়। যারা বাতিলের বাহ্যিক শোভা বৃদ্ধি করে তাকে চাকচিক্যময় করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"আর এভাবেই আমি মনুষ্য শয়তান ও জিন শয়তানদেরকে প্রত্যেক নাবীর দুশমনে পরিণত করেছি। তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো। তোমার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করতো না। কাজেই তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও"। *(সূরা আল-আনআম: ১১২)*

আসলে বাক্যের অর্থটিই মূল উদ্দেশ্য ও গ্রহণযোগ্য। শব্দমালা মূল উদ্দেশ্য নয়। অনেক বাতিল জিনিসকে সুশোভিত করে সত্যের বিরোধীতা করা হয়েছে।

সুতরাং শাইখের উক্তি: لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ যে ব্যক্তি ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দিদারকে কল্পনা করবে, -তার অবস্থা পূর্বোক্ত কথার মতই। সেখানে তিনি বলেছেন, لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا "এতে আমরা আমাদের নিজস্ব মতের উপর নির্ভর

বিশাল পাহাড় ও সুদর্শন মানুষকে সামনে দেখি, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারি না। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রেও কথা অনেকটা এ রকম। তাকে জান্নাতীগণ দেখার অর্থ এই নয় যে, তারা তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলবে। কোনো সৃষ্টির পক্ষেই এটি সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী, لاتدركه الأبصار "দৃষ্টিসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না", এর দ্বারা দলীল পেশ করে যারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়, তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ ইদরাক বা আল্লাহকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা এক জিনিস আর الرؤية বা তাকে দেখা অন্য জিনিস। এমনি আল্লাহ তা'আলাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করা এক জিনিস এবং তার সম্পর্কে ইলম বা মারেফত হাসিল করা অন্য জিনিস। আল্লাহ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা সৃষ্টির জন্য সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় বলেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ولايحيطون به علما "তারা তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন ও আয়ত্ত করতে পারবে না"।

করে কোনো অপব্যাখ্যা করবো না এবং আমাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাড়িত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না।

অতঃপর শাইখ তার কথাকে অধিকতর শক্তিশালী করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহকে দেখার বিষয়টি এবং রবের অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলীর বিষয়ের প্রকৃত কথা হচ্ছে ঐগুলোর কোনোরূপ তাবীল করার অপচেষ্টা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবেই অবিকৃতভাবে মেনে নেয়া। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দীন। এখানে তাবীল বর্জন করার অর্থ হলো, বিদআতীরা যে তাহরীফকে তাবীল নাম দিয়েছে, তা উদ্দেশ্য। কিন্তু ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ হিকমত, বিচক্ষণতা, উত্তম পদ্ধতি এবং অত্যন্ত আদবের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের সাথে বিতর্ক করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"হে নাবী! হেকমত এবং উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে"। *(সূরা আন নাহল: ১২৫)*[২০১]

সকল প্রকার তাবীল বর্জন করতে হবে, শাইখের উদ্দেশ্য এটি নয় এবং কোনো কোনো মানুষের কথার বিপরীত হওয়ার কারণে কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক দলীল দ্বারা সাব্যস্ত জিনিসকে বর্জন করাও উদ্দেশ্য নয়। বরং শাইখের উদ্দেশ্য হলো ঐসব তাবীল বর্জন করা, যা সালাফে সালেহীনের মাজহাবের বিপরীত এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীল যেগুলো ভ্রান্ত হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জেনে কথা বলাও বর্জন করা আবশ্যক।

আর ভ্রান্ত তাবীলের মধ্যে গণ্য হলো, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দলীলগুলোর তাবীল করা, আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হওয়ার দলীলগুলোর তাবীল করা ও এ কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেননি এবং তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি।

---

২০১. **সত্য প্রকাশের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে বিতর্কের কিছু আদব:** এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্য দ্বারা প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি-প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, প্রতিপক্ষ কূটতর্কে লিপ্ত হওয়াকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে তখন তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে। যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায় আর না হয় তার ভ্রষ্টতা দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত না হয়।

আর التأويل শব্দটি অনেক সময় তার আসল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের পরিভাষায় তাবীল দ্বারা সেই প্রকৃত অর্থ, বাস্তব রূপ এবং পরিণাম উদ্দেশ্য, যার দিকে কালামকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। সুতরাং খবরের তাবীল বলতে হুবহু খবরকেই বুঝায়। আদেশের তাবীল বলতে আদিষ্ট কাজ সম্পাদন করাকেই বুঝায়। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুতে কখনও এ দু'আটির সাথে পড়তেন,

سُبْحَانك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي

"হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো"।[২০২] এর মাধ্যমে তিনি কুরআনের তাবীল করতেন। অর্থাৎ তার আদেশ বাস্তবায়ন করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾

"আর তারা কোনো কিছুর অপেক্ষা করছে না, শুধুমাত্র ওর সর্বশেষ পরিণতির প্রতীক্ষায় আছে? যেদিন এর সর্বশেষ পরিণতি উপস্থিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, বাস্তবিকই কি আমাদের রবের রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন?"। *(সূরা আল-আরাফ: ৫৩)*

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করাকেও তাবীল বলা হয়। সেই সঙ্গে কাজ-কর্মের ব্যাখ্যাকেও তাবীল বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের উক্তি নকল করে বলেন,

﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾

"আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন" *(সূরা ইফসুফ:১০০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

"এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন"। *(সূরা ইউসুফ: ৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর"। *(সূরা আন নিসা: ৫৯)* আর কাজের ব্যাখ্যাকেও তাবীল বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২০২. ছ্বহীহ মুসলিম ৪৮৪, ছ্বহীহ বুখারী ৭৯৪, আবূদাউদ ৮৭৭, নাসাঈ ১১২৩।

﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾

"যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরতে পারনি, আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। নৌকাটির ব্যাপারে কথা হলো, ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে কাজ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে সকল নিখুত নৌকা ছিনিয়ে নিতো। আর বালকটির কথা এ যে, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার, আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফুরী দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন; যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। আর ঐ প্রাচীরটির কথা এ যে, ওটা ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতীম বালকের, ওর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎ লোক। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপূর্বক ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজের তরফ থেকে এসব করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা"। *(সূরা কাহাফ: ৭৮-৮২)*

সুতরাং এ ধরণের ব্যাখ্যা এবং আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞানকে কেউ কি অস্বীকার করতে পারে? আর যেসব আয়াত খবর সম্পর্কিত, যাতে আল্লাহর নাম, তার সত্তা, তার ছিফাত এবং আখিরাত দিবসের বিভিন্ন খবর রয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গায়েবী বিষয়গুলোর হাকীকত জানা সম্ভব নয়। কেননা খবরের মাধ্যমে এগুলোর হাকীকত জানা যায়নি। আসল কথা হলো সম্বোধিত ব্যক্তি যদি সংবাদের মাধ্যমে অবগত জিনিসটি কল্পনা করতে না পারে অথবা সম্বোধনের পূর্বে থেকেই যদি সেটি সম্পর্কে পরিচিত না থাকে, তাহলে সম্বোধিত ব্যক্তি খবরের মাধ্যমে কখনো ঐ জিনিসের হাকীকত সম্পর্কে জানতে পারবে না। আর এ হাকীকতটির নাএ হলো তাবীল। আল্লাহ ছাড়া এ তাবীল সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত নয়। তবে কোনো বস্তুর হাকীকত বা প্রকৃত রূপ না জানার অর্থ এ নয় যে, সম্বোধনকারী সম্বোধিত ব্যক্তিকে যা বুঝাতে চাচ্ছে, সে সম্পর্কে মোটেই অবগত হবে না। কুরআনে যত আয়াত রয়েছে, তার সবগুলো নিয়েই আল্লাহ তা'আলা চিন্তা-গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেসব আয়াত নাযিল করেছেন, তাতে তিনি পছন্দ করেন যে, তার সবগুলো সম্পর্কেই মানুষ অবগত হোক। যদিও তা এমন তাবীলের অন্তর্ভুক্ত হয়, যার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের

কথার মধ্যে যে তাবীল শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ এটিই। যদিও এ তাবীল বাহ্যিক বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় কিংবা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হয়।

التأويل শব্দের অর্থ: অনেক মুফাস্‌সিরের মতে التأويل শব্দটি তাফসীর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইমাম ইবনে জারীর এবং অনুরূপ অন্যান্য মুফাস্‌সির তাবীল শব্দটি ব্যবহার করেন কালামের ব্যাখ্যা এবং তার অর্থ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে। চাই সে ব্যাখ্যা কালামের বাহ্যিক অর্থের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক কিংবা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হোক। এটি একটি বহু প্রচলিত পরিভাষা। এ তাবীল তাফসীরের মতই। তাবীলের যে অংশ সত্যের অনুরূপ হবে, তা গ্রহণ করা হবে এবং যে অংশ বাতিল হবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ এবং পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৭)*

এ আয়াতাংশের মধ্যে দু'টি কিরা'আত রয়েছে। কোনো কোনো কারী إلا الله এর পরে ওয়াক্‌ফ করে থাকেন। আবার কোনো কোনো কারী إلا الله এর পরে ওয়াক্‌ফ করেন না। উভয় কিরাতই সঠিক। প্রথম কিরাআত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হলো, যে আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষেই মুতাশাবেহা, তার অর্থ কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। আর দ্বিতীয় কিরাআত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হলো, মুতাশাবেহা আয়াতগুলোর অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ কেবল জ্ঞানে পরিপক্করাই জানেন; অন্যরা এগুলোর ব্যাখ্যা জানেন না। যারা إلا الله এর পরে ওয়াক্‌ফ করে থাকেন, তারা তাবীল এবং তাফসীরকে সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে গণ্য করেন না। এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের উপর এমন কিছু আয়াতও নাযিল করেছেন, যার অর্থ উম্মতের কোনো লোকই জানে না এবং স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জানতেন না। সেই সঙ্গে জ্ঞানে যারা পরিপক্ক, মুতাশাবেহার অর্থ সম্পর্কে তাদেরও কোনো ধারণা নেই। তারাও শুধু এটি বলবে, {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: ٧] "আমরা এসব বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত"। *(সূরা আলে ইমরান:৭)* এটি তো মুমিনদের মধ্যে যারা জ্ঞানে অপরিপক্ক তারাও বলে থাকে।

তবে জ্ঞানে যারা পরিপক্ক, সাধারণ মুমিনদের মধ্য থেকে মুতাশাবেহা আয়াতগুলোর ব্যাপারে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, আমি ঐসব সুবিজ্ঞ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুতাশাবেহা আয়াতগুলোর তাবীল সম্পর্কেও

অবগত রয়েছেন। তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য দুআ করতে গিয়ে বলেছেন,

اللهم فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وعلمه التأويل

"হে আল্লাহ! তুমি তাকে দীনের জ্ঞান দান করো এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করো"।[২০৩] ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুস্তাজাবুদ দাওয়াত। অর্থাৎ তার কোনো দু'আই আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দিতেন না।

প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহুর নিকট কুরআন মজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পেশ করেছি। প্রত্যেকটি আয়াত পাঠ করেই আমি থেমেছি এবং তাকে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। মুতাওয়াতের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কুরআনের সমস্ত আয়াতের অর্থের ব্যাপারেই কথা বলেছেন। তিনি কোনো আয়াতের ব্যাপারেই বলেননি যে, এটি মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণ উসূলের কিতাবসমূহে বলেছেন, কুরআন মজীদের সূরাসমূহের শুরুতে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোকে মুতাশাবেহা বলা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ কুরআনের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার এ অক্ষরগুলোর অর্থ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ অক্ষরগুলোর অর্থ যদি আলেমদের নিকট পরিচিত থাকে, তাহলে মুতাশাবেহা আয়াতসমূহের অর্থও জানা যাবে। আর যদি এগুলোর অর্থ জানা না যায়, তাহলে এগুলোও মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতগুলোর অর্থ বোধগম্য। যে আয়াতসমূহের অর্থ আমরা জানতে পারবো, সেগুলোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

"তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট)"। *(সূরা আলে-ইমরান:৭)* আর সূরার শুরুর দিকে উল্লেখিত অক্ষরগুলো অধিকাংশ আলেমের মতে আলাদা আয়াত নয়।

পরবর্তীকালের ফক্বীহ এবং মুতাকাল্লিমীনদের পরিভাষায় বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া গেলে শব্দকে প্রাধান্যযোগ্য সম্ভাব্য অর্থ থেকে সরিয়ে অপ্রাধান্যযোগ্য সম্ভাব্য অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়াকে তাবীল বলা হয়। সংবাদ কিংবা আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত অনেক ব্যাপারেই এ তাবীল নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। সঠিক তাবীল তাই, যা কুরআন ও ছ্বহীহ

২০৩. ছ্বহীহ: আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান।

হাদীছের দলীলের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। আর যে তাবীল কুরআন ও ছুহীহ হাদীছের দলীলের বিরোধী হবে, তা ভ্রান্ত তাবীল বলে গণ্য হবে। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আলী সিরাজী রহিমাহুল্লাহ তার 'তাবসিরা' নামক কিতাবে নুসাইর বিন ইয়াহইয়া বালখী আমর বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হলে কি সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তাশবীহ হয়ে যায় না? জবাবে তিনি বললেন, এগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবেই রেখে দিবো এবং তাতে বিশ্বাস করবো। আমরা বলবো না যে এগুলোর ধরণ কী?

জেনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন-সুন্নাহর যেসব দলীলের বাহ্যিক দাবি মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত হয়েছে, তা সাব্যস্ত করা বাতিল বা কুফুরী নয়; বরং যে ব্যক্তি তা সাব্যস্ত করাকে কুফুরী মনে করবে, তার বুঝ এবং ইলমের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কবি বলেছেন,

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا... وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

অনেক লোক রয়েছে, যারা সঠিক কথাকে দোষারোপ করে। আসলে দোষিত বুঝশক্তিই এ মুছীবতের একমাত্র কারণ। অন্য এক কবি বলেন,

عَلَيَّ نَحْتُ الْقَوَافِي مِنْ مَعادنها... وَمَا عَلَيَّ إذا لَمْ تَفْهَمِ الْبَقَرُ

"আমার উপর আবশ্যক হলো, শব্দমালার ভান্ডার থেকে উচ্চাঙ্গের শব্দ প্রয়োগ করবো। গরুর দল (নির্বোধ লোকেরা) তা যদি না বুঝে, তাতে আমার কিছু করণীয় নেই।[২০৪]

যেক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব হলো সর্বাধিক সত্য, তার বাণী হলো সর্বোত্তম বাণী এবং তা এমন কিতাব, যার আয়াতগুলো মজবুত (সুবিন্যাস্ত) করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

{أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هُودٍ: ١]

এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাকে বিবৃত *(সূরা হুদ:১)*।

সেখানে কিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কুরআন মজীদের আয়াতগুলোর মধ্যে এমন কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, যা থেকে আক্বীদাহ গ্রহণ করা যেতে পারে? তারা আরো

২০৪. ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ এখানে সৃষ্টির সিফাতের সাথে তাশবীহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যারা উহাকে অস্বীকার করেছে, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

বলেছে যে, কুরআনে তাওহীদের কোনো বর্ণনা নেই এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার যথাযথ পবিত্রতাও বর্ণনা করা হয়নি। নাউযুবিল্লাহ। এ হলো কুরআনের অপব্যাখ্যাকারীদের কথার প্রকৃত অবস্থা। তাদের কথার প্রকৃত অর্থ হলো কুরআন ও হাদীছের বাহ্যিক দলীলগুলোর মধ্যে বাতিল অর্থ রয়েছে, নাউযুবিল্লাহ। অথচ সত্য কথা হলো, কুরআন ও হাদীছের দলীলগুলো দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তাই প্রকৃত সত্য। কুরআনের কোনো দলীলই বাতিল কিছু সাব্যস্ত করেনি। কিন্তু বাতিলপন্থীরা দাবি করে যে, কুরআনের আয়াত ও হাদীছের দলীল এমন বাতিল কথা সাব্যস্ত করে, যা প্রত্যাখ্যান করা জরুরী।

তাদের জবাবে বলা হবে যে, তোমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দলীলগুলোর বাহ্যিক অর্থের তাবীল করার যে দ্বার উন্মুক্ত করেছো, এর মাধ্যমে তোমাদের ধারণায় কিছু কিছু অস্পষ্ট ক্ষেত্রে তোমাদের মুমিন ভাইদের উপর জয়লাভ করতে পারলেও তোমরা কেবল মুশরিক ও বিদ'আতীদের জন্য তোমাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছো।[২০৫] এ দরজা তোমরা কখনো বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। তোমরা যদি কুরআনের দলীল থেকে বোধগম্য অর্থকে শরীয়তের অন্য কোনো দলীল ছাড়াই পরিবর্তন করে ফেলতে চাও, তাহলে তোমাদের কাছে এমন কোনো মূলনীতি আছে কি, যার মাধ্যমে তোমরা নির্ধারণ করে থাকো যে, অমুক আয়াতের তাবীল করা বৈধ এবং অমুক আয়াতের তাবীল করা বৈধ নয়?

এখন তোমরা যদি বলো, বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল যে আয়াতের মর্মার্থ কবুল করে নেয়াকে অসম্ভব মনে করে, আমরা তার তাবীল করবো। আর যদি অসম্ভব মনে না করে, তাহলে আমরা সেই বক্তব্যকে কবুল করে নিবো, তাহলে তোমাদেরকে বলা হবে, কোন্ আকলী দলীলের মাধ্যমে আমরা বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীলকে ওজন করবো? কেননা বাতেনী সম্প্রদায়ের ইমাম কিরমিতের মতে বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল শরী'আতের বাহ্যিক হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান বাতিল করে দেয়, দার্শনিকরা মনে করে বিবেক-

---

২০৫. আশায়েরা, মুতাযেলা এবং মাতুরীদিরা আল্লাহ তা'আলার নাম ও ছিফাতগুলোকে তাবীলের মাধ্যমে বিদ'আতীদের জন্য কুফুরী ও নাস্তিক্যবাদের দরজা খুলে দিয়েছে। যদিও তারা মনে করেছে যে, তারা তাদের আকলী যুক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু সাধারণ মুমিনদের উপর জয়লাভ করেছে। মাতুরীদি ও আশায়েরাগণ যখন আরশের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার তাবীল করেছে, তখন দার্শনিকগণ ও বাতেনী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে যে, তোমরা কেন বলছো যে, তোমাদের তাবীল সঠিক এবং আমাদের তাবীল সঠিক নয়? শত শত দলীল থাকা সত্ত্বেও তোমরা সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার তাবীল করছো। আর আমরা রূহের পুনরুত্থানের তাবীল করছি। সুতরাং আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? তোমরা কুরআনের আয়াতের তাবীল-ব্যাখ্যা করছো, আমরাও তাবীল-ব্যাখ্যা করছি। তোমাদের কাছে অকাট্য আকলী দলীল রয়েছে, আমাদের কাছেও অকাট্য আকলী দলীল রয়েছে।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথা হলো, আমাদের কাছে এমন মূলনীতি থাকা আবশ্যক, যা সকলেই মানতে বাধ্য থাকবে। সেটি হলো কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের মাধ্যমেই করা কিংবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা করা। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। ছাহাবীগণ উহা বুঝে নিয়েছেন। এটিই সালাফে সালেহীনদের নীতি। এ ছাড়া যারাই অন্য পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাবে, তারা বিদআতী বলে গণ্য হবে। এই বিদআত কখনো কুফুরী, কখনো গোমরাহী এবং কখনো ভুল হিসাবে গণ্য হবে।

বুদ্ধির অকাট্য দলীল মানুষের দেহের পুনরুত্থানকে বাতিল করে, মুতাযেলারা মনে করে বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল মোতাবেক আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। এমনি তাদের বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ তা'আলার ইলম, কালাম এবং রহমতকে অস্বীকার করে। বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোর তাবীল করাকে ওয়াজিব মনে করে, তাদের সমস্ত কথা এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কালামের তাবীল করতে গেলে দু'টি বড় ধরণের সমস্যায় পড়তে হবে।

(১) অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা ব্যতীত আমরা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো কিছুই সাব্যস্ত করতে পারবো না। এভাবে দীর্ঘ আলোচনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে যে, বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করা সম্ভব কি না? আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মতভেদকারী প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তাদের মাযহাবই বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা সমর্থিত। এতে করে দীনের মূলনীতির বিষয়ে লোকেরা দিশেহারা হবে, যা আকীদার মাসআলাসমূহে সম্পূর্ণ নিষেধ।

(২) আল্লাহর বাণীর তাবীল করা হলে গায়েবী বিষয়সমূহে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সংবাদ দিয়েছেন অন্তর থেকে সেসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস উঠে যাবে। ফলে অনেকেই দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস করবে না যে, এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য। ঐদিকে তাবীলগুলো তো বিভিন্ন রকম। এতে করে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে যে সংবাদ দিয়েছেন, তার নির্দেশনা থেকে কুরআন ও সুন্নাহকে দূরে সরিয়ে ফেলা আবশ্যক হবে। النبي শব্দটি الإنباء থেকে গৃহীত। অর্থাৎ সংবাদ প্রদান করা থেকে নেয়া হয়েছে। সুতরাং নাবীর কাজ হলো সংবাদ প্রদান করা। ঐদিকে কুরআনে রয়েছে মহা সংবাদ। তাবীলকারীরা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো কেবল সমর্থন স্বরূপ উল্লেখ করে থাকে; স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে উল্লেখ করে না। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো তাদের দাবি মোতাবেক হলে তারা বলে বিবেক-বুদ্ধি এটি সমর্থন করে এবং তারা তা গ্রহণ করে নেয়। আর কুরআন-সুন্নাহর দলীল তাদের বিবেক-বুদ্ধির খেলাফ হলে তারা শরীয়তের দলীলগুলোর তাবীল করে। এতে করে নাস্তিকদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কুফল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৪০) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ

যে ব্যক্তি রবের জন্য সুসাব্যস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তার সাদৃশ্য করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করা এবং তাকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করা অন্তরের রোগসমূহের অন্যতম একটি রোগ। অন্তরের রোগসমূহ দু'প্রকার।

(১) শুবুহাত বা সন্দেহের রোগ। এখান থেকেই দীনের মধ্যে বিদআত, নিফাকী, শির্ক এবং দীনের বিভিন্ন বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে অন্তরের মধ্যে সন্দেহ উদিত হয়।

(২) শাহওয়াত বা নফসের খাহেশাত, প্রবৃত্তি এবং কামোত্তজনা বিষয়ক রোগ। এর কারণেই মানুষের মনে অবৈধ যৌনাচার ও বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত নারী ভোগ করার কামনাসহ আরো অনেক পাপাচারের জন্ম নেয়। কুরআনুল কারীমে এ উভয় প্রকার রোগের কথাই আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

"তোমরা নরম স্বরে কথা বলো না। এতে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, সে প্রলুব্ধ হতে পারে। আর তোমরা সদালাপ করো (স্বাভাবিকভাবে কথা বলো)"। *(সূরা আহযাব: ৩২)*

এখান থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পর্দা সংক্রান্ত বিধানের সূচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এখানে জৈবিক চাহিদা পুরণ সংক্রান্ত রোগের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শুবুহাত বা সন্দেহের রোগ সম্পর্কে বলেন,

﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

"তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। *(সূরা আল-বাকারা: ১০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

তবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদের পূর্ব অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে। *(সূরা আত-তাওবা: ১২৫)*

এ আয়াত দু'টিতে অন্তরের সন্দেহের রোগের কথা বলা হয়েছে। এটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট রোগ। অন্তরের মধ্যে শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির যে রোগ সৃষ্টি হয়, শাহাওয়াত ও কামোত্তেজনার চাহিদা পুরণ করার মাধ্যমে সে রোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সন্দেহের রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। যদি না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে সন্দেহের রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন।

আর আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে যে সন্দেহের রোগে নিপতিত হয়, তা কেবল তার সুউচ্চ গুণাবলী নাকোচ করা কিংবা সেগুলোকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে আলেমদের মতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলোকে অস্বীকার বা নাকোচ করার সন্দেহ তাকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা করার চেয়ে নিকৃষ্টতর। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীকে নফী করার মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত শরী'আতকে মিথ্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু আল্লাহর ছিফাতগুলোকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি হয়।

আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুফুরী

আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুফুরী। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, **[الشُّورَى: ١١]** **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}** "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই *(সূরা আশ-শূরা:১১)*। ঐদিকে আল্লাহর ছিফাতসমূহকে অস্বীকার করাও কুফুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** "তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা আশ-শূরা:১১)*।

আসলে আল্লাহর ছিফাতসমূহকে নাকোচ করা তাশবীহর দু'টি প্রকারের মধ্যে এটিই হলো মূল। কেননা তাশবীহ দুই প্রকার।

(১) স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা।

(২) সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্য করা। প্রথম প্রকার সাদৃশ্য বা তাশবীহকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে কালামপন্থীরা প্রচুর পরিশ্রম করে থাকে।

তবে প্রথম প্রকারের লোক মানব সমাজে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের চেয়ে খুব কম পাওয়া যায়। যারা শায়েখ-মাশায়েখ, উযাইর, ঈসা, সূর্য, চন্দ্র, ফেরেশতা, আগুন, পানি, বাছুর, কবর, জিন এবং অনুরূপ অন্যান্য সৃষ্টির ইবাদত করে, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের কাছেই আল্লাহ তা'আলা রসূল পাঠিয়েছেন। রসূলগণ তাদেরকে এগুলোর ইবাদত বর্জন করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

(৪১) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ

আমাদের মহান রব একক ও নজীর বিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তার গুণে ভূষিত নয়।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখ ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ এখানে এমন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, যা তার ছিফাত হিসাবে স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে অনেক জিনিস থেকে পবিত্র করেছেন এবং তার পবিত্র সত্তার জন্য অনেক সুউচ্চ বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। শাইখ এখানে আল্লাহর ছিফাতের ব্যাপারে যে বাক্যটি উল্লেখ করেছেন, তা সূরা আল-ইখলাছের মর্মার্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: ١, ٢]

"বল, আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। *(সূরা আল-ইখলাছ:১-২)।* এটি নেয়া হয়েছে, **قل هو الله أحد** থেকে।

'তিনি নজীরবিহীন গুণে গুণান্বিত। এটি নেয়া হয়েছে, ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ "আল্লাহ অমুখাপেক্ষী[২০৬] থেকে। তার কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন" *(সূরা ইখলাছ:২-৩)।*

মাখলুকের মধ্যে কেউ তার গুণে ভূষিত নয়। এটি নেয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"তার সমতুল্য কেউ নেই" *(সূরা আল-ইখলাছ:৪)* থেকে। সেই সঙ্গে এ শেষোক্ত বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত ছিফাতগুলোর তাগিদ স্বরূপ এবং তার পবিত্র সত্তা ও ছিফাতের সদৃশ না থাকার দাবিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আর الوصف এবং النعت শব্দদ্বয় পরস্পর সমার্থবোধক। কেউ কেউ বলেছেন, উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে সামান্য পার্থক্য

২০৬. আল্লাহ তাআলা কারোর উপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তার উপর নির্ভরশীল।

রয়েছে। তারা বলেছেন, আল্লাহর সত্তার জন্য রয়েছে ছিফাত আর তার কর্মের জন্য হয় نعت বা প্রশংসা।

এমনি الوجدانية এবং الفردانية শব্দদ্বয়ও সমার্থবোধক। কেউ কেউ বলেছেন, উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেছেন আল্লাহ তা'আলার যাতের জন্য ব্যবহৃত হয় الوحدانية এবং তার ছিফাতের জন্য হয় الفردانية।

মোট কথা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তায় একক এবং তার ছিফাতে অদ্বিতীয়। এ অর্থটি সঠিক। এতে আলেমদের কোনো মতভেদ নেই। তবে শব্দের মধ্যে শুধু এক প্রকার পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ইমাম ত্বহাবী এভাবে একই অর্থে একাধিক শব্দের পুনঃব্যবহার করেছেন। তবে কথা হলো আক্বীদাহ সংক্রান্ত কিতাবাদির তুলনায় ভাষণ-বক্তৃতা ও দুআর মধ্যে এ জাতিয় শব্দ উল্লেখ করা অধিক শোভনীয়। কেননা খুতবা ও ভাষণের মধ্যে ছন্দময় বাক্য উল্লেখ করা খুবই উপকারী।

স্রষ্টার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাত থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ "মাখলুকের মধ্যে কেউ তার গুণে ভূষিত নয়" এ কথা বলার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই" *(সূরা শূরা:১১)* বলাই অধিক পরিপূর্ণ।

(৪২) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

আর আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি,[২০৭] অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ-সরঞ্জাম, উপাদান-উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়ার অনেক উর্ধ্বে এবং সকল সৃষ্ট বস্তুকে যেমন ছয়টি দিক পরিবেষ্টন করে রাখে, দিকসমূহ তাকে সেভাবে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

---

২০৭. আর আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ-সরঞ্জাম, উপাদান-উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়ার অনেক উর্ধ্বে। সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয়টি দিক তাকে পরিবেষ্টন করে রাখতে পারে না" এ কথাটিতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যাকারী ও বিকৃতিকারীদের কেউ সে অস্পষ্টতার সুযোগ নিতে পারে। অথচ গ্রন্থকারের এ কথার মধ্যে তাদের মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কারণ উক্ত কথা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। তবে তিনি একটি অস্পষ্ট বাক্য নিয়ে এসেছেন যা স্পষ্ট করার প্রয়োজন; যাতে করে সন্দেহ-সংশয় দূরিভূত হয়। এখানে গ্রন্থকার সীমা বলে বুঝিয়েছেন সেই সীমা যা মানুষ জানে। কারণ মহান আল্লাহর সীমা-পরিসীমা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। যেমন তিনি সূরা ত্বহায় বলেন, ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ "তিনি তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে সবই জানেন আর তারা তাকে জ্ঞানে আয়ত্ব করতে পারে না"। (সূরা তোহা: ১১০)

সালাফে সালেহীন তথা পূণ্যবান পূর্বসূরীগণের মধ্যে যারা আরশের উপর আরোহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত সীমা বর্ণনা করেছেন, সেখানে সীমা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সীমা-পরিসীমার কথা যা আল্লাহ তা'আলা জানেন, বান্দার জানা কোনো সীমা নয়। গ্রন্থকারের অন্য কথা, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত, এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলাকে তার প্রজ্ঞা ও সত্তার সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলী, যেমন চেহারা, হাত, পা ইত্যাদিতে সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা থেকে পবিত্র করা। তবে মহান আল্লাহ তা'আলা চেহারা, হাত, পা ইত্যাদি গুণাগুণে গুণান্বিত, যদিও তার কোনো গুণ সৃষ্টিকুলের গুণের মত নয়; আর আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ তার এ গুণের ধরণ সম্পর্কে অবহিত নয়। বিদ'আতীরা এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে থাকে যাতে করে এর দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করতে পারে। আর সে উদ্দেশ্যে তারা এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেননি এবং নিজের জন্য সাব্যস্ত করেননি; যাতে করে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে না পড়ে এবং হকপন্থীরা তাদের উপর দোষ না দিতে পারে। গ্রন্থকার অবশ্য বিদ'আতীদের মত উদ্দেশ্য নেননি। কারণ তিনি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্তকারী। এ আক্বীদায় তার কথা-বার্তার একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা করে, একাংশ অপর অংশের সত্যায়ণ করে এবং সন্দেহযুক্ত অংশকে সন্দেহমুক্ত অংশে ব্যাখ্যা করে। অনুরূপভাবে গ্রন্থকারের কথা অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না, -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টিগত ছয়টি দিক। এর দ্বারা মহান আল্লাহর উচ্চে থাকা ও আরশের উপর তাঁর আরোহন করার বিষয়টি অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এটি সৃষ্ট ছয় দিকের অভ্যন্তরে নয়। কারণ তিনি সৃষ্টিজগতের উপরে এবং সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করে আছেন। মহান আল্লাহ সুউচ্চে থাকার বিষয়টির উপর ঈমান থাকা তিনি তাঁর বান্দাদের ফিতরাত তথা অন্তরে স্বাভাবিকভাবে গেঁথে দিয়েছেন। তাদের স্বাভাবিক অন্তরের কথা হচ্ছে যে, তিনি উপরের দিকে। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবী এবং সুন্দরভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈগণও এর উপর একমত হয়েছেন। কুরআনে কারীম ও ছ্বহীহ মুতাওয়াতির সুন্নাহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি উপরে রয়েছেন। হে প্রিয় পাঠক এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে সাবধান থাকুন এবং জেনে রাখুন যে এটাই সত্য, এটা ব্যতীত অন্য কিছু বাতিল। আর আল্লাহই তাওফীক দেওয়ার মালিক।

.....

ব্যাখ্যা: ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে অপূর্ণতার গুণাবলী নাকোচ করতে গিয়ে ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ এখানে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার আগে আমি একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা পেশ করতে চাই। তা হলো, আল্লাহ তা'আলার শানে এ শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে লোকেরা তিন দলে বিভক্ত হয়েছে।

(১) একদল লোক আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এসব শব্দ ব্যবহার করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

(২) অন্য একটি দল এগুলো সাব্যস্ত করেছে এবং

(৩) আরেকটি দল এসব শব্দের ব্যাখ্যা করেছে। আর এ শেষোক্ত দলটিই হলো সালাফদের অনুসারী। তারা এগুলোর অর্থ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত নাকোচ করে না এবং এগুলো সাব্যস্তও করে না। এগুলোর মাধ্যমে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে, তারা তা কুরআন-সুন্নাহর শব্দের মাধ্যমে সাব্যস্ত করে থাকেন এবং যা নাকোচ করা হয়েছে, তা কুরআন-সুন্নাহর শব্দ দ্বারা নাকোচ করে থাকেন। কেননা পরবর্তীকালের আলেমদের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সুমহান গুণাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এ শব্দগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন অস্পষ্টতা রয়েছে তাদের অন্যান্য পরিভাষার শব্দসমূহে। তাদের প্রত্যেকেই এ শব্দগুলো আভিধানিক দিক থেকে একই অর্থে ব্যবহার করেননি। তাই তারা এ শব্দগুলো নাকোচ করার মাধ্যমে হক ও বাতিল উভয়কেই অস্বীকার করে থাকে এবং যারা এগুলোকে সাব্যস্ত করে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বর্ণনা করে থাকে, যা তারা বলে না। তবে সাব্যস্তকারীদের কেউ কেউ এ শব্দগুলোর ছত্র ছায়ায় আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলীর মধ্যে বাতিল অর্থও প্রবেশ করিয়ে দেয়। অথচ এ অর্থগুলো সালাফদের কথা এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী। এ শব্দগুলো নাকোচ করে কিংবা সাব্যস্ত করে কুরআন ও সুন্নাহয় কোনো দলীল আসেনি। ঐদিকে আমাদের জন্য বৈধ নয় যে, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে এমন বিশেষণে বিশেষিত করবো, যা দ্বারা তিনি নিজের সত্তাকে বিশেষিত করেননি এবং তার রসূলও তাকে তা দ্বারা বিশেষিত করেননি। এমনি আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে কোনো কিছু নাকোচ করার ক্ষেত্রেও একই নীতি অবলম্বন করবো। অর্থাৎ আমরা তার পবিত্র সত্তা থেকে এমন কিছু নাকোচ করবো না, যা তিনি তার পবিত্র সত্তা থেকে নাকোচ করেননি কিংবা তার রসূলও তার পবিত্র সত্তা থেকে তা নাকোচ করেননি। বরং আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের অনুসরণ করবো, বিদ'আত করবো না।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রসূল যা সাব্যস্ত করেছেন, আমরা কেবল তাই সাব্যস্ত করি। আর আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র সত্তা থেকে অপূর্ণতার যেসব বিশেষণ নাকোচ করেছেন

এবং তার রসূল যা নাকোচ করেছেন, আমরা কেবল তাই নাকোচ করি। আর যেসব শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিংবা যেসব শব্দের মাধ্যমে তার থেকে অপূর্ণতার বিশেষণ নাকোচ করা হয়েছে, আমরা কেবল সেই শব্দগুলোই ব্যবহার করি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল যেসব শব্দ ও অর্থ সাব্যস্ত করেছেন, আমরা তাই সাব্যস্ত করি। আর কালাম শাস্ত্রবিদগণ আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে যেসব অভিনব শব্দ ব্যবহার করেছেন তা নাকোচ কিংবা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আমরা তাড়াহুড়া করি না। বরং আমরা উক্ত শব্দগুলোর প্রবক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। তার কথার মধ্যে যদি সঠিক অর্থ বিদ্যমান থাকে, তাহলে আমরা সেই সঠিক অর্থকে সমর্থন করি। তবে সেই সঠিক অর্থ কুরআন-হাদীছের যে শব্দের মাধ্যমে এসেছে, আমরা সেই শব্দের মাধ্যমে তা প্রকাশ করি। তবে বিনা প্রয়োজনে আমরা এ বিষয়ে মানুষের তৈরী শব্দ ব্যবহার করি না। আর আমরা কেবল এ শব্দগুলো তখনই ব্যবহার করি, যখন তা থেকে এ সঠিক অর্থটি সুস্পষ্ট হওয়ার কোনো আলামত পাওয়া যাবে। শব্দগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন কেবল তখনই হতে পারে, যখন উপরোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা ব্যতীত সম্বোধিত ব্যক্তিকে বুঝানো সম্ভব হয় না। অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনেও আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করা জায়েয আছে।

আসলে ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ তার বক্তব্যের মাধ্যমে দাউদ আল জাওয়ারেবী এবং অন্যান্য মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। তারা বলে থাকে আল্লাহর শরীর আছে, দেহ আছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য জিনিসও আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে। শাইখ এখানে যে অর্থ নাকচ করতে চেয়েছেন, তা নাকচ করা ঠিক আছে। কিন্তু শাইখের পরে যারা আগমন করেছেন তারা তার সাধারণ নাকচ করার মধ্যে হক ও বাতিল উভয়ই ঢুকিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী।

সালাফগণের ঐকমত্যে কোনো মানুষের পক্ষেই আল্লাহ তা'আলার সীমা, ধরণ-কায়া-আকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাতেরও কোনো সীমা ও ধরণ নির্ধারণ করেন না। ইমাম আবু দাউদ আত্-তায়ালেসী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুফিয়ান, শু'বা, হাম্মাদ বিন যায়েদ, হাম্মাদ বিন সালামা, শুরাইক এবং আবু আওয়ানা রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার কাইফিয়্যাত-সীমা বর্ণনা করতেন না, আল্লাহ তা'আলার সদৃশ বর্ণনা করতেন না এবং তার পবিত্র সত্তার উপমাও পেশ করতেন না। তারা আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতের হাদীছগুলো বর্ণনা করতেন। কিন্তু তারা كيف তথা কিভাবে শব্দটি উচ্চারণ করতেন না। এ ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তারা হাদীছ ও ছাহাবীদের উক্তি পেশ করতেন। শাইখের উক্তি, قد أعجز خلقه عن الإحاطة به "তার সৃষ্টি তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে অক্ষম" -এ কথার ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

সুতরাং ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ এর কথা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে সীমায়িত করা অসম্ভব এবং তার প্রকৃত অবস্থা ও স্বরূপ বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ছিফাত তার সৃষ্টির ছিফাতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তিনি সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তার সৃষ্টিও তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[২০৮]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহকে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আমাদের প্রভুকে কিভাবে চিনতে পারবো? জবাবে তিনি বললেন, আমাদের প্রভু আরশের উপরে এবং তিনি তার সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাকে বলা হলো, তার কোনো সীমা বা ধরণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কথা এখানেই শেষ।

আর এটি জানা কথা যে, এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসকে যা দ্বারা আলাদা করা হয় এবং যেসব গুণাবলী দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা হয়, তাকে সীমা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার কোনো সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করেন না এবং কোনো সৃষ্টির সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন; বরং তিনি অবিনশ্বর, চিরন্তন, নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুকে প্রতিষ্ঠাকারী। সুতরাং যখন الحد বা সীমার এ অর্থ জানা গেল, তখন এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ করা মোটেই বৈধ হবে না। সুতরাং আল্লাহর হদ্দ বা কাইফিয়্যাত নেই, এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ নেই এবং তার কোনো হাকীকতও নেই। (নাউযুবিল্লাহ) বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সীমা বা ধরন-কায়া-আকৃতি আছে; কিন্তু আমাদের তা জানা নেই। বান্দারা এ ব্যাপারে কথা বলতে অক্ষম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে আল্লাহ তা'আলার কায়া-আকৃতি-হাকীকত ও ধরন কোনো সৃষ্টির জানা নেই।

আবুল কাসেম আল-কুসাইরী রহিমাহুল্লাহ তার পুস্তিকায় বলেন, আমি আবু আব্দুর রাহমান আস-সুলামীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মানসুর বিন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান আল-আনবারীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি সাহল বিন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তাকে যখন আল্লাহর যাত বা সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, জবাবে তিনি বলেছেন আল্লাহ তা'আলার সত্তা পূর্ণতার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত, জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো সৃষ্টির পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব, দুনিয়াতে কপালের চোখ দিয়ে তাকে কেউ দেখেনি। কেনো সৃষ্টি তার ধরণ, আকৃতি-কায়া, সীমা সম্পর্কে জানতে পারেনি। কোনো সৃষ্টির পক্ষে তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয় এবং তিনি কোনো সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেন না। আখিরাতে মানুষ চোখ দিয়ে তাকে দেখবে। তিনি স্বীয় কুদরত ও নির্দশনের মাধ্যমে সৃষ্টির নিকট প্রকাশ্য। সৃষ্টি তার সত্তা ও বিশেষণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিদর্শনের মাধ্যমে তার বান্দাদেরকে তাওহীদের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। সৃষ্টির অন্তরসমূহ তাকে চিনতে পারে; কিন্তু তাদের

---

২০৮. আক্বীদাহর কিতাবসমূহে আলেমগণ বলেছেন, الله تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه "আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত এবং তার সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা"। আল্লাহ তাআলার সত্তা আরশের সাথে লেগে ও মিশে থাকার ধারণাকে নাকোচ করার জন্যই আলেমগণ এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন।

চোখ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। মুমিনগণ জান্নাতে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে; কিন্তু পরিপূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করতে পারবে না এবং তাকে চূড়ান্তভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর কথা, "তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ-সরঞ্জাম, উপাদান-উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়ার বহু উর্ধ্বে" এ শব্দগুলোর ছত্রছায়ায় আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে অবিশ্বাসীরা কুরআন-সুন্নার অকাট্য দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত কতিপয় ছিফাতকে অস্বীকার করে থাকে। যেমন হাত ও চেহারা বা মুখমন্ডল।

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ফিকহুল আকবারে বলেন, আল্লাহ তা'আলার হাত, চেহারা ও নফস্ রয়েছে। কেননা কুরআনে আল্লাহ তা'আলার হাত, চেহারা ও নফস্ থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। হাত আল্লাহর ছিফাত। তবে এর ধরণ আমরা জানি না। হাত বলতে আল্লাহর কুদরত ও নেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে, -এ কথা বলা ঠিক নয়। এতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতকে বাতিল করা হয়। ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহর কথা এখানেই শেষ।

আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ এর এ কথা অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! যাকে আমি নিজের দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে? না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?" *(সূরা ছ্বদ: ৭৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহ্র মর্যাদা ও ক্ষমতা মোতাবেক কদর করেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে"। *(সূরা আয-যুমার: ৬৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّاوَجْهَهُ

"তার চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে"। *(সূরা কাসাস: ৮৮)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হবে। একমাত্র তোমার সেই রবের চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিয়ান ও দয়াবান। *(সূরা আর্ রাহমান: ২৬-২৭)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

"আমার অন্তরে যা আছে তা তুমি জানো। কিন্তু তোমার অন্তরে যা আছে আমি তা জানি না, তুমি তো গায়েবের সমস্ত জ্ঞান রাখো"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতা বশত কোন খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি দয়া করেন"। *(সূরা আল-আনআম: ৫৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ "আমি তোমাকে আমার নফ্সের জন্য তৈরী করে নিয়েছি"। *(সূরা ত্বহা: ৪১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ "আল্লাহ তোমাদেরকে তার নফসের ভয় দেখাচ্ছেন"। *(সূরা আলে-ইমরান: ২৮)*

শাফা'আতের হাদীছে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَمَّا يَأْتِي النَّاسُ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ»

"কিয়ামতের দিন যখন মানুষ আদম আলাইহিস সালামের নিকট এসে বলবে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার ফেরেশতাকে দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন"।[২০৯]

যারা আল্লাহ তা'আলার হাতকে কুদরত দ্বারা তাবীল করে, তাদের কথা সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

২০৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৪৭৬, মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫৬২।

{لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: ٧٥]

"যাকে আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি" *(সূরা ছ্বদ:৭৫)*

এখানে يد শব্দের দ্বি-বচন يدين কে قدرتين (দু'টি কুদরত) দ্বারা তাবীল করা ছ্বহীহ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার কুদরত মাত্র দু'টি নয়। হাত দ্বারা যদি কুদরত উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইবলীসের জন্যও এ কথা বলার সুযোগ থাকতো যে, আমাকেও তো তোমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছো। সুতরাং এ কারণে আমার উপর আদমের কোনো মর্যাদা থাকতে পারে না। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইবলীস কাফের হওয়া সত্তেও তার রব সম্পর্কে জাহমীয়াদের চেয়েও অধিক অবগত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾

"এরা কি দেখে না, আমি নিজের হাতে তৈরী জিনিসের মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং এখন এরা তার মালিক"। *(সূরা ইয়াসীন: ৭১)*

এখানে يد শব্দের বহুবচন أيد ব্যবহার করার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত হাত অস্বীকার করার কোনো দলীল নেই। অর্থাৎ তারা বলে থাকে হাত দ্বারা যদি প্রকৃত হাত উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এখানে হাত বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হতো না। হাত শব্দটি যেহেতু কখনো একবচন, কখনো দ্বি-বচন আবার কখনো বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই বুঝা যাচ্ছে হাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত উদ্দেশ্য।

আমরা তাদের জবাবে বলবো যে, এখানে যেহেতু يد কে বহুবচনের যমীরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তাই আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে يد কেও বহুবচন أيد হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা দ্বি-বচনের শব্দকে যখন বহুবচনের যমীরের দিক ইযাফত করা হয়, তখন আরবী গ্রামারের নিয়ম অনুসারে সেই দ্বি-বচনকে বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করা আবশ্যক। আর এখানে আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব ও সম্মান-মর্যাদা বুঝানোর জন্য শব্দ দু'টিকে বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐদিকে ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ "যাকে আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি" -এর মধ্যে হাতকে বহুবচন ব্যবহার করার মাধ্যমে একবচনের যমীরের দিকে সম্বন্ধ করে أَيْدِيَّ বলেন নি এবং يد কে দ্বি-বচন হিসাবে ব্যবহার করে বহুবচনের যমীরের দিকে সম্বন্ধ يَدَيْنَا বলেননি।

এর কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾

"আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি" এবং

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾

"যাকে আমি নিজের দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি" এ উভয় বাক্যের উদ্দেশ্য এক নয়।

অতঃপর শাইখ আল্লাহ তা'আলার চেহারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার চেহারা সম্পর্কে বলেন,

(حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)

"তার পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি যদি তা উন্মুক্ত করেন, তবে তার চোখের দৃষ্টি যতদূর যাবে, ততোদূর পর্যন্ত সকল মাখলুক তার চেহারার আলোতে জ্বলে যাবে"।[২১০]

তবে আল্লাহ তা'আলার এ ছ্বিফাতগুলো সম্পর্কে বলা যাবে না যে, এগুলো তার কাজ করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা তার কাজ করার হাতিয়ার বা তার রুকন। কেননা কোনো জিনিসের অংশকে তার রুকন বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা একক ও অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলার কোনো অংশ হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অংশ বিশেষ ও খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার অর্থ বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা এসবের অনেক উর্ধ্বে। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾

"যারা নিজেদের কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে"। *(সূরা হিজর: ৯১)*

অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে রয়েছে অর্জন-উপার্জন এবং উপকৃত হওয়ার অর্থ। এমনি যন্ত্রপাতি সাধারণত কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এসব অর্থ আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাতের ক্ষেত্রে এ শব্দগুলো কুরআন-হাদীছে ব্যবহৃত হয়নি। আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাতের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীছে যেসব শব্দমালা ব্যবহার হয়েছে সেগুলোর অর্থই সঠিক এবং বাতিল অর্থের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার ছ্বিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এবং তার পবিত্র সত্তা থেকে অপূর্ণতার বিশেষণ নাকোচ করার ব্যাপারে কখনো কুরআন-হাদীছের বাইরে যাওয়া যাবে না। এতেই বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করা থেকে বাঁচা যাবে এবং সঠিক অর্থ নাকোচ হওয়া থেকেও নিরাপদ থাকা যাবে। উপরে যেসব সংক্ষিপ্ত শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলোর মধ্যেই হক ও বাতিল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

২১০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

যারা আল্লাহ তা'আলা থেকে দিক নাকোচ করার মাধ্যমে সৃষ্টির উপর তার সমুন্নত হওয়া নাকোচ করতে চায়, তাদের জবাব

আর الجهة (দিক) শব্দটি দ্বারা কখনো অস্তিত্বশীল জিনিস বুঝায়। আবার কখনো তা দ্বারা অস্তিত্বহীন জিনিস বুঝানো হয়। বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত যে, অস্তিত্বশীল জিনিস মাত্র দু'টি। স্রষ্টা ও সৃষ্টি। 'দিক' বলতে যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্বশীল জিনিস বুঝায়, তাহলে তা মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো সৃষ্টির পক্ষেই আল্লাহ তা'আলাকে সীমায়িত করা সম্ভব নয়। কোনো সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তা'আলা এরূপ চিন্তার বহু উর্ধ্বে। কিয়ামতের দিন যে মহান সত্তা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলে রাখবেন, কোনো সৃষ্টির পক্ষে তাকে সীমায়িত ও সীমাবদ্ধ করার ধারণা যাদের মাথায় আসে, তারা আল্লাহর যথাযথ বড়ত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি।

আর যদি তা দ্বারা কোনো অস্তিত্বহীন বিষয় বুঝায়, তাহলে তা হবে সৃষ্টিজগতের সম্পূর্ণ বাইরে। অর্থাৎ 'দিক' নামে কোনো সৃষ্টির অস্তিত্বই নেই। সুতরাং যখন বলা হবে, আল্লাহ উপরের দিকে রয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সম্পূর্ণ বাইরে তাহলে ঠিক আছে। এর অর্থ হলো তিনি সৃষ্টি জগতের সম্পূর্ণ বাইরে ও সম্পূর্ণ উপরে। সৃষ্টিজগতের বাইরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রয়েছেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টিজগতের সম্পূর্ণ বাইরে এবং সকল সৃষ্টির উপরে সমুন্নত।

আর যারা আল্লাহ তা'আলার শানে الجهة 'দিক' শব্দটি ব্যবহার করে সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে নাকোচ করতে চায়, তারা তাদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করে যে, সকল দিকই সৃষ্টি। আর আল্লাহ তা'আলা 'দিক' সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই আছেন। তারা আরো বলে, যারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা কোনো দিকে রয়েছেন, তাদের কথা থেকে সৃষ্টির কোনো কোনো জিনিস চিরন্তন ও অবিনশ্বর হওয়া আবশ্যক হয়। এতে আরো আবশ্যক হয় যে, প্রথমে তিনি দিকের প্রতি অমুখাপেক্ষী ছিলেন। পরে দিকের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। নাউযুবিল্লাহ।

আসল কথা হলো ইমাম ত্বহাবী উপরোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সৃষ্টির ভিতরে নন। সেটিকে 'দিক' হিসাবে নাম দেয়া হোক বা না হোক। এটিই সঠিক। সঠিক কথা হলো 'দিক' কোনো স্বনির্ভর অস্তিত্বশীল সৃষ্টি নয়। অন্যের প্রতি সম্বন্ধ করা ব্যতীত এটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। নিঃসন্দেহে দিকের কোনো শেষ বা প্রান্তসীমা নেই। সীমাহীন কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব নেই। সুতরাং অসীমকে সসীম জিনিসের দ্বারা সীমায়িত করার ধারণা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেই 'দিক' সাব্যস্ত করি, তা কোনো সৃষ্টি নয়। তাহলো সৃষ্টির উপরের 'দিক'। কিন্তু কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে 'দিক' শব্দটি আসে নেই। এটি আল্লাহ

তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি। নাকোচও করা হয়নি। তাই আমরা এ থেকে দূরে থাকাই উচিত মনে করি।

তবে কেউ যদি বলে, আল্লাহর কোনো 'দিক' ও সীমা নেই, তাকে আমরা বলবো, এ কথার মাধ্যমে আপনার উদ্দেশ্য কী? সে যদি বলে, আমার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলাকে কোনো কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না, তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, সবচেয়ে বড় এবং সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী, তাহলে আমরা তাকে বলবো, তোমার উদ্দেশ্য সঠিক। তবে যারা সৃষ্টির উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে, তারাই বলে আল্লাহ তা'আলার কোনো 'দিক' ও সীমা নেই।[২১১] তারা বলে ليس لله جهة "অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কোনো 'দিক' নেই। তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে নয়। তাই আল্লাহ তা'আলার শানে এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেসব শব্দ হক ও বাতিলের সম্ভাবনা রাখে তা ব্যবহার না করে শরীয়ত সম্মত শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ "সকল সৃষ্ট বস্তুকে যেমন ছয়টি দিক পরিবেষ্টন করে রাখে, দিকসমূহ সেভাবে তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না"। ইমামের এ কথা সঠিক। এ দৃষ্টিকোন থেকে কথাটি সঠিক যে, সৃষ্টিজগতের কিছুই তাকে পরিবেষ্টন করে রাখতে পারে না। বরং তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং রয়েছেন সবকিছুর উপরে। শাইখ এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা এ বিষয়ে শাইখের উক্তি: أَنَّهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ "তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন" এবং তিনি রয়েছেন সবকিছুর উপরে, শাইখের এ কথা সামনে আসছে।

শাইখের কথা: **সকল সৃষ্ট বস্তুকে যেমন ছয়টি দিক পরিবেষ্টন করে রাখে, দিকসমূহ তাকে সেভাবে পরিবেষ্টন করে রাখতে পারে না এবং "তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন"** এ দুই কথাকে যখন একত্র করা হবে, তখন বুঝা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলাকে সীমায়িত করা এবং পরিবেষ্টন করা কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন পরিবেষ্টন ও সীমায়িত করা সম্ভব হয় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী, তিনিই সবকিছুর উপরে সমুন্নত।

শাইখের বক্তব্যের মধ্যে দু'টি বিষয় বাকী রয়ে গেছে। প্রথম বিষয়টি হলো এ জাতিয় শব্দের মধ্যে যেহেতু অস্পষ্টতা এবং বাতিল অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ জাতিয় শব্দ পরিহার করাই উত্তম ছিল। এ ধরণের শব্দ পরিহার না করার কারণে শাইখের কথা থেকে

---

২১১. মোটকথা আল্লাহ তা'আলা থেকে جهة (দিক) নাকোচ করা দ্বারা যদি এটি উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি আমাদের ডানে নন, বামে নন, নীচে নন, সামনে নন, পিছনে নন, পূর্বে নন, পশ্চিমে নন এবং উত্তরে কিংবা দক্ষিনে নন, তাহলে এই নাকোচ করা ঠিক আছে। কিন্তু দিক নাকোচ করা দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি সৃষ্টির উপর নন, তাহলে এ কথা বাতিল। কেননা কুরআন, সুন্নাহ, সালাফদের ইজমা, মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির উপরে।

ভুল বুঝার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং তিনি যে সবকিছুর উপরে, -তার কথা থেকে এটি সাব্যস্ত করার সাথে সাথে তিনি উপরের দিকে থাকার বিষয়টি নাকোচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে গেছে। যদিও এ সন্দেহের জবাবে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে কোনো সৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে, -ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ তার কথার মাধ্যমে কেবল এ ধারণাকে নাকোচ করেছেন। উপরের দিক নাকোচ করেননি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত শব্দগুলো ব্যবহার করাই উত্তম।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, তার কথা: كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ "সকল সৃষ্ট বস্তুকে যেমন ছয়টি দিক পরিবেষ্টন করে রাখে, দিকসমূহ সেভাবে তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না"। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক সৃষ্টিই অন্য সৃষ্টি দ্বারা বেষ্টিত!! শাইখের এ কথার মধ্যে আপত্তি রয়েছে। শাইখ যদি উদ্দেশ্য করে থাকেন যে, প্রত্যেক সৃষ্টি অন্য একটি অস্তিত্বশীল সৃষ্টি দ্বারা আবদ্ধ তাহলে এ কথা ঠিক নয়। কেননা গোটা সৃষ্টি জগৎ আরেকটি সৃষ্টিজগতের ভিতরে আবদ্ধ নয়। এমনটি হলে তাসালসুল তথা প্রারম্ভ ও অন্তহীন সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা আবশ্যক হয়। অথচ এটি অসম্ভব।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, প্রত্যেক সৃষ্টি অন্য একটি অস্তিত্বহীন বিষয়ের ভিতরে আবদ্ধ, তাহলে এ কথাও ঠিক নয়। কেননা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুই অস্তিত্বহীন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বরং সৃষ্টির কিছু কিছু জিনিস অন্য সৃষ্টির দ্বারা আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত। যেমন আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যস্ত সৃষ্টিসমূহ আল্লাহ তা'আলার কুরসী দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর কিছু কিছু সৃষ্টি আছে যা রয়েছে সৃষ্টিসমূহের শেষ প্রান্তে। তার পরে আর কোনো সৃষ্টি নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলার আরশ। আরশের পরে ও উপরে আর কোনো সৃষ্টি নেই। আরশের পরে শুধু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কিছুই নেই।[২১২]

সুতরাং আরশের ছাদ অন্য কোনো সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আবদ্ধ নয়। প্রারম্ভ ও অন্তহীন সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার ধারণাকে কেটে দেয়ার জন্য এ বিশ্বাস করা আবশ্যক। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

উপরোক্ত আপত্তির জবাব এভাবেও দেয়া যেতে পারে যে, এখানে سائر (সকল) শব্দটি بقية (অবশিষ্ট) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। جميع সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং سائر এর মূল অর্থ হলো অবশিষ্ট। এখান থেকেই السؤر শব্দটি এসেছে। পানকারী পান করার পাত্রে যা রেখে দেয়, তাকে السؤر বলা হয়। সুতরাং শাইখের উদ্দেশ্য মোতাবেক سائر المبتدعات অর্থ

২১২. আরশের উপর রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এ থেকে এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর মিশে আছেন কিংবা লেগে আছেন অথবা আরশের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী হিসাবে এর উপর সমুন্নত হয়েছে। তিনি এমন ধারণার বহু উর্ধ্বে। সৃষ্টির কোনো কিছুর প্রতিই তার কোনো প্রয়োজন নেই।

হলো অধিকাংশ সৃষ্টি; সকল সৃষ্টি নয়। তাই আমরা বলতে পারি سائر শব্দটির অর্থ সকল হওয়ার চেয়ে অধিকাংশ হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট।

সুতরাং সব মিলিয়ে শাইখের কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু দ্বারাই পরিবেষ্টিত নন। যেমন অধিকাংশ মাখলুকই অন্য আরেকটি মাখলুক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। বরং তিনি কোনো কিছু দ্বারাই পরিবেষ্টিত নন। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ধারণার বহু উর্ধ্বে। আমরা মনে করি না যে, ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা বলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরে নয়; বাইরেও নয়। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরে কিংবা বাইরে, -এর কোনো একটি নির্দিষ্ট করাকে তারা নাকোচ করে থাকে। কতক ব্যাখ্যাকার ধারণা করে থাকে যে, ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরে নন; বাইরেও নন। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়; বরং শাইখের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা কোনো সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার বহু উর্ধ্বে। এমনি তিনি কোনো সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ারও বহু উর্ধ্বে। তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তার উপর সমুন্নত হননি। এমনি তিনি অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতিও মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরে নন; বাইরেও নন, - ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ থেকে এ কথা বিশুদ্ধে সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কেননা তার প্রতিপক্ষগণ এর চেয়ে ছোট-খাটো বিষয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন। তার থেকে যদি প্রতি পক্ষগণ এ কথা শুনতেন, তাহলে তারা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করতেন এবং সেই প্রতিবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। আবু মুতী আল-বলখী ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য উলু বা উপর সাব্যস্ত করতেন। অচিরেই ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহর প্রকাশ্য বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি তা বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরেও নন, বাহিরেও নন, এ কথা তিনি বলেননি। আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতেও এ কথা আসেনি। এ জন্যই আমি বলছি, ইমামের পক্ষ হতে এ কথা বর্ণিত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ আছে। উত্তম হলো এ জাতীয় কথা পরিহার করে চলা। কেননা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এ ধরণের কথা খুবই ক্ষতিকর। শরীয়াতে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার মাধ্যমে কথা বলাই উত্তম। যেমন আল্লাহ আরশের উপরে আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া ও দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে।

যেসব মূর্খ লোক মনে করে, আল্লাহ তা'আলা যখন দুনিয়ার আসমানে নামেন তখন আরশ তার উপরে থাকে এবং তিনি দু'টি সৃষ্টির মাঝখানে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাদের কথা আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফদের ইজমার পরিপন্থী। আমরা যেখানে বিশ্বাস করেছি الله أكبر অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড়, তখন এ ধারণা কিভাবে হতে পারে যে, যদি বলা হয় আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে, তাহলে তাকে সৃষ্টির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হলো

এবং যদি বলা হয়, আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নামে, তাহলে বাকী আসমানগুলো তার উপরে থাকে এবং তিনি নীচে চলে যান? আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার শানে এ জাতিয় কিয়াস ও যুক্তি অচল-বাতিল। সেই সঙ্গে বেআদবীও বটে।[২১৩]

আপনার মানিব্যাগের মধ্যে টাকা ঢুকে, মানি ব্যাগ পকেটে ঢুকে। কারণ টাকা মানিব্যাগের চেয়ে ছোট, মানিব্যাগ পকেটের চেয়ে ছোট। কিন্তু মানিব্যাগ টাকার মধ্যে এবং পকেট মানিব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করে না। কারণ মানিব্যাগ টাকার চেয়ে বড় এবং পকেট মানিব্যাগের চেয়ে বড়। আপনি গাড়িতে আরোহন করেন, কারণ গাড়ি আপনার চেয়ে বড়। তাই আপনার উপর গাড়ি আরোহন করা এবং টাকার মধ্যে পকেট প্রবেশ করা অসম্ভব।

আপনাকে ঘিরে আছে ছয়টি দিক ও অন্যান্য সৃষ্টি। অন্যান্য সৃষ্টিকে ঘিরে আছে বাকীসব সৃষ্টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক সৃষ্টিকে ঘিরে আছে অন্য সৃষ্টি। আসমান-যমীন এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সকল সৃষ্টিকে ঘিরে আছে কুরসী। আর কুরসীকে ঘিরে আছে আল্লাহ তা'আলার সর্ববৃহৎ সৃষ্টি আরশ। আরশ পর্যন্ত গিয়ে এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টি দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার ধারাবাহিকতা শেষ। আরশকে কোনো কিছুই ঘিরে রাখতে পারে না। কারণ আরশ সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। যেমন আপনি গাড়িতে ঢুকতে পারেন, কিন্তু গাড়ি আপনার মধ্যে ঢুকতে পারে না। কারণ গাড়ি আপনার চেয়ে অনেক বড়, পকেটে টাকা ঢুকে, কিন্তু টাকার মধ্যে পকেট ঢুকতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহ যেহেতু সবচেয়ে বড়, তাই তিনি আসমানে ঢুকেন কিভাবে? আরশে ঢুকেন কিভাবে? ছয়টি দিক তাকে পরিবেষ্টন করে কিভাবে? তিনি সর্বত্র বিরাজমান হন কিভাবে? মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ হয় কিভাবে? তবে আল্লাহ আরশের উপরে, এ বিশ্বাস ঠিক রেখে যদি বলা হয় মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও মর্যাদা আছে,

---

২১৩. কোনো শিশু যদি জন্মের পরেই জেল খানায় থেকে বড় হয় কিংবা জেলখানায় জন্মলাভ করে, সে তাতে হয়তবা পীপড়া, তেলাপোকা ও ঈদুরের চেয়ে বড় আর কোনো প্রাণী ও জীব-জন্তু দেখবেনা। বন্দীশালা থেকে বের হয়ে সে যখন তার পিতার কাছে হাতী, উট বা ঘোড়ার কথা শুনবে, সে তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করবে, হে আমার পিতা! হাতী ঈদুরের চেয়ে বড় না কি পীপড়ার মতই? এমনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান সীমিত ও জেলখানায় বন্দী। যখন আমরা বলি, ينزل ربنا إلَى السماء الدنيا "আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে নামেন" তখন বিদ'আতীরা প্রশ্ন করেন তাহলে কি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমান ও তার উপরের আসমানের মাঝখানে হয়ে যান না কি? এরপর আরেকটি প্রশ্ন তারা খুব দ্রুত করে ফেলে, তাহলে কি আরশ খালি হয়ে যায় না কি? এই প্রশ্নগুলো যারা করে তাদের জ্ঞান একদম সামান্য ও দুর্বল।

ঈমান ও গায়েবী বিষয়গুলোতে মুমিনদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ বৈশিষ্ট হলো, ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ "তারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে"। সুতরাং আমরা গায়েবে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তাতে তিনি সত্যবাদী এবং রসূল যা বলেছেন, তাতেও তিনি সত্যবাদী। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি গায়েবী বিষয়গুলো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে অক্ষম ও দুর্বল। বিবেক-বুদ্ধির উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ এবং তার রসূল যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করা। গায়েবী বিষয়গুলোর হাকীকত ও ধরণ বুঝতে সক্ষম হোক বা না হোক। মানুষ যখন এগুলো নিয়ে ঝগড়া করবে, বিশ্বাস করতে টালবাহানা করবে এবং এগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা করবে, তখন তারা গায়েবে বিশ্বাসকারী হিসাবে গণ্য হবে না।

তাহলে তাদের কথা ঠিক আছে। তবে এ জাতিয় কথা যেহেতু কুরআন-হাদীছের কথা নয়, তাই তা পরিহার করে চলাই উত্তম।[২১৪]

শাইখুল ইসলাম আবু উছমান ইসমাঈল বিন আব্দুর রাহমান আস্ সাবুনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি উস্তাদ আবু মানসুর বিন হাম্মাদকে বলতে শুনেছি, তিনি নুযলে ইলাহীর হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহকে রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তা'আলার নুযুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, তিনি নামে, তবে এর কোনো ধরণ আমাদের জানা নেই।

কেউ কেউ সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি নাকোচ করা থেকে বিরত রয়েছেন। যেমন বিরত রয়েছেন তা সাব্যস্ত করা থেকে। কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনদের উক্তি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে থাকেন। তারা বলে তিনি সৃষ্টি থেকে পৃথক নন এবং দূরেও নন এবং সৃষ্টিজগতের ভিতরে নন এবং বাইরেও নন। তারা আল্লাহ তা'আলাকে অসম্ভব ও অস্তিত্বহীন বিষয় দ্বারা বিশেষিত করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন, তারা তাকে তা দ্বারা বিশেষিত করে না। ঐদিকে বিদ'আতীদের কেউ কেউ বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করেন অথবা তারা বলে থাকে প্রত্যেক সৃষ্টির অস্তিত্বই তার অস্তিত্ব। এমনি তাদের কেউ কেউ বলে থাকে, الله في كل مكان অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক স্থানেই বিরাজমান। আল্লাহ তা'আলা যালেমদের কথার বহু উর্ধ্বে। আল্লাহর উলু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। এ বিষয়ে শাইখের উক্তি: **أَنَّهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ** "তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন" এবং "তিনি রয়েছেন সবকিছুর উপরে"। ইনশাআল্লাহ শাইখের এ কথার ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

---

২১৪. আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে, তিনি আরশের উপরে সমুন্নত। এটি কুরআনের বহু আয়াত, অনেক ছহীহ হাদীছ, বিবেক-বুদ্ধির দলীল, সৃষ্টিগত ও জন্মগত স্বভাব এবং মুসলিম আলেম-উলামাদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত যে আল্লাহর যাত বা সত্তা আরশের উপর সমুন্নত। শুধু তাই নয়; কুরআন-সুন্নাহর দলীল আসার আগেই সৃষ্টি স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের উপরে। আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের একাধিক লোককে বলতে শুনেছি, মালিক উপরে রয়েছেন, আল্লাহ আছেন উপরে আর আমরা আছি নীচে। জাহেলী কবি আনতারা বিন শাদ্দাদ বলেন, يا عبل أين من المنية مهرب إن كَانَ ربي في السماء قضاها "হে আবলা! আসমানে আমার রব যেখানে আমার মৃত্যু লিখে রেখেছেন, তাই উহা থেকে পালানোর কোনো পথ আছে কি?

সুতরাং আল্লাহর উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত হলো। যারা এটিকে অস্বীকার করলো, তারা কুরআনের দলীলকে অস্বীকার করলো, হাদীছের দলীলকেও অস্বীকার করলো। সেই সঙ্গে তারা জন্মগত ও সৃষ্টিগত দলীলকেও অস্বীকার করলো এবং বোধশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির দলীল ও অস্বীকার করলো।

(৪৩) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

আর মিরাজ সত্য, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা আকসায় ভ্রমণ করানো হয়েছে। অতঃপর তাকে জাগ্রত অবস্থায় স্ব-শরীরে উর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছে। সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো উর্ধ্বে নেয়া হয়েছে। সেখানে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন। তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি। আল্লাহ তার উপর আখিরাতে এবং দুনিয়ার জগতে সালাত (দরুদ) ও সালাম নাযিল করুন।

.....

ব্যাখ্যা: المعراج শব্দটি مفعال এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে উঠার যন্ত্রকে المعراج বলা হয়। এটি সিড়ির মতই। কিন্তু তা কেএ, তা জানা সম্ভব নয়। এর হুকুম অন্যান্য গায়েবী বিষয়ের হুকুম একই রকম। আমরা এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করি। কিন্তু এগুলোর কাইফিয়্যাত জানার চেষ্টা করি না। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় রাতের বেলায় বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছে। আলেমগণ এ ইসরা বা রাতের ভ্রমণ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ইসরা হয়েছিল 'রূহ'এর মাধ্যমে। ঐ রাতে তার শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইবনে ইসহাক আয়েশা ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল স্বপ্নযোগে অথবা শরীর ব্যতীত শুধু 'রূহ'এর মাধ্যমে, -এ দু'কথার মধ্যকার পার্থক্য জানা আবশ্যক। উভয় কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আয়েশা ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ কথা বলেননি যে, ইসরা ও মিরাজ হয়েছিল স্বপ্নযোগে। তারা কেবল বলেছেন, 'রূহ' এর মাধ্যমে মিরাজ হয়েছে। ঐ রাতে তার পবিত্র দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। সুতরাং যারা স্বপ্নযোগে মিরাজ হওয়ার কথা বলেছে তাদের কথার মধ্যে এবং আয়েশা ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) র কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, তা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জানা বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ পেশ হয়। যেমন কেউ দেখল যে, সে আকাশে উড়ছে, মক্কায় যাচ্ছে। অথচ তার রূহ উপরে উঠেনি এবং মক্কা যায়নি। স্বপ্ন সম্রাট কেবল তার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছে। সুতরাং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এটি উদ্দেশ্য করেননি যে, মিরাজ হয়েছিল; বরং তার এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল, মিরাজ হয়েছিল 'রূহ' সহকারে। রূহ প্রথমে দেহ থেকে আলাদা হয়েছিল, অতঃপর দেহের মধ্যে ফিরে এসেছে। আয়েশা ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এটিকে একমাত্র

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্যদের রূহ মৃত্যুর পূর্বে আসমানে পরিপূর্ণরূপে আরোহন করার মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, মিরাজ হয়েছে দু'বার। একবার জাগ্রত অবস্থায় এবং আরেকবার স্বপ্নের মাধ্যমে। এ মতের সমর্থকগণ সম্ভবত শরীকের হাদীছ, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ثم استيقظت "অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম" এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছেন। আবার কেউ কেউ জাগ্রত অবস্থাতেই দু'বার মিরাজ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। একবার নবুওয়াতের পূর্বে আরেকবার নবুওয়াতের পরে।

কেউ কেউ বলেছেন, মিরাজ হয়েছিল তিনবার। নবুওয়াতের পূর্বে একবার এবং নবুওয়াতের পরে দু'বার। এ শ্রেণীর লোকদের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, মিরাজ সম্পর্কিত হাদীছের কোনো শব্দ যখন তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়েছে তারা উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে একটি মিরাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটি হলো দুর্বল মুহাদ্দিছদের কাজ। অন্যথায় মুহাদ্দিছদের ইমামগণের মতে নবুওয়াতের পরে হিজরতের পূর্বে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনে মিরাজ কেবল একবারই হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরতের একবছর দু'মাস আগে মিরাজ হয়েছিল। ইমাম ইবনে আব্দুল বার এ কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ঐসব লোকদের জন্য আশ্চর্যবোধ করি, যারা বহুবার মিরাজ হওয়ার কথা বলে থাকেন। তারা কিভাবে ধারণা করতে পারে যে, প্রত্যেকবারই ৫০ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেকবার মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং তার প্রভুর মাঝে যাতায়াত করার মাধ্যমে ৫ ওয়াক্তে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকবারই তিনি বলেছেন, আমি আমার ফরয ঠিক রাখলাম; কিন্তু আমার বান্দাদের উপর কমিয়ে দিলাম। অতঃপর দ্বিতীয়বার ৫০ ওয়াক্তে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করলেন।

হাদীছের হাফেযগণ বলেন, বর্ণনাকারী শারীক, ইসরা ও মিরাজের হাদীছের বেশ কিছু শব্দে ভুল করেছেন। ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ শারীক থেকে সনদসহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম বলেন, শারীক হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে পরের শব্দ আগে এনেছেন এবং আগের শব্দ পরে উল্লেখ করেছেন ও শব্দ কমবেশী করেছেন। তিনি হাদীছকে পূর্ণরূপে উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি খুব সুন্দর কাজ করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহর কথা এখানেই শেষ।

ইসরা বা রাতের ভ্রমণের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, তাকে রাতের বেলা জাগ্রত অবস্থায় মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। জিবরীলের সঙ্গে

বোরাকের[২১৫] উপর আরোহন করে তিনি বাইতুল মাকদিসে গিয়ে নামলেন। বাইতুল মাকদিসে নেমে তিনি নাবীদের ইমাম হয়ে ছ্বলাত পড়ালেন। এ সময় মসজিদের দরজার হাতলের সাথে বোরাক বেধেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বেতেল হামে অবতরণ করেছেন এবং সেখানে ছ্বলাত পড়েছেন। এ বর্ণনা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত নয়।

অতঃপর সেই রাতে বাইতুল মাকদিস থেকে তাকে প্রথমত দুনিয়ার আসমানে উঠানো হয়েছিল। প্রথম আসমানের দরজায় গিয়ে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দরজা খুলতে বললেন। তাদের জন্য দরজা খোলা হলো। সেখানে তিনি মানব জাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) কে দেখতে পেলেন। তিনি আদম (আলাইহিস সালাম) কে সালাম দিলেন। আদম (আলাইহিস সালাম) তাকে স্বাগত জানালেন এবং সালামের জবাব দিলেন।

অতঃপর তাকে দ্বিতীয় আসমানে উঠানো হলো। এখানে এসে দরজা খুলতে বলা হলো। দ্বিতীয় আসমানে তিনি ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামকে দেখতে পেলেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় সালাম দিলেন। তারা তার সালামের জবাব দিলেন এবং তাকে স্বাগত জানালেন ও তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

অতঃপর তৃতীয় আসমানে উঠে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে দেখতে পেলেন। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং তাকে স্বাগত জানালেন ও তার নবুওয়াতের স্বীকৃত প্রদান করলেন।

অতঃপর তিনি চতুর্থ আসমানে গেলেন। সেখানে ইদরীস আলাইহিস সালামের সাথে দেখা করলেন। তিনি ইদরীস (আলাইহিস সালাম) কে সালাম জানালেন। ইদরীস (আলাইহিস সালাম) সালামের জবাব দিলেন, তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নবুওয়াতের স্বীকৃত প্রদান করলেন।

অতঃপর পঞ্চম আসমানে গিয়ে হারুন বিন ইমরান (আলাইহিস সালাম) কে দেখতে পেলেন। তাকে সালাম দেয়া হলে তিনি নাবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব দিলেন, তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

অতঃপর ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলে মূসা সালামের জবাব দিলেন, তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করলেন। তিনি যখন মূসাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) কাঁদতে লাগলেন। মূসাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার কাঁদার কারণ

২১৫. বোরাকের বর্ণনা হাদীছে এভাবে এসেছে যে, এটি ছিল চকচকে উজ্জ্বল, গাধার চেয়ে একটু বড় এবং খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট। সেটি এত দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল যে, তার চোখের দৃষ্টি যে পর্যন্ত পৌঁছতো, সেখানে সে একেকবার পা ফেলতো।

হলো এ ছেলেকে আমার পরে নাবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তার উম্মত থেকে আমার উম্মতের চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক জান্নাতে পাঠানো হবে।

অতঃপর তাকে সপ্তম আসমানে উঠানো হলো। সপ্তম আসমানে তিনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে দেখতে পেলেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে সালাম দিলে তিনি তার সালামের জবাব দিলেন, তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করলেন। অতঃপর তাকে সিদরাতুল মুনতাহায়[২১৬] নেয়া হলো। সেখানে তার জন্য বাইতুল মামুরও উন্মুক্ত করা হলো।

অতঃপর তাকে মহাপরাক্রমশালী ও পবিত্র নামসমূহের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তার অতি নিকটবর্তী হলেন। তখন তার মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে দুই ধনুক অথবা তার চেয়েও কম ব্যবধান ছিল। তখন আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার ছিল তা প্রত্যাদেশ করলেন। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হলো। ফিরে আসার সময় মূসা আলাইহিস সালামের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কিসের আদেশ করা হয়েছে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হয়েছে।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার উম্মত এত ছ্বলাত পড়তে পারবে না। আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য ছ্বলাত কমাতে বলুন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলের দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন এ ব্যাপারে জিবরীলের কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত দিলেন এবং বললেন, আপনি চাইলে যেতে পারেন। জিবরীল তাকে নিয়ে উপরে উঠলেন এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার নিকট গেলেন। তিনি সেখানেই ছিলেন।[২১৭] এটি ইমাম বুখারীর শব্দ। বুখারীর কিছু কিছু সনদে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তখন দশ রাক'আত কমিয়ে দিলেন।

অতঃপর নেমে এসে পুনরায় মূসার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং মূসাকে জানালেন। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং ছ্বলাতের সংখ্যা কমানোর আবেদন করুন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আল্লাহ তা'আলা এবং মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যাতায়াত করেই যাচ্ছিলেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো।

---

২১৬. সিদরাতুল মুনতাহা হলো সীমান্তের কূলবৃক্ষ। এটি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বড় একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বজগতে সৃষ্টি করেছেন। এর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এর ফলগুলো হিজর গোত্রের কলসীর মত, পাতাগুলো হাতির কানের মত বৃহৎ, সোনালী রঙ্গের প্রজাপতি সদৃশ সুন্দর সৃষ্টিরা সেখানে বসছে ও উড়ছে। এর প্রকৃত সৌন্দর্য মনোরম পরিবেশ কোনো সৃষ্টির পক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির জ্ঞান সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এর পরের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটেই। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে এ পর্যন্তই গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সৌন্দর্যের কিছু দিক হাদীছে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সেখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করার তাওফীক দেন।

২১৭. মিরাজের হাদীছ বর্ণনায় শারীকের এই শব্দটি মুহাদ্দিছগণ সমর্থন করেননি।

এর পরেও মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরে গিয়ে আরো কমানোর আবেদন করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমি আমার রবের কাছে পুনরায় যেতে লজ্জাবোধ করছি। আমি এতে সন্তুষ্ট আছি এবং মেনে নিয়েছি। অতঃপর তিনি যখন ফিরে আসছিলেন, তখন আলাহর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হলো, আমার ফরয ঠিক রাখলাম। কিন্তু বান্দাদের উপর থেকে সংখ্যা কমিয়ে দিলাম।[২১৮]

মিরাজের রাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে ছাহাবীদের মতভেদঃ

মিরাজের রাতে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন কিনা, সে ব্যাপারে ছাহাবীদের মতভেদ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, তিনি অন্তরের মাধ্যমে দেখেছেন। কপালের চোখ দিয়ে দেখেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾

"তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি"। *(সূরা নাজম: ১১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾

"তিনি তাকে আরেকবার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত"। *(সূরা নাজম: ১৩-১৫)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে জিবরীলকে দেখার কথা বলা হয়েছে।[২১৯] জিবরীলকে আল্লাহ তা'আলা যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, সে আকৃতিতে তিনি তাকে দুইবার দেখেছেন।

---

২১৮. ইসরা ও মিরাজের এ হাদীছটি ছ্বহীহ। এর শব্দগুলো বিভিন্ন হাদীছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এখানে নিকটবর্তী হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা শারীক বিন আব্দুল্লাহর রেওয়াত। ইসরা ও মিরাজের হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে শারীক যেসব শব্দ উল্লেখ করেছেন, তার কিছু কিছু শব্দে শারীক ভুল করেছেন বলে হাদীছের হাফেযগণ মন্তব্য করেছেন। যেমন উপরে ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

২১৯. আল্লাহ তা'আলাকে কপালের চোখ দিয়ে দেখার কথাটি সঠিক নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহি.) আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আলেমদের মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি। কারণ কোন ছাহাবী স্বচক্ষে দেখার পক্ষে কোন বর্ণনা উল্লেখ করেননি। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তার অর্থ হলো অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখা। কপালের চক্ষু দিয়ে দেখা উদ্দেশ্য নয়। তিরমিযী শরীফে আয়েশা হতে বর্ণিত

সূরা নাজমের যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ "অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন। অতঃপর ঝুলে গেলো", সেখানে মিরাজের ঘটনায় উল্লেখিত নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুলে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সূরা নাজমে যে নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুলে পড়ার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা জিবরীলের নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুলে যাওয়া উদ্দেশ্য। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾

"তাকে মহাশক্তির অধিকারী একজন শিক্ষা দিয়েছে, যে অত্যন্ত জ্ঞানী। সে সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন সে উঁচু দিগন্তে ছিল। তারপর কাছে এগিয়ে এলো এবং উপরে শূণ্যে ঝুলে রইলো"। *(সূরা নাজম: ৫-৮)*

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটি সর্বনাএ মহাশক্তিশালী শিক্ষক জিবরীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর মিরাজের ঘটনায় যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়া এবং ঝুলে যাওয়া উদ্দেশ্য। আর সূরা নাজমে বলা হয়েছে, "তিনি তাকে আরেকবার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। এখানে নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুলে পড়া বলতে জিবরীলের নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুলে যাওয়া উদ্দেশ্য। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুইবার দেখেছেন। একবার যমীনে আরেকবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।

আছে যে, তিনি বলেন, তিনটি এমন বিষয় রয়েছে, সে ব্যাপারে যে কথা বলবে, সে আল্লাহর উপর বিরাট এক অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি বলল যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌কে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর বিরাট এক মিথ্যারোপ করল। যে ব্যক্তি বলল যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোন অংশ গোপন করেছেন, সে বিরাট এক মিথ্যা রচনা করল। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

"হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা মানুষের নিকট পৌছিয়ে দিন। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে আপনার প্রভুর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। (সূরা মায়িদা: ৬৭) তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবের খবর জানতেন, তাহলে সে আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় মিথ্যা রচনা করলো। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

"হে নাবী! তুমি বলে দাও, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না। (সূরা নামল: ৬৫) (সুনানে তিরমিযী, ২৯৯৪)

মিরাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল

স্বশরীরে মিরাজ হওয়ার অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীর কিয়দাংশে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত। যার পরিবেশকে আমি করেছিলাম বরকতময়। তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা বাণী ইসরাঈল: ১)*

দেহ ও 'রূহ'এর সমন্বয়ে গঠিত সত্তাকে عبد বা বান্দা বলা হয়। ঠিক এমনি দেহ ও রূহের সমষ্টিগত রূপকে إنسان মানুষ বলা হয়। এটিই সর্বজন বিদিত এবং এটিই সঠিক। সুতরাং দেহ ও রূহসহ মিরাজ হয়েছিল। বিবেক-বুদ্ধির দলীল এটিকে অসম্ভব মনে করে না। যমীন থেকে মানুষ আসমানে উঠা অসম্ভব হলে আসমান থেকে ফেরেশতা নামাও অসম্ভব হবে। আর তা হলে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী অস্বীকার করা হয়। এ রকম অস্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফুরী।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, মিরাজের রাতে উর্ধ্বাকাশে যাওয়ার পূর্বে বাইতুল মাকদিসে ভ্রমণ করানোর হিকমত কী? এর জবাব হলো, আল্লাহই অধিক জানেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজের সত্যতা প্রকাশ করা। কুরাইশরা যখন বাইতুল মাকদিসের কিছু লক্ষণাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তখন তিনি তাদেরকে তা বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; বাইতুল মাকদিস থেকে ফিরে আসার পথে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা যে স্থানে দেখে এসেছিলেন, তাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। মক্কা থেকে সরাসরি যদি আসমানের দিকে উঠে যেতেন, তাহলে এ ফায়দাটি হাসিল হতো না। কেননা আসমানে যা দেখে এসেছেন, সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে খবর দিলেও তারা তার সত্যতা যাচাই করতে পারতো না। আর বাইতুল মাকদিস এবং তার মধ্যকার নিদর্শনাবলী তাদের জানা ছিল। তাই তিনি তার বর্ণনা প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি মিরাজের ঘটনা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে সকল সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়ার বিশেষণ।[২২০] আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা বুঝার তাওফীক দিন।

---

২২০. **মিরাজের রাত্রিতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত নিদর্শন দেখেছেন:** তিনি যমীনে যেসব নিদর্শন দেখেছেন, তার মধ্যে রয়েছে,

১) তিনি যখন বাইতুল মাকদিসে পৌছলেন, তখন তার জন্য দুধ ও মদ পরিবেশন করা হলে তিনি দুধ গ্রহণ করলেন এবং মদ পরিহার করলেন। তাকে বলা হলো আপনি যদি মদ পান করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২

২) তিনি দেখলেন, একদল লোক চাষাবাদ করছে। তারা বীজ বপন করছে। একদিনেই সে ফসল পেকে যাচ্ছে এবং তারা তা কাটছে। যখন কাটা শেষ হয়, সাথে সাথে ফসল পূর্বের মত হয়ে যায়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জিবরীল! এটি কী? জিবরীল বললেন, এরা হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। তারা আল্লাহর রাস্তায় যে মাল খরচ করে, তা এভাবেই বৃদ্ধি পায়।

৩) রাস্তার পাশে একজন বৃদ্ধ মহিলা দেখলেন। তার শরীরে রয়েছে সকল প্রকার অলংকার। মহিলাটি বয়সের ভারে একেবারে নুইয়ে পড়েছে। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ মহিলাটির বয়স যে পরিমাণ বাকী রয়েছে, দুনিয়ার বয়স কেবল সেই পরিমাণ বাকী আছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বয়স একেবারে শেষ প্রান্তে এসে গেছে। বৃদ্ধ মহিলার শরীরে যেসব অলঙ্কার রয়েছে, তা হলো দুনিয়ার চাকচিক্যময় সম্পদ ও অলঙ্কার।

৪) তিনি দেখলেন কিছু লোকের ঠোঁট ও জিহ্বা লোহার কেঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। একবার কাটা শেষ হলে পুনরায় আগের মত জোড়া লেগে যাচ্ছে। পুনরায় কাটা হচ্ছে। কোনো বিরতি দেয়া হচ্ছে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরীল! এ লোকগুলো কারা? জিবরীল বললেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের বক্তা। বক্তৃতার মাধ্যমে এরা মানুষের মধ্যে ফিতনা ছড়াতো এবং তারা এমন কথা বলতো যে অনুযায়ী তারা নিজেরাই আমল করতো না।

৫) তিনি সে রাতে সুদখোরের শাস্তি দেখেছেন। তিনি বলেন, "আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে আসলাম। দেখলাম নদীতে একটি লোক সাঁতার কাটছে। নদীর তীরে অন্য একটি লোক কতগুলো পাথর একত্রিত করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁতার কাটতে কাটতে লোকটি যখন নদীর কিনারায় পাথরের কাছে দাঁড়ানো ব্যক্তির নিকটে আসে তখন দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পাথর মুখে নিয়ে লোকটি আবার সাঁতরাতে শুরু করে। যখনই লোকটি নদীর তীরে আসতে চায় তখনই তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের সুদখোর"।

৬) তিনি ব্যভিচারীর শাস্তি দেখেছেন। মিরাজের রাত্রিতে তিনি একদল লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাদের সামনে একটি পাত্রে গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। অদূরেই অন্য একটি পাত্রে রয়েছে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা গোশত। লোকদেরকে রান্না করে রাখা গোশত থেকে বিরত রেখে পঁচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কাঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা চিৎকার করছে এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্তেও তা থেকে ভক্ষণ করছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কোন্ শ্রেণীর লোক? জিবরীল বললেন: এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত পুরুষ যারা নিজেদের ঘরে পবিত্র এবং হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অপবিত্র এবং খারাপ মহিলাদের সাথে রাত্রি যাপন করত।

৭) অতঃপর তিনি একটি ছোট পাথরের কাছে আসলেন। দেখলেন তা থেকে একটি বিরাট ষাঁড় বের হচ্ছে। বের হওয়ার পর সেই ছিদ্র দিয়ে পুনরায় প্রবেশ করতে চাচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাতে প্রবেশ করতে পারছেনা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলেন: এ কি দেখছি হে জিবরীল! তিনি বললেন, এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, বড় বড় কথা বলে। অতঃপর সেই কথার জন্য সে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তা ফেরত নিতে পারে না।

৮) তিনি দেখলেন একলোক বিরাট এক লাকড়ির বোঝা বেধে মাথায় উঠানোর চেষ্টা করছে, কিন্ত পারছেনা। তারপর আরো লাকড়ি সংগ্রহ করে বোঝাটা আরো বড় করছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: হে জিবরীল! এ কী কান্ড দেখছি? জিবরীল বললেন: এ হলো তোমার উম্মতের ঐ ব্যক্তি যার নিকট মানুষের অনেক আমানত রয়েছে। সে তা আদায় না করেই আরো নতুন নতুন আমানত সংগ্রহ করছে।

৯) সে রাতে তিনি ছ্বলাত আদায় না করার শাস্তি দেখেছেন। তিনি বলেন, আমরা এক শায়িত ব্যক্তির কাছে আসলাম। তার মাথার কাছে পাথর হাতে নিয়ে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মাথায় সেই পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মত গড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার মাথা ভালো হয়ে যাচ্ছে। দাড়ানো ব্যক্তি প্রথম বারের মত আবার আঘাত করছে এবং তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, কী অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেন:

এব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করেছিল। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি এবং সে ফরয ছ্বলাতের সময় ঘুমিয়ে থাকত। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

১০) যারা যাকাত আদায় করে না, সে রাতে তিনি তাদের শাস্তি দেখেছেন। অতঃপর তিনি এমন একদল লোকের কাছে আসলেন, যাদের লজ্জাস্থানের উপর এক টুকরা এবং পিছনের রাস্তার উপর এক টুকরা কাপড় ঝুলছে। চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় তারা চলাফেরা করছে। তারা কাটাযুক্ত, যাক্কুম গাছ, জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর খাচ্ছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল বললেন, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের মালের যাকাত দেয় না। আল্লাহ কাউকে যুলুম করেন না। আর আল্লাহ যালেম নন।

১১) ফেরাউনের মেয়েদের সেবিকা মাশেতার কবর দেখেছেন।

আকাশে যেসব নিদর্শন দেখেছেন:

১) তিনি সাত আসমানের উপর বায়তুল মামূর দেখেছেন। বায়তুল মামূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরীল বললেন, এটি হলো বায়তুল মা'মূর। এতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ছ্বলাত আদায় করে। এক বার যে এখান থেকে বের হয়ে আসে কিয়ামতের পূর্বে সে আর তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালী নেই, যাতে কোন না কোন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে, কিংবা রুকু অবস্থায় অথবা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

"তারা অহংকার বশত তাঁর বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্ত হয় না। দিন রাত তার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিশ্রাম নেয় না"। (সূরা আম্বীয়া: ১৯-২০)

২) অতঃপর আমার জন্যে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সিমান্তের কূল বৃক্ষ উম্মুক্ত করা হল। এ বৃক্ষের ফলগুলো ছিল কলসীর ন্যায় বড়। গাছের পাতাগুলো ছিল হাতীর কানের মত বড়।

৩) মিরাজের রাত্রিতে তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরীল ফেরেশতাকে আসল আকৃতিতে দেখলেন। অথচ ইতোপূর্বে তিনি আরেকবার দুনিয়াতে তাকে দেখেছেন।

৪) তিনি জান্নাত দেখেছেন। সাত আসমানের উপরে তিনি জান্নাত দেখেছেন। তাতে রয়েছে, এমন নিয়ামত, যা কোন চোখ কোনো দিন দেখেনি, কোনো কান যার বর্ণনা শুনেনি এবং মানুষ যার কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা মুমিন মুত্তাকীদের জন্য এটি তৈরী করে রেখেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হলো। আমি সেখানে আবু তালহার স্ত্রীকে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি আমার সামনে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আওয়াজ শুনলাম। (ছ্বহীহ মুসলিম)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বেলাল! কোন্ আমলের মাধ্যমে তুমি আমার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলে? কেননা আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, তখনই আমার সামনে তোমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। গতরাতেও আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তোমার আওয়াজ শুনেছি। বেলাল তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি, তখনই দু'রাকআত ছ্বলাত পড়েছি। আর যখনই আমার অযু ছুটে যায়, তখনই আমি অযু করি এবং আমি মনে করি আমার উপর দুই রাকআত ছ্বলাত পড়া জরুরী। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, এ কারনেই তুমি এত ফযীলতের অধিকারী হয়েছো।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ দেখলাম। বললাম, এটি কার প্রাসাদ? ফেরেশতাগণ বললেন, কুরাইশদের একজন যুবক লোকের। আমি মনে করলাম, আমি তো একজন যুবক ব্যক্তি। তারপরও আমি বললাম, সেই যুবকটি কে? ফেরেশতাগণ বললেন, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে উমার ইবনুল খাত্তাব! আমি যদি তোমার গাইরাতের (ঈর্ষার) কথা না জানতাম, তাহলে আমি সেখানে প্রবেশ করতাম। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপর গাইরাত বা ঈর্ষা করবো? (বুখারী, হা/৭০২৪)

৫) তিনি সেই রাতে জাহান্নাম দেখেছেন। তিনি সেই রাত্রে জাহান্নামের প্রহরী মালেক ফেরেশতাকেও দেখেছেন। তাকে সালাম দিলেন। তার দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি আমাকে প্রথমেই সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিষন্ন-চিন্তিত। তার মুখে হাসি ছিল না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যেদিন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করে তাকে এর প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, সেদিন থেকে তিনি কখনো হাসেননি। তিনি যদি ইতিপূর্বে কারো সাথে হাসতেন, তাহলে আপনার জন্য অবশ্যই হাসতেন। তাহলে চিন্তা করুন! যারা এতে প্রবেশ করবে, তাদের অবস্থা কী হবে?

মিরাজের কতিপয় শিক্ষা:

১) ঈমানী পরীক্ষা: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সংবাদ দিলেন যে, তিনি আজ রাতে বাইতুল মাকদিস দেখে এসেছেন, তখন মুশরিকদের কিছু লোক দৌড়িয়ে আবূ বকরের নিকট গিয়ে বলল, তোমর বন্ধুর খবর শুনবে কি? সে বলছে, আজকের রাত্রির ভিতরেই সে নাকি বাইতুল মাকদিস ভ্রমণ করে চলে এসেছে। তিনি বললেন, আসলেই কি মুহাম্মাদ তা বলেছেন? তারা একবাক্যে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: যদি বলেই থাকে, তাহলে সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল: তুমি কি বিশ্বাস কর যে, সে এক রাত্রির ভিতরে বাইতুল মাকদিস ভ্রমণ করে সকাল হওয়ার পূর্বেই আবার মক্কায় চলে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেন: আমি এর চেয়েও দূরের সংবাদ বিশ্বাস করি। সকাল-বিকাল আকাশ থেকে সংবাদ আসে। আমি তা বিশ্বাস করি। সে দিনই আবূ বকরকে সত্যবাদী তথা সিদ্দীক উপাধীতে ভূষিত করা হয়।

২) দাঈদের জন্য শিক্ষা: এ বরকতময় সফরে দ্বীনের দাঈদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করার জন্য বের হতে চাইলেন তখন উম্মে হানী তাকে বাধা দিয়ে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ভয় হচ্ছে মানুষ আপনাকে মিথ্যুক বলবে। তিনি তখন বললেন: আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তা বলবো। তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বললেও আমি তা সকলের সামনে প্রকাশ করবো। এখান থেকে দাঈদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তারা আল্লাহর দ্বীন মানুষের কাছে নির্ভয়ে পৌঁছে দিবে। মানুষ এতে খুশী হোক বা নাখোশ হোক। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

(ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس)

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবে, আল্লাহ তার উপর নাখোশ হবেন এবং মানুষকেও তার উপর নাখোশ করে দিবেন"। সুতরাং নাবী-রসূলদেরকে যেখানে যাদুকর, মিথ্যুক ও পাগল বলা হয়েছে, দাঈদেরকে তা বলা হলে সেটি কোন নতুন বিষয় নয়।

৩) পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: অতঃপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হল। ফেরত আসার সময় মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে সাক্ষাৎ হল। মূসা (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করলেন: কি নিয়ে আসলেন? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করা হয়েছে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি মানুষের অবস্থা আপনার চেয়ে অনেক বেশী অবগত। বানী ইসরাঈলকে আমি ভালোভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছি। আপনার উম্মাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছ্বলাত পড়তে পারবে না। আপনি ফেরত যান এবং কমাতে বলুন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি মূসা (আলাইহিস সালাম) এর পরামর্শ মোতাবেক ফেরত গিয়ে কমাতে বললাম। চল্লিশ করা হলো। আবার গিয়ে আবদারের প্রেক্ষিতে ত্রিশ করা হলো। পুনরায় যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিশ ওয়াক্ত করে দেয়া হলো। অতঃপর দশে পরিণত হলো। মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে দশ ওয়াক্ত নিয়ে ফেরত আসলে তিনি আবার যেতে বললেন। এবার পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত নিয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে আগমন করলাম। তিনি আমাকে আবার যেতে বললেন। আমি তাকে বললাম: আমি গ্রহণ করে নিয়েছি। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হলো: আমার ফরজ ঠিক রাখলাম। কিন্তু বান্দাদের উপর থেকে সংখ্যা কমিয়ে দিলাম। আর আমি প্রতিটি সৎআমলের বিনিময় দশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিব। ছ্বহীহ মুসলিম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ "আমার কথার নিকট কথার কোনো পরিবর্তন হয় না। আর আমি বান্দাদের প্রতি যালেমও নই"। (সূরা কাফ: ২৯)

(৪৪) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ حَقٌّ

আর হাউয যা আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, তা অবশ্যই সত্য।

.....

ব্যাখ্যা: হাওযে কাউছারের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছগুলো মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। ত্রিশের অধিক ছাহাবী থেকে হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে। আমাদের সম্মানিত শাইখ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ হাদীছের সনদগুলো তার রচিত 'বেদায়া ওয়ান নেহায়া' নামক বিশাল ইতিহাস গ্রন্থে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিন। এসব হাদীছ থেকে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ

"আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে ইয়ামানের আয়লা এবং সানআর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এর পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমপরিমাণ"।[২২১]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اخْتَلَجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أُصَيْحَابِي، فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»

"কিয়ামতের দিন আমার নিকট আমার সাথীদের কিছু লোক উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারবো। অতঃপর তাদেরকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি তখন বলবো, এরা তো আমার সাথী। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি জানো না, এরা

মিরাজ সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তার প্রতিবাদ:

দীর্ঘ ২৭ বছর পর্যন্ত মিরাজে থাকার কাল্পনিক গল্প।

আব্দুল কাদের জিলানীর ঘাড়ে আরোহন সিদরাতুল মুন্তাহা পার হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার কিচ্ছা।

শবে মিরাজ উপলক্ষে আমাদের সমাজে যেসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তা সঠিক নয়।

২২১. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৮০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩০৩।

তোমার মৃত্যুর পর কী পরিমাণ নতুন নতুন বিধান তৈরী করেছে?[২২২] ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ আনাস বিন মালেক (ছাহাবী আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। হঠাৎ তার মধ্যে তন্দ্রা বা এক প্রকার অচেতন ভাব দেখা দিল। তারপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনার হাসির কারণ কী হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, এ মুহূর্তে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি পাঠ করলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাকে হাওযে কাওছার প্রদান করেছি। তাই তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো ও কুরবানী করো। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই লেজকাটা নির্বংশ" *(সূরা কাওছার:১-৩)।*

অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো কাওছার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তার রসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, এটি জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে তা প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি একটি হাওয, যেখানে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকাসম। তখন কতক লোককে ফেরেস্তাগণ হাওয থেকে তাড়িয়ে দিবেন। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী পরিমাণ নতুন নতুন পথ ও মত অবলম্বন করেছিল"।[২২৩] ইমাম মুসলিমও এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের শব্দগুলো নিম্নরূপ,

«هُوَ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

এটি হলো একটি নদী। আমার রব এটি আমাকে দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে রয়েছে প্রচুর কল্যাণ। এটি এমন একটি জলাশয়, যাতে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে আসবে"।

হাদীছের বাকী শব্দগুলো মুসনাদে আহমাদের শব্দের মতই। হাউযে কাউছার হলো হাশরের মাঠের এমন একটি জলাশয়ের নাম যাতে জান্নাতের কাউছার নামক নদী থেকে দু'টি নালা বের হয়ে তাতে পতিত হবে। হাওয হবে হাশরের মাঠে পুলসিরাত পার হওয়ার পূর্বে। কেননা হাওযে কাউছারের নিকট থেকে এমন এক শ্রেণীর লোককে তাড়িয়ে দেয়া হবে, যারা

২২২. ছ্বহীহ মুসলিম ২২৯৫।
২২৩. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এ শ্রেণীর লোক পুলসিরাত পার হতে পারবে না।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ আলবাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»

"তোমাদের আগেই আমি হাওযে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকবো।[২২৪] ফারাত বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি কাফেলার আগেই পানির ঘাটে পৌঁছে যান এবং সহযাত্রীদের পানির ব্যবস্থা করেন।

ছ্বহীহ বুখারীতে সাহল বিন সা'দ বিন আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ»

"কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্য হাউযে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকবো। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে আমি তাকে তা থেকে পান করাবো। আমার হাউজ থেকে যে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার কাছে একদল লোক আগমন করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারবো। তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে।[২২৫]

হাদীছের অন্যতম বর্ণনাকারী আবু হাযেম বলেন, আমার এ বর্ণনা শুনে নুমান বিন আবু আয়াশ বললেন, তুমি হাদীছটি এভাবেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছো? আবু হাযেম বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ এভাবেই শুনেছি। নুমান বিন আবু আয়াশ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি হাওযে কাউছারের বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তিনি আরো বাড়িয়ে বলেছেন,

«فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي»

"আমি বলবো, এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কত বিদ'আত তৈরী করেছিল। আমি বলবো, আমার রেখে আসা দীনের মধ্যে

২২৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৭৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৮৯।
২২৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৮৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৯০।

যারা পরিবর্তন করেছো তারা এখান থেকে সরে যাও। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে”।[২২৬] এখানে سحقا অর্থ হলো بعدا অর্থাৎ দূরে চলে যাও।

হাওযে কাউছারের গুণাগুণ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো থেকে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা যা জানতে পারি, তা হলো, হাওযে কাউছার হবে অত্যন্ত বিশাল এবং বরকতময় জলাশয়। জান্নাতের নদী আল কাউছার হতে এটি সম্প্রসারিত করা হবে। যার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, বরফের চেয়ে শীতল, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুঘ্রাণের চেয়েও পবিত্র। এটি হবে অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তার দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান। এর প্রত্যেক পার্শ্বের দূরত্ব হবে একমাসের পথ।

কতিপয় হাদীছে এসেছে, এখান থেকে যতই পান করা হবে, এর পানি ততই বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং এর প্রশস্ততাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কস্তুরীর মত সুঘ্রাণময় কাদা, মুক্তার ছোট ছোট পাথর এবং স্বর্ণের ছোট ছোট গাছ-পালার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। তা থেকে মণি-মুক্ত সদৃশ উজ্জ্বল ফল-ফলাদি উৎপন্ন হবে। আমি সেই মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যাকে কোনো কিছুই অক্ষম করতে পারে না। অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّ حَوْضَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُهَا وَأَحْلَاهَا وَأَكْثَرُهَا وَارِدًا

প্রত্যেক নাবীরই হাওয থাকবে। আর আমাদের নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয হবে সবচেয়ে বড়, এর পানি হবে সর্বাধিক মিষ্টি এবং এখান থেকে পানি পানকারীর সংখ্যাও হবে সবচেয়ে বেশী।[২২৭] আল্লাহ তা'আলা যেন তার অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে তাদের কাতারে শামিল করেন।

আল্লামা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ التذكرة নামক গ্রন্থে বলেন, মীযান (দাঁড়িপাল্লা) এবং হাওযে কাউছারের ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। এ দু'টি থেকে আগে কোন্‌টি হবে? কেউ কেউ বলেছেন, মীযান আগে স্থাপন করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আগে হবে, হাউযে কাউছার। আবুল হাসান আল-কাবেসী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সঠিক কথা হলো হাউয হবে মীযানের প্রথমে।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, পরিস্থিতি ও অবস্থা বিচারে এ কথাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা কিয়ামতের দিন লোকেরা পিপাসিত হয়ে কবর থেকে বের হবে। তাই এটি মীযান ও সীরাতের আগে হওয়াই শ্রেয়। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আবু হামেদ ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ তার অন্যতম কিতাব كشف علم الآخرة -এ বলেন, সালাফদের কিছু কিছু লেখক বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা পুলসিরাত পার হওয়ার পর হাওযে কাউছারের

২২৬. ছ্বহীহ বুখারী ৬৫৮৪, অধ্যায়: কিতাবুর্ রিকাক।

২২৭. হাসান: তিরমিযী ২৪৪৩।

নিকট উপস্থিত হবে। এ কথা যিনি বলেছেন, তিনি ভুল করেছেন। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহর কথাই সঠিক।

অতঃপর ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমার মনে যেন এ কথা না জাগে যে, বর্তমান এ পৃথিবীতে পুলসিরাত, হাউযে কাউছার ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। বরং এ পৃথিবীকে অন্য যমীনে পরিবর্তন করে হাশরের মাঠ তৈরী করা হবে। রোপার মত চকচকে সাদা হবে সে যমীন। এমন যমীন যাতে কোনো রক্তপাত করা হয়নি এবং তাতে কেউ কারো উপর কোনো যুলুম করেনি। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বিচার-ফায়ছালার জন্য অবতরণ করার সময় এ যমীন উদ্ভাসিত হবে। ইমাম কুরতুবীর কথা এখানেই শেষ।

আল্লাহ তা'আলা হাউযে কাউছার অস্বীকারকারীদের অমঙ্গল করুন। মহা পিপাসার দিন তারা হাউযে কাউছার থেকে বিতাড়িত হওয়ারই উপযুক্ত।

(৪৫) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ

"আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা'আত সত্য। যা তিনি উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। যেমনটি বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

.....

ব্যাখ্যা: শাফা'আত কয়েক প্রকার। এগুলোর মধ্য থেকে কতিপয় শাফাআতের ব্যাপারে উম্মত ঐকমত্য পোষণ করেছে। আর কতিপয়ের ব্যাপারে মুতাযেলা সম্প্রদায় এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায় ভিন্নমত পোষণ করেছে।

(১) প্রথম প্রকার শাফা'আত বা শাফা'আতে উযমা (বৃহৎ): শাফা'আতে উয্মা হবে হাশরের মাঠে। এটি হবে বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যখন হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। এটি হবে সমস্ত নাবী-রসূলদের মধ্য থেকে শুধু আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে নির্দিষ্ট। সমস্ত নাবী-রসূলদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শান্তি বর্ষিত হোক। শাফা'আতের হাদীছগুলো ছ্বহীহ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছের কিতাবে একদল ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গোশত পেশ করা হলো। এ সময় তাকে রানের গোশত দেয়া হলো। তিনি রানের গোশত খুব পছন্দ করতেন। এ থেকে তিনি চাকু দিয়ে কেটে কেটে খেলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন মানুষের সরদার হবো। তোমরা কি জানো কেন আমি সরদার হবো? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বনী আদমকে একটি মাটিতে একত্র করবেন। তখন লোকদের একজন অন্যজনকে বলবে, তোমরা কি দেখছো না যে, তোমরা কী অবস্থায় আছো? তোমরা কি দেখছো না তোমাদের কেএ কষ্ট হচ্ছে? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট সুপারিশ করবেন? তখন লোকদের কেউ কেউ বলবে, তোমাদের পিতা আদম এ কাজ করবেন। এরপর তারা আদমের কাছে যাবে। আদমের কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম! আপনি আবুল বাশার। আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী পরিমাণ অসুবিধার মধ্যে রয়েছি? আপনি দেখছেন না, আমাদের কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে? আদম তখন বলবে,

إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ: عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ؟ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ،

ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى»

"আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হননি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে বারণ করেছিলেন। আমি তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা নূহ (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাও। তারা নূহ (আলাইহিস সালাম) এর কাছে গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি তো পৃথিবীবাসীর নিকট প্রথম রসূল। আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অবিহিত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেন, আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হননি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমাকে একটি দু'আ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। আমি তা আমার জাতির বিরুদ্ধে করে ফেলেছি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও। তারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে গিয়ে বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি তো আল্লাহর নাবী এবং পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনিই আল্লাহর বন্ধু। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেন, আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হননি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর ইতিপূর্বে আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলে ফেলেছি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে গিয়ে বলবে, হে মূসা! আপনি তো আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালাত দিয়ে এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানুষের মধ্যে আপনাকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেন, আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হননি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমি পৃথিবীতে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। অথচ তাকে হত্যা করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়নি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম)

এর কাছে গিয়ে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল এবং আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছেন। আর আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রূহ। আপনি শিশুকালে মায়ের কোলে থেকেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেন, আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হননি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি পৃথিবীতে থাকা কালে কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেন, হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদের কাছে যাও। তারা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি আরশের নীচে গিয়ে আমার প্রভুর জন্য সিজদায় নত হবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে তার এমন কিছু প্রশংসা ও গুণগান ঢেলে দিবেন যা ইতিপূর্বে কাউকে দেন নি। (আমি সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করবো) অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। চান, আপনি যা চাইবেন, তাই দেয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি তখন মাথা উঠিয়ে বলবো, হে আমার প্রভু! আমার উম্মাতকে বাঁচান। আমার উম্মাতকে বাঁচান। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যাদের উপর কোন হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করান। তবে তারা চাইলে লোকদের সাথে জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অতঃপর তিনি বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হবে মক্কা ও হিময়ার অথবা মক্কা ও বুসরার মধ্যকার দূরত্বের সমান"।[২২৮] হাদীছের মূল অর্থ ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। উপরোক্ত শব্দগুলো ইমাম আহমাদের।

আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমামগণ এ হাদীছ বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন ঠিকই; কিন্তু প্রথম প্রকার শাফা'আত তথা শাফা'আতে উযমার বিষয়টি কেউ উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ হাশরের মাঠে বিচারের জন্য আল্লাহ তা'আলার আগমনের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। যেমনটি সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ স্থানে এ বিষয়টি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। হাদীছের প্রথমাংশের বর্ণনা প্রসঙ্গের দাবিও এটি।

কিয়ামতের দিন লোকেরা পূর্বোক্ত পাঁচজন থেকে শুরু করে সমস্ত নাবীর কাছেই শাফা'আত করার অনুরোধ করবে। যাতে করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করেন এবং যাতে তারা হাশরের মাঠের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। সকল সনদে উপরোক্ত হাদীছের বর্ণনা প্রসঙ্গ এ কথারই প্রমাণ বহন করে। কিয়ামতের দিন ভালো-মন্দের বিনিময়

---

২২৮. বুখারী ও মুসলিমের সনদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন: ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ১৯৮।

প্রদানের বিষয়ে তারা যখন আলোচনা করেছেন, কেবল তখন তারা পাপীগণের শাফা'আতের বিষয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাদের বের হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। সালাফদের উদ্দেশ্য ছিল হাদীছ থেকে শুধু এ পরিমাণ অংশের উপর নির্ভর করা। আর তা হলো খারেজী সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসারী মুতাযেলা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা। কেননা তাদের কথা হলো যারা একবার জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের কেউ আর সেখান থেকে বের হবে না।

সুতরাং সালাফগণ কেবল হাদীছের সেই অংশই বর্ণনা করেছেন, যাতে সুস্পষ্টভাবেই খারেজীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ছ্বহীহ হাদীছের খেলাফে তারা যে বিদ'আতী মতবাদ প্রকাশ করেছে, সালাফগণ কেবল তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে হাদীছের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার হাদীছে তা সুস্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছে। দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে পূর্ণ হাদীছটি উল্লেখ করতাম। তবে হাদীছের সারাংশ হলো, তারা প্রথমে আদম (আলাইহিস সালাম), অতঃপর নূহ (আলাইহিস সালাম), অতঃপর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), অতঃপর মূসা (আলাইহিস সালাম), অতঃপর ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট আগমন করবে। পরিশেষে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করবে। তিনি তখন আরশের নীচে গিয়ে 'ফাহাস' নামক একটি স্থানে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার কী হয়েছে? অথচ তিনিই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তখন বলবো, হে আমার রব! তুমি আমার শাফা'আত কবুল করার ওয়াদা করেছো। সুতরাং এখন তোমার সৃষ্টির ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করো এবং তাদের মাঝে ফায়ছালা করো। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তখন বলবেন, আমি তোমাকে শাফা'আত করার অনুমতি দিলাম এবং আমি তোমাদের মাঝে আসবো এবং বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করবো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি ফিরে এসে মানুষের সাথে দাঁড়াবো। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার এবং মেঘমালার ছায়াতে ফেরেশতাদের অবতরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করার জন্য আগমন করবেন। তখন কারুবীয়া ফেরেশতা এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল অন্যান্য ফেরেশতাগণ বিভিন্ন প্রকার তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার যমীনের যেখানে ইচ্ছা স্বীয় কুরসী স্থাপন করবেন। অতঃপর বলবেন, আমি যেদিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেদিন থেকে তোমাদের এ দিন পর্যন্ত চুপ ছিলাম। আমি তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণ করতাম, তোমাদের কর্মসমূহ দেখতাম। সুতরাং এ নাও তোমাদের কর্ম এবং আমলনামাসমূহ। আজ তোমাদের জন্য এটি পাঠ করা হবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এতে কল্যাণকর কিছু পাবে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পাবে, সে যেন কেবল নিজেকেই দোষারোপ করে।

পরিশেষে জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হবে, তখন তারা বলবে, জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে কে আমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবে? তারা বলবে,

তোমাদের পিতা আদম অপেক্ষা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আর কে বেশী অধিকার রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে তার নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন। অতঃপর তারা আদমের নিকট গিয়ে শাফাআতের আবেদন করবে। বর্ণনাকারী যথাক্রমে নূহ (আলাইহিস সালাম), ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস সালাম), ঈসা (আলাইহিস সালাম), সর্বশেষে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে উল্লেখ করেছেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে তার দরজার হাতল ধরবো এবং দরজা খুলতে বলবো। অতঃপর আমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে। আমাকে জান্নাতে স্বাগতম জানানো হবে। জান্নাতে প্রবেশ করে আমি আমার প্রভুকে দেখে সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। এ সময় আমাকে তার এমন কিছু প্রশংসা ও গুণাবলী শিখানো হবে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার জন্য আর কাউকে অনুমতি প্রদান করা হয়নি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মাথা উঠাও। সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তুমি চাও। তোমাকে প্রদান করা হবে। আমি যখন মাথা উঠাবো, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, অথচ তিনি সবকিছু অবগত রয়েছেন। তোমার কী হয়েছে? আমি তখন বলবো, হে আমার রব! তুমি আমার শাফা'আত কবুল করার ওয়াদা করেছো। সুতরাং আমাকে জান্নাতীদের ব্যাপারে শাফা'আত করার অনুমতি দাও। যাতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাকে শাফা'আত করার অনুমতি দিলাম এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলাম। ইমামগণ এ হাদীছ দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২২৯] তাদের মধ্যে ইবনে জারীর আত্ তাবারী, তাবারানী, আবু ইয়ালা মুসেলী, বায়হাকী এবং অন্যান্য ইমাগণ রয়েছেন।

অন্যান্য শাফা'আতের বর্ণনাঃ

দ্বিতীয় প্রকার শাফা'আতঃ

কিয়ামতের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বহু সংখ্যক লোকের জন্য শাফা'আত করবেন, যাদের সৎ আমল এবং খারাপ আমল সমান সমান হবে। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শাফা'আত করবেন।

২২৯. যঈফঃ তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর।

তৃতীয় প্রকার শাফা'আত:

এমনি তিনি আরো এক শ্রেণীর লোকের জন্য শাফা'আত করবেন, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ করা হয়েছে। তিনি সুপারিশ করবেন, যাতে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ না করানো হয়।

চতুর্থ প্রকার শাফা'আত:

জান্নাতে প্রবেশকারী এক শ্রেণীর লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন। তাদের আমল অনুযায়ী যে পরিমাণ ছাওয়াব পাওয়ার হকদার, তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বেশী প্রদান করার জন্য শাফা'আত করবেন। মুতাযেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু এ প্রকার শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রকার শাফা'আতকে তারা অস্বীকার করেছে। যদিও সে ব্যাপারে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ রয়েছে।

পঞ্চম প্রকার শাফা'আত:

এক শ্রেণীর লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে তিনি শাফা'আত করবেন। উক্কাশা বিন মিহসানের হাদীছটি এ শ্রেণীর লোকদের শাফা'আতের ব্যাপারে সর্বোত্তম দলীল।

حِينَ دَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

উক্কাশার জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ করেছেন যে, তিনি যেন তাকে ঐ ৭০ হাজারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৩০] ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রকার শাফা'আত:

যারা জাহান্নামে প্রবেশের হকদার হবে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শাস্তি কমানোর জন্য শাফা'আত করবেন। তিনি তার চাচা আবু তালেবের শাস্তি কমানোর জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন।[২৩১]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ তাযকিরা নামক কিতাবে এ প্রকার শাফা'আত সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন, যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿**فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ**﴾। "সে সময় সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না"। *(সূরা মুদ্দাছছির: ৪৮)*

---

২৩০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২০।
২৩১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৯।

তার জবাবে বলা হবে, কাফেরদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে শাফা'আত কারীদের কোনো শাফা'আতই কাজে আসবে না। কিন্তু তাওহীদপন্থী পাপীদের জন্য সুপারিশ কারীদের সুপারিশ কাজে আসবে। তাওহীদপন্থী পাপী মুমিনগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সপ্তম প্রকার শাফা'আত:

সমস্ত মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ছ্বহীহ মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ আমি জান্নাতের মধ্যে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো।[২৩২]

অষ্টম প্রকার শাফা'আত:

তার উম্মতের কবীরাগুনাহকারী এক শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে। কিন্তু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য শাফা'আতের কারণে তারা জাহান্নাম থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।[২৩৩] এ প্রকার শাফা'আতের ব্যাপারে মুতাওয়াতের সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। মুতাযেলাদের কাছে এ প্রকার হাদীছগুলো অস্পষ্ট রয়েছে। তাই তারা এ প্রকার শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে। এ ছ্বহীহ হাদীছগুলো সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণেই তারা এ ধরণের মত প্রকাশ করেছে। আর কিছু কিছু লোক এগুলো সম্পর্কে জেনেও তা কবুল করতে অস্বীকার করেছে এবং তারা তাদের বিদ'আতের উপর অবিচল রয়েছে। ফেরেশতা, নাবীগণ এবং মুমিনগণও এ প্রকার শাফা'আত করবেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারবার এ শাফা'আত করবেন। এ প্রকার শাফা'আতের পক্ষে যেসব হাদীছ রয়েছে, তার মধ্যে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ অন্যতম।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» "আমার উম্মতের কবীরাহ গুনাহকারী লোকেরাই কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভ করে ধন্য হবে"।[২৩৪] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ কিতাবুত্ তাওহীদে বলেন, আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান বিন হারব্, তিনি বর্ণনা করেন হাম্মাদ বিন যাইদ থেকে, হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, মামাদ বিন হেলাল আনাযী থেকে, তিনি বলেন, আমরা বসরার অধিবাসী একদল লোক আনাস বিন মালিকের নিকট গেলাম। শাফাআতের হাদীছ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা

---

২৩২. ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬, মুসনাদে আহমাদ।

২৩৩. শারহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতিয়াহ, পৃষ্ঠা নং- ১৪২।

২৩৪. মিশকাত ৫৫৯৮-৫৫৯৯। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের টিকাসহ শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২০৫।

করার জন্য আমাদের সাথে ছাবিত আল-বুনানীকেও নিয়ে গেলাম। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন তার গৃহে অবস্থান করছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম। তিনি চাশতের ছ্বলাত পড়ছেন। আমরা তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তখন তিনি স্বীয় বিছানার উপর ছিলেন। আমরা ছাবিতকে বললাম, শাফাআতের হাদীছের পূর্বে তাকে অন্য কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। ছাবিত তখন বললেন, হে আবু হামযাহ! তোমার এ ভাইয়েরা বসরা থেকে এসেছে। তোমাকে তারা শাফাআতের হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন মানুষ দলে দলে পরস্পরের নিকট গমণ করবে। তারা আদম আলাইহি সালামের কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট শাফা'আত করুন। আদম বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা চলে যাও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে। তিনি হলেন আল্লাহর খলীল। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা চলে যাও মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে। তিনি হলেন কালীমুল্লাহ।

তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে চলে যাও। তিনি হলেন রূহুল্লাহ এবং আল্লাহর কালেমা। তারা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা চলে যাও। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলবো, আমি এর যোগ্য। আমি তখন আমার রবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে এমন কিছু প্রশংসা শিখানো হবে, যা দ্বারা আমি সেদিন আল্লাহর প্রশংসা করবো। এখন সেগুলো আমার মনে পড়ছে না। আমি সেগুলোর দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং আল্লাহর জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে, শাফা'আত করো, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে এবং চাও, তোমাকে দেয়া হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও। অতঃপর বলা হবে, যাও। যার অন্তরে একটি যবের দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি গিয়ে তাই করবো।

অতঃপর ফিরে এসে ঐ প্রশংসার বাক্যগুলো দিয়েই আবার আল্লাহর প্রশংসা শুরু করবো এবং আল্লাহর জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে, শাফা'আত করো, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে এবং চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও। অতঃপর বলা হবে, যাও। যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি গিয়ে তাই করবো।

অতঃপর ফিরে এসে ঐ প্রশংসার বাক্যগুলো দিয়েই আবার আল্লাহর প্রশংসা শুরু করবো এবং আল্লাহর জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে, শাফা'আত করো, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে এবং চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও। অতঃপর বলা হবে, যাও। যার অন্তরে সরিষার দানার চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি গিয়ে তাই করবো।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট থেকে বের হলাম, তখন আমি আমার কতক সাথীকে বললাম, আমরা যদি হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহর কাছে যেতাম! অতঃপর আমরা তার কাছে গিয়ে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করতাম! তখন তিনি হাজ্জাজের যুলুমের ভয়ে আবু খলীফার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। আমরা তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা তাকে বললাম, হে আবু সাঈদ! আমরা তোমার ভাই আনাস বিন মালেকের নিকট থেকে আগমন করেছি। তিনি আমাদের কাছে শাফা'আত সম্পর্কে যে হাদীছ শুনিয়েছেন, আমরা তা আর কখনো শুনতে পাইনি। তিনি বললেন, সেটি কোন্ হাদীছ? আমরা তাকে হাদীছটি শুনালাম। আমরা যখন হাদীছে বর্ণিত শেষোক্ত তিনটি শাফা'আত পর্যন্ত বর্ণনা করলাম, তখন তিনি বললেন, এরপর কী? আমরা বললাম, তিনি এর চেয়ে বেশী আর কিছুই বর্ণনা করেনি। অতঃপর তিনি বললেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ২০ বছর আগে যুবক বয়সে আমার কাছে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমি আশঙ্কা করছি, তিনি কি তা ভুলে গেছেন? না কি তোমরা আমল ছেড়ে দিয়ে শাফাআতের উপর ভরসা করে বসে থাকবে, এ আশঙ্কায় তিনি পুরো হাদীছটি তোমাদেরকে শুনানো অপছন্দ করছেন। অতঃপর আমরা বললাম, হে আবু সাঈদ! আমাদের কাছে আপনি তা বর্ণনা করুন। এতে তিনি হাসলেন এবং তাদেরকে তাড়াহুড়া করতে দেখে বললেন,

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾

"মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ১১)*

তোমরা আমার কাছে যা বর্ণনা করলে, তা আমি পুনরায় বর্ণনা করতে চাই না। তোমাদেরকে তিনি যেভাবে শুনিয়েছেন, আমাকেও সেভাবে শুনিয়েছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চতুর্থবার আমি গিয়ে আল্লাহ তা'আলার সেই প্রশংসাগুলো করবো এবং আল্লাহর জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ মাথা উঠাও। কথা বলো, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। চাও, দেয়া হবে, সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার রব! যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার

জন্য আমাকে অনুমতি দাও। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, আমার বড়ত্ব, মর্যাদা, অহঙ্কার এবং সম্মানের শপথ! যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, আমি অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।[২৩৫] ইমাম মুসলিম হাদীছটিকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

হাফেয আবু ইয়ালা উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফা'আত করবে। (১) নাবীগণ (২) আলেমগণ (৩) শহীদগণ।[২৩৬]

ছ্বহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফেরেশতাগণ সুপারিশ করেছে, নাবীগণ শাফা'আত করেছে এবং মুমিনগণ শাফা'আত করেছে। এখন শুধু সর্বাধিক আল্লাহ তা'আলাই অবশিষ্ট রয়েছে। অতঃপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুষ্ঠি মানুষ বের করবেন, যারা কোনো আমলই করেনি।[২৩৭]

অতঃপর শাফা'আতের ক্ষেত্রে লোকেরা তিনভাবে বিভক্ত।

(১) মুশরিক, খৃষ্টান এবং যেসব সুফী তাদের শাইখদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, তারা আল্লাহর নিকট তাদের বড়দের শাফা'আতকে ঠিক দুনিয়ার মানুষের নিকট পরিচিত শাফাআতের মতই মনে করে।

(২) মুতাযেলা সম্প্রদায় এবং খারেজীরা কবীরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যদের শাফা'আতকে অস্বীকার করে।

(৩) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবীরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যদের শাফা'আতের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুমতি দেয়ার আগে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার পূর্বে শাফা'আত শুরু করবেন না।

যেমনটি শাফা'আতের ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন লোকেরা সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস সালামের নিকট যাবে, অতঃপর নূহ (আলাইহিস সালাম), ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং সবশেষে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, তোমরা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহর এমন একজন বান্দা, যার পূর্বের এবং পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা আমার কাছে আসবে। আমি যখন আমার রবকে দেখবো, তখন তার জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। আমাকে আল্লাহ তা'আলা তখন এমন কিছু প্রশংসা

২৩৫. ছ্বহীহ।
২৩৬. হাদীছটি বানোয়াট। ইবনে মাজাহ ৪৩১৩।
২৩৭. ছ্বহীহ: মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ।

শিখিয়ে দিবেন, যা দ্বারা আমি তার প্রশংসা করবো। এখন আমার সেগুলো মনে পড়ছে না। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। কথা বলো, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে, শাফা'আত করো, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে। আমি তখন মাথা উঠিয়ে বলবো, হে আমার রব! আমার উম্মতকে বাঁচাও। তখন আমাকে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। অতঃপর আমি পুনরায় গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। অতঃপর আমাকে আরেকটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে।[২৩৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা মোট তিনবার উল্লেখ করেছেন।

দুনিয়ার জীবনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসীলায় দু'আ করা

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসীলায় দু'আ করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। কেননা দু'আকারী কখনো বলে, হে আল্লাহ! তোমার নাবী বা অমুকের অধিকারের উসীলায় তোমার কাছে দু'আ করছি। অথবা কোনো সৃষ্টির দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে থাকে। দু'কারণে এরূপ বলা নিষিদ্ধ।

(১) এটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

(২) এটি এমন বিশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার উপর কারো হক রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা জায়েয নয়। আর আল্লাহ তা'আলার উপর কারো কোনো হক নেই। তবে তিনি নিজের উপর যা আবশ্যক করেছেন সে কথা ভিন্ন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য"। *(সূরা আর রূম: ৫৫)*

এমনি ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছেন, (মুআয তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একই বাহনে বসা ছিলেন) হে মুআয! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? মুআয বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, তারা একমাত্র তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর

২৩৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো উপরোক্ত কাজ করলে আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? মুআয বললেন, আল্লাহ এবং তার রসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তিনি তখন বললেন, তারা উপরোক্ত কাজটি করলে তাদের জন্য আল্লাহর উপর হক হলো, তাদেরকে শাস্তি না দেয়া। এটি সত্য। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালেমার দাবি এবং তার সত্য ওয়াদার দাবি অনুপাতে এ হক আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। তবে এমনটি নয় যে, বান্দা নিজেই আল্লাহর উপর কোনো কিছু আবশ্যক করে দিয়েছে। যেমন এক মাখলুক অন্য মাখলুকের উপর আবশ্যক করে দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে সকল প্রকার কল্যাণ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তার অনুগত বান্দাদেরকে শাস্তি না দেয়ার ওয়াদা করেছেন, তাই সেই ওয়াদা অনুপাতে আল্লাহর উপর তাদের হক সাব্যস্ত হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি না দেয়ার অর্থ এ নয় যে, তা দ্বারা কসম খাওয়া যাবে, আল্লাহর কাছে তা দ্বারা কোনো কিছু চাওয়া যাবে এবং তার উসীলা দিয়ে দু'আ করা যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয়কে নাজাতের মাধ্যম বানিয়েছেন, তাই নাজাতের মাধ্যম হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার কথাও অনুরূপ। সেখানে ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে গমনকারীর কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, أسألك بحق ممشايّ هذا وبحق السائلين عليك

"হে আল্লাহ! ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে আমার এ গমনের উসীলায় এবং তোমার নিকট দু'আকারীর হকের উসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।[২৩৯] কবি খুব সুন্দর বলেছেন,

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ+ كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ

إِنْ عُذِّبُوا فَبِعَدْلِهِ، أَوْ نُعِّمُوا+ فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ الوَاسِع

"আল্লাহর উপর বান্দার কোনো হক নেই। এটি হতেই পারে না। তবে তার নিকট কারো আমল বিনষ্ট হয় না। বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়া হলে তার ইনসাফের কারণেই দেয়া হবে অথবা যদি তাদেরকে নেয়ামত দেয়া হয়, তাহলে তার ইনসাফের কারণেই। আর আল্লাহ তা'আলা দয়ালু দাতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় দু'আকারীর কথা, بحق السائلين عليك এবং بحق نبيك এ দুই বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী? এর জবাব হলো بحق السائلين عليك এ কথার অর্থ হলো হে আল্লাহ! তুমি তো দু'আকারীদের সাথে ওয়াদা করেছো যে, তুমি তাদের দু'আ কবুল করবে। আমি তো সে দু'আকারীদের দলভুক্ত। সুতরাং আমার দু'আ কবুল করো। এটি بحق فلان বা অমুকের হকের উসীলায় আমার দু'আ কবুল করো, এ কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলার

২৩৯. হাদীছটি যঈফ। দেখুন: শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর টিকাসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং-২১২।

সত্য ওয়াদার কারণে কারো জন্য আল্লাহর উপর হক থাকলেও তার মাঝে এবং দু'আকারীর দু'আ কবুলের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি দু'আর মধ্যে অন্যকে উসীলা দেয়, তার কথা এরূপ যে, সে যেন বলছে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি যেহেতু আপনার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমার দু'আ কবুল করো। দু'আ কবুল করার সাথে এভাবে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার সম্পর্ক কী? দু'আর মধ্যে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেই দু'আ কবুল হওয়া আবশ্যক হয় কিভাবে? এটি দু'আর মধ্যে যুলুম ও সীমালংঘন করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে। অবশ্যই তিনি সীমালংঘন কারীদেরকে পছন্দ করেন না"। *(সূরা আল-আরাফ: ৫৫)*

এভাবে দু'আর মধ্যে কারো নাম উল্লেখ করে দু'আ করা বিদআতী দু'আর অন্তর্ভুক্ত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এভাবে দু'আ করার কথা বর্ণিত হয়নি। এমনকি ছাহাবী, তাবেঈ কিংবা কোনো ইমাম থেকেও এভাবে দু'আ করার কথা বর্ণিত হয়নি। মূর্খ ও সুফীরা তাবীজ -কবজ এবং দর্গা ও মাজারের মধ্যে এগুলো লিখে রাখে। দু'আ হলো সর্বোত্তম ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা হবে। বিদ'আত ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে কোনো ইবাদত করা যাবে না।

কারো হকের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং কিভাবে স্রষ্টার উপর কারো হক আছে বলে দাবি করা যেতে পারে? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে শির্ক করল"।[২৪০]

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথীদ্বয় বলেছেন, দুআকারীর এ কথা বলা মাকরুহ যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অমুকের হকের উসীলায় প্রার্থনা করছি, তোমার নাবী-রসূলদের হকের উসীলায় প্রার্থনা করছি, পবিত্র কাবা ঘরের সম্মানের উসীলায় প্রার্থনা করছি, পবিত্র স্থানসমূহের হকের উসীলায় প্রার্থনা করছি অথবা অনুরূপ অন্য কিছুর হকের উসীলায় প্রার্থনা করছি। দু'আর মধ্যে ইত্যাদি কথা বলা মাকরুহ। ইমাম আবু হানীফা এবং মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ দু'আকারীর এ কথা অপছন্দ করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আরশের সম্মানের উসীলায় প্রার্থনা করছি। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ ইহাকে অপছন্দ করেননি। কারণ এ বিষয়ে হাদীছ রয়েছে।[২৪১]

---

২৪০. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩২৫১, মুসনাদে আহমাদ হা/৬০৭৩।

২৪১. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি বানোয়াট। দেখুন শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর টিকাসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২১৪।

মুর্খরা কখনো কখনো দু'আর মধ্যে এভাবে বলে থাকে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অমুকের সম্মানের উসীলায় প্রার্থনা করছি। কেউ কেউ বলে থাকে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে তোমার নাবী-রসূলদের এবং অলী-আওলীয়াদের উসীলায় প্রার্থনা করছি। এতে দু'আকারী যেন বলছে, হে আল্লাহ! অমুক লোক তোমার কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সুতরাং তুমি আমার দু'আ কবুল করো। এভাবে দু'আ করাও নিষিদ্ধ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ছাহাবীগণ যে উসীলা দিতেন, তা যদি হুবহু এ উসীলা হতো, তাহলে তার মৃত্যু বরণের পরও তারা তার উসীলা দিতেন। ছাহাবীগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তার দু'আর উসীলা দিতেন। তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাদের জন্য দু'আ করার আবেদন করতেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতেন এবং ছাহাবীগণ তার দু'আয় আমীন বলতেন। যেমন বৃষ্টি প্রার্থনা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করার পর যখন তারা বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হতেন তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ»

"হে আল্লাহ! আমাদের নাবী জীবিত থাকতে আমরা তার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করলে তুমি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আপনার নাবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করো। অতঃপর তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করা হত"।[২৪২]

এখানে নাবীর মাধ্যমে বা নাবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি চাওয়ার অর্থ হল বৃষ্টির জন্য দু'আ করার আবেদন করা এবং তার কাছে সুপারিশ করা ও বৃষ্টি চাওয়ার আবেদন করা। অর্থ এটি নয় যে, আব্বাসের হকের মাধ্যমে জোর দিয়ে তোমার কাছে বৃষ্টি চাচ্ছি। অথবা তাদের উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, আমরা তোমার নিকট আব্বাসের সম্মান ও মর্যাদার উসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। এটি যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহর নিকট আব্বাসের সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা যেহেতু বেশী, তাই তারা কখনো রসূলকে বাদ দিয়ে আব্বাসের দিকে যেতেন না। কেননা মৃত্যু বরণের কারণে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা কমে যায়নি।

দু'আকারী কখনো বলে থাকে, হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসূলের আনুগত্য করি, তাকে ভালোবাসি, তার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার সকল নাবী-রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, তাদের সকলকে সত্যায়ন করেছি এবং অনুরূপ অন্যান্য কথা বলে থাকে। দু'আ করা, উসীলা দেয়া এবং শাফা'আত চাওয়ার মধ্যে এ ধরণের কথা খুবই উত্তম।

---

২৪২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১০১০।

কিন্তু কারো ব্যক্তি সত্তার উসীলা দেয়া এবং তার মাধ্যমে দু'আ করার মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। এর অর্থ যারা বুঝেনি তারা মারাত্মক ভুল করেছে। কোনো দু'আকারী যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দু'আর মধ্যে উল্লেখ করে এ কারণে যে, সে আল্লাহর নিকট তার জন্য দু'আ করছে, সুপারিশ করছে আর এটি জীবিত থাকা কালেই সম্ভব অথবা এ জন্য উল্লেখ করে যে, দু'আকারী সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসে, তার আনুগত্য করে এবং তাকে আদর্শ মনে করে, কারণ সে ভালোবাসা পাওয়ার হকদার, আনুগত্যের যোগ্য ও অনুসরণীয়, এমন ব্যক্তির উসীলা দেয়ার অর্থ হলো, তার দু'আ এবং শাফাআতের উসীলা দেয়া। অথবা তার ভালোবাসা এবং অনুসরণ করার উসীলা দেয়া।

তবে কাউকে দু'আর মধ্যে উল্লেখ করা দ্বারা যদি তার ব্যক্তিসত্তার উসীলা দেয়া উদ্দেশ্য হয় অথবা আল্লাহর কাছে তার অধিকার আছে বলে জোর দিয়ে দাবি করা হয়, তাহলে এ পদ্ধতিকে আলেমগণ অপছন্দ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন। কোনো ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া দ্বারা কখনো উক্ত ইবাদতকে উদ্দেশ্য হাসিলের কারণ মনে করা হয়। আবার কখনো দু'আ করার সময় কোনো জিনিস উল্লেখ করে জোর দাবি জানানো হয়।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ স্বরূপ এখানে তিন ব্যক্তির হাদীছকে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীছটি খুব প্রসিদ্ধ। বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলো, তখন একটি পাথর গুহার মুখ বন্ধ করে দিলো। তারা তাদের খালেস সৎ আমলগুলোর উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলো। তাদের প্রত্যেকেই বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি যদি এ আমলটি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা থেকে উদ্ধার করো। এতে করে পাথরটি সরে গেল। তারা গুহা থেকে বের হয়ে এলো। এরা আল্লাহর নিকট সৎ আমল তুলে ধরে দুআ করেছিল। তারা এভাবে দুআ করেনি যে, হে আল্লাহ! অমুক বান্দার হকের মাধ্যমে তোমার কাছে দু'আ করছি কিংবা তারা এটি বলেনি যে, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে অমুক অমুক অলী ও নেক বান্দা রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে উদ্ধার করো। কেননা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য বান্দার সৎ আমল হলো সর্বোত্তম মাধ্যম। বান্দা সৎআমলের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, তার কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও সৎ আমলকারীদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিবেন এবং নিজের পক্ষ হতে অতিরিক্ত পুরস্কার দান করবেন।

মোটকথা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করা এক মানুষের নিকট অন্য মানুষের সুপারিশ করার মত নয়। কেননা মানুষের নিকট সুপারিশকারী, সুপারিশ প্রার্থী এবং সুপারিশকে নিজের সাথে যুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ সুপারিশ প্রার্থী প্রথমে থাকে একা বা বেজোড়। এখন তার সাথে আরেকজন যোগদান করার মাধ্যমে দুই বা জোড়ে পরিণত হয়েছে। এখন সুপারিশকারী ও তার সুপারিশ প্রার্থী একই বস্তু প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ শাফা'আত তলবকারী এবং শাফা'আতকারী উভয়ে মিলে জোড় সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা বেজোড়।

কেউ তাকে জোড় করতে পারে না। কোনো মানুষ যখন রাজা-বাদশাহর নিকট থেকে প্রয়োজন পুরণ করতে চায়, তখন রাজা-বাদশাহদের সাথে তার পরিচয় না থাকার কারণে সে একটি শক্তিশালী মাধ্যম বা সুপারিশকারী খুঁজে। এভাবে মানুষ দুইজনের মাধ্যমে প্রয়োজন পুরণ করে। শাফা'আতকারী এবং যার নিকট শাফা'আত করা হয়। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা একাই সৃষ্টি করা, আদেশ দেয়া, রিযিক দেয়া, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং সমস্ত ভান্ডারের মালিক। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেউ তার নিকট সুপারিশ করতে পারে না। সমস্ত বিষয়ের মালিক একমাত্র তিনি। কোনো অবস্থাতেই তার কোনো শরীক নেই।

শাফা'আতকারীদের সর্দার কিয়ামতের দিন যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন, তখন তিনি তাকে বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। কথা বলো, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে এবং সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। অতঃপর তার জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সবকিছুই আল্লাহর মালিকানাধীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾

"তাদেরকে বলে দাও, সমস্ত বিষয়ের অধিকার রয়েছে একমাত্র আল্লাহর হাতে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ليس لك من الأمر شيئ ﴾

"এ বিষয়ে তোমার কিছুই করার নেই"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১২৮)* আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

"সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহরই রয়েছে সৃষ্টি করা ও হুকুম করার ক্ষমতা"।

আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া তার নিকট কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। তিনি যাকে এবং যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন, তিনি কেবল তার জন্যই আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবেন। তবে আল্লাহ তা'আলা শাফা'আতকারীর শাফা'আত কবুল করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ»

"তোমরা শাফা'আত করো, তোমাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর জবানের মাধ্যমে যা ইচ্ছা ফায়ছালা করেন"।[২৪৩]

ছ্বহীহ বুখারীতে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاأملك لكم من الله شيئا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لا أملك لك مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ عم رسول الله لا أملك لك مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

"হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না। হে রাসূলের ফুফু সাফীয়া! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না। হে রাসূলের চাচা আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না"।[২৪৪] ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، شَاةٌ لَهَا يعار أو رقاع تخفق فيَقُولُ: أَغِثْنِي أغثني فَأَقُولُ: قد أبلغت لَا أَمْلِكُ لَكَ من الله من شَيْئٍ»

আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, সে তার ঘাড়ে একটি চিৎকাররত উট রয়েছে অথবা সে চিৎকাররত ছাগল কিংবা ঘোড়া বহন করছে। সে আমাকে ডেকে বলছে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন!! আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলবো: আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আজ আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার কোন উপকার করতে পারবো না"।[২৪৫]

সৃষ্টির সেরা মানব এবং সর্বোত্তম শাফা'আতকারী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকটতম মানুষকে যেখানে উপরোক্ত কথা বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেন না, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কিভাবে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা কিয়ামতের দিন মানুষের বিপদা-পদ দূর করতে সক্ষম হবেন?

দু'আকারী যখন আল্লাহর নিকট দুআ করে, শাফা'আতকারী যখন তার নিকট শাফা'আত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা দু'আ শ্রবণ করেন এবং সুপারিশ কবুল করেন। তবে দু'আ এবং শাফা'আত আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোনো প্রভাব খাটাতে পারে না। যেমন এক মাখলুক অন্য মাখলুকের উপর প্রভাব খাটাতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই কাউকে দু'আ করার তাওফীক দেন এবং তিনিই শাফা'আত করার প্রতি অনুপ্রেরণা জাগান। তিনিই বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা। তিনিই বান্দাকে তাওবা করার তাওফীক দেন, তিনিই তাওবা কবুল করেন।

---

২৪৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৪৩২।
২৪৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬।
২৪৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩১।

তিনিই তাদেরকে আমল করার তাওফীক দেন। অতঃপর তিনিই ছাওয়াব দান করেন। তিনিই দু'আ করার তাওফীক দেন এবং তিনিই তা কবুল করেন। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি অনুসারে এটিই সঠিক কথা। আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর স্রষ্টা।

(৪৬) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ

আল্লাহ তা'আলা আদম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ﴾

"আর হে নাবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা আমি এ জন্য করেছি যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, আমরা তো এ কথা জানতাম না"। *(সূরা আল-আরাফ: ১৭২)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর এ মর্মে সাক্ষী বানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাদের প্রভু ও মালিক। তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই।[২৪৬]

আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে সমস্ত বনী আদমকে বের করার ব্যাপারেও অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে এও বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার জান্নাতীদেরকে জাহান্নামীদেরকে

২৪৬. এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে নয়; বরং তার সন্তানদের কতকের পৃষ্ঠদেশ থেকে কতককে বের করে ওয়াদা-অঙ্গিকার নিয়েছেন। উপরোক্ত আয়াতটি এ কথাকেই সমর্থন করে।

আলাদা করা হয়েছে। এগুলোর কোনোটিতে তাদের থেকে এ সাক্ষ্য নেয়ার কথা বলা হয়েছে যে, তাদের রব হলেন একমাত্র আল্লাহ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আরাফা দিবসে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করে অঙ্গীকার নিয়েছেন। তিনি তার পিঠ থেকে তার প্রত্যেক সন্তানকে বের করেছেন। অতঃপর তার সামনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন ؟الست بربكم। "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالُوا بَلَى شَـهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْـرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾

তারা সকলেই বলেছে, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা আমি এ জন্য করেছি যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, আমরা তো এ কথা জানতাম না। অথবা তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, শির্কের সূচনা তো আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের পূর্বেই করেছিলো এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশে আমাদের জন্ম হয়েছে। তবে কি ভ্রষ্টাচারী লোকেরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করছো? *(সূরা আল-আরাফ: ১৭২-১৭৩)* ইমাম নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম এবং আবু আব্দুল্লাহ হাকেম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদীছের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক ছ্বহীহ। তারা তাদের কিতাবে হাদীছটি উল্লেখ করেননি।[২৪৭]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ আরো বর্ণনা করেন যে, তাকে যখন উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, আমি শুনেছি, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা তার পিঠ মাসেহ করে তার থেকে তার কিছু বংশধরকে বের করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, আমি এদেরকে সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য। তারা জান্নাতবাসী হওয়ার আমলই করবে।

তিনি দ্বিতীয়বার তার পিঠে হাত মারলেন। এবারও তার থেকে কিছু বংশধর বের করলেন। এদের সম্পর্কে বললেন যে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহান্নামবাসীদের আমলই করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, তাহলে আমলের প্রয়োজন কী?

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে জান্নাতে যাওয়ার আমল করার তাওফীক

২৪৭. ছ্বহীহ: আস ছ্বহীহ ১৬২৩।

দেন। সে জান্নাতবাসী হওয়ার কোনো একটি আমল করেই মৃত্যু বরণ করে। ফলে সে জান্নাতেই প্রবেশ করে। আর যখন তিনি জাহান্নামের জন্য কাউকে সৃষ্টি করেন, তাকে জাহান্নামবাসীদের আমলেই লাগিয়ে দেন। এতে করে সে জাহান্নামবাসীদের কোনো একটি আমল করেই মৃত্যু বরণ করে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে আবী হাতিম, ইবনে জারীর এবং ইবনে হিব্বান তার ছ্বহীহতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৪৮]

ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করলেন, তখন তার পিঠে হাত বুলালেন। এতে তার পিঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হবে, তার সবগুলোই বের হয়ে আসলো। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেকের কপালে দুই চোখের মাঝখানে উজ্জল একটি নূর স্থাপন করলেন। অতঃপর তাদেরকে আদম আলাইহিস সালামের সামনে পেশ করা হলো। আদম (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরা হলো তোমার সন্তান। আদম তাদের মধ্যে এমন একজন লোকের কপালের নূর দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তখন বললেন, হে আমার রব! এ লোকটি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তিনি হলেন, আখেরী যামানায় তোমার বংশের একজন লোক। তার নাম দাউদ। আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার রব! তার বয়স কত? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ৬০ বছর। তিনি বললেন, হে আমার রব! আমার বয়স থেকে কেটে ৪০ বছর নিয়ে তার বয়স ১০০ করে দাও। আদমের বয়স যখন শেষ হলো তখন মালাকুল মাওত আসলেন। আদম তখন বললেন, আমার বয়স কি আরো ৪০ বছর অবশিষ্ট রয়ে যায়নি? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি তোমার সন্তান দাউদকে ৪০ বছর দিয়ে দাওনি? আদম তা অস্বীকার করলেন। তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে। আদম ভুলে গিয়েছিলেন তাই তার সন্তানেরাও ভুলে যায়। আদম (আলাইহিস সালাম) গুনাহ করেছিলেন, তাই তার সন্তানেরাও গুনাহ করে।[২৪৯] ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ। ইমাম হাকেমও হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদীছটি ছ্বহীহ মুসলিমের শর্তে ছ্বহীহ, তবে তিনি তা বর্ণনা করেননি।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

২৪৮. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্য হাদীছ দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে হাদীছটি ছ্বহীহ। দেখুন, শাইখের তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২২০।

২৪৯. ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২২১।

«يقال للرجل من أَهْلِ النَّارِ يوم القيامة أرأيت لَوْ كان لَكَ مَا على الارْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مفْتَدِيا بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فيقول فَقَدْ أردت منك أَهْوَنَ مِنْ هَذَا قد أخذت عليك فِي ظهر آدَمَ؛ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي شيئا فَأَبَيْتَ إِلا أن تشرك بي شيئا» (بخارى: ٣٣٣٤)

"আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসীদের কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ যদি তোমার হাসিল হয়ে যায়, তাহলে এ আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিনিময় স্বরূপ তুমি কি সব সম্পদ দিয়ে দিবে? সে বলবে, হ্যাঁ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ বলবেন, অথচ তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়ে অতি সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম। তা হচ্ছে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করেছো এবং শির্কে লিপ্ত হয়েছো। হাদীছটি ইমাম বুখারী এবং মুসলিমও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তার সবগুলো হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা আদমের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করে জান্নাতীদের থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা করেছেন। এখান থেকেই একদল লোক বলেছে, দেহ সৃষ্টি করার পূর্বেই রূহ সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৫০] তবে হাদীছগুলো এ কথা প্রমাণ করে না যে, দেহের পূর্বেই স্থায়ীভাবে রূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো সর্বোচ্চ যা প্রমাণ করে, তা হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা রূহগুলোর আকৃতি বানিয়েছেন, তাদের সৃষ্টি, বয়স এবং কর্ম নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর উক্ত আকৃতিগুলো তাদের সৃষ্টির মূল উপাদান থেকে বের করেছেন। অতঃপর তিনি সেগুলোকে সেই উপাদানের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বনী আদমকে তার জন্য নির্ধারিত সময়ে বের হওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন। হাদীছগুলো প্রমাণ করে না যে, রূহগুলো স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয়ে আছে, সবগুলো রূহ এক স্থানে মজুদ আছে ও পরস্পর কথা বলছে। এ কথা প্রমাণ করে না যে, সেই স্থান থেকে দলে দলে বিভক্ত করে রূহগুলো দেহে পাঠানো হয়। যেমনটি বলেছেন ইমাম ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহ এ কথার প্রমাণ বহন করে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা পূর্বের নির্ধারণ অনুযায়ী একদলের পরে আরেক দল রূহ সৃষ্টি করেন। তাই পূর্বের নির্ধারণ অনুপাতেই সৃষ্টিজগতের মধ্যে সৃষ্টিসমূহ অস্তিত্বে আসে। সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ম। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর তাক্বদীর ও বয়স নির্ধারণ করেছেন এবং এগুলোর বিশেষণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা-আকার-আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তিনি পূর্বের তাক্বদীর অনুযায়ী অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন।[২৫১]

---

২৫০. দার্শনিক ও মুতাযেলা সম্প্রদায় এ কথা বলেছে। তাদের মতে মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রূহ আলাদাভাবে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে রূহসমূহকে দেহের পূর্বে সৃষ্টি করে এক স্থানে রাখা হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের সৃষ্টির উপাদান থেকে একবার বের করেছেন এবং আকৃতি দিয়েছেন। অতঃপর তাদের বয়স, আমল ইত্যাদি নির্ধারণ করে তাদের সৃষ্টির উপাদানের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২৫১. এটিই সালাফে সালেহীনদের মত।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো আদিতে তাক্বদীর নির্ধারণ করার কথা প্রমাণ করে। এগুলো থেকে কিছু কিছু হাদীছ প্রমাণ করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হবে তাদের ছবি বের করে দেখিয়েছেন এবং সেগুলোকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন এবং জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে আলাদা করেছেন।

আর সমস্ত আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার পর তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নেয়ার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)মা থেকে দু'টি মাওকুফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখান থেকেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের অনেক আলেম বলেছেন এ সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো তাদেরকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করা। যেমনটি সূরা আরাফের ১৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: شَـــهِدْنَا "আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি"। এর অর্থ হলো, তারা বলেছে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু। ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন, একজনকে অন্যজনের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, شَـهِدْنَا "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি", এটি হলো ফেরেশতাদের কথা। আর ওয়াক্ফ করতে হবে بلى শব্দের উপর। মুজাহিদ, যাহহাক এবং সুদ্দী এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম সুদ্দী আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের এবং ফেরেশতাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তারা বনী আদমের স্বীকৃতির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[২৫২]

তবে প্রথম অর্থটিই অধিক সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তাওহীদের উপর তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাওহীদের দলীল-পত্র তাদের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অন্য কথাগুলো সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে তার পক্ষে কোনো দলীল নেই। আয়াতের বাহ্যিক অর্থও প্রথম অর্থকেই সমর্থন করে।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, কতিপয় মুফাস্সির শুধু এ কথাই উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরদেরকে বের করে তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছেন। অতঃপর তাদেরকে আদমের পীঠে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ইমাম ছা'লাবী, বগবী এবং অন্যান্য ইমামগণ এ কথাই বলেছেন। অন্যদিকে কতিপয় মুফাস্সির এ কথা উল্লেখ করেননি। তারা শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যে বিবেক-বুদ্ধি

২৫২. অর্থাৎ রূহ জগতে ফেরেশতাগণ বনী আদমের স্বীকৃতির উপর সাক্ষী হয়েছে।

স্থাপন করেছেন, তা তার রুবুবীয়াত এবং একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে। ইমাম যামাখশারী এবং অন্যান্য ইমামগণ এ কথা উল্লেখ করেছেন।

কোনো কোনো মুফাস্‌সির উভয় কথাই উল্লেখ করেছেন।[২৫৩] ওয়াহেদী, ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম কুরতুবী এবং অন্যান্য ইমাম এ কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রথম মতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। আর দ্বিতীয় কথাটিকে মুতাযেলাদের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। নিঃসন্দেহে আয়াতটি প্রমাণ করে যে, অঙ্গীকার আদমের পিঠ থেকেই নেয়া হয়েছিল এবং তাতে এ কথাও পাওয়া যাচ্ছে যে, আদমের সন্তানদের পিঠ থেকেও অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। তবে কতক হাদীছ প্রমাণ করে যে, আদমের পীঠ থেকে তার বংশধরদেরকে বের করা হয়েছিল এবং সেখানে তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানানো হয়েছিল। কতক হাদীছ এও প্রমাণ করে যে, সাক্ষী বানানো হয়েছে এবং ফায়ছালা করা হয়েছে যে, তাদের কতক যাবে জান্নাতে এবং কতক যাবে জাহান্নামে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের হাদীছে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। কিছু কিছু হাদীছে অঙ্গীকার গ্রহণ করা এবং আদমকে তার বংশধর দেখানোর কথা বর্ণিত হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নামের ফায়ছালা এবং সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়নি। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে এটি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম মতের প্রবক্তাগণ যেভাবে সাক্ষ্য নেয়ার কথা বলেছেন, তাদের মতের পক্ষের হাদীছটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মাওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন। ছ্বহীহ ও বুখারীর শর্তে রচিত মুস্তাদরাক আল-হাকেম ব্যতীত অন্য কোনো ছ্বহীহ গ্রন্থকার হাদীছটি বর্ণনা করেননি। আর আবু আব্দুল্লাহ আল হাকেম তার ছ্বহীহ গ্রন্থে স্বীয় শর্তের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনের বিষয়টি সর্বজন বিদিত।

আর যে হাদীছে জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে আলাদা করার কথা এসেছে, তাতে তাক্বদীরের দলীল রয়েছে। এর সমর্থনে রয়েছে অনেক হাদীছ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের মধ্যে তাক্বদীর নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। বিদআতী ও বাতিলপন্থী কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাই এতে মতভেদ করেছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বলেছেন, অঙ্গিকার নেয়া হয়েছে আদমের সন্তানদের থেকে এবং সাক্ষী রাখা হয়েছে তাদেরকেই। তবে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে এ অঙ্গিকার নেয়ার ধরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আমি যদি নিজের উপর কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করার শর্তারোপ না করতাম, তাহলে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো সবিস্তারে

২৫৩. প্রথম কথাটি হলো আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরদেরকে বের করে অঙ্গিকার নিয়েছেন। আর দ্বিতীয় কথাটি হলো তাদেরকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করেছেন এবং তাওহীদের দলীল-পত্র দেখিয়েছেন।

উল্লেখ করতাম। সেই সঙ্গে হাদীছগুলোর ব্যাপারে যত কথা বলা হয়েছে, যত বোধগম্য অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এবং আয়াতে কারীমার শব্দসমূহে যত দলীল রয়েছে তাও উল্লেখ করতাম।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতটির অর্থের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় অনেক কথা বলেছেন। আমার পক্ষে যতদূর জানা সম্ভব হয়েছে, তার আলোকে তাদের কথাগুলো থেকে কিছুটা উল্লেখ করবো। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের একজনের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যজনকে বের করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾

"এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি তোমাদের রব নই? *(সূরা আল-আরাফ:১৭২)।*

এর অর্থ হলো তিনি তাদেরকে তাওহীদের দলীল-প্রমাণ দেখিয়েছেন। কেননা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকই জানে যে, তার এক প্রভু রয়েছেন। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত। এটিই তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানানোর অর্থ।

যেমন আসমান-যমীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ "তারা বলল, আমরা অনুগত হয়ে আগমন করলাম"। ইমাম কাফফাল এ মত পোষণ করেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেহ সৃষ্টি করার আগেই তাদের রূহ সৃষ্টি করেছেন।[২৫৪]

রূহ সৃষ্টি করে তাতে এমন ইলম ও মারেফত স্থাপন করেছেন, যাতে তারা আল্লাহর সম্বোধন বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এরপর ইমাম কুরতুবী এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন। ইমাম কুরতুবীর কথা আরো বাকী রয়েছে।

বনী আদমের পৃষ্ঠদেশেই তাদের বংশধরকে বের করার পর তাদেরকে তাদের উপর সাক্ষী রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ। তাতে রয়েছে,

«فَقَدْ أردت منك أَهْوَنَ مِنْ هَذَا قد أخذت عليك فِي ظهر آدَمَ؛ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي شيئا فَأَبَيْتَ إِلا أن تشرك بي شيئا»

২৫৪. আশায়েরা সম্প্রদায় এ মত পোষণ করেছে।

হে বনী আদম! তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়ে অতি সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম। তা হচ্ছে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করেছো এবং শির্কে লিপ্ত হয়েছো।[২৫৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে এর চেয়ে কম ও সহজতর একটি বিষয় চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তা করোনি। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ হাদীছে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদেরকে বের করার কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ প্রথম মতের প্রবক্তাগণ আদম সন্তানদেরকে যেভাবে বের করার কথা বর্ণনা করেছেন প্রথম বর্ণনাতে তা উল্লেখ করা হয়নি।

অতঃপর ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম মতটি অর্থাৎ যদি বলা হয় প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ তা'আলা আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেছেন এবং তাদেরকে পরস্পরের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন, তাহলে এতে দু'টি আশ্চর্যজনক বিষয় আবশ্যক হয়।

(১) সমস্ত মানুষ তখন কথা বলেছে এবং রবের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, এর মাধ্যমে তাদের উপর কিয়ামতের দিন হুজ্জত কায়েম হবে।[২৫৬]

(২) আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকেই তার বংশধরকে বের করা হয়েছে।

আসলে একাধিক কারণে আয়াত তা প্রমাণ করে না।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছেন। আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে, এ কথা বলা হয়নি।

(২) তিনি বলেছেন যে, তাদের বংশধর বের করেছেন। তার পৃষ্ঠ দেশ থেকে বের করা হয়েছে, -এটি বলা হয়নি। এটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় بدل البعض অথবা بدل الاشتمال বলা হয়। আর বাদলুল ইশতেমাল হওয়াই অধিক উত্তম।

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাদের বংশধরদেরকে বের করেছেন। তার বংশধরদেরকে বের করা হয়েছে, এ কথা বলা হয়নি।[২৫৭]

---

২৫৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৫৭, মুসনাদে আহমাদ। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আদমের পৃষ্ঠেই তার সন্তানদেরকে তাওহীদের দলীল-প্রমাণ দেখানো হয়েছে এবং সম্বোধন করা হয়েছে। পৃষ্ঠদেশ থেকে বাহিরে আনয়ন করা হয়নি।

২৫৬. আসলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষ তখন কথা বলেছে এবং ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ কথা কুরআনে বলেছেন। ছ্বহীহ হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে। আল্লাহ তাআলা রূহ সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলিয়েছেন। যেমন তিনি অন্যান্য সৃষ্টিকে কথা বলিয়ে থাকেন।

২৫৭. এ তিনটি কথার মাধ্যমে ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আদমের সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকেই তাদের বংশধরকে বের করা হয়েছে। আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে নয়। কেননা বহুবচনের শব্দের মাধ্যমে

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ "তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন"। সাক্ষীদাতার জন্য সাক্ষ্যের বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। মানুষ শুধু দুনিয়াতে আগমন করার পর যে সাক্ষ্য দেয় তাই স্মরণ করে। এর আগের সাক্ষ্যের কথা তো কেউ মনে করছে না।

(৫) আল্লাহ তা'আলা এখানে সাক্ষ্য দেয়ার হিকমত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। আর তা হলো এর মাধ্যমে তিনি কিয়ামতের দিন মানুষের উপর দলীল কায়েম করবেন। যাতে কিয়ামতের দিন তারা এ কথা বলতে না পারে, ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ "আমরা তো এ কথা জানতাম না"। অথচ দলীল-প্রমাণ তো কায়েম করা হবে রসূলগণকে পাঠানোর মাধ্যমে এবং সেই ফিতরাতের মাধ্যমে যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

"সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আন নিসা ৪:১৬৫)*

(৬) এ আয়াতে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন এ কথা না বলে যে, ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ "আমরা তো এ কথা জানতাম না" *(সূরা আল-আরাফ:১৭২)*। আর এটি জানা কথা যে, আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা এবং সে সময় তাদের থেকে অঙ্গিকার নেয়ার কথা কোনো মানুষই জানে না।[২৫৮] সুতরাং কেউ তো এটি স্মরণ করছে না।

(৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾

উল্লেখ করার কারণে বুঝা যায় যে, পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে পুত্রদেরকে বের করা হয়েছে। এভাবে বনী আদমের সর্বশেষ লোকসমূহকে বের করা হয়েছে। আর যদি বলা হতো আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে, তাহলে শুধু আদম থেকে সরাসরি জন্মগ্রহণ করেছে, তাদেরকেই বুঝানো হতো। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদেরকে বুঝানো হতো না।

২৫৮. দু'ভাবে এ কথার জবাব দেয়া যেতে পারে। এখানে বের করা ও সাক্ষী বানানো সম্পর্কে গাফেল থাকলেও তাওহীদ সম্পর্কে তারা গাফেল ছিল না। বের করা ও সাক্ষী বানানোর উদ্দেশ্য এটিই। সুতরাং কিয়ামতের দিন তারা যেন এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা তাওহীদ সম্পর্কে গাফেল ছিলাম। কেননা তাদের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যেই তাওহীদ রয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো, দুনিয়ার জীবনে বের করা ও তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের কথা মনে না থাকলেও আখিরাতে স্মরণ করা এবং স্বীকার করা অসম্ভব নয়। অথবা অহংকারের কারণে তাদের কেউ কেউ অস্বীকার করতেও পারে। অথচ উচিত ছিল স্মরণ করা।

"অথবা তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, শির্কের সূচনা তো আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের পূর্বেই করেছিলো এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশে আমাদের জন্ম হয়েছে। তবে কি বাতিলপন্থীরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করছো?"। *(সূরা আল-আরাফ ৭:১৭৩)*

এখানে সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্যে দু'টি হিকমত উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) যাতে তারা অজ্ঞতার অযুহাত পেশ করতে না পারে।

(খ) বাপ-দাদাদের তাকলীদ তথা অন্ধ অনুসরণের অযুহাতও যেন পেশ করতে না পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি গাফেল, তার কোনো অনুভূতি থাকে না। আর মুকাল্লিদ অন্যের অনুসরণ করে। এ দু'টি হিকমত বাস্তবায়ন করার জন্য রসূল পাঠানো এবং তাওহীদের উপর সৃষ্টি করে দলীল-প্রমাণ কায়েম করার প্রয়োজন ছিল।[২৫৯]

(৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ "তবে কি বাতিলপন্থীরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করছো?" *(সূরা আল-আরাফ:১৭৩)*।

অর্থাৎ বাপ-দাদাদের কুফুরী ও শির্ক করার কারণে যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! বাতিলপন্থীরা যে অপকর্ম করেছে, তার কারণে কি তুমি আমাকে শাস্তি দিবে? আমরা তো বাতিলপন্থী নই। বরং আমরা তো কেবল মুকাল্লিদ। আমাদের বাপ-দাদারা শির্ক করেছে। আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তাই আমরা শির্কের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছি। সুতরাং অন্যের অপরাধের কারণে কিভাবে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন?

অথচ আল্লাহ তা'আলা তাকলীদের কারণে কাউকে শাস্তি দিবেন না। তিনি কেবল শাস্তি দিবেন রসূলদের বিরোধীতা করার কারণে এবং তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জনপদগুলোকে যুলুম সহকারে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হয়"। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রসূল পাঠানোর মাধ্যমে সতর্ক করা এবং সকল প্রকার ওযর-অযুহাত দূর করার পরই জনপদগুলোকে ধ্বংস করেন।

(৯) আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষ থেকেই এ সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি নিয়েছেন যে, তিনি তার প্রভু ও স্রষ্টা। তার কিতাবের অনেক জায়গাতেই তিনি এ স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যের দ্বারা দলীল-পত্র কায়েম করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

২৫৯. বস্তুত রসূল পাঠানো, তাওহীদের উপর সৃষ্টি করা এবং সাক্ষ্য নেয়া সবগুলোই ধর্তব্য। এখানে কোনো পারস্পরিক বৈপরিত্য নেই।

"এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। *(সূরা লুকমান: ২৫)*

এ সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির বিষয়কেই তাদের উপর তাদের সাক্ষী বানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রসূলগণ এ সাক্ষ্যের কথাই তাদের জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"তাদের রসূলগণ বলেছে, আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?" *(সূরা ইবরাহীম: ১০)*

(১০) আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে তার অস্তিত্ব ও তাওহীদে রুবুবীয়াতের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এ দলীলগুলো আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও উলুহীয়াতকে আবশ্যক করে। আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নির্দশনগুলো এ রকম। এগুলো তাওহীদের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি। আর এ জন্য করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে"।[২৬০] *(সূরা আল-আরাফ: ১৭৪)*

এখানে নিদর্শন বলতে ঐ ফিতরাত উদ্দেশ্য, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত তথা তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে। এ ফিতরাত ব্যতীত অন্য কিছুর উপর কোনো শিশুই জন্ম গ্রহণ করে না। এটি একটি মীমাংসিত বিষয়। এতে কোনো রদবদল নেই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ইমাম ইবনে আতীয়া এবং অন্যান্য ইমামগণ এ অর্থটি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তারা ঐ হাদীছগুলোর প্রকাশ্য অর্থ স্বীকার করতে ইতস্তবোধ করেছেন, যাতে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বনী আদমকে তাদের বাপদাদাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন। অতঃপর যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাইখ আবু মানসুর মাতুরীদি রহিমাহুল্লাহ শারহুত্ তাবীল গ্রন্থে এ উভয় মতই উল্লেখ করেছেন। উভয় মত উল্লেখ করার পর তিনি দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ রূহ জগতে আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের

---

২৬০. অর্থাৎ বিদ্রোহ ও বিকৃতি -বিভ্রান্তির নীতি পরিত্যাগ করে বন্দেগী ও আল্লাহর আনুগত্যের আচরণের দিকে যেন ফিরে আসে।

বংশধরদেরকে বের করে তাদের থেকে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি নেয়ার মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলার পর তিনি এ দিকেই ঝুকে পড়েছেন।

নিঃসন্দেহে তাওহীদে রুবুবীয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। তাদের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করে বাইরে থেকে। সন্তানেরা বাপদাদাদের তাকলীদ করেই শির্ক করে থাকে। কিয়ামতের দিন যখন তারা এ বলে ঝগড়া করবে যে, তাদের বাপদাদারা শির্ক করেছিল। আর তারা বাপদাদাদের অনুসরণ করেই শির্ক করেছে। যেমন পানাহার, বাসস্থান ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সন্তানেরা পিতাদের অনুসরণ করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তো স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে। আরো স্বীকার করতে যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের রব, তার কোনো শরীক নেই। তোমরা নিজেদের উপর নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়েছো। কোনো মানুষ নিজের উপর কোনো বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান করাকেই সাক্ষ্য প্রদান বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হয়ে যাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়"। *(সূরা আন নিসা: ১৩৫)*

এখানে এভাবে বলা উদ্দেশ্য নয় যে, আমি নিজের উপর এ সাক্ষ্য দিচ্ছি। বরং যে ব্যক্তি কোনো বিষয় স্বীকার করলো, সে নিজের উপর তার সাক্ষ্য দিল। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যেহেতু তাওহীদ সম্পর্কে জানতে পেরেছো, তার স্বীকৃতি প্রদান করেছো এবং তার উপর নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়েছো, তাই সে স্বীকৃতি থেকে সরে এসে শির্কের দিকে গেলে কেন? শুধু তাই নয়; জ্ঞাত ও নিশ্চিত বিষয়কে ছেড়ে অবাস্তব জিনিসের দিকে কেন গেলে? তোমরা কেন এমন লোকদের তাকলীদ করে শির্ক করতে গেলে, যাদের সাথে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। তবে পার্থিব জীবনের বিষয়াদির কথা ভিন্ন। এতে বাপদাদাদের তাকলীদ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে বাপদাদাদের তাকলীদ করার মধ্যেই সন্তানদের কল্যাণ রয়েছে। তবে তাদের তাকলীদ করে শির্ক করা মোটেই উচিত হয়নি। কেননা তোমাদের কাছে তাওহীদের ইলম ছিল এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দিয়েছিলে যে আল্লাহই তোমাদের রব। এ সাক্ষ্য দেয়াই শির্কের অসারতাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দেয়। সেই সঙ্গে তোমাদের অবস্থা আরো সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছো।

শিশু তার পিতা-মাতা থেকে যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা হলো প্রশিক্ষণ এবং অভ্যাসগত দীন ও জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন ও স্বার্থ লাভ করার জন্যই শিশু তার পিতা-মাতার অনুসরণ করে। কেননা শিশুর জন্য একজন পরিচর্যাকারী ও প্রশিক্ষক আবশ্যক। পিতা-মাতাই শিশুর পরিচর্যা করার সর্বাধিক উপযোগী। এ জন্যই ইসলামী শরীয়তের বিধানে দুনিয়ার বাহ্যিক হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে শিশু পিতা-মাতার দীনের অনুগামী হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এ দীনের উপর কোনো শিশু মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি

দিবেন না। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সে বিবেকবান হলে এবং তার উপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করা হলে তার উপর অহী এবং বিবেক-বুদ্ধি ভিত্তিক দীনের অনুসরণ করা আবশ্যক। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় যে, নাবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওহীদের যে দীন নিয়ে এসেছেন এবং আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশে তাদের থেকে তাওহীদের যেই স্বীকৃতি নিয়েছেন, তাই সঠিক দীন।

ঐ দিকে পিতা-মাতা যদি সঠিক দীনের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে শিশুও সঠিক দীনের অনুসারী হয়। যেমন সত্যবাদী ইউসুফ তার পিতাদের দীনের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾

"আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের দীন অনুসরণ করেছি" *(সূরা ইউসুফ:৩৮)*। ইয়াকুব আলাইহি সালাম তার সন্তানদেরকে বলেছেন,

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

"আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সবাই জবাব দিল আমরা সেই এক আল্লাহর ইবাদত করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তারই অনুগত মুসলিম"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৩৩)* তবে শিশুর বাপ-দাদারা যদি নাবী-রসূলদের বিরোধী হয়, তাহলে শিশুর উপর বাপদাদাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করে নাবী-রসূলদের অনুসরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

"আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার উপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না"। *(সূরা আনকাবুত: ৮)*

সুতরাং যে ব্যক্তি না জেনে ও না বুঝে বাপদাদার অনুসরণ করলো এবং তার নিকট সুবিদিত সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তা থেকে সরে দাঁড়ালো না সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

"তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা সে পথেই চলবো। যদিও তাদের বাপ-দাদাদের বিবেক-বুদ্ধি ছিল না এবং তারা সুপথগামী ছিল না তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?" *(সূরা আল-বাকারা: ১৭০)*

যারা ইসলামী সমাজে এবং ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের অনেকের অবস্থা ঠিক এ রকম। তাদের কেউ তার পিতার অনুসরণ করে। তার বাপ-দাদারা যে আক্বীদাহ ও মাযহাবের অনুসরণ করেছে, সেও তার অনুসরণ করতে চায়। যদিও সে আক্বীদাহ ও মাযহাব ভুল হয়ে থাকে এবং তার বাপদাদারা তাতে পূর্ণ প্রজ্ঞার উপর না থাকে। বরং তারা শুধু মুসলিমদের ঘরে জন্মগ্রহণকারী হিসাবে মুসলিম ছিল। জেনে-বুঝে ও দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তারা দীন ইসলামকে পালন করেনি। এ ধরণের লোককে যখন কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, من ربك তোমার প্রভু কে? জবাবে সে বলবে, হায় আফসোস! আমি তো এটি জানি না। লোকদেরকে একটি কথা বলতে শুনতাম। আমিও তা বলেছি।

সুতরাং বুদ্ধিমান লোকের উচিত এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, নিজেকে নসীহত করা এবং আল্লাহ তা'আলার পথে চলা। সে যেন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে এবং নির্ধারণ করে সে কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত? আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক প্রদানকারী। তাওহীদে রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করার জন্য কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয়না। মানুষের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই তাওহীদে রুবুবীয়াত ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। স্রষ্টার নিদর্শন ও তাওহীদের দলীল-প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্য মানুষের সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেয়া দরকার তার নিজের মধ্যে। সে ছিল এক সময় নগণ্য শুক্রবিন্দু। যা বের হয়েছে পিতার পৃষ্ঠদেশ ও মাতার বক্ষদেশ থেকে। অর্থাৎ মায়ের বুকের হাড্ডী থেকে। অতঃপর সেই শুক্রবিন্দু তিনটি অন্ধকারের মধ্যে একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়েছে। সেখানে পিতা-মাতা এমনকি সমস্ত সৃষ্টিকূলের কারো তদবীরের প্রয়োজন হয়নি। এ শুক্রবিন্দুটি যদি মায়ের গর্ভাশয়ের বাইরে কোনো পাত্রের মধ্যে কিংবা সংরক্ষিত স্থানে রেখে তাকে মানব আকৃতি প্রদান করার জন্য দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী লোক এক জোট হয়ে চেষ্টা করতো, তাহলেও তারা তাকে মানব আকৃতি দিতে সক্ষম হতো না। এতে প্রকৃতির কোনো প্রভাব নেই।[২৬১] সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টার কুদরতই এখানে কার্যকর হয়। কেননা শুক্রবিন্দু প্রথমে সম্পূর্ণ মৃত থাকে। এতে কোনো জীবন থাকে না। আসলে মৃতের কোনো কাজ ও

২৬১. শাইখ এখানে ঐসব প্রকৃতি বাদীদের জবাব দিয়েছেন, যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। যারা মনে করে সবকিছু প্রকৃতির নিয়মে কিংবা এমনিতেই সৃষ্টি হয়। শাইখ এখানে তাদের জবাব দিয়েছেন। মাতৃগর্ভে শুক্রকীট থেকে সুন্দর মানুষ তৈরীর বিষয়টি প্রকৃতিবাদীদের ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এটি মহান স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত এবং সুনিপুন কৌশলের প্রমাণ বহন করে। তিনটি অন্ধকারের মধ্যে তুচ্ছ মৃত একটি শুক্রকীট থেকে এত সুন্দর গঠনের মানুষের সৃষ্টিকে যারা প্রকৃতির নিয়মের দিকে সম্বন্ধ করে, তারা মূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। মূলত গ্রীক দর্শন থেকে প্রকৃতি বাদের ধারণা এসেছে। মূর্খ-অজ্ঞ মূর্তিপূজক গ্রীক জাতিই সর্বপ্রথম সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে প্রকৃতির দিকে সম্বন্ধ করার ধারণা উদ্ভাবন করে।

তদবীর থাকে না। অর্থাৎ মৃত শুক্রবিন্দু থেকে সুন্দর আকৃতির মানুষ তৈরী হওয়া কিংবা প্রাণী জগৎ তৈরী হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি মাতৃগর্ভের শুক্রকীট নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তার রূপান্তরের বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিবে সে এর মধ্যে তাওহীদে রুবুবীয়াতের দলীল-প্রমাণ খুঁজে পাবে। তাওহীদে রুবুবীয়াই বান্দাকে তাওহীদে উলুহীয়াতের দিকে নিয়ে যায়।

সুতরাং জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির দলীলের মাধ্যমে যখন কেউ জানতে পারবে যে, তার এমন এক মহান প্রভু রয়েছেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন সে তাকে বাদ দিয়ে কিভাবে অন্যের ইবাদত করতে পারে!! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বান্দা যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই স্রষ্টার প্রতি তার ইয়াকীন বৃদ্ধি পাবে এবং তাওহীদ সম্পর্কেও তার গভীর জ্ঞান লাভ হবে। বান্দা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে যে, আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো প্রভু নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দাতা।

(৪৭) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النار، جملة واحدة، فلا يزداد فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ, وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ"

মহান আল্লাহ আগে থেকেই জানেন, সর্বমোট কত সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে আর কত সংখ্যক লোক জাহান্নামে যাবে। এ সংখ্যায় কোনো কমবেশী হবে না। অর্থাৎ এ সংখ্যা কমবেও না, বাড়বেও না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবহিত।[২৬২]

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ " নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত"। *(সূরা তাওবা: ১১৫, সূরা আনফাল ৭৫)*

২৬২. এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহান স্রষ্টা তার সৃষ্টি এবং সৃষ্টির কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। অন্যথায় স্রষ্টার সৃষ্টিগুণে ত্রুটি প্রমাণিত হয়। আর আল্লাহ তা'আলা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতএব প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি সৃজন করার পূর্ব হতেই তার কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ "আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আহযাব: ৪০)*

সুতরাং আল্লাহ এভাবে বিশেষিত যে, তিনি সর্ববিষয়ে আদি থেকেই পূর্ণ অবগত রয়েছেন বর্তমানেও সেভাবে আছেন এবং অনন্তকাল তিনি সর্ববিষয়ে অবগত থাকবেন। সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে অবগত রয়েছেন যে, অতীতে কোনো সময় কোনো জিনিস সম্পর্কেই তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। আর তোমার প্রভু কোনো কিছুকে ভুলেও যান না।

আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ وقد كتب الله مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ: شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً». قال فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَقال مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثم قَالَ: اعملوا فكل ميسر لما خلق له «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ الآيَةَ.
(بخارى: ١٣٦٢)

"আমরা বাকী গোরস্থানের একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং বসলেন। আমরাও তার চার পাশে বসে গেলাম। তার হাতে ছিল ছোট্ট একটি লাঠি। তিনি নীচের দিকে মাথা ঝুকালেন এবং লাঠি দিয়ে যমীনে আঘাত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়নি এবং এও লেখা হয়নি যে, সে সৌভাগ্যবান না হতভাগ্য। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কি নির্ধারিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেবনা? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আমাদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান সে তো অবশ্যই সৌভাগ্যবানদের ন্যায় আমল করবে। আর আমাদের মধ্যে যে হতভাগ্য হিসাবে লিখিত তারা অচিরেই হতভাগ্যদের ন্যায় কাজ করবে। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

“যে ব্যক্তি দান করে ও তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে আরো সহজ করে দিব। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করলো ও বেপরোয়া হলো এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করলো, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিবো কঠিন পরিণামের পথ”। *(সূরা লাইল: ৫-১০)*[২৬৩]

(৪৮) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ"

যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। শেষ কর্ম দ্বারাই ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হতভাগ্য সে ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় হতভাগ্য বলে নির্ধারিত হয়েছে।

.....

ব্যাখ্যা: ইতিপূর্বে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ"، وَعَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ: "لَا، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ"، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ. مَا قَالَ؟ فَقَالَ: "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ"

তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে। যুহাইর রহিমাহুল্লাহ আবু যুবাইর থেকে বর্ণনা করেন যে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুরাকা বিন মালেক জু'শুম এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য দীনের মাসআলাসমূহ এভাবে বর্ণনা করুন যেন

২৬৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৬২, মুসলিম হা/২৬৪৭।

আমরা এখন সৃষ্টি হয়েছি। আমরা আজ কীসের জন্য আমল করবো? আমরা কি এমন জিনিস অর্জনের জন্য আমল করবো, যা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীরে নির্ধারিত হয়ে গেছে? না কি এমন জিনিসের জন্য আমল করবো, যা ভবিষ্যতে আমল অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে? জবাবে তিনি বললেন যে, না। বরং তোমরা এমন জিনিস অর্জনের জন্য আমল করবে, যা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীরে নির্ধারিত হয়ে গেছে? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে আমল করে লাভ কী? যুহাইর বলেন, অতঃপর আবু যুবাইর এমন কিছু কথা বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কী বলেছেন? তিনি বললেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, اعملوا فكل ميسر لما خلق له "তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে"।[২৬৪] ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

সাহ্ল বিন সা'দ আস্-সা'দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

"মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে। অথচ সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেউ জাহান্নামীদের আমলের ন্যায় আমল করে। অথচ সে জান্নাতী"।[২৬৫] ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী আরেকটু বাড়িয়ে বলেন যে, وإنما الأعمال بالخواتيم "শেষ কর্ম দ্বারাই মানুষের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়"।[২৬৬]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

---

২৬৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৪৮।

২৬৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৯৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১২।

২৬৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬০৭। সুতরাং যে ব্যক্তি সারা জীবন কুফুরী অবস্থায় জীবন যাপন করে, অতঃপর সে যদি মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে পূর্বেকার কুফুরী জীবনের কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না। এ ব্যক্তি ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করার কারণে জান্নাতী হবে।

পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি সারা জীবন ঈমানী হালতে থাকে এবং ঈমানের উপরই জীবন যাপন করে, কিন্তু মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে কুফুরী অবস্থায় ফিরে যায় এবং সে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার পূর্বেকার ঈমানী জীবন যাপনের কোনো প্রতিদান পাবে না। বরং তার শেষ পরিণতি কুফুরীর উপর হয়েছে বলে সে জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন।

«حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نطفة، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْـــغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يرســـل إليه الملك فينفخ فيه الروح وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يكتب رزقه وَأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وَشَـقِيٌّ أَوْ سَـعِيدٌ، فوالذي لاإله غيره إن أحدكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْـــبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِفيدخلها وَ إن أحدكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَلَ أَهْلِ بعمل أهل النار حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فيدخلها»

“রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন তা মাংস পিন্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এসময় তাকে চারটি বিষয় লেখার নির্দেশ দেয়া হয়: (১) সে কী পরিমাণ রিযিক পাবে। (২) বয়স কত হবে। (৩) কর্ম কি হবে এবং (৪) সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে। সে সত্তার শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই! তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তাক্দীরের লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের মতো আমল করে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করে। এমনিভাবে তোমাদের একজন জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তাক্দীরের লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মতো আমল করে। পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে”।[২৬৭]

তাক্বদীরের এ বিষয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং সালাফে সালেহীন থেকে বহু আছারও রয়েছে। ইমাম ইবনে আব্দিল বার ‘তামহীদ’ গ্রন্থে বলেন, তাক্বদীর সম্পর্কে আলেমগণ অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কালাম শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এ হাদীছগুলো সম্পর্কে ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক হওয়ার উপর ইজমা পোষণ করেছেন। সেই সঙ্গে তাক্বদীর নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক বর্জন করার উপরও আলেমদের ইজমা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া দীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচা অসম্ভব।

২৬৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী ৬৫৯৪, মুসলিম ২৬৪৩।

(৪৯) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الْأَنْبِيَاءِ: ٢٣]. فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ"

তাক্বদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটি সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি গোপন বিষয়; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো নাবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের স্তর। অতএব সাবধান! এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক থাকুন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীর সম্পর্কিত জ্ঞান তার সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ "তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং তারা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা আম্বিয়াঃ ২৩)* অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞাসা করবে তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

.....

ব্যাখ্যাঃ তাক্বদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটি সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি বিষয়। অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই ধ্বংস করেন, তিনিই কাউকে ফকীর বানান, তিনিই ধনী বানান, তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই গোমরাহ করেন এবং তিনিই হিদায়াত দান করেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাক্বদীর হলো আল্লাহর গোপন রহস্য। সুতরাং আমরা এটি উন্মুক্ত করার চেষ্টা করবো না। এ মাস'আলা সম্পর্কে মানুষের মতভেদ খুবই প্রসিদ্ধ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে সবকিছুই আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণ অনুপাতেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই বান্দার কর্মের স্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ"। *(সূরা কামার: ৪৯)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"এবং তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। *(সূরা আল-ফুরকান: ২)*

কাফের যেই কুফুরী করে তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়; কিন্তু তিনি কুফুরীকে পছন্দ করেন না। তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে কুফুরী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু দীন হিসাবে পছন্দ করেন না।

কাদারীয়া ও মুতাযেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে।[২৬৮] তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের থেকে ঈমান সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কাফের কুফুরীর ইচ্ছা করে। তারা এমন ধারণা থেকে বাঁচার জন্য এ কথা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কুফুরী সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং কুফুরী করার কারণেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। আসলে তাদের অবস্থা হলো ঐ লোকের মতো যে উত্তপ্ত বালুর উপর দাড়িয়ে থাকার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আগুনে ঝাপ দিয়েছে। কেননা তারা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর জিনিস থেকে পালিয়ে এসে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্মের স্রষ্টা, আর বান্দার কর্মের মধ্যে যেহেতু ভালো-মন্দ উভয়ই রয়েছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দিকে মন্দের সম্বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা বলেছে বান্দার কর্ম বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে। এখন যেই সমস্যাটি হলো, তাদের পূর্বেরটির চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। এতে করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা জয়লাভ করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, কাফের ঈমান আনয়ন করুক। এ ক্ষেত্রে কাফের যদি ঈমান না আনে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা জয়লাভ করেছে। নাউযুবিল্লাহ। কেননা তাদের মতেও আল্লাহ তা'আলা কাফের থেকে ঈমান সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন। আর কাফের কুফুরী করার ইচ্ছা করেছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়ন না হয়ে কাফেরের ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে!! সে সঙ্গে এরূপ বিশ্বাস থেকে একাধিক স্রষ্টাও সাব্যস্ত হয়ে যায়!! এ আক্বীদাহ হচ্ছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট

---

২৬৮. ছাহাবীদের যুগের পর থেকেই এ মাস'আলায় মতভেদ শুরু হয়েছে। তারা সকলেই তাকদীরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের যুগে এ মাসআলাতে কোনো দ্বিমত ছিল না। তাদের যুগের একদম শেষপ্রান্তে এ মাস'আলায় মতভেদ শুরু হয়। তখন কেবল আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এবং ইবনে আব্বাসসহ মাত্র কয়েকজন ছাহাবী জীবিত ছিলেন। তারাও তাকদীর অস্বীকার কারীদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। এ মাস'আলায় মতভেদ করা থেকেই উম্মতের মধ্যে শির্কের সূত্রপাত ঘটেছে।

আক্বীদাহ। এ কথার উপর কোনো দলীল নেই। বরং এটি কুরআন ও হাদীছের দলীলের সুস্পষ্ট বিপরীত।

বাকীয়া ইবনুল ওয়ালীদ রহিমাহুল্লাহর হাদীছ থেকে ইমাম আওযাঈর সনদে লালাকায়ী বর্ণনা করেন যে, আমাদের কাছে আলা ইবনুল হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন উবাইদ আল-মক্কী, তিনি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমাদের কাছে একজন লোক এসেছে, যে তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। জবাবে তিনি বললেন, আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বললো, আপনি তাকে কী করবেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমি যদি সক্ষম হই, তাহলে আমি তার নাক কেটে ফেলবো। আমি যদি তার ঘাড় ধরতে পারি, তাহলে তার ঘাড় মটকিয়ে ফেলবো। কেননা আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَفِقُ أَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ

"আমি যেন বনী ফিহিরের মহিলাদেরকে দেখছি, তারা মুশরিক অবস্থায় তাদের নিতম্ব নাড়াতে নাড়াতে খাযরাজ গোত্রে বিচরণ করছে"।

তারা এমনভাবে কোমড় নাড়াচ্ছে, যাতে তাদের একজনের নিতম্ব অন্যজনের নিতম্বে লেগে যাচ্ছে। এ হচ্ছে দীন ইসলামের মধ্যে প্রথম শির্ক। আল্লাহর শপথ! তাদের এ নিকৃষ্ট মতবাদ তাদেরকে এ পর্যন্ত নিয়ে ঠেকাবে যে, তারা বলবে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকর বিষয়গুলো সৃষ্টি করেননি, যেমন তারা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা মনে করেনি"।[২৬৯]

গ্রন্থকারের কথা, এ হচ্ছে দীন ইসলামের মধ্যে প্রথম শির্ক, এখান থেকে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য।

তাকদীরে বিশ্বাস করা তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসকে সুশৃঙ্খল করে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার একত্বে বিশ্বাস করবে, কিন্তু তাকদীরে অবিশ্বাস করবে তার এ মিথ্যারোপ তাওহীদকে ত্রুটিযুক্ত করে।[২৭০] আমর বিন হায়ছাম বলেন, আমরা একদা নৌকায় আরোহন করলাম। নৌকাতে আমাদের সাথে একজন অগ্নিপূজক এবং একজন তাকদীরে অবিশ্বাসী মুসলিম ছিল। তাকদীরে অবিশ্বাসী লোকটি অগ্নিপূজককে বলল, ইসলাম কবুল করো। অগ্নিপূজক বলল, আল্লাহ তা'আলা চাইলে ইসলাম গ্রহণ করবো। তাকদীরে অবিশ্বাসী মুসলিম বলল, আল্লাহ তা'আলা তো চায় যে তুমি মুসলিম হয়ে যাও। কিন্তু শয়তান তা চায় না। অগ্নিপূজক বলল, তোমার কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ চান আমি মুসলিম হয়ে যাই, কিন্তু

২৬৯. হাদীছটি যঈফ। দেখুন ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহর টিকাসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং-২৪৪।
২৭০. যঈফ।

শয়তান তা চায় না। তাহলে তো শয়তানের ইচ্ছাই জয়লাভ করেছে। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে শয়তানই আল্লাহর চেয়ে বেশী শক্তিশালী! আমি অধিক শক্তিশালীর সাথেই থাকবো। নাউযুবিল্লাহ

আসল কথা হলো কাদারীয়া বা মুতাযেলারা বান্দার কর্মে বান্দাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। ভালো-মন্দ সবকিছু যে আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়, তাতে তারা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে মন্দ কাজগুলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নয়। এগুলো বান্দা নিজেই সৃষ্টি ও সম্পাদন করে। তাই তাদের মতে বান্দার কুফুরীতে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কাফের থেকে ঈমানের ইচ্ছা করলেও কাফের না চাইলে কাফেরের ইচ্ছাই জয়লাভ করে।

বর্ণিত আছে যে, তাকদীরে অবিশ্বাসী মুতাযেলী ইমাম আমর বিন উবাইদ একদা ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিল। তখন একজন গ্রাম্য লোক এসে বলল, হে লোক সকল! আমার উট চুরি হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে আপনারা দুআ করুন, তিনি যেন আমার উটটি আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। আমর বিন উবাইদ তখন বলল, হে আল্লাহ! তুমি চাওনি যে, তার উট চুরি হোক। তারপরও চুরি হয়েছে। এখন তুমি তার উটটি ফিরিয়ে দাও। এতে গ্রাম্য লোকটি বলল, আমার জন্য তোমার দু'আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমর বিন উবাইদ বলল, কেন? আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যেহেতু চুরি হয়েছে, তাই এখন তিনি ফিরিয়ে দিতে চাইলেও সম্ভবত ফিরিয়ে দিতে পারবেন না!!

জনৈক ব্যক্তি আবু ইসাম কুস্তুল্লানিকে বলল, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করে গোমরাহিতে নিক্ষেপ করেন, অতঃপর শাস্তি দেন, তাহলে আপনার অভিমত কী? এরপরও কি আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারী হবেন? আবু ইসাম এতে বললেন, হিদায়াতের মালিক যেহেতু আল্লাহ তা'আলা, তাই তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করবেন। যাকে ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করবেন।

আর কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দলীল প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

"আমি যদি চাইতাম তাহলে পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছি যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো"। *(সূরা সাজদা: ১৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

"যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো তাহলে সারা দুনিয়াবাসী ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের উপর জবরদস্তি করবে?"। *(সূরা ইউনুস: ৯৯)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না"। আল্লাহ তা'আলা সূরা দাহারের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান"। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১২৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে"।

অর্থাৎ জোর খাটিয়ে যেমন আকাশের দিকে উঠা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ যার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন তার মধ্যে ঈমান ও তাওহীদের আলো ঢুকানো সম্ভব হয়না। আল্লাহ তা'আলা তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে না দেয়া পর্যন্ত তাতে ঈমান ও তাওহীদ প্রবেশ করে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন"।

যারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং ভালোবাসা ও পছন্দকে একই রকম মনে করে, তাদের থেকেই মূলত গোমরাহির উৎপত্তি হয়েছে। জাবরীয়া ও মুতাযেলারা প্রথমত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ভালোবাসাকে এক সমান মনে করেছে। অতঃপর জাবরীয়ারা মুতাযেলাদের থেকে আলাদা হয়ে বলেছে, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ও নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং সৃষ্টিজগতে যা কিছু হয়, সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও পছন্দ অনুপাতেই হয়ে থাকে।[২৭১]

২৭১. তাদের এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল। সৃষ্টিজগতে যা কিছু হয়, সবই আল্লাহর পছন্দ অনুপাতে হয় না। আল্লাহ তা'আলা পাপাচার সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে নিষেধ করেছেন। পাপাচারী থেকে যে পাপাচার সংঘটিত হয়, তাও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়; কিন্তু তিনি উহাকে পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে তিনি আনুগত্যের কাজসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং

আর তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে পাপাচার প্রিয় নয়। তিনি তা পছন্দও করেন না। সুতরাং তিনি তা সৃষ্টি, নির্ধারণ ও পছন্দ করেননি। পাপাচার তার ইচ্ছা ও সৃষ্টির বাইরে।

কুরআন ও সুন্নাহর বহু দলীল-প্রমাণ এবং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা সম্পর্কিত কিছু দলীল ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু দলীল উল্লেখ করবো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ "আল্লাহ বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না"। *(সূরা আল-বাকারা: ২০৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ "কিন্তু তিনি তার বান্দার জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না"। *(সূরা আয-যুমার: ৭)*

আল্লাহ তা'আলা শির্ক, যুলুম, অশ্লীলতা, অহঙ্কার এবং অন্যান্য পাপাচার থেকে নিষেধ করার পর বলেন, ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

"এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৮)*

ছ্বহীহ বুখারীতে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّ اللَّهَ كره لَكُمْ ثلاثا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। তোমাদের জন্য অর্থহীন কথা বলা, বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেছেন"।[২৭২]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

আল্লাহ যেসব কাজের অনুমতি দিয়েছেন, তা গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন। আর তিনি অপছন্দ করেন পাপাচারে লিপ্ত হওয়াকে।[২৭৩] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আতে বলেছেন,

---

বান্দাদেরকে তা বাস্তবায়ন করার হুকুম করেছেন। আনুগত্যের কাজ বাস্তবায়ন হওয়াকে তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন।

২৭২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪৭৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৩।

২৭৩. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৫৮৬৬।

«أللهم إني أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وأعوذبك منك»

“হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির উসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার ক্ষমার উসীলায় তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার আযাব থেকে তোমার কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি।[২৭৪]

প্রিয় পাঠক! আপনি লক্ষ্য করুন! নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ছ্বিফাতের মাধ্যমে তার ক্রোধ থেকে এবং তার ক্ষমা করে দেয়া ছ্বিফাতের মাধ্যমে শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। উপরোক্ত ছ্বিফাতগুলোর মধ্যে সন্তুষ্টি নামক ছ্বিফাতটির প্রভাব হলো ক্ষমা এবং ক্রোধ নামক ছ্বিফাতটির প্রভাব হলো শাস্তি দেয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে আল্লাহ তা‘আলার এক ছ্বিফাতের উসীলায় অন্য ছ্বিফাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো মূল ছ্বিফাত আর দ্বিতীয়টি হলো তার প্রভাব। দু‘আটির শেষে সবগুলো ছ্বিফাতকেই আল্লাহ তা‘আলার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মূলত সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে।

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। আমি যা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তা তোমার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং তোমার যেই সন্তুষ্টি ও ক্ষমার উসীলায় তোমার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাও তোমার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। তুমি যদি ইচ্ছা করো, তাহলে তোমার বান্দার উপর সন্তুষ্ট হবে এবং তাকে ক্ষমা করে দিবে। আর ইচ্ছা করলে তুমি তার উপর ক্রোধান্বিত হবে এবং তাকে শাস্তি দিবে।

সুতরাং আমি যা অপছন্দ করি, তা থেকে আমার আশ্রয় প্রার্থনা এবং তা আমার উপর আপতিত হওয়াতে বাধা প্রদান করাও তোমার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। প্রিয়-অপ্রিয় সবই তোমার ফায়ছালা ও ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। তোমার শাস্তি থেকে তোমার কাছেই আমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার শক্তি, ক্ষমতা ও রহমতের উসীলায় ঐ বিপদাপদ, অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা তোমার শক্তি, ইনসাফ ও হিকমতের কারণে হয়ে থাকে।

তুমি ব্যতীত অন্য কারো ক্ষতি থেকে অন্যের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি না এবং তোমার কাছে এমন কোনো ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি না, যা তোমার অনিচ্ছায় প্রকাশিত হয়। বরং তা তোমার নিকট থেকেই আগমন করে। উপরোক্ত কথাগুলোতে তাওহীদের যে পরিমাণ মারেফত এবং আল্লাহ তা‘আলার উবুদীয়াত রয়েছে, তা কেবল আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, তার মারেফত এবং প্রকৃত উবুদীয়াত সম্পর্কে অবগত আলেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

---

২৭৪. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ ১৪২৭।

ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস সৃষ্টি করার তাৎপর্য বা হেকমত

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এমন জিনিসের ইচ্ছা করেন যা তিনি পছন্দ করেন না ও ভালোবাসেন না? তিনি কিভাবে এর ইচ্ছা করেন ও তৈরি করেন? কিভাবে তিনি একই সাথে তার ইচ্ছা করেন এবং ঘৃণা করেন।

এ প্রশ্ন থেকেই উম্মত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। এ থেকেই তাদের মত ও পথ বিভিন্ন হয়েছে। এ জাতিয় প্রশ্নের জবাবে ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা দুই প্রকার।

(১) যা মূলগত দিক থেকেই আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন। যেমন ঈমান ও আনুগত্যের কাজগুলো তিনি মূলগত দিক থেকেই পছন্দ করে সৃষ্টি করেছেন। মুমিনদের থেকে তিনি চেয়েছেন যে, তারা এগুলো বাস্তবায়ন করুক।

(২) যা মূলগত দিক থেকে ইচ্ছা করেননি: বরং অন্য কারণে ইচ্ছা করেছেন। যেমন তিনি পাপাচারকেও সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু মূলগত দিক থেকে এগুলোকে ভালোবেসে সৃষ্টি করেননি। বরং অন্য একটি উদ্দেশ্যে তথা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

যা তিনি মূলগত দিক থেকে ইচ্ছা করেছেন এবং তাতে যেই কল্যাণ রয়েছে তা মূলতই প্রিয়।[২৭৫] তাকে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি স্বীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন।

---

২৭৫. উদাহরণ স্বরূপ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। এটি আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের অন্যতম একটি কর্ম। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। মূলতই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার মধ্যে বিরাট কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত থেকেই প্রিয়।

আর আল্লাহ যা অন্য কারণে ও বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নাও থাকতে পারে এবং তার ব্যক্তিসত্তার দিকে দৃষ্টি দিলে সেখানে কোনো মঙ্গল নাও দেখা যেতে পারে। কিন্তু অন্য একটি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাধ্যম স্বরূপ তাকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ধরুন আল্লাহ তাআলা ইবলীসকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে সৃষ্টি করা মূলগত দিক থেকে উদ্দেশ্য নয়, তার ব্যক্তিসত্তার দিকে তাকালে দেখা যায় তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার হেকমতের দাবি এই যে, তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক শ্রেণী হবে কাফের আরেক শ্রেণী হবে মুমিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً "আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (সূরা হুদ: ১১৮) কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন নি। তার হেকমতের দাবি হলো মানুষ দু'টি জাতিতে বিভক্ত হবে। সুতরাং আদি থেকে এই হলো হেকমতের দাবি। এই মর্মে আল্লাহ তাআলার ফায়ছালা হয়ে গেছে যে, একদল মানুষ জান্নাতে যাবে আরেক দল যাবে জাহান্নামে। এটি একটি মীমাংসিত বিষয়।

ইবলীস নামক অকল্যাণটি মূলত উদ্দেশ্য নয়, সে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয়ও নয়। তবে তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অন্য একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তা হলো তার কারণে একদলকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং আরেকদলকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে পছন্দ করে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেননি;

আর যা অন্য কারণে ইচ্ছা করেছেন, তা দ্বারা তিনি সরাসরি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন না। তার ব্যক্তিসত্তার দিকে তাকালে তাতে কোনো কল্যাণও দেখা যায় না। তবে এ কথা সঠিক যে ইবলীসকে সৃষ্টি করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার অন্য একটি মাকসুদ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং ইবলীস তার নফ্স ও সত্তার দিক থেকে নিন্দিত ও ঘৃণীত। কিন্তু বিশেষ একটি হেকমত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ইবলীসকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল।

ইবলীস সৃষ্টির মধ্যে দু'টি বিষয় একসাথে মিলিত হয়েছে। তাকে ঘৃণা করা এবং তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা। বিষয় দু'টি পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কেননা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। বিষয়টি ঠিক অরুচিকর ঔষধের ন্যায়। মানুষ যখন জানতে পারে যে, অরুচিকর ঔষধের মধ্যে তার আরোগ্য রয়েছে, তখন সে তিতা লাগলেও তা সেবন করে। কারণ তা পান করার মধ্যে তার স্বার্থ রয়েছে।

ঠিক এমনি মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গে যখন পচন ধরে, তখন সে যদি জানতে পারে যে, তা কেটে ফেলে দেয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ রয়েছে, তাহলে অপছন্দ হলেও সে শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলে। কেননা সে বুঝতে পেরেছে যে, অঙ্গটি কেটে ফেলাই শরীরের বাকী অংশের জন্য নিরাপদ। মুসাফির যখন জানতে পারে যে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার মধ্যে তার কল্যাণ রয়েছে এবং তা অতিক্রম করার মাধ্যমে সে প্রিয় বস্তু লাভ করতে পারবে, তখন কষ্ট লাগলেও বহু দূরের পথ ভ্রমণ করে।[২৭৬] প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষই এ অপছন্দনীয় কাজগুলো করার ইচ্ছা করে এবং প্রবল ধারণা রাখে যে, এতে তার কল্যাণ রয়েছে। যদিও তার কাছে অনেক ক্ষেত্রে পরিণাম অস্পষ্ট থাকে।

বরং অন্য কারণে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইবলীসকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার হেকমত এভাবে পূর্ণ হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ ইবলীসের অবাধ্য হয়ে জান্নাতে যাবে আরেক শ্রেণীর মানুষ তার আনুগত্য করে জাহান্নামে যাবে। সুতরাং ইবলীস সৃষ্টি করার ফলে অনেক স্বার্থ অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার মহা হিকমত বাস্তবায়ন হয়েছে। যদিও সত্তাগত দিক থেকে ইবলীস খুবই নিকৃষ্ট, মূলগত দিক থেকেও সে অপ্রিয়। তবে তার মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহর ফায়ছালার দিকে পৌঁছা যায় এবং হেকমত বাস্তবায়ন হয়, তাই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

২৭৬. মানুষ হাজার হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে মক্কায় আগমণ করে। দিন-রাত অনেক কষ্ট করে আল্লাহর ঘরের নিকট উপস্থিত হয়। আল্লাহর ঘর দেখে সে আনন্দ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই জিনিস একদিক থেকে কষ্টকর। কিন্তু উহাতে যেই ফলাফল ও সুখ-শান্তি অর্জিত হয়, তার দিকটা বিবেচনায় খুব ভালো। সুতরাং একই জিনিস একদিক থেকে প্রিয় এবং মূলগত দিক থেকে অপ্রিয় হওয়ার কারণে উহা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কোনো ডাক্তার যদি তার রোগীকে বলে তোমার এই অঙ্গটি কেটে ফেললে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ৮০% কিংবা ৭০%, তাহলে রোগী অঙ্গ কেটে ফেলতে রাযি হয়ে যায়। এখানে রোগী আরোগ্য লাভের ৮০% বা ৭০% সম্ভাবনা থাকার কারণেই মনের মধ্যে ভালো একটি প্রিয় আশা নিয়ে কষ্টকর এবং অপছন্দনীয় একটি কাজ করে ফেলে। সুতরাং তার প্রিয় আশাটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত নয়।

সাধারণ একটি আল্লাহর সৃষ্টি যেখানে পরিণাম সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত না হয়েই ভালো ফলাফলের আশা নিয়ে একটি ঝুকিপূর্ণ ও কষ্টকর কাজের দিকে অগ্রসর হয়, সেখানে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সবকিছু অবগত, মন্দ বিষয় সৃষ্টি করা থেকে কল্যাণ ও ভালো ফলাফল অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তাই তার জন্য মন্দ জিনিস সৃষ্টি করা মোটেই দোষণীয় নয়।

সুতরাং যেই মহান সত্তার কাছে কোনো কিছুই অস্পষ্ট নয়, তিনি এমন অপছন্দনীয় বস্তু সৃষ্টি করবেন না কেন, যার পরিণাম ভালো হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকে অপছন্দ করেন। এ অপছন্দ করা তাকে অন্য একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করার পরিপন্থি নয়। কেননা তা সৃষ্টি করার মাধ্যমে এমন একটি প্রিয় জিনিস হাসিল হয়, যা তা সৃষ্টি না হলে হত না। উদাহরণ স্বরূপ ইবলীস সৃষ্টি করার বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। এ ইবলীসই মানুষের দীন, আমল, আক্বীদাহ এবং সৎ ইচ্ছা ধ্বংসের মূল কারণ। সে অনেক বনী আদমের দুর্ভাগ্যের কারণে পরিণত হয়েছে। এ ইবলীসের কারণেই মানুষ এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়, যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের শিকার হয়। ইবলীস আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রিয় আমলগুলোর বিপরীত কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণ। এত কিছু সত্ত্বেও তাকে সৃষ্টি করার কারণে আল্লাহ তা'আলার অনেক প্রিয় জিনিস অর্জিত হয়। সুতরাং ইবলীস না থাকার চেয়ে থাকাই ভালো।

(১) পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিস সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের নিকট স্বীয় কুদরত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ নিকৃষ্টতম অপদার্থটি সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক পাপাচারের মূল কারণ হলো এ শয়তান। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিবরীলের বিপরীতে সৃষ্টি করেছেন। জিবরীল হলেন সৃষ্টিকূলের সকল প্রকার কল্যাণের মাধ্যম।[২৭৭]

সকল কল্যাণের মূলেই রয়েছেন তিনি। আসমান থেকে তিনিই সমস্ত নাবী-রাসূলের নিকট অহী নিয়ে আগমন করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ এটি সৃষ্টি করেছেন ঐটিও সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তার কুদরত প্রকাশিত হয়েছে। যেমন তিনি দিন সৃষ্টি করেছেন। তার বিপরীতে রাত সৃষ্টি করেছেন। তিনি রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন, তার বিপরীতে চিকিৎসা সৃষ্টি করেছেন। জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন, ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিই যদি ভালো হতো, তাহলে বুঝা সম্ভব ছিল না যে, এগুলো ভালো। সুতরাং মন্দের মন্দত্ব অনুভব করা ব্যতীত ভালোর ভালোত্ব বুঝা সম্ভব নয়। তিনি তাওহীদ ও শির্ক সৃষ্টি করেছেন, সুন্নাত ও বিদআত সৃষ্টি করেছেন, আনুগত্য ও পাপাচার সৃষ্টি করেছেন এবং অলী-আওলীয়া ও আল্লাহর দুশমন সৃষ্টি করেছেন, মুত্তাকী ও পাপাচারী সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির এ বৈপরিত্য তার পরিপূর্ণ কুদরত, শক্তি, রাজত্ব এবং ক্ষমতার উৎকৃষ্টতম দলীল। তিনি এ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন। এগুলো থেকে কতকের বিপরীত অন্য কতককে সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে তিনি তার পরিচালনা ও তদবীরের মহল বানিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টিজগত থেকে কিছু সৃষ্টি যদি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হেকমত ও তার রাজত্বের পরিপূর্ণ পরিচালনা ও পরিচর্যার মধ্যে ত্রুটি দেখা দিবে।

---

২৭৭. এখানে লেখকের এটি উদ্দেশ্য নয় যে, জিবরীল সর্বোত্তম সৃষ্টি। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বোত্তম সৃষ্টি।

(২) ইবলীস ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার পিছনে আরো যেসব হেকমত রয়েছে, তার মধ্য থেকে আরেকটি হেকমত হলো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপশালীতা সংক্রান্ত নামগুলোর প্রভাব সৃষ্টির উপর পতিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার নামগুলোর মধ্যে রয়েছে, القَهَّار (পরাক্রমশালী), المنتقم (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), العدل (ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী), الضَّـــار (ক্ষতিকারক), شديد العقاب (কঠিন শাস্তি প্রদানকারী), سريع العقاب (দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী, ذو البطش الشـــديد (কঠোরভাবে পাকড়াওকারী), الخَافِض (নিচুকারী), المذل (অপদস্তকারী) ইত্যাদি। কেননা আল্লাহ তা'আলার এ অতি সুন্দর নাম ও কর্মগুলো তার কামালিয়াত তথা পূর্ণতার পরিচায়ক। এমন কিছু সৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, যাদের উপর এ ছিফাতগুলোর প্রভাব পড়তে পারে। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে যদি এমন কিছু সৃষ্টি না থাকতো, যাদেরকে পরাভুত করা হবে, যাদের হিসাব নেয়া হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, তাহলে القهار নামের প্রভাব প্রকাশ পেতো না। অনুরূপ অপরাধী না থাকলে ذو البطش الشـــديد (কঠোরভাবে পাকড়াওকারী) ছিফাতের প্রভাব প্রকাশ পেতো না, নীচু হওয়ার যোগ্য কেউ না থাকলে الخَافِض (নিচুকারী) নামের প্রভাব প্রকাশ পেতো না। অপমানিত হওয়ার যোগ্য কেউ না থাকলে المـــذل (অপদস্তকারী) নামের প্রভাব প্রকাশিত হতো না।[২৭৮] অন্যান্য নামের ক্ষেত্রে কথা একই।

(৩) ইবলীস ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার পিছনে আরো যেসব হেকমত রয়েছে, তার মধ্যে আরেকটি হেকমত হলো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত নামের প্রভাব বান্দাদের উপর পড়বে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে তার সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা এবং তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেয়ার অর্থ। তিনি যদি এমন কোনো অপছন্দনীয় কাজ সৃষ্টি না করতেন, যা এ সমস্ত অতি সুন্দর নামগুলোর প্রভাব প্রকাশ হওয়ার কারণ হয়, তাহলে তার নামগুলোর হেকমত ও উপকারীতা অকেজো হয়ে যেত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»

২৭৮. এ সমস্ত নাম তার বিপরীত অর্থবোধক নাম উল্লেখ ছাড়া আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা শোভা পায় না। এগুলো যদি এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে পূর্ণতার স্থলে অপূর্ণতা ও ত্রুটি বুঝায়। যেমন النَّافِع الضَّار (ক্ষতিকারক ও কল্যাণকারী), الخَافِض الرَّافِع (নিচুকারী ও উত্তোলনকারী), الْمُعْطِي الْمَانِع (দাতা ও প্রতিরোধকারী), المعِزُّ المذِلُّ (সম্মানদাতা ও অপমানকারী) ইত্যাদি। সুতরাং এককভাবে শুধু الضَّار, الخَافِض, الْمَانِع এবং المذِلُّ ব্যবহার করা জায়েয নেই।

"তোমরা যদি অপরাধ না করতে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে এমন লোক সৃষ্টি করতেন, যারা অপরাধ করার পর তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন"।[২৭৯]

(৪) ইবলীস ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার পিছনে আরো যেসব হেকমত রয়েছে, তার মধ্য থেকে আরেকটি হেকমত হলো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কিত নামসমূহের প্রভাব প্রকাশিত হয়। কেননা তিনি হলেন প্রজ্ঞাবান ও সুবিজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক জিনিসকে যথাস্থানে স্থাপন করেন এবং প্রত্যেক জিনিসের জন্য যেই স্থান উপযুক্ত তিনি তাকে সেখানেই রাখেন। তিনি কোনো জিনিসকে তার নির্দিষ্ট স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখেন না। তার পরিপূর্ণ ইলম, হেকমত ও জ্ঞান যে জিনিস যে স্থানে রাখার দাবি করে, তাকে তিনি সেই স্থান বাদ দিয়ে অন্য স্থানে রাখেন না। তিনি কাকে রসূল বানাবেন তা তিনিই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি আরো অবগত আছেন যে, কে রেসালাত কবুল করার জন্য বেশী উপযোগী এবং কে তা পেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ হবে। কে রিসালাতের উপযুক্ত নয়, তিনি তাও জানেন। তিনি যদি অপছন্দনীয় কাজকর্ম সৃষ্টি না করতেন, তাহলে অনেক হেকমত বাতিল হয়ে যেত এবং বহু উপকার ছুটে যেত। মন্দ জিনিসগুলোর মধ্যে যেই ক্ষতি রয়েছে, তার কারণে যদি সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে উক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষতি রয়েছে, তার তুলনায় বহুগুণ বড় উপকার হাত ছাড়া হতো। এটি ঠিক সূর্যের তাপ, বৃষ্টি এবং বাতাসের ক্ষতির মতই। তাতে যে পরিমাণ ক্ষতি রয়েছে, তার তুলনায় উপকার অনেক বেশী।

(৫) ইবলীস ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার পিছনে আরো যেসব হেকমত রয়েছে, তার মধ্য থেকে আরেকটি হেকমত হলো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্যে ভিন্নতা আসে। ইবলীস ও তার বাহিনী সৃষ্টি না করা হলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফযীলত অর্জন এবং তার রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ বঞ্চিত হতো। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা যদি শুধু ভালো আমলই সৃষ্টি করতেন এবং সমস্ত মানুষই যদি মুমিন হতো, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তার আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো বাতিল হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং তার জন্যই কাউকে শত্রু বানানোর ইবাদতটি অচল হয়ে যেত। সেই সঙ্গে সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজের নিষেধ করা, আল্লাহর পথে ধৈর্য ধারণ করা, কুপ্রবৃত্তির বিরোধীতা করা, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আমলকে প্রাধান্য দেয়া, তাওবা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, যাতে করে তিনি বান্দাকে তার শত্রু এবং শত্রুর ষড়যন্ত্র ও কষ্ট থেকে নিরাপত্তা দান করেন। ইবলীস ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার পিছনে এমনি আরো অনেক হেকমত রয়েছে, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে অক্ষম।

---

২৭৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৪৯।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, ইবলীস, কুফুরী, পাপাচার, অকল্যাণ ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি না করে উপরোক্ত স্বার্থগুলো হাসিল করা কি সম্ভব ছিল না?

এ প্রশ্নটি মূলতই ভুল। এতে গাছ রোপন করা ছাড়াই ফল কামনা করার ধারণাকে আবশ্যক করে। বিবাহ করা ছাড়াই সন্তান পাওয়ার ধারণাকে আবশ্যক করে। নড়াচড়াকারীর অস্তিত্ব ব্যতীত কোনো কিছুর নড়াচড়া আবশ্যক করে। তাওবাকারী ব্যতীত তাওবার অস্তিত্বকে আবশ্যক করে।[২৮০]

কেউ যদি আপনাকে বলে আল্লাহ তা'আলা কি বিবাহ ছাড়া আমাকে সন্তান দিতে পারেন না? আপনি অবশ্যই বলবেন, এটি একটি বাতিল প্রশ্ন। কারণ আল্লাহ তা'আলা এভাবে তোমাকে সন্তান দেয়ার ইচ্ছাই করেননি। তিনি চেয়েছেন, বান্দা নিজে উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ফলাফল প্রদান করবেন। তিনি চেয়েছেন, বান্দা বিবাহ করবে। এর মাধ্যমে সে দুনিয়ার সর্বাধিক আনন্দ উপভোগ করবে, তার যৌন ক্ষুধা হালালভাবে নিবারণ করবে এবং চক্ষু শিতলকারী সন্তানাদিও লাভ করবে।

অতঃপর যদি প্রশ্ন করা হয়, ইবলীস, কুফুরী, পাপাচার, অকল্যাণ ও ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করার মাধ্যমে যখন বিশেষ একটি হেকমত বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে কি এদিক বিবেচনায় এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হতে পারে? না কি এগুলো সকল দিক থেকেই অপছন্দনীয়?

দু'ভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যেতে পারে।

(১) পাপাচার ও অন্যায় কর্ম কখনো কখনো যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বস্তুর দিকে নিয়ে যায়, সেদিক বিবেচনায় এগুলো তার নিকট প্রিয় কি না? কেননা এগুলো বান্দাকে পরবর্তীতে আল্লাহর আনুগত্য, তার ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। যদিও এগুলোকে মূলগত দিক থেকে তিনি অপছন্দ করেন, যারা এতে লিপ্ত হয়, তাদেরকে ঘৃণা করেন এবং শাস্তি দেন। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার দিক থেকে

(২) বান্দার দিক বিবেচনায় এগুলোর প্রতি তার সন্তুষ্ট থাকা জায়েয কি না? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কোনো মুসলিম পাপাচার পছন্দ করে না। কেননা কমপক্ষে অন্তর দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকে না। মানুষ কখনো কখনো হাত দ্বারা কিংবা জবান দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। তবে অন্তর দিয়ে

---

২৮০. মূলত এটি সাব্যস্ত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এমন কতিপয় অতি সুন্দর নাম রয়েছে, যা ইবলীস ও পাপাচার সৃষ্টি না করলে তার প্রভাব বান্দার উপর পড়তো না এবং তা দ্বারা বান্দা কোনো উপকারই হাসিল করতে পারতো না। যেমন ধরুন আল্লাহ তাআলা, العفو الغفور الغفار ইত্যাদি। এই নামগুলোর দাবি হলো, সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি থাকবে, যারা গুনাহ করবে। গুনাহ করার পর তারা তাওবা করবে। তাওবা করা বিরাট একটি এবাদত। এতে করে আল্লাহ তাআলার ক্ষমাকারী, দয়াকারী, ক্ষমাশীল নামের মধ্যে যেই ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা রয়েছে, তার প্রভাব বান্দার উপর পড়বে। বান্দা তার মাধ্যমে উপকৃত হবে। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমেও উপাস্য হবেন।

অবশ্যই অন্যায়কে অপছন্দ করতে হবে। সুতরাং এমন কোনো মুমিন পাওয়া যাবে না, যিনি অন্তর দিয়ে পাপাচারকে পছন্দ করে।

আপনার কাছে যদি কোনো মুমিন এসে বলে, আমি মুমিন, কিন্তু আমি এ পাপাচারগুলো অপছন্দ করি। যেহেতু এগুলো আল্লাহ তা'আলাই বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে হিসাবে আমি এগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। আমি যে এগুলোকে পছন্দ করি, তা কিন্তু নয়। পাপাচার হিসাবে এগুলোকে পছন্দ করি না। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তবে এগুলোকে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মুসীবত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, সে হিসাবে এগুলোকে তাক্বদীরের বিষয় বলে সমর্থন করি।

অতঃপর ইমাম ইবনে আবীল ইয রহিমাহুল্লাহ বলেন, অকল্যাণকর বস্তু এবং অকল্যাণের উপকরণগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু সৃষ্টিগত ও অস্তিত্বগত দিক থেকে তাতে কোনো অকল্যাণ নেই। সৃষ্টি ও অস্তিত্বগত দিক থেকে পাপাচার সৃষ্টি হওয়া ভালো। এর মাধ্যমে অকল্যাণ তখনই হয়, যখন তাকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করা হয় না। কেননা মূলত গতি সম্পন্ন করে ও নড়াচড়া করার শক্তি দিয়ে ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। ইলম ও সঠিক সিদ্বান্তের মাধ্যমে যদি এটিকে পরাজিত করা হয়, তাহলে তা ভালোর দিকে ধাবিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঈমানের শত্রু ইবলীস, বিষাক্ত সাপ ও কীট-পতঙ্গ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টির বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। আর যদি পাপাত্মাকে সংশোধন না করে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই রেখে দেয়া হয়, তাহলে তা স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী সৎকাজের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। পাপাত্মাগুলোর নড়াচড়ার শক্তি থাকলেই তাকে ভালো কিংবা খারাপ বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা ভালো উদ্দেশ্যেই এ নড়াচড়া সৃষ্টি করেছেন। গতি ও নড়াচড়াটি মন্দের দিকে সম্বন্ধ হওয়া থেকেই তা ক্ষতিকর হয়। মূলত নড়াচড়াটি ক্ষতিকর নয়। যুলুমের দিকে নড়াচড়া, সীমালংঘনের দিকে নড়াচড়া ইত্যাদি।

ক্ষতি ও কষ্টকর বিষয় যদি যথাস্থানে না রেখে অন্যস্থানে রাখা হয়, তাহলে দোষের কিছু নয়। এতে বুঝা গেল, যে কষ্ট ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে কষ্ট দিলে যুলুম হয় না। সুতরাং কষ্ট ও ক্ষতির ব্যাপারটি আপেক্ষিক। এ জন্য ইসলামী শরী'আত পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তা যদি যথাস্থানে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দোষারোপের কিছুই থাকে না। তবে যাকে শাস্তি দেয়া হলো, সে তো কষ্ট পাবেই এবং তাকে অপছন্দ করবেই। কারণ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এরূপ যে, সবসময় আরামদায়ক জিনিস গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কষ্ট সহ্য করতে চায় না।

সুতরাং তার জন্য কষ্ট স্বীকার করা ক্ষতিকর হলেও যে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার কারণে তাকে শাস্তি দিলো সে ভালোই করেছে। কেননা সে শাস্তিটা যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সকলদিক বিবেচনায় কোনো কিছুকেই শুধু অকল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও প্রজ্ঞা এটিকে অস্বীকার করে। সুতরাং

সকল দিক বিবেচনায় কোনো ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি করা মহান প্রভুর শানের খেলাফ। এ ধরণের জিনিস সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সেটি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার গুণাবলীর জন্য অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। অকল্যাণের সম্বন্ধ তার দিকে শোভনীয় নয়।

কোনো কোনো সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে শুধু ক্ষতির জন্য সৃষ্টি করেননি। ভালো উদ্দেশ্যেই তিনি তা সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই অকল্যাণের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে নয়। আল্লাহ তা'আলার দিকে যা কিছুর সম্বন্ধ করা হয়, তার সবগুলোর মধ্যেই সৃষ্টি করার দিক বিবেচনায় কল্যাণ রয়েছে। অকল্যাণকে কোনো পক্ষের দিকে সম্বন্ধ না করার আগে সাধারণত ক্ষতিকর হিসাবেই ধরা হয়। অর্থাৎ অকল্যাণকর জিনিসগুলো দুই দিক থেকে মূল্যায়নযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এগুলোর স্রষ্টা, তাই এতেও কল্যাণ রয়েছে। আর বান্দার দিক থেকে যেহেতু এটি সংঘটিত হয়, তাই এর মধ্যে ক্ষতি রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করা হলে তাতে কোনো অকল্যাণ থাকে না। আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ না করা হলেই তাতে অকল্যাণ আছে বলে ধরা হয়। অর্থাৎ যেমন ধরুন কেউ যখন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে যেমন যেনা-ব্যভিচার করে, তখন এটিকে দুইভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এটি সৃষ্টি করে ভালোই করেছেন। কেননা তিনি বিনা হিকমতে কোনো কিছুই সৃষ্টি করেন না। এ হেকমতগুলো আমরা কখনো জানতে পারি। আবার কখনো জানতে পারি না। তবে বান্দার দিক থেকে সংঘটিত হয় বলে এতে নিঃসন্দেহে ক্ষতি রয়েছে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় এবং তার হুরমতের সীমা লংঘন করে, তখন নিঃসন্দেহে তা ক্ষতিকর। তবে যখন আল্লাহ তা'আলার দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে মূল্যায়ন করবো, তখন এভাবে মূল্যায়ন করবো যে, এটি আল্লাহর নির্ধারণ অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে। এতে কল্যাণ ও হেকমত রয়েছে। আমরা তা জানি কিংবা না জানি।[২৮১] সুতরাং কথাটির মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন এবং তার ইচ্ছাও করেছেন, তাহলে আল্লাহর দিকে তার সম্বন্ধ হওয়া শোভনীয় হয়না কেন? জবাবে বলা হবে যে, সৃষ্টিগত দিক থেকে খারাপ জিনিস সৃষ্টি করা দোষণীয় নয়। সুতরাং সৃষ্টিগত দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার দিকে মন্দের সম্বন্ধ করা দোষণীয় নয়। এ দিক মূল্যায়নে ইবলীস ও মন্দ সৃষ্টি করা ক্ষতিকর নয়। ভালো কাজ ও তার উপকরণ দিয়ে পাপাচারকে

---

২৮১. ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার এমন কতিপয় অতি সুন্দর নাম রয়েছে, যা ইবলীস ও পাপাচার সৃষ্টি না করা হলে তার প্রভাব বান্দার উপর পড়া সম্ভব হতো না এবং উহা দ্বারা বান্দা কোনো উপকারই হাসিল করতে পারতো না। যেমন ধরুন আল্লাহ তা'আলার العفو الغفور الغفار ইত্যাদি নাম রয়েছে। এই নামগুলোর দাবি হলো, তার বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা থাকবে, যারা গুনাহ করবে। গুনাহ করার পর তারা তাওবা করবে। তাওবা বিরাট একটি ইবাদত। এতে করে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাকারী, দয়াকারী, ক্ষমাশীল নামের মধ্যে যে ক্ষমা, দয়া ও সহনশীলতা রয়েছে, তার প্রভাব বান্দার উপর পড়বে। বান্দা তার মাধ্যমে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমেও উপাস্য হবেন।

দএ না করলে খারাপ জিনিস দ্বারা মানুষ কষ্ট পেয়ে থাকে। যার হাতে রয়েছে সকল কল্যাণ, তার দিকে অকল্যাণের সম্বন্ধ শোভনীয় হয় না। এ বিষয়টি আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনি জেনে রাখুন যে, কল্যাণের উপকরণ হলো তিনটি। কল্যাণের উপর সৃষ্টি করা, প্রস্তুত করা এবং কল্যাণের উপকরণ সংগ্রহ করাতে সাহায্য করা। কল্যাণ সৃষ্টি করা ভালো। আল্লাহ তা'আলা এটি সৃষ্টি করেছেন। এমনি কল্যাণ প্রস্তুত করা এবং তা অর্জনে সাহায্যও আসে আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসে না, তাতেই অকল্যাণ হয়। সাহায্য না থাকার কারণেই অকল্যাণ হয়।

তবে মন্দ সৃষ্টি করা দোষণীয় নয়। মন্দকে ভালোর দ্বারা মোকাবেলা না করলেই অকল্যাণ আসে। অর্থাৎ তাকে স্বীয় স্বভাব ও অভ্যাসের উপর ছেড়ে দিলে তার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে আমাদের নফসের উপর ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে এ বলে দু'আ করতেন যে, তিনি যেন তাকে এক পলকের জন্যও তার নফসের উপর ছেড়ে না দেন। কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের নফসের উপর একাকী ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর দিকে ধাবিত হয়েছে। এ কারণে নয় যে, কাফেরদের অস্তিত্ব অকল্যাণের কারণ নয়। আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদেরকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা এবং অস্তিত্বে আনয়ন করা কল্যাণকর। তাদের মধ্যে অকল্যাণ এ কারণে এসেছে যে, তাদেরকে বিনা সহায়তায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াতের জন্য মদদ করেন নি। বরং তাদেরকে নিজেদের নফসের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের কাছে অকল্যাণ এসেছে তাদের নফসের পক্ষ হতে, শয়তানের পক্ষ হতে এবং তাদের অপকর্মের কারণে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু ভালো-মন্দ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি ভালোটি অর্জন করতে বান্দাকে সাহায্য করেননি কেন? অকল্যাণ থেকে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখেননি কেন? শাইখ ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহুল্লাহ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলার হেকমত এটি ছিল না যে, তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করবেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বান্দাকে সাহায্যও করবেন। বরং হেকমত এটি ছিল যে, তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করবেন এবং তা পরিত্যাগে বান্দাকে সাহায্য করা বর্জন করবেন। কেননা অমঙ্গল বর্জনে তাকে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না।[২৮২]

---

২৮২. সে সাথে আরো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের মধ্যে স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেখতে চেয়েছেন কে তাকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় তার ইবাদত করে। তিনি ইচ্ছা করলে সকলের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারতেন এবং সকল মানুষকে ঈমানের উপর বাধ্য করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। কুফুরী করা এবং আনুগত্যের কাজ বর্জন করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু তা করলে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার বাস্তবায়ন হলেও তার আদল বা ইনসাফ গুণের ব্যাঘাত ঘটতো। কারণ আনুগত্যের উপর বাধ্য করে পুরস্কার দেয়া ইনসাফের পরিপন্থি। সে সঙ্গে অনর্থক কাজও বটে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অনর্থক কাজের সম্পূর্ণ

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সকল মানুষকে আনুগত্যের উপর সাহায্য করা হলোনা কেন? আসলে এ প্রশ্নটি একদম বাতিল। এ প্রশ্নের অর্থ হলো, মানুষ ও শয়তানকে ফেরেশতাদের মত করে সৃষ্টি করা হলোনা কেন? অথবা সৃষ্টির সকলেই ফেরেশতা হলোনা কেন? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে, এটি একটি বাতিল প্রশ্ন। বরং সকল মাখলুক একই রকম না হওয়ার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার হেকমত বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ধরণের প্রশ্ন যারা করে, তাদের ধারণা হলো, সকল সৃষ্টিকে এক সমান করাই সর্বাধিক হেকমতপূর্ণ। এ ধারণা মুর্খতার পরিচায়ক। বরং সকল বস্তুর পরস্পরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকাটাই হেকমতপূর্ণ। তবে সৃষ্টির প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টিগত দিক থেকে কোনো পারস্পরিক অসংগতি নেই। তবে সৃষ্টিগত দিক বাদ দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য কারণে পারস্পরিক তারতম্য হয়। যেমন কোনো সৃষ্টির মধ্যে ভালো গুণাবলী বিদ্যমান থাকা বা কোনোটির মধ্যে তা না থাকার কারণেই উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হয়। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এ দিক থেকে সব সৃষ্টিই কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকেই সকল দিক বিবেচনায় ক্ষতিকর বানিয়ে সৃষ্টি করেন নি। কল্যাণের মাধ্যমে সাহায্য না করার কারণেই কোনো কোনো সৃষ্টির মধ্যে অকল্যাণ আসে। যে সৃষ্টির মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যেও চলাচল ও নড়াচড়া করার শক্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে তাওফীক দেন, তাহলে তা ভালোর দিকে পরিচালিত হয়।[২৮৩] আর যদি তাওফীক না দিয়ে এবং সাহায্য না করে তাকে আপন অবস্থায়

উর্ধ্বে এবং তিনি যেহেতু বান্দার উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না, তাই তাকে পুরস্কৃত করা কিংবা শাস্তি দেয়ার আগে স্বেচ্ছায় হিদায়াত ও আনুগত্যের পথ বেছে নেয়ার কিংবা তা না করার স্বাধীনতা দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

আরো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা পাহাড়-পর্বত, আসমান-যমীন এবং চন্দ্র-সূর্য ও দিবা-রাত্রিসহ আরো এমন অনেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রাখা হয়নি। তারা আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যগত। পাহাড়কে আল্লাহ তাআলা যেখানে স্থাপন করেছেন, সেখান থেকে এক চুল পরিমাণও সরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। আসমানের সমস্ত ফেরেশতা দিবা-রাত্রি অবিরাম আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। তাদের মধ্যে পাপাচারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও রাখা হয়নি।

ঐদিকে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন আরেক প্রকার মাখলুক সৃষ্টি করতে, যাদের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকবে। তারা ইচ্ছা করলে আল্লাহকে ভালোবেসে ও ভয় করে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবে। আর তা না করে স্বীয় ইচ্ছায় ব্যতিক্রমও করতে পারবে। জিন ও ইনসান হচ্ছে এই প্রকার মাখলুক। আল্লাহ তাদেরকে জড়পদার্থের মত না করে তাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি স্থাপন করেছেন। যাতে করে তিনি উভয় প্রকার সৃষ্টির দ্বারা উভয়ভাবেই এবাদতের উপাস্য হতে পারেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

২৮৩. আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করেন না এবং অন্যায়ের পথ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করেন না, যতক্ষণ না বান্দা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে উদ্যোগ নিয়ে কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। বান্দা যখন তার ভিতরকার উৎকৃষ্ট স্বভাব ও সৃষ্টিগত ভালোগুণসমূহ জাগিয়ে তুলে এবং কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তা'আলা তখনই কেবল বান্দাকে হিদায়াতের পথে আরো এগিয়ে দেন। অকল্যাণ ও পাপাচার হতে তাকে হেফাযত করেন। অপরপক্ষে, যে বান্দা অন্তর দিয়ে হিদায়াত কামনা করে না এবং বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ভালো পথে অগ্রসর হয় না, আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে কল্যাণের পথে চলতে বাধ্য করেন না। কারণ এতে করে মানুষ সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তাআলা যে হিকমত রেখেছেন, তা বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তাকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। আর বাধ্য করে হিদায়াত ও ঈমানের পথে এনে পুরস্কার দেয়াও অনর্থক হয়। আল্লাহ তাআলা অনর্থক কাজ করার বহু উর্ধ্বে। ঐদিকে কুফুরী ও পাপাচারের উপর বাধ্য করার পর শাস্তি দিলে আল্লাহ

ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তার নফ্সে আম্মারা, শয়তান এবং কুপ্রবৃত্তি তাকে অন্যায়ের দিকে টেনে নেয়। যদিও তার সামনে সত্য সুস্পষ্ট থাকে।

সুতরাং সৃষ্টিগত দিক থেকে সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসংগতি ও বৈষম্য নেই। তবে মর্যাদার দিক থেকে অনেক তারতম্য ও বৈষম্য আছে। আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক উত্তম সৃষ্টি হলেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মোকাবেলায় তিনি ইবলীস সৃষ্টি করেছেন। ইবলীস হলো সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

হে পাঠক! আপনি যদি উপরের কথাগুলো বুঝতে না পারেন, তাহলে নিম্নের লাইনটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন।

إذا لم تستطع شيئا فدعه... وجاوزه إلى ما تستطيع

তুমি যখন কোনো কাজ করতে অক্ষম হবে, তখন তা ছেড়ে দিয়ে এমন একটি কাজে যোগদান করো, যা তুমি করতে সক্ষম।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তার বান্দার জন্য এমন জিনিস পছন্দ করেন, যাতে তিনি বান্দাকে সাহায্য করেন না? এর জবাব হলো, বান্দাকে আনুগত্যের কাজের উপর বাধ্য করা হলে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ আনুগত্যের চেয়ে বড় অন্য একটি প্রিয় বস্তু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারো কারো নিকট থেকে আনুগত্য বাস্তবায়ন হলে তার বড় একটি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার কাছে উক্ত আনুগত্যের কাজের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটির মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾

"আর সত্যি সত্যিই যদি তারা বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন। ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন আর বলা হলো, তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাকো"। *(সূরা আত তাওবা: ৪৬)*

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তার রাসূলের সাথে তাবুক যুদ্ধে মুনাফেকদের বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। অথচ তাতে বের হওয়া ছিল বিরাট একটি ইবাদত। তিনি যখন তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন, তখন তিনি তাদেরকে তা থেকে পিছিয়ে দিয়েছেন।

তাআলার আদল ও ইনসাফ ঠিক থাকে না। মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি সকল প্রকার যুলুম ও অনর্থ কাজ করার বহু উর্ধ্বে।

মুনাফেকরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হলে কী পরিমাণ ক্ষতি হতো, আল্লাহ তা'আলা এখানে তা থেকে কতিপয় ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

"তারা যদি তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না"। *(সূরা আত তাওবা: ৪৭)*

অর্থাৎ তারা ফাসাদ ও অকল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করতো না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾

"তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতো। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে"। *(সূরা আত তাওবা: ৪৭)*

অর্থাৎ তাদের থেকে গ্রহণ করে এবং তাদের ডাকে সাড়া প্রদান করে। সুতরাং তাদের কথা শ্রবণ এবং তাদের কথা গ্রহণ করা থেকে এমন ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাদের বের হওয়ার কল্যাণের চেয়ে অধিক বড়। সুতরাং তাদেরকে পিছিয়ে রাখার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার হেকমত নিহিত ছিল এবং একনিষ্ঠ মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপও ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ উপমাটিকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করুন এবং এর উপর কিয়াস করুন।

(২) পাপাচার ও অন্যায় কর্মের প্রতি অপছন্দ বান্দার দিক থেকেও হয়ে থাকে। এমনটি হওয়া সম্ভব; বরং এটিই বাস্তব। বান্দা পাপাচার ও সীমালংঘনের কাজকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে। অথচ এটি বান্দার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এটি যেহেতু আল্লাহর অবগতি, নির্ধারণ, ইচ্ছা এবং সৃষ্টিগত হুকুমে হয়ে থাকে, তাই বান্দা এতে রাযী থাকে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়েও বান্দা খুশী হয় এবং তার পক্ষ থেকে এর বিপরীত কিছু আসলে অসন্তুষ্ট হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন ধরুন কারো আত্মীয় ছ্বলাত পড়ে না। তার আত্মীয়ের পক্ষ হতে এমন কাজ হওয়াকে সে খুব অপছন্দ করে। এতে সে কষ্টও পায় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে। কেউ যখন তাকে এসে এ উপদেশ দেয় যে, দেখো ভাই! এসব কিছুই তাক্বদীর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাক্বদীরের উপর সবর করতে বলেছেন। তোমার মা-বাপ ছ্বলাত পড়ে না। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে একটি মুসীবত এবং তা আল্লাহর হুকুমে। এর উপর তোমার সবর-ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হওয়া

খুশীর খবর নয়; কিন্তু তা যেহেতু আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাই আমরা তাতেও নাখোশ-অসন্তুষ্ট হবো না।

এটি সুফীদের একদলের কথা। তারা বলেছে, আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো-মন্দ যা কিছুই হোক না কেন, আমরা তাতে সন্তুষ্ট আছি। আর বান্দার পক্ষ হতে পাপাচার হলে আমরা তাকে অপছন্দ করি। আরেকদল পাপাচারকে সাধারণভাবে অপছন্দ করেছে। আল্লাহর নির্ধারণ হিসাবে অপছন্দ করেনি। আসলে এ কথা এবং পূর্বোক্ত কথার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পাপাচার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতি, তার লিখন এবং তার ইচ্ছাকে অপছন্দ করে না। বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও শরী'আত বিরোধী হওয়ার কারণে পাপাচারকে অপছন্দ করেন। এটিই হলো এ ক্ষেত্রে মূল বিষয়। পাপাচার ও অন্যায় কর্মের সম্বন্ধ যখন আল্লাহর দিকে করা হবে, তখন তা অপছন্দনীয় হবে না। আর যখন বান্দার দিকে করা হবে, তখন অপছন্দনীয় হবে।

কেউ যদি বলে, বান্দা ভালো-মন্দ কিছুই করে না। যা কিছু হয় সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। তার জবাবে আমরা বলবো যে, এটি হলো জাবরীয়াদের মাযহাব।[২৮৪] জাবরীয়া

---

২৮৪. এ মতাদর্শের মাধ্যমে তারা বান্দাকে মরা কাঠ ও পাথরে পরিণত করেছে। তাদের মতে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ঘুরান বান্দা সেভাবেই ঘুরে। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ও এখতিয়ার নেই। তাই ভালো-মন্দ সবই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতাতেই হয়। এ যেন শিশুর হাতে লাটিম এবং কাঠ-প্লাষ্টিকের পুতুলের মতই। তারা আরো বলে, মানুষের পানাহার করা, ঘুমানো, আল্লাহর আনুগত্য করা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বাতাস তুলা উড়িয়ে নেয়া এবং বন্যার পানি খড়কুটা ভাসিয়ে নেয়ার মতই। এগুলোতে বান্দার কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। শিশুর হাতে লাটিম শিশুর সম্পূর্ণ অনুগত ও বাধ্যগত, পুতুলকে শিশু যেভাবে নাচায় পুতুল সেভাবেই নাচে। বান্দাও আল্লাহর হাতে ঠিক সেরকমই। (নাউযুবিল্লাহ)

সম্ভবত এই জাবরীয়াদের মতবাদ থেকেই ভোগবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, ওয়াহদাতুল উজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) এবং বস্তাপঁচা সুফীবাদের সূচনা হয়েছে। কেননা সুফীবাদের মধ্যে যারা ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী তারা কোন কিছুকেই হারাম মনে করে না। মদ, জিনা-ব্যভিচারসহ সকল প্রকার কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়াই তাদের জন্য বৈধ। তারা মনে করে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। বান্দার এখানে কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই।

তাদের এ কথা মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তির সুস্পষ্ট বিরোধী। তাদের কথা মানা হলে নাবী-রসূল পাঠানো অযথা ও নিরর্থক হয়ে যায়। তাদের কথা যদি সঠিকই হতো, তাহলে অতীতে যারা নাবী-রসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করলো, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিলেন কেন? কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামে দিবেন কেন? বান্দার কাজ অন্যের দ্বারা হলে তার কাজের জন্য মানুষ তাকেই দোষে কেন? তার ভালো কাজের প্রশংসা করে কেন? বান্দার কাজ যদি আল্লাহর দ্বারাই হয়ে থাকে, তাহলে কি বান্দাকে শাস্তি দেয়া কিংবা ছাওয়াব দেয়া অন্যায় ও নিরর্থক হয় না? অথচ আল্লাহ তাআলা যুলুম ও নিরর্থক কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মোটকথা জাবরীয়ারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও সবকিছুর উপর তার সার্বভৌমত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার আদল-ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের কথা বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছে। তাদের কথা থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার বিশেষণ সাব্যস্ত হলেও আল্লাহ তা'আলার আরেকটি ছিফাত অচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার আদল তথা ন্যায় বিচারের দাবী হচ্ছে, তিনি বান্দাদের উপর মোটেই যুলুম করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

মতবাদের লোকদের পক্ষে এ সংকীর্ণ স্থান থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। ঐ দিকে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী কাদারীয়া মতবাদের লোকদের পক্ষে জাবরীয়াদের তুলনায় তাদের মাযহাব থেকে বের হয়ে আসা অনেক সহজ। অর্থাৎ জাবরীয়াদের মাজহাব কাদারীয়াদের মাযহাবের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কেননা কাদারীয়ারা খারাপ কাজ, পাপাচার ও গুনাহর কাজের সম্বন্ধ কেবল বান্দার দিকেই করে; আল্লাহর দিকে করে না। অপর পক্ষে জাবরীয়ারা সমস্ত পাপকাজের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকেই করে এবং বলে এতে বান্দার কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাদারীয়া ও জাবরীয়াদের মধ্যখানে। তারা উভয় শ্রেণীর বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা। এ হিসাবে আল্লাহর দিকে পাপাচারের সম্বন্ধ করা ঠিক আছে। বান্দা যেসব পাপাচার ও নাফরমানী করে থাকে তা আল্লাহ তা'আলার তাক্বদীর, ফায়ছালা এবং তার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা অনুপাতেই হয়ে থাকে। কিন্তু ইহা তার শরীয়তগত ইচ্ছা, আদেশ ও নিষেধের বিরোধী। এ জন্যই তাদেরকে গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দেয়া হবে। কেননা তারা তাদের ইচ্ছাতেই পাপাচারে

"আল্লাহ কারো উপর এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন"। (সূরা আন নিসা: ৪০) আল্লাহ তাআলা সুরা আনফালের ৫১ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

"এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই প্রেরণ করেছো। আল্লাহ তার বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন। এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা যুলুম করা থেকে পবিত্র। সুতরাং বান্দাকে তার আদেশ বাস্তবায়ন করার স্বাধীনতা না দিয়ে এবং নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে পাপ কাজে বাধ্য করে শাস্তি দিলে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত ঘটে। তাই তিনি তার আদল বা ন্যায় বিচার ঠিক রাখার জন্য বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে করে স্বেচ্ছায় আনুগত্যের কাজ করে সে নিজেই পুরস্কার পায় আবার আনুগত্যের খেলাফ করলে সে নিজেই শাস্তি ভোগ করে। যাতে করে আল্লাহ তাআলার উপর যুলুম করার কোন অভিযোগ না আসে। (আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত রয়েছেন)

আল্লাহ তাআলার সবগুলো ছিফাতকেই একসাথে সাব্যস্ত করতে হবে। একটি মানতে গিয়ে আরেকটি ছেড়ে দিলে চলবেনা। তাই আল্লাহর আদলের দাবী হলো তিনি কাজ করার বা না করার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার না দিয়ে কাউকে শাস্তি দিবেন না। জাবরীয়াদের কথা মানতে গেলে আল্লাহর আদল ছিফাতটি ছুটে যায়।

সুতরাং বান্দার কাজ প্রকৃতপক্ষে বান্দা তার নিজস্ব ইচ্ছাতেই করে। যদিও তা আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা সবাই জানি যে, বান্দার হাতে অস্ত্র থাকলে বান্দাই সেটি চালায়। সে অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে না কি ডাকাতি করবে অথবা নিরপরাধ মানুষকে খুন করবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। তার হাতে পয়সা থাকলে সে পয়সা দিয়ে মদ ক্রয় করবে? না কুরআনের তাফসীর ক্রয় করবে? এটি তার ইচ্ছাধীন।

আপনি যদি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন: কোথায় যাচ্ছো? বন্ধু হয়ত জবাব দিবে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়েছি কিংবা বলবে বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা করছি.....। সুতরাং জানা গেল যে, বান্দার ইচ্ছাতেই বান্দা কাজ করে। আল্লাহ তাআলা বান্দার মধ্যে সেই ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করলে এবং আল্লাহর মর্জির খেলাফ চললে সে নিন্দিত হয়। আর তার ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করলে এবং উহাকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক চালালে আল্লাহ তাআলা তাকে সৎপথে চলতে সাহায্য করেন। (আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত)

লিপ্ত হয়েছে। এমনি তাদের ইচ্ছাতে আনুগত্যের কাজ করে বলেই তাদেরকে উত্তম বিনিময় দেয়া হয়।

যদি বলা হয় পাপাচার ও গুনাহর কাজ সৃষ্টি করার মধ্যে হেকমত রয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতে বান্দারা তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে এর কারণে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাওবা করার প্রয়োজন হয় কেন?

কোনো জিনিসকে তার আসল অবস্থায় না দেখে অন্যভাবে দেখার কারণে যার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, সে-ই কেবল এ ধরণের প্রশ্ন করতে পারে। পৃথিবীতে যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমতের দাবি ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না, তাই তিনি চাইলে পাপাচারও সংঘটিত হতো না। সুতরাং গুনাহর কারণে তাওবার দরকার নেই। কারণ তা আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে। তাতে আল্লাহ তা'আলার হেকমত রয়েছে। এ কারণেই সুফীরা পাপাচারকেও আনুগত্যের কাজ হিসাবে দেখে। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণ অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলেছে, আমি যদি আল্লাহর আদেশের বিরোধীতা করে থাকি, তা তার ইচ্ছার অনুরূপ করেছি। তাদের কোনো এক কবি বলেছেন,

أصبحت منفعلاً لما تختاره مني ففعلي كله طاعات

আমার জন্য তুমি যা কিছু নির্ধারণ করো আমি তাই করি। সুতরাং আমার সমস্ত কাজই তোমার আনুগত্য স্বরূপ।

যারা এ রকম বলে, তারা সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বাধিক মুর্খ এবং আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক অজ্ঞ। সেই সঙ্গে তারা আল্লাহর সৃষ্টি ও তার দীন সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম সম্পর্কেও অজ্ঞ। শরী'আতের আদেশ ও হুকুম অনুযায়ী কাজ করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহর ইচ্ছা ও তাক্বদীর অনুযায়ী পাপাচারে লিপ্ত হলে আনুগত্য হয় না। তাক্বদীর অনুযায়ী কাজ হলেই যদি সৎকাজ হয়ে যেতো, তাহলে ইবলীসও আল্লাহর সর্বাধিক আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতো। সেই সঙ্গে নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শুআইব ও ফেরআউনের সম্প্রদায়ের লোকেরাও পূর্ণ ঈমানদার হতো। কেননা তারাও আল্লাহর নির্ধারণ অনুপাতেই পাপাচার ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। যারা তাদেরকে ঈমানদার মনে করে তারা একদম মূর্খ। তবে কেউ যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম দেখে, নিজের মধ্যে তাক্বদীরের বিধান বাস্তবায়ন হতে দেখে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি মুহতাজ মনে করে এবং চোখের পলকের জন্যও আল্লাহর হেফাযত থেকে নিজেকে অমূখাপেক্ষী মনে করে না, তখন সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু করে। এ অবস্থায় সে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করে না। বান্দা যখন এ অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন তার থেকে পাপাচারের কল্পনাও হতে পারে না। কেননা তখন সে সুরক্ষিত দূর্গের মাধ্যমে পরিবেষ্টিত থাকে। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই শুনে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই দেখে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই ধরে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই চলে। এ অবস্থায় বান্দার পক্ষ হতে পাপাচার সংঘটিত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। বান্দা যখন এ অবস্থার বাইরে চলে

যায় এবং একাকী হয়ে যায় তখন তার উপর নফসের হুকুম চেপে বসে। এ সময়ই সে গাফিলতির জালে আটকা পড়ে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে।

অতঃপর প্রবৃত্তির এ ঘন কুয়াশা যখন তার উপর থেকে উঠে যায়, তখনই সে অনুতপ্ত হয়, তাওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসে। কেননা পাপাচারে ডুবে থাকার কারণে সে তার রব থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বীয় নফসের চাহিদা পুরণের কাজে মগ্ন ছিল। সুতরাং সে যখন পূর্বের অবস্থা থেকে ফিরে এসেছে, তাই তার বর্তমান সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ফলে সে তার রবের সাথে যুক্ত হয়েছে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুফুরী যদি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং আমাদেরকে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার আদেশ করা হয়েছে, তাই কিভাবে আমরা তাক্বদীর অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়ের প্রতিবাদ করতে পারি?

এর জবাবে প্রথমত: বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন এবং যেসব বিষয়ের ফায়ছালা করেছেন, তার সবগুলোর প্রতি আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়নি। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এ ধরণের কোনো আদেশ খুঁজে পাওয়াও যাবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, যাতে সন্তুষ্ট হওয়ার মত এবং তাতে এমন কিছু রয়েছে, যা অপছন্দনীয়। কেননা বিচারক যখন রায় প্রদান করে তখন তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না। বরং কিছু কিছু রায়কে তিনি অপছন্দ করেন। যাদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়ে থাকে, তাদের উপরও মানুষ ক্রোধান্বিত হয়, তাদেরকে ঘৃণা করা হয়, তিরস্কার করা হয় এবং তাদের উপর লা'নত করা হয়।

দ্বিতীয়ত: বলা যেতে পারে যে, এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে।

(১) আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করেন। আর এটি এমন কাজ, যা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত

(২) আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণকৃত বিষয়। আর এটি হলো আল্লাহ তা'আলার সত্তা থেকে আলাদা একটি বিষয়। আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ ও ফায়ছালা করেন, তার সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ, ইনমাফ এবং বিরাট হেকমত। এর সবগুলোর প্রতিই আমরা সন্তুষ্ট।

ঐ দিকে নির্ধারণকৃত বিষয়গুলো দু'প্রকার।

(১) যার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

(২) আর তা থেকে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যাতে আমরা সন্তুষ্ট হই না।

তৃতীয় জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণের দু'টি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। একটি সম্পর্ক হলো আল্লাহ তা'আলার দিকে। এ দিক থেকে তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী। অন্য সম্পর্কটি হচ্ছে বান্দার দিকে। এ সম্পর্কের দিক থেকে তাক্বদীরের নির্ধারণ দুই প্রকার। একটির প্রতি মানুষ সন্তুষ্ট হয় এবং অন্যটির প্রতি মানুষ সন্তুষ্ট হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ আত্মহত্যার বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। আত্মহত্যার বিষয়টিকে দুইভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন, লিখেছেন, এটি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন এবং নিহত ব্যক্তির বয়স ও হায়াত এ পর্যন্তই নির্ধারণ করেছেন। আত্মহত্যার সময় পর্যন্তই তার শেষ বয়স নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ ফায়ছালা ও নির্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। আর যার পক্ষ হতে আত্মহত্যা নামক অপরাধটি সংঘটিত হয়, যে নিজেকে হত্যা করে, এটি উপার্জন করে, স্বীয় ইচ্ছায় এদিকে অগ্রসর হয় এবং স্বীয় কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। এ দিক বিবেচনায় আমরা তাকে ও তার কাজকে ঘৃণা করি এবং তার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকি না।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلم الحرمان ودرجة الطغيان "এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের ধাপ"।

কোনো কিছুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার গভীরতায় প্রবেশ করাকে مبالغة বলা হয়। তাক্বদীরের বিষয়ে বেশী অনুসন্ধান চালানো এবং তার ব্যাপারে বেশী বেশী কথা বলা অপদস্ত হওয়ার কারণ। الذريعة শব্দের অর্থ হলো মাধ্যম ও কারণ। الذريعة, الدرجة এবং السلم পরস্পর সামর্থ বোধক। এমনি الخذلان, الحرمان এবং الطغيان পরস্পর সামর্থ বোধক শব্দ। তবে الخذلان (বিফল হওয়া) শব্দটি الظفر (সফল হওয়া) শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর الطغيان শব্দটি الاستقامة শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة অতএব সাবধান! তাক্বদীর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকুন।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছাহাবীদের একদল লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো,

إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

"আমরা আমাদের অন্তরে কখনো কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সত্যিই কি তোমরা এরকম পেয়ে থাক? তারা বললেন হ্যাঁ, আমরা এরকম অনুভব করে থাকি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ"।[২৮৫]

২৮৫. মুসলিম ১৩২, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: অন্তরের ওয়াস্ ওয়াসা।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণের লক্ষণ। এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তারা এ ব্যাপারে কথা বলাকে খুব বড় অপরাধ মনে করতেন। ইমাম মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে আরো বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, "تلك محض الإيمان" এটি শুধু ঈমানেরই আলামত।[২৮৬]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছেও একই কথা বলা হয়েছে। মানুষের মনের ওয়াসওয়াসা ও মানুষ তার মনের সাথে কথা বলা দুই জন মানুষের পরস্পরিক কথা-বার্তার মতই। সুতরাং শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করার চেষ্টা করা এবং তার কুমন্ত্রণাকে বড় মনে করা সুস্পষ্ট ও খাঁটি ঈমানের লক্ষণ। এ ব্যাপারে এটিই ছিল ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈদের তরীকা। তাদের যুগের পরে এমন এক শ্রেণীর লোক আগমন করলো, যারা অনুমানের উপর ভিত্তি করে তাক্বদীর সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা সংক্রান্ত বিষয়াদি লিখে অনেক কাগজ-কালি নষ্ট করেছে। এগুলো নিছক সন্দেহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এরা এগুলো লিখে বিশাল পরিমাণ কাগজ কালো করার সাথে সাথে মানুষের অন্তরগুলো কালো করে ফেলেছে। সত্যকে ধ্বংস করার জন্য তারা অন্যায় বিতর্ক করেছে। এ জন্যই শাইখ ইলমুল কালাম, তাক্বদীর ও তাক্বদীর সংক্রান্ত বিষয়ে বেশী গবেষণা করার নিন্দা করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ»

"আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক ঘৃণিত, যে সর্বাধিক ঝগড়াটে"।[২৮৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ আমাদের কাছে আবু মুআবিয়া হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আমর বিন শুআইব থেকে দাউদ বিন ইবনে আবী হিন্দ, আমর বিন শুআইব বর্ণনা করেন তার পিতা থেকে, তার পিতা বর্ণনা করেন তার দাদা থেকে। তিনি বলেন, একদিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। লোকেরা তখন তাক্বদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাক্বদীর সম্পর্কে তর্ক করতে দেখে রাগে তার চেহারা এমন হলো যে মনে হচ্ছিল তাতে ডালিমের দানা ফুড়ে দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমাদের কী হলো? তোমরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে দাড় করাচ্ছো কেন? তোমাদের পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি সেই মজলিসে উপস্থিত না হয়ে যতটা খুশী হয়েছি, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু

২৮৬. ছ্বহীহ মুসলিম ১৩৩।
২৮৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৭১৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৬৮।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোনো মজলিসে উপস্থিত না হতে পেরে ততটা খুশী হতে পারিনি।[২৮৮]

ইমাম ইবনে মাজাহ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُو﴾

"তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো। যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত রয়েছো"। *(সূরা আত-তাওবা: ৬৯)* এ আয়াতে الخلاق শব্দটি النصيب তথা অংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-বাকারার ২০০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

"এ ধরনের লোকের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই"। *(সূরা আল-বাকারা: ২০০)*

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেভাবে তাদের দুনিয়ার অংশ উপভোগ করেছিল, তোমরাও সেভাবে তোমাদের দুনিয়ার অংশ উপভোগ করেছো। তারা যেভাবে অন্যায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তোমরাও সেভাবে অন্যায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছো। তোমরা ঐ দল বা শ্রেণী কিংবা প্রজন্মের ন্যায় অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছো। আল্লাহ তা'আলা এখানে দুনিয়ার অংশ উপভোগ করা এবং অনর্থক বিতর্ককে একসাথে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ দু'টি কারণেই মানুষের দীন ধ্বংস হয়। অন্যায়-অপকর্ম এবং খারাপ আকীদার কারণেই মানুষের দীন ও দুনিয়া ধ্বংস হয়। নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণেই প্রথমটি সংঘটিত হয়। আর দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় দীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারণে।

ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَأْخُذَ أُمَّتِي مأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» قالوا: فَارِسَ وَالرُّومِ؟ قَالَ: فمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ»

"আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের চালচলন হুবহু অনুসরণ করবে। যেমন এক বিঘত অন্য এক বিঘতের এবং এক বাহু অন্য বাহুর সমান হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, পূর্ববর্তী উম্মত বলতে পারসিক ও রোমানদের বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, তাদেরকে ছাড়া আর কারা উদ্দেশ্য হতে পারে?"[২৮৯]

---

২৮৮. হাদীছটি ছ্বহীহ। ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ ইহা বর্ণনা করেছেন।

২৮৯. ছ্বহীহ বুখারী ৭৩১৯।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক পায়ের জুতা যেমন অন্য পায়ের অনুরূপ হয়, ঠিক তেমনি আমার উম্মতের উপর ঐরূপ অবস্থা আগমন করবে। এমনকি তাদের কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে। আর বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের দীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এর দ্বারা তিনি বিদআতী দল উদ্দেশ্য করেছেন। মাত্র একটি দল ব্যতীত বাকী সব দলই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! সেটি কোন্ জামা'আত? তিনি তখন বললেন,

«مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

"আমি যে হকের উপর আছি এবং আমার ছাহাবীগণ যে হকের উপর রয়েছে, যারা সে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারাই হবে সেই নাজাত প্রাপ্ত জামা'আত।[২৯০] ইমাম তিরমিযী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"تَفَرَّقَتِ [الْيَهُودُ] عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً"، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছিল ৭১ অথবা ৭২ দলে। খ্রিষ্টানরাও বিভক্ত হয়েছিল ৭১ অথবা ৭২ দলে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাসান-ছ্বহীহ।

মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের দীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে।[২৯১]

এখানে প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতী দল উদ্দেশ্য। একটি দল ব্যতীত বাকীসব দল জাহান্নামে যাবে। আর এরা হলো জামা'আত।

এ উম্মতের মধ্যে যে মাস'আলাটি নিয়ে সবচেয়ে বড় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো তাক্বদীরের মাস'আলা। এতে রয়েছে অনেক দীর্ঘ আলোচনা।

---

২৯০. হাসান: তিরমযী ২৬৪১, মুস্তাদরাক হাকীম ৪৪৪।।

২৯১. ছ্বহীহ, দেখুন, শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২৬৫।

আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি কেন এটি করেছেন?

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب، كان من الكافرين "অতএব যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞেস করবে তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল"।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তার রসূলসমূহের প্রতি ঈমান এবং তার ইবাদতের মূলভিত্তি হলো সবকিছু মাথা পেতে মেনে নেয়া এবং ইসলামী শরী'আতের আদেশ-নিষেধসমূহের বিস্তারিত হেকমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা। আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নাবীর উম্মতের কথা আমাদেরকে বলেননি, যারা তাদের নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং নাবীর আনিত দীনের প্রতি বিশ্বাস করার পর তাকে আদেশ-নিষেধের হেকমত সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করেছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি যেই দীন প্রচার করেছেন, তারা হেকমতের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। তারা যদি তাদের নাবীকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তাহলে তারা তাদের নাবীর প্রতি ঈমানদার হতে পারতো না। বরং তারা তাদের নাবীর প্রতি অনুগত হয়েছে এবং তার কথা মেনে নিয়েছে। তাদের নাবী যেসব আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান নিয়ে এসেছেন, তা থেকে যেগুলোর হেকমত তারা জানতে পেরেছে, তা তো জানতে পেরেছেই। আর যেসব বিষয়ের হেকমত তারা জানতে পারেনি, তা মেনে নেয়ার জন্য ঐগুলোর হেকমত জানার অপেক্ষা করেনি। হেকমত সম্পর্কে জানাকে তারা নবুওয়াতের শানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেনি। তাদের রসূলকে তারা হেকমত সম্পর্কে প্রশ্ন করার অনেক উর্ধ্বে মনে করতো।

ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা এ কথা বলো না যে, আমাদের রব কেনো এ আদেশ করেছেন? বরং তোমরা বলো, আমাদের রব কিসের আদেশ দিয়েছেন? এ জন্যই এ উম্মতের পূর্বসূরীগণ ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে অধিক পরিপূর্ণ। তারা তাদের নাবীকে কখনো এ প্রশ্ন করতেন না যে, আল্লাহ তা'আলা কেন আমাদেরকে এ আদেশ করেছেন? কেন এ নিষেধ করেছেন? কেন এটি নির্ধারণ করেছেন? কেন তিনি এটি করেছেন? তারা ভালো করেই জানতেন যে, এ ধরণের প্রশ্ন করা ঈমান ও আনুগত্যের পরিপন্থি। তারা আরো জানতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পন না করলে ইসলামের উপর কারো অবস্থান সুদৃঢ় হয় না।

সুতরাং দীনের সকল বিষয়ের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শনের প্রথম স্তর হলো তাকে সত্যায়ন করা। অতঃপর তা বাস্তবায়ন করার প্রতি সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা। অতঃপর বাস্তবায়ন করতে কোনো প্রকার বিলম্ব না করা। সে সঙ্গে যেসব বিষয় দীনের বিধিবিধান মেনে চলার প্রতিবন্ধক হয়, তা থেকে সাবধান থাকা। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে দীনের বিষয়গুলো পালন করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। হেকমত জানার অপেক্ষায় না থেকে আদেশগুলো বাস্তবায়ন

করা। এমন যেন না হয় যে, হেকমত জানতে পারলে আদেশ বাস্তবায়ন করবে এবং তা জানতে না পারলে বাস্তবায়ন করা হতে বিরত থাকবে। কেননা এরূপ করা আনুগত্যের পরিপন্থি। এটি মানুষের দীন পালনের পথে বিরাট বাধাও বটে।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ ইবনে আব্দিল বারের বরাত দিয়ে বলেন, ইলম অর্জনের আগ্রহ নিয়ে, নিজ থেকে মূর্খতা দূর করার জন্য এবং দীন পালনের জন্য জরুরী মনে করে কোনো বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা অজানা রোগের চিকিৎসাই হলো প্রশ্ন করা। যে ব্যক্তি বিদ্রোহী হয়ে এবং জানার আগ্রহ ছাড়াই প্রশ্ন করবে, তার জন্য কোনো প্রশ্ন করা জায়েয নেই।

ইবনুল আরাবী বলেন, আলেমের উচিত দলীলের ভিত্তিতে কথা বলা, গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করা, ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জন করা এবং মাসায়েল নির্গত করার জন্য সহায়ক দলীল-প্রমাণ প্রস্তুত করা। তিনি আরো বলেন, নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যথাযথ পন্থায় তা সমাধানের চেষ্টা করা হলে আল্লাহ তা'আলা মুজতাহিদের জন্য সে ব্যাপারে সঠিক পন্থা উন্মুক্ত করে দিবেন। ইবনুল আরাবীর উক্তি এখানেই শেষ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোনো লোকের ইসলাম সুন্দর করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে অনর্থক কথা বলা বাদ দেয়া"।[২৯২] ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমামগণ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের হুকুম প্রত্যাখ্যান করবে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কোনো দলীলের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের তাবীল করবে, তার জন্য সঠিক কথা বর্ণনা করা হবে। যাতে করে সে ভুল পথ বর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা যা করেন, সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না। কেননা তার সকল কাজই হেকমত, রহমত ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। তা যে শুধু প্রতাপশালী ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা নয়। যে এ বলে থাকে জাহাম বিন সাফওয়ান ও তার অনুসারীরা।

শাইখের উক্তি: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، "আহলে কিবলার কেউ গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফের বলি না, যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সেই গুনাহয় লিপ্ত হয়"- এ অংশের ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আসবে। ইনশা-আল্লাহ।

২৯২. দেখুন, শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২৬৮।

(৫০) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ"

"তাক্বদীর বিষয়ে যা জানা ও যার উপর ঈমান আনয়ন করা প্রয়োজন উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহর অলীদের মধ্যে যার অন্তর জ্যোতিদীপ্ত তার জন্য এতটুকু জানাই প্রয়োজন। আর এটিই হচ্ছে জ্ঞানে সুগভীর প্রজ্ঞাবানদের স্তর। ইলম দু'প্রকার। (১) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান।[২৯৩] (২) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান নয়।[২৯৪] বিদ্যমান ইলমকে অস্বীকার করা যেমন কুফুরী, অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবী করাও তেমনি কুফুরী। বিদ্যমান ইলম কবুল করা, আর অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষন করা হতে বিরত থাকা ব্যতীত কারো ঈমান সুদৃঢ় বিশুদ্ধ হবে না।

---

২৯৩. আর তা হচ্ছে শরী'আতের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা জনিত জ্ঞান।

২৯৪. গ্রন্থকার এখানে অবিদ্যমান ইলম বলতে গায়েবী জ্ঞান বুঝিয়েছেন। যা একমাত্র আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট। কোনো মানুষ সেটার দাবী করলে কাফের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

"আর তার কাছেই রয়েছে গায়েবের জ্ঞান, যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না"। *(সূরা আল-আনআম: ৫৯)* অনুরূপ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"বলো, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউই গায়েব জানে না"। (সূরা আন-নামল: ৬৫) অনুরূপ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া আর তা কেউ জানে না। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন"। (সূরা লুকমান: ৩৪)

অনুরূপভাবে এতদসংক্রান্ত আরও বহু হাদীছ রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না; যদিও তিনি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ এবং রসূলদের নেতা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্যরা তো মোটেই জানার কথা নয়। বস্তুত রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ জ্ঞানের কিছুই জানতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাকে তা হতে কিছু জানাতেন। এ জন্যই আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উপর অপবাদ দেওয়ার বিষয় নিয়ে লোকেরা যখন বলাবলি করছিল তখন তিনি অহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্রতার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো এক সফরে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হার হারিয়ে গেলে তিনি বেশ কয়েকজনকে সেটার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। সেটা কোথায় আছে সেটা জানতে পারেননি, অবশেষে যখন উট দাঁড় করানো হলো তখন তারা হারটিকে উটের নিচে দেখতে পেল। আর কুরআন ও সুন্নাহয় এ বিষয়ে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আর গায়েবী জ্ঞানের অন্যতম হচ্ছে, তাকদীরের জ্ঞান, যা আল্লাহ তার সৃষ্টির কাছে পর্দাবৃত রেখেছেন। সেটাও কোনো সৃষ্টিই তা জানতে পারে না।

.....

ব্যাখ্যা: ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ এখানে فهذا দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইসলামী শরী'আত আক্বীদাহ ও আমল সংক্রান্ত যেসব বিষয় নিয়ে এসেছে এখানে তা উদ্দেশ্য। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীদের স্তর বলতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে জানা উদ্দেশ্য। সৃষ্টির নিকট অবিদ্যমান ইলম বলতে তাক্বদীরের ইলম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি থেকে আড়াল করে ইহাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টিকে এর পিছনে ছুটতে নিষেধ করেছেন।

সৃষ্টির নিকট বিদ্যমান ইলম বলতে শরীয়তের أصـــول وفروع তথা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত ইলম উদ্দেশ্য। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতদসংক্রান্ত যেসব ইলম নিয়ে এসেছেন, তা থেকে যে ব্যক্তি কোনো কিছু অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং ইলমে গায়েব থেকে যে ব্যক্তি কোনো কিছু দাবী করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তার মনোনীত কোনো রসূল ব্যতীত। *(সূরা জিন: ২৬-২৭)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

"কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা তিনিই জানেন।[২৯৫] কেউ জানে না, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, সে কোন্ যমীনে মৃত্যু বরণ করবে"। *(সূরা লুকমান: ৩৪)*

তাক্বদীর ও কিয়ামতের জ্ঞান আমাদের নিকট থেকে গোপন রাখার অর্থ এ নয় যে, তাতে কোনো হেকমত নেই। আমরা তা জানি না, -এর অর্থও এটি নয় যে, তাতে কোনো হেকমত থাকা অনাবশ্যক। আপনি কি দেখেন না যে, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, কীট-পতঙ্গ সৃষ্টি করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার হেকমত আমাদের নিকট অস্পষ্ট। আমরা কেবল এগুলো ক্ষতিকর

২৯৫. যদি প্রশ্ন করা হয় আজকাল ডাক্তারগণও তো বলে দিতে পারে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান আছে? না মেয়ে সন্তান? উত্তর হল সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার পরই ডাক্তারগণ যন্ত্রের সাহায্যে তা বলতে পারে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা বলতে পারে না। তাছাড়া ডাক্তারগণ শুধু ছেলে না মেয়ে এটি বলতে পারে। সন্তান সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে? তার স্বভাব-চরিত্র ভালো হবে না মন্দ হবে? সে কি ধনী হবে না ফকীর হবে? এ সমস্ত বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মেঘ দেখে আমরা বলতে পারি বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বৃষ্টি হবেই, নিশ্চিতরূপে এ কথা কেউ বলতে পারে না।

বলেই জানি। এগুলো ক্ষতিকর বলেই এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেন নি। এটি বলাও ঠিক নয় যে, এগুলো সৃষ্টির পিছনে এমন কোনো হেকমত নেই, যা আমাদের নিকট অস্পষ্ট রয়েছে। কেননা কোনো জিনিস সম্পর্কে ইলম না থাকা তার অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ নয়।

(৫১) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ"

আর আমরা লাওহে মাহফুযে ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি কলমের উপর। আর যা আল্লাহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তার সবকিছুতেই আমরা বিশ্বাস করি।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ "বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ" *(সূরা বুরুজ:২১-২২)।*

হাফেয আবুল কাসেম আত্ তাবারানী স্বীয় সনদে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء»

আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুয। সাদা মুক্তা দিয়ে তিনি এটি তৈরী করেছেন। তার উভয় পার্শ্ব তৈরী করা হয়েছে লাল রং এর হিরা দিয়ে। কলমটি হচ্ছে নূরের তৈরী, কালিও নূরের। তার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান-যমীনের মধ্যকার প্রশস্ততার সমপরিমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে দৈনিক তিনশ ষাট বার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার সময় কাউকে জীবিত রাখেন (কোনো না কোনো বস্তু সৃষ্টি করেন), কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা চান তাই করেন"।[২৯৬]

২৯৬. হাদীছটি যঈফ, দেখুন: শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং-২৭০।

লাওহে মাহফুয বলতে সে বিশাল সৃষ্টি উদ্দেশ্য, যাতে তিনি সমস্ত সৃষ্টির তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। এখানে কলম বলতে সেই কলম উদ্দেশ্য, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তা দ্বারা লাওহে মাহফুযে সৃষ্টিকূলের তাক্বদীর লিখেছেন। সুনানে আবু দাউদে উবাদাহ বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«إن أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: يا رب مَا ذا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقادير كل شيئ حتى تقوم الساعة»

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে কলমকে আদেশ করলেন যে, লিখো। কলম বললো, হে আমার রব! আমি কী লিখবো? আল্লাহ তা'আলা বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাক্বদীর লিখে ফেলো"।[২৯৭]

কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি কি না এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ

কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি না কি আরশ সর্বপ্রথম সৃষ্টি এ ব্যাপারে আলেমগণ থেকে দু'টি কথা বর্ণিত হয়েছে। হাফেয আবুল আলা আল-হামাদানী এ মত দু'টি উল্লেখ করেছেন। এ মত দু'টির মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে কলমের পূর্বে আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء»

"আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন তার আরশ ছিল পানির উপর"।[২৯৮]

এখানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আরশ সৃষ্টির পর তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর কলম সৃষ্টি করার সময় তাক্বদীর লেখা হয়েছে। উবাদাহ বিন সামেত রাদ্বিয়াল্লাহুর হাদীছ দ্বারা এটি সাব্যস্ত।

---

২৯৭. হাদীছটি ছ্বহীহ। দেখুন: শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং-২৭১।

২৯৮. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩১৯১।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন..." পুরো হাদীছ মিলে বাক্য মাত্র একটি হতে পারে আবার দু'টিও হতে পারে। বাক্য যদি একটি হয়, তাহলে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে তাকে প্রথম আদেশ দিলেন, লিখো।

এ হাদীছের শব্দ থেকে বুঝা যায়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ এখানে اولَ শব্দের লাম বর্ণের উপর যবর এবং القلم শব্দের মীম বর্ণের উপর যবর দিয়ে পড়া থেকে বুঝা যায় বাক্য মাত্র একটি। আর যদি বাক্য দু'টি হয়, তাহলে এখানে اولَ শব্দের লাম বর্ণের উপর পেশ এবং القلم শব্দের মীম বর্ণের উপরও পেশদিয়ে পড়তে হবে। এতে করে অর্থ হবে কলএ প্রথম সৃষ্টি । এতে করে উবাদাহ ইবনে সামেত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হয়। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের হাদীছে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে যে, তাক্বদীর সৃষ্টির আগেই আরশ ছিল। আর তাক্বদীর ও কলম একসাথেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«لما خلق الله القلم قال له: اكتب»

"আল্লাহ তা'আলা যখন কলম সৃষ্টি করলেন, তখন কলমকে বললেন, লিখো"।[২৯৯]

সুতরাং কলএ হলো প্রথম কলম, সর্বোত্তম কলম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কলম। একাধিক মুফাস্সির বলেন, এটি হলো সেই কলম, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সূরা কলমের শুরুতেই শপথ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾

"নূন, শপথ কলমের এবং লেখকরা যা লিখে চলেছে তার"। *(সূরা কালাম: ১-২)*

দ্বিতীয় কলম হলো, অহী লেখার কলম। এর মাধ্যমে নাবী-রসূলদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর অহী লেখা হয়। এ কলমের ধারকরাই সৃষ্টিজগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। দুনিয়ার সমস্ত কলম তাদের কলমের সেবক।

মিরাজের রাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত উপরে উঠানো হয়েছিল যে, তিনি কলম দিয়ে অহী লেখার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। এ কলমগুলো দিয়েই আল্লাহ

২৯৯. ত্বারানী, মু'আজুম কাবীর

তা'আলার ঐসব অহী লেখা হয়, যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছু পরিচালনা করেন। উর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতের যাবতীয় বিষয়ের অহী এ কলমগুলো দিয়েই লেখা হয়।[৩০০]

---

৩০০. পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম আলবানী (রহি.) এমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা নিম্নের ছ্বহীহ হাদীছগুলো দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে কলম। অতঃপর কলমকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে বললেন"। *{(আবু ইয়ালা (১/১২৬) আল-আসমা ওয়াস ছ্বিফাত লিল-বায়হাকী ২৭১), সিলসিলা সাহীহা, হাদীছ নং- ১৩৩)}* তিনি আরো বলেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন, লিখো। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বস্তুর তাকদীর লিখো"। (দেখুন: আবু দাউদ, তিরমিজী, বায়হাকী এবং অন্যান্য) মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম ইবনুল আরাবী বলেন, قبل القلم لم يكن شيء إلا هو سبحانه কলমের পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (দেখুন আরেযাতুল আহওয়াযী) অপর পক্ষে আরেক দল আলেমের মতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর আরশ। আল্লামা ইবনে তাইমীয়া এবং অন্যান্য আলেম থেকে এই মত পাওয়া যায়। তাদের দলীল হচ্ছে, ইমরান বিন হুসাইন থেকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»

আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার আরশ ছিল পানির উপর। তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিস লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করলেন। *(বুখারী, হাদীছ নং- ৩১৯১)* উপরের হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে আবার কেউ কেউ পানি সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী মত। কারণ এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট হাদীছ হলো, আবু রাযীন বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম,

«أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخلق عرشهُ عَلَى الْمَاءِ»

সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, বাদলের উপর ছিলেন। যার উপর-নীচে কোনো বায়ু ছিল না। অতঃপর তিনি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ثم خلق عرشه على الماء "অতঃপর তিনি তার আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করেছেন। (আহমাদ ২৬/১০৮) উপরোক্ত হাদীছকে ইমাম তাবারী, তিরমিযী, ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে তাইমীয়া বিশুদ্ধ বলেছেন। (আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন)।

প্রথম পর্যায়ের কতিপয় মাখলুক বা সৃষ্টি: بعض الأمثلة من أوائل المخلوقات

এ কথা সত্য যে, আরশ, কুরসী, লাওহে মাহফুয, পানি, আসমান, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কোনো ক্রমেই উপরোক্ত সৃষ্টিসমূহের পূর্বে সৃষ্টি হয়নি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নন। কলমও প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টি। তবে আমরা যে কলম দিয়ে লেখি সেই কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি নয়; বরং যে কলম দিয়ে লাওহে মাহফুয লেখা হয়েছে সেটিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে কোন ছ্বহীহ দলীল না থাকায় তা মুসলিমের আকীদাহ হতে পারে না। তাই উপরোক্ত হাদীছগুলো এবং অন্যান্য ছ্বহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী। ইমাম মালেক (রহি.) বলেন,

«ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله أو يرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم»

(৫২) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ، لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ –لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ, وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا– لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তা যদি সকল সৃষ্টি একত্রিত হয়েও রোধ করতে চায় তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে, তাতে যে বিষয় সংঘটিত হবার কথা তিনি লিখেননি, সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে পারবে না। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।

.....

ব্যাখ্যা: জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুম আগমন করে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের দীনের বিষয়গুলো এভাবে বর্ণনা করুন যে, মনে করবেন আমাদেরকে কেবল এ মাত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আজ কীসের জন্য আমল করবো? ঐ বিষয়ের জন্য যা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং তাক্বদীর নির্ধারণ হয়ে গেছে? নাকি আমরা ঐ বিষয়ের জন্য আমল করছি, যা ভবিষ্যতে নির্ধারণ করা হবে? জবাবে তিনি বললেন, না। বরং তোমরা ঐ বিষয়ের জন্য আমল করছো, যা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং তাক্বদীর নির্ধারণ হয়ে গেছে।[৩০১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)মা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসাছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন,

يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الأقلام، وجفت الصحف

"আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখবো। তুমি আল্লাহর হকসমূহের সংরক্ষণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর অধিকার সমূহের হেফাযত করো। তাহলে তুমি আল্লাহকে সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন কেবল আল্লাহর কাছেই

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সকল কথাই গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ আমাদের কারো কথা গ্রহণ করা যেতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে। তবে এই কবরের অধিবাসী ব্যতীত। এই কথা বলে তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।

৩০১. ছ্বহীহ: শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২৪০।

চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রাখ! দুনিয়ার সব মানুষ মিলেও যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তাথাপি তারা শুধু তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। আর যদি তারা মিলিত হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তথাপি তারা শুধু সেই পরিমাণ ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর লিখে দিয়েছেন। যা কিছু লেখার ছিল তা লেখার পর কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পুস্তকে লেখার পর কালি শুকিয়ে গেছে"।[৩০২] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাসান ছ্বহীহ বলেছেন।

তিরমিযী ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে হাদীছটি এভাবে এসেছে, তুমি আল্লাহর হকসমূহের হেফাযত করো, তাহলে আল্লাহকে সামনে পাবে। স্বাচ্ছন্দের সময় তুমি আল্লাহকে চিনবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে কষ্টের সময় চিনবেন। তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা ঘটারই ছিল না। আর যা ঘটেছে তা তোমার জীবনে ঘটারই ছিল। জেনে রাখো! সবরের সাথেই বিজয়। আপদ-বিপদের পরেই মুক্তি এবং দুঃখের পরই সুখ"।

উপরোক্ত হাদীছগুলো এবং অন্যান্য হাদীছের মধ্যে কলমকে বহুবচন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল লাওহে মাহফুয যে কলম দিয়ে লেখা হয়েছে সেই প্রথম কলমটি ব্যতীত তাক্বদীর সমূহ লেখার আরো অনেক কলম রয়েছে।

তাক্বদীর লেখার স্তরসমূহ:

মোটকথা ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, কলম দিয়ে তাক্বদীর লেখার স্তর মোট চারটি।

(১) সমস্ত সৃষ্টির তাক্বদীর একসাথে লিপিবদ্ধ করণ। ইতিপূর্বে লাওহে মাহফুয সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করার সময়ও বনী আদমের তাক্বদীর লেখা হয়েছে। এ পর্যায়ে সমস্ত আদম সন্তানের তাক্বদীর লেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনের একাধিক আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের আমল, রিযিক, হায়াত, সৌভাগ্যবান হওয়া এবং হতভাগ্য হওয়ার বিষয়টি তাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করার সময়ই নির্ধারণ করেছেন।

(৩) মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে সন্তান তৈরী হওয়ার সময় ফেরেশতা পাঠানো হয়। ফেরেশতা সেখানে রূহ ফুঁকে দেন এবং ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার আদেশ করা হয়।

---

৩০২. মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মিশকাত, হাদীছ নং-৫৩০২।

(ক) রিযিক লেখার আদেশ করা হয়।

(খ) বয়স লেখার আদেশ করা হয়।

(গ) আমল লেখার আদেশ করা হয় এবং

(ঘ) সৌভাগ্যবান হবে না কি হতভাগ্য হবে, তা লেখার আদেশ করা হয়। ছ্বহীহ হাদীছসমূহে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

(৪) বান্দা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তখন সম্মানিত লেখকদের হাতে সংরক্ষিত কিতাবসমূহেও বান্দার আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। বান্দা যা করে ফেরেশতাগণ তা লিখে ফেলেন। কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত।

সুতরাং বান্দা যখন জানতে পারবে যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে, তখন কেবল একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾ "তোমরা মানুষকে ভয় করো না। কেবল আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা মায়েদা: ৪৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ "তোমরা আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আল-বাকারা: ৪০)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ "তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আল-বাকারা: ৪১)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

"আর সফলকাম তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে"। *(সূরা নূর: ৫২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ "একমাত্র তিনিই তাকওয়া বা ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমাকারী"। *(সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৫৬)*

কুরআনে এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। মানুষ একা বাস করতে পারে না, কারণ সে তার আশপাশের অনেক জিনিসকে ভয় করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই একাধিক জিনিসকে ভয় করে। যদিও তিনি অনুসরণীয় রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন। তিনি তার নিজের উপর এবং তার নাগরিকদের উপর একাধিক বিষয়ের আশঙ্কা ও ভয় করেন। সুতরাং জানা গেল যে, আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো জিনিসকে ভয় করি। যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আল্লাহর কোনো না কোনো সৃষ্টিকে ভয় করে।

ঐ দিকে প্রত্যেক সৃষ্টিই প্রত্যেক সৃষ্টিকে ভালোবাসতে পারে না। ঘৃণা করার ক্ষেত্রেও কথা একই। একই সৃষ্টিকে কেউ ভালোবাসে আবার কেউ তাকে ঘৃণা করে। কোনো মানুষের পক্ষেই দুনিয়ার সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিষয়টি এ যে, কেউ এর শেষ সীমায় পৌঁছতে পারে না। সুতরাং যে কাজ করলে আপনি উপকৃত হবেন, তাই করা আবশ্যক। এ ছাড়া অন্যান্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত করবেন না। সমস্ত সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে এ ব্যাপারে আদেশও করা হয়নি। স্রষ্টা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ, তাই তাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। এর আদেশও আপনাকে করা হয়েছে। মাখলুককে ভয় করে লাভ কী? কোনো মাখলুকই আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার কোনো উপকারে আসবে না।

আল্লাহর আযাব হতে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং কোনো বান্দা যখন তার রবকে ভয় করবে, তখন তার মাওলাই তাকে মানুষের কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ানের কাছে লিখে পাঠালেন, যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং মানুষকে তার উপর সন্তুষ্ট করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে যাবে তার প্রশংসাকারী অচিরেই নিন্দুকে পরিণত হবে।[৩০৩] হাদীছটি মারফু ও মাওকুফ উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করবে, আল্লাহ তাকে মানুষের কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর বিলম্বে হলেও মানুষেরা তার উপর সন্তুষ্ট হবে। কেননা মুত্তাকীদের শেষ পরিণতি ভালো হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন। মানুষেরাও তাকে ভালোবাসে।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى يا جِبْرِيلَ: إِنِي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ»

"আল্লাহ্ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আমি অমুককে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো। তাই জিবরীলও তাকে ভালোবাসেন। তারপর জিবরীল আকাশের অধিবাসীকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুককে

৩০৩. ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের টিকাসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২৭৮।

ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশবাসীও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর যমীনেও তার জন্য কবুলিয়াত স্থাপন করা হয়”।[৩০৪]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন কাউকে ঘৃণা করেন, তখনও অনুরূপ বলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই ভয় করে। হয় আল্লাহকে ভয় করে নতুবা আল্লাহর কোনো না কোনো সৃষ্টিকে ভয় করে।

মানুষকে ভয় করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই হয় বেশী। এ ক্ষতি বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করা যায়। আল্লাহ তা‘আলাই ভয়ের যোগ্য। তিনিই ক্ষমার অধিকারী। তিনিই গুনাহ ক্ষমা করেন। কোনো মানুষই অন্য মানুষের গুনাহ ক্ষমা করার অধিকার রাখে না। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করারও ক্ষমতা রাখে না। তিনিই আশ্রয় দেন। তাকে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করে, আল্লাহ ছাড়া সে অন্য কারো কাছে মুখাপেক্ষী হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

“আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে উদ্ধারের পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন”। *(সূরা আত-তালাক: ২-৩)*

আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকীদের দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন যে, মানুষেরা যেসব সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়ে থাকে, তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে ঐ স্থান থেকে রিযিক প্রদান করবেন, যার কল্পনাও তারা করতে পারে না। তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাদের তাকওয়ার মধ্যে দোষ-ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং তার নিকট তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট”। *(সূরা আত-তালাক: ৩)* অর্থাৎ আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাকে অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী করবেন না।

আল্লাহর উপর ভরসা করা উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও চেষ্টা করার পরিপন্থি নয়

কিছু মানুষ মনে করে, জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থি। তারা আরো বলে সবকিছু যেহেতু তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে, তাই উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের ধারণা বাতিল। উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে

৩০৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৩২০৯, ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৩৭।

ফরয, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুস্তাহাব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈধ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাকরুহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে হারাম। এ বিষয়টি যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম ভরসাকারী। তারপরও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাথায় হেলমেট পরিধান করতেন এবং জীবিকা তালাশের জন্য বাজারে যেতেন। কাফেররা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো,

﴿مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ سورة الفرقان:٧

এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়? *(সূরা আল-ফুরকান ২৫:৭)*।

এ জন্যই অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন, যারা মনে করে জীবিকার জন্য চেষ্টা করা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার পরিপন্থি, তারা রিযিকের জন্য অপর মানুষের কাছে হাত পাতে। মানুষের দান-খয়রাত ও হাদীয়া-উপঢৌকনের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনা করে। কখনো চাঁদাবাজি ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ অপহরণ করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ের আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

"আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যা চান কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তার কাছেই আছে"। (সূরা রা'দ: ৩৯)

এর ব্যাখ্যা করার সময় কিছু কথার প্রতি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ "তিনি প্রতিদিন কোন না কোনো মহান কার্যে রত আছেন"। *(সূরা আর-রাহমান: ২৯)*

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম বগবী মুকাতিল থেকে বর্ণনা করে বলেন, আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা শনিবারের দিন কিছুই করেন না। মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন কোনো না কোনো কাজে রত থাকেন, -এর অর্থ হলো তিনি কাউকে সৃষ্টি করেন, জীবন দান করেন, কারো মৃত্যু ঘটান, কারো রিযিকের ব্যবস্থা করেন, কাউকে সম্মান দান করেন, কাউকে অপদস্ত করেন, রোগীকে শিফা দান করেন, কয়েদী মুক্ত করেন, বিপদগ্রস্তকে বিপদ মুক্ত করেন, দু'আকারীর দু'আ কবুল করেন, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং কারো গুনাহ মাফ করেন। এমনি তার সৃষ্টির মধ্যে স্বীয় ইচ্ছায় আরো অনেক কিছু করেন, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

(৫৩) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ"

“যা বান্দার ভাগ্যে-নসীবে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে না আর যা বান্দার নসীবে লেখা আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না।

.....

ব্যাখ্যা: ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা হবেই। তা ঠেকানো অসম্ভব। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন।

ما قضى الله كائن لا محاله... والشقي الجهول من لام حاله

আল্লাহ তা'আলা যা ফয়ছালা করেছেন, তাতো হবেই, তা ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। হতভাগ্য মূর্খ হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজের অবস্থাকে দোষারোপ করে। অন্য এক কবি বলেছেন,

اقنع بما ترزق يا ذا الفتى... فليس ينسى ربنا نمله

إن أقبل الدهر فقم قائما... وإن تولى مدبرا نم له

হে যুবক! তোমার জন্য যে রিযিক বণ্টন করা হয়েছে, তা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। আমাদের রব একটি পীপড়াকেও খাওয়াতে ভুলেন না। মহাকাল যখন বিপদাপদ নিয়ে আসে, তখন তুমি তাতে দৃঢ়পদ থাকো। আর যখন তা চলে যায়, তখন নির্বিঘ্নে নিদ্রায় যাও।

(৫৪) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ، وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وأرضه"

বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব হতে অবহিত। অতএব, তিনি সেটাকে অকাট্য ও অবিচল তাক্বদীর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আসমান ও যমীনের কোনো মাখলুক এটাকে বানচালকারী অথবা এর বিরোধিতাকারী নেই, অনুরূপ একে কেউ অপসারণ অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না, একে সংকোচন কিংবা পরিবর্ধনও করতে পারবে না।

.....

ব্যাখ্যা: ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবগত। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিসমূহ অস্তিত্বে আনয়ন করার আগেই তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«قدر اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তার আরশ ছিল পানির উপর"।[৩০৫]

সুতরাং বান্দার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। যে সময় যা সৃষ্টি হবে বলে তিনি অবগত আছেন, তা যথাসময়ে সৃষ্টি হবে। তার পরিপূর্ণ হেকমতের দাবি অনুযায়ীই সবকিছু যথাসময়ে অস্তিত্বে আসবে। সুতরাং সবকিছুই তার অনাদি-অনন্ত ইলম অনুপাতেই সংঘটিত হবে। কেননা সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ দেখে নিশ্চিতভাবেই অবগত হওয়া যায় যে, তা ঐ এক মহাজ্ঞানী দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, যিনি পূর্ব থেকে এগুলো সৃষ্টি করার জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [سورة الملك: ١٤]

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় অবগত" *(সূরা আল মূলক ৬৭:১৪)।*

মুতাযেলা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার অনাদি-অনন্ত-অবিনশ্বর ইলমকে অস্বীকার করে। তারা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে ঐ সময় জানতে পারেন যখন বান্দা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কর্তৃক ক্রিয়া-কর্ম সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা তাক্বদীর অস্বীকার করে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইলম ছিফাতটি দ্বারা যুক্তি পেশ করো। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার ইলমকে স্বীকার করে, তাহলে তারা পরাজিত হবে। আর যদি ইলমকে অস্বীকার করে, তাহলে তারা কাফেরে পরিণত হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, অমুক বান্দা সক্ষম। সে তার ক্ষমতাধীন কার্য সম্পাদন করবে। বান্দা কাজটি করার পর তিনি প্রতিদান দিবেন। আর অমুক বান্দা কাজটি করতে সক্ষম। কিন্তু করার ক্ষমতা থাকার পরও সে তা করবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন। তিনি তাকে শাস্তি এ জন্য দিবেন যে, সে ক্ষমতা থাকার

---

৩০৫. ছ্বহীহ বুখারী ৩১৯১, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র, মুসলিম ২৬৫৩।

পরও কাজটি করেনি। আল্লাহ তা'আলা এটি আগেই জেনেছেন। আর যে বান্দা কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশও দেন না। যে কাজ সে করতে পারে না, তার কারণে তিনি শাস্তিও দেন না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কি আবশ্যক হয় যে, বান্দা আল্লাহর ইলম পরিবর্তন করতে সক্ষম? কেননা আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, কোনো কোনো বান্দা আমল করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও আমল করবে না। ঐদিকে যে বান্দা কাজ করার ক্ষমতা রাখে সে কি আল্লাহ তা'আলার ইলমকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না?

আসলে এ ধরণের প্রশ্ন করা ভুল। কারণ কাজ করার ক্ষমতা রাখা হতে আবশ্যক হয় না যে, সে আল্লাহ তা'আলার ইলম পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখে। বান্দার দ্বারা কোনো কর্ম সম্পাদিত হলেই এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে যে, এতে আল্লাহর ইলম পরিবর্তন হয়েছে। বান্দার দ্বারা যে কাজ হয় আল্লাহ আগে থেকেই তা জানেন। এমন নয় যে, তা হবে না বলে নির্ধারিত ছিল। যে কাজটি হবে না বলে আল্লাহ আগে থেকেই জানেন তা বাস্তবায়ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং যা সংঘটিত হয়, তা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ আগে থেকেই জানেন। আর যা সংঘটিত হয় না, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানেন যে, তা সংঘটিত হবে না। আর আমরা আল্লাহর ইলম থেকে কিছুটা কেবল তখনই জানতে পারি, যখন তা থেকে কিছু বাস্তবে প্রকাশিত হয়। বাস্তবে যা সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর ইলম মোতাবেকই হয়। সুতরাং কোনো কিছু হলেই যে তা আল্লাহর ইলমকে পরিবর্তন করে হয়েছে, এমন ধারণা করা ঠিক নয়। বরং যা সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে, তা কেবল আল্লাহর ইলম অনুপাতেই হচ্ছে।

আর যে বান্দা কাজ করেনি, সেও এমন কিছু করেনি, যাতে বুঝা যায় সে আল্লাহর ইলমকে পরিবর্তন করেছে। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে এমন কাজ করতে সক্ষম ছিল, যা সে করেনি। যদি কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা হবে বলেই জানতেন। এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, তিনি হবে না বলে জানতেন।

আর যখন বলা হবে কোনো কাজ সংঘটিত না হলেই আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, তা হওয়ার ছিল না। বান্দা যদি কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলার ইলম পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না কেন?

এ কথা ঠিক নয়। বরং বান্দা কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও কখনো তা সম্পাদন করে না। যদি সম্পাদন করে, তাহলে সম্পাদন হবে বলেই আল্লাহ জানেন। সুতরাং বান্দার ক্ষমতাধীন কাজ যখন সম্পাদিত হয়, তখন জানা বিষয়ই সম্পাদিত হয়। মুতাযেলারা নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অবগতি ছাড়াই বান্দার কর্ম সম্পাদিত হয়। এটি একটি অসম্ভব নির্ধারণ। কথাটি মূলত এরূপ যেমন ধরুন কেউ বলল, কাজটি সংঘটিত হবে এবং হবে না। অর্থাৎ এ কথার বাস্তবতা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলার অবগতি ছাড়া বান্দার কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এ ধরণের কথা পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসকে একত্র করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করার শামিল। এটি সম্ভব নয়। এ ধরণের চিন্তা

মুতাযেলাদেরকে হয়রান করে ফেলেছে। এরূপ কল্পনা থেকেই মুতাযেলারা আল্লাহ তা'আলার ইলমকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

যদি বলা হয়, বান্দার পক্ষে যখন আল্লাহর অবগতি ব্যতীত কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, তাহলে বুঝা গেল, বান্দা কাজ করতে মোটেই সক্ষম নয়। এর জবাবে লেখক বলেছেন যে, অসম্ভব কথাটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এমনটি নয় যে, বান্দার ক্ষমতা না থাকার কারণে কিংবা অপারগ হওয়ার কারণে অথবা কাজটি বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে সংঘটিত হয়নি। বরং কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং বান্দার ক্ষমতাধীন ছিল। বরং যে কাজটি বাস্তবায়ন হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই অবগত থাকেন যে, তা বাস্তবায়ন হবেই। আর যা সংঘটিত হয় না তা সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত থাকেন যে, তা সংঘটিত হবে না।

সুতরাং বান্দা কাজ করুক বা না করুক, করার ক্ষমতা তার অবশ্যই থাকে। এটি একটি পরিক্ষিত বিষয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে এটি অনুভব করি। যে কাজটি বান্দা করেছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, সে তা করবে। আর বান্দা যেটি করেনি, সে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, সে তা করবে না। মোট কথা, যা কিছু হয়, তা আল্লাহর ইলম অনুযায়ী হয়। উভয় অবস্থাতেই ক্ষমতা বিদ্যমান।[৩০৬]

---

৩০৬. উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার আগেই জানতেন যে, তিনি তাকে সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ তা'আলা যা জানেন তাই সৃষ্টির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু তার অর্থ কি এ নয় যে, তিনি তার কর্ম বর্জন করতে সক্ষম নন? অবশ্যই সক্ষম। বর্জন করার ক্ষমতা তার অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন যে, কাজটি হবে। এমনি আল্লাহ তা'আলা যে কাজটি না করার ইচ্ছা করেন, তা না করতেও তিনি সক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজের ইচ্ছাতেই তা করতে চান না। বান্দাদের কর্মের ব্যাপারেও একই কথা। বান্দারা যা করে, তা তারা না করারও ক্ষমতা রাখে। আর যা তারা করে না, তা করার ক্ষমতা রাখে।

বান্দা কী করবে কিংবা করবে না, -তা আল্লাহ তা'আলা জানেন বলেই বান্দাকে কর্মের উপর বাধ্য করা আল্লাহর উপর আবশ্যক নয়। কাদারীয়া এবং জাবরীয়ারা কারো কথার পক্ষে কোনো দলীল নেই। আমাদের সকলের উপর এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে অবগত। আল্লাহ তা'আলার ইলম সাব্যস্ত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি বান্দাদেরকে বাধ্য করেন। যেমন জাবরীয়ারা মনে করে থাকে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু জানেন, তাই তিনি বাধ্য করেন। তাদের কথা মোতাবেক বান্দা সম্পূর্ণ বাধ্যগত।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইলম এক জিনিস এবং বান্দাকে কাজ করার যে শক্তি দিয়েছেন তা অন্য জিনিস। বান্দা কাজ করবে কি করবে না, এটি সে জানে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু নির্ধারণ করেন তখন তিনি জানেন যে তা হবে। আর যে ব্যাপারে নির্ধারণ করেন যে তা হবে না, তা কখনো সংঘটিত হয় না।

আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত বান্দাকে কাজ-কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। তা না হলে মানুষের হিসাব নেয়া, ছাওয়াব দেয়া, পরীক্ষা করা সম্ভব হতো না। বান্দার কাজে তার যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকতো, তাহলে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং জিনে ধরা রোগীর আচরণ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির নড়াচড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো না। জাবরীয়াদের ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তা না হলে তাকে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ "যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক" *(সূরা কাহাফ ১৮:২৯)।*

(৫৫) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا}. [الفرقان:٢] وَقَالَ تَعَالَى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الْأَحْزَابِ: ٣٨]

"আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, মারেফতের মূলবস্তু এবং আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ অনুপাত অনুসারে পরিমিতি প্রদান করেছেন। *(সূরা আল-ফুরকান ২৫:২)* **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন, "আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত"** *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৮)*

.....

ব্যাখ্যা: এখানে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইলম-জ্ঞান থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঈমান সম্পর্কে প্রশ্নকারীর জবাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেস্তাদের উপর (৩) তার কিতাব সমূহের উপর (৪) তার রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর"।[৩০৭]

সুতরাং বান্দা যদি ঈমান আনয়ন করে, তাহলে সে ছাওয়াব পাবে এবং কুফুরী করলে শাস্তি ভোগ করবে।

আমাদের বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আমরা নিজেদের জন্য যে কাজ নির্বাচন করি, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। আমরাই আমাদের কাজ নির্বাচন করি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন আমরা কী নির্বাচন করি? আমরা নিজেরা নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখি। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর ইলমকে পরিবর্তন করতে পারি। যেমন বলে থাকে মুতাযেলারা। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে। বান্দার কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই জানেন এর অর্থ এ নয় যে, বান্দা তার কাজ-কর্মে বাধ্যগত, সে অসহায়, তার কোনো স্বাধীনতা নেই এবং সে কোনো কাজ করার ক্ষমতা রাখে না। মুতাযেলাদের এ কথা বাতিল-মিথ্যা। উভয় মতভেদের মাঝখানেই রয়েছে সত্য-সঠিক মত। তা এ যে, বান্দা কাজ করা বা না করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না"।

বান্দা যখন কাজ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে থাকে যে, বান্দা তা করবে। আর বান্দা যখন কাজ করে না, তখন আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে তা করবে না।

৩০৭. ছ্বহীহ মুসলিম ৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

হাদীছের শেষাংশে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে উমার! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে? উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ এবং তার রসূলই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য"।[৩০৮]

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে স্বীকৃতি দানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন না করলে তাওহীদের প্রতি কারো ঈমান এবং আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াতের প্রতি কারো স্বীকৃতি দান পরিপূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করলো যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো স্রষ্টা আছে সে শির্ক করলো। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তার প্রত্যেকটি কর্মের স্রষ্টা সে নিজেই তার অবস্থা কী হতে পারে? এ জন্যই কাদারীয়ারা এ উম্মতের অগ্নিপূজক। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো সুনানের কিতাবসমূহে রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাদারীয়ারা এ উম্মতের অগ্নিপূজক।[৩০৯] তারা যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তাদেরকে দেখতে যেয়ো না। আর তারা যদি মৃত্যু বরণ করে, তাদের জানাযায় শরীক হয়ো না।[৩১০]

ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ হুযায়ফা বিন ইয়ামান থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই অগ্নিপূজক রয়েছে। এ উম্মতের অগ্নিপূজক হলো ঐসব লোক, যারা বলে তাক্বদীর বলতে কিছু নেই। এদের কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়তে যেয়ো না। এদের কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেয়ো না। এরা দাজ্জালের বাহিনী। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে দাজ্জালের সাথে মিলিয়ে দিবেন।[৩১১]

ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাদারীয়াদের সাথে বসো না এবং তাদেরকে আগে সালাম দিয়ো না।[৩১২]

---

৩০৮. ছ্বহীহ মুসলিম ৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

৩০৯. অগ্নিপূজকরা দু'স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তাদের মতে কল্যাণের স্রষ্টা একজন এবং অকল্যাণের স্রষ্টা অন্যজন। এই উম্মতের কাদারীয়ারা যেহেতু বান্দাকে তার কর্মের স্রষ্টা মনে করে, তাই তাদেরকে অগ্নিপূজকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৩১০. হাদীছের সনদ দুর্বল। তবে অনেক সনদে হাদীছটি বর্ণিত হওয়ার কারণে শক্তিশালী হয়েছে। সে হিসাবে হাদিছটি হাসান। দেখুন ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং ২৮৪।

৩১১. হাদীছের সনদ দুর্বল। দেখুন: ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া টিকা নং- ২৮৫।

৩১২. হাদীছের সনদ দুর্বল। দেখুন, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং- ২৮৬।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী আদমের দুই শ্রেণীর লোকদের জন্য ইসলামের কোনো অংশ নেই। এরা হলো মুরজিয়া ও কাদারীয়া।[৩১৩] তবে কাদারীয়াদের ব্যাপারে বর্ণিত মারফু হাদীছগুলো যঈফ। কিন্তু তাদের ব্যাপারে মাওকুফ হিসাবে বর্ণিত হাদীছগুলো ছ্বহীহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান বান্দার তাওহীদকে সুশৃঙ্খল করে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, কিন্তু তাক্বদীরকে মিথ্যায়ন করবে, তার তাওহীদ ছুটে যাবে।[৩১৪] কেননা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আল্লাহ তা'আলার অনাদি-অবিনশ্বর ও চিরন্তন ইলমের প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তিনি তার কালাম ও সৃষ্টিসমূহের তাক্বদীর লেখার মাধ্যমে যেই ইলম প্রকাশ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়নের নামান্তর।

মুশরিক, বেদীন, দার্শনিক এবং আরো অনেকেই মুতাকাল্লিমীনদের বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। যারা বলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তারাও বিভ্রান্ত হয়েছে। এ সবকিছুই তাক্বদীর অস্বীকার করার মধ্যে শামিল। কাদারীয়ারা সকল বিষয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা থাকার কথা অস্বীকার করে। তারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না। বান্দাদের কাজ-কর্মকে তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টি থেকে বের করে দিয়েছে।

তাক্বদীরের বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার দলীল দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে তারাই ভ্রান্ত কাদারীয়া। কাদরীয়াদের নিন্দায় ছাহাবী এবং তাবেঈদের থেকে যেসব কথা এসেছে, তা দ্বারা এসব লোকই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী বিদ'আতী লোক উদ্দেশ্য। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যখন বলা হলো, এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা বলে তাক্বদীর বলতে কিছু নেই। সবকিছুই নতুনভাবে হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোনো কাজই পূর্বে নির্ধারণ করেননি। ইবনে উমার বললেন, তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তাদের থেকে মুক্ত। তারাও আমাদের থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

---

৩১৩. হাদীছের সনদ দুর্বল, দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর তাহকীকসহ শারহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া টিকা নং- ২৮৭। তবে ইমাম তিরমিযী হাদীছের সনদকে হাসান বলেছেন।

৩১৪. যঈফ, দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর টিকাসহ শারহুল আকীদাহ আত্-ত্বহাবীয়া, টিকা নং- ২৮৮।

তাক্বদীরের মূলনীতিসমূহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম অনুযায়ী যে তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন, তাতে অনেকগুলো মূলনীতি রয়েছে।

(১) আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা নির্ধারণ করার পূর্ব থেকেই অবগত রয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্য ইলমে আযালী তথা প্রাক্তন, অনাদি-অনন্ত এবং অবিনশ্বর ইলম সাব্যস্ত। সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার আযালী ইলমকে অস্বীকার করে, তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত।

(২) তাক্বদীর বলতে সমস্ত সৃষ্টির পরিমাণ-পরিণতি ও যাবতীয় অবস্থা এবং সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য-স্বভাব ইত্যাদি উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ سورة الفرقان:٢

"তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন" *(সূরা আল-ফুরকান ২৫:২)*।

সুতরাং সৃষ্টি করার জন্য পরিমাণ ও পরিমাপ নির্ধারণ করা জরুরী। কোনো জিনিসের তাক্বদীর নির্ধারণ করা অর্থ হলো তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করা। অস্তিত্বে আসার পূর্বেই তার পরিমাপ নির্ধারণ করা দরকার। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যেহেতু নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ, অবস্থা ও পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির ছোট-বড় সকল অবস্থাই অবগত রয়েছেন। এতে মুতাযেলাদের একটি সম্প্রদায় ভিন্ন মত পোষণ করেছে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলো জানেন। কিন্তু আংশিক বিষয়সমূহ জানেন না।

তাক্বদীর নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মৌলিক ও আংশিক সবকিছুই জানেন।

(৩) আল্লাহ তা'আলা মাখলুকসমূহ সৃষ্টি করার আগেই বিস্তারিতভাবে সংবাদ দিয়েছেন এবং তা প্রকাশ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই বান্দাদেরকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ দেয়া সম্ভব। বান্দাদের পক্ষে যখন মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার আগেই তা জানা সম্ভব, তাই স্রষ্টার জন্য তা জানা আরো অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি যেহেতু সৃষ্টিকে জানান, তাই কিভাবে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি জানেন না?

(৪) তাক্বদীরের বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তা স্বীয় ইচ্ছাতেই করেন, যা সৃষ্টি করেন, তা তার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেন। এমনটি নয় যে, সৃষ্টি করা তার সত্তার সাথে যুক্ত কোনো বিশেষণ, যা ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

(৫) তাক্বদীরের মাস'আলার মধ্যে এও রয়েছে যে, সৃষ্টিজগৎ অনাদি-অনন্ত ও অবিনশ্বর নয়। প্রথমে এটি ছিল না। পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সৃষ্টির পরিমাণ ও পরিমাপ নির্ধারণ করেন। অতঃপর সৃষ্টি করেন।

(৫৬) ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أفكا أثيما"

অতএব ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে এবং রোগাক্রান্ত অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের (অদৃশ্যের) একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে এবং এ সম্পর্কে সে যা মন্তব্য করেছে তার ফলে সে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীতে পরিণত হয়েছে।

.....

ব্যাখ্যা: জেনে রাখা আবশ্যক যে, অন্তরের রয়েছে জীবন ও মৃত্যু, রয়েছে রোগ ও আরোগ্য। অন্তরের রোগ দেহের রোগের চেয়েও ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾

سورة الأنعام: ١٢٢

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সেকি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারে পড়ে আছে এবং কোনক্রমে সেখান থেকে বের হয় না? *(সূরা আল আন'আম ৬:১২২)*।

অর্থাৎ সে কুফুরীর কারণে মৃত ছিল। অতঃপর ঈমানের মাধ্যমে তাকে জীবিত করেছি। সুতরাং পরিশুদ্ধ জীবন্ত অন্তরের কাছে যখন বাতিল এবং নিকৃষ্ট কাজগুলো পেশ করা হয়, তখন পরিশুদ্ধ অন্তর স্বীয় স্বভাব প্রকৃতির দ্বারাই তা কবুল করতে অস্বীকার করে, তা অপছন্দ করে এবং সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না। মৃত অন্তরের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, সে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী অন্তর যার নেই, সে ধ্বংস হয়েছে। এমনি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে যার অন্তর রোগাক্রান্ত হয়েছে, তার অন্তর যেহেতু দুর্বল, তাই তার কাছে যখনই অবৈধ ভোগের বিষয় পেশ করা হয়, রোগের শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী তখনই সে দিকে ঝুকে পড়ে।

অন্তরের জীবন, মরণ, রোগ ও সুস্থতা

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, অন্তরের রোগ দু'প্রকার: **مَرَضُ شَهْوَةٍ** বা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার রোগ[৩১৫] এবং **ومرض شبهة** বা দীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ ও **وأردؤها مَرَضُ الشُّبْهَةِ** শির্ক-বিদআতে লিপ্ত হওয়ার রোগ।

প্রবৃত্তির অনুসরণের রোগের চেয়ে দীনের মধ্যে সন্দেহ পোষণ ও শির্ক-বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার রোগ অধিক নিকৃষ্ট। আর সন্দেহের রোগসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো তাক্বদীরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পেতে পেতে কখনো কখনো এমন জটিল আকার ধারণ করে যে, মানুষ তা অনুভব করতে পারে না। অন্তরের সুস্থতা ও অসুস্থতা এবং তার কারণসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই অন্তরের রোগ বাড়তে থাকে। কখনো কখনো মানুষের অজান্তেই অন্তর মারা যায়। মৃত অন্তর ওয়ালা মানুষের আলামত হলো, খারাপ কাজ করার পরও তার অন্তর ব্যথিত হয় না এবং সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ও বাতিল আক্বীদাহ পোষণ করেও কষ্ট অনুভব করে না। জীবন্ত অন্তরের জীবনী শক্তি অনুপাতে তার মধ্যে খারাপ জিনিস প্রবেশ করার কারণে তা কষ্ট পায় এবং হক সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেও অন্তর ব্যথিত হয়। কিন্তু মরা অন্তর কিছুতেই ব্যথিত হয় না।

আরবী প্রবাদে বলা হয়েছে **ما لجرح بميت إيلام** মৃত ব্যক্তির শরীর আহত হলেও ব্যথা অনুভব করে না। যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তারা তাদের রোগ সম্পর্কে অনুভব করতে পারলেও এর সুস্থতার জন্য তিক্ত ঔষধ গ্রহণ করা এবং তার উপর ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। রোগাক্রান্ত অন্তরের চিকিৎসার জন্য ঔষধ সেবন করা খুবই কষ্টকর। কারণ এর ঔষধ সেবন

---

৩১৫. শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির রোগে আক্রান্ত অন্তর ওয়ালা লোকেরা সবসময় অশ্লীল কাজের প্রতি আসক্ত থাকে এবং পরনারীর কণ্ঠ শুনলেই তাদের অন্তর সেদিকে ঝুকে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾

"হে নারীগণ! তোমরা চিকন কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। আর তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলো" *(সূরা আহযাব ৩৩:৩২)*। আর যাদের অন্তরে শুবুহাত তথা নিফাকি, শির্ক-বিদআত ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের রোগে আক্রান্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ "তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। *(সূরা আল-বাকারা ২:১০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

"তবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদের পূর্ব অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে" *(সূরা আত-তাওবা ৯:১২৫)* এই আয়াত দু'টিতে অন্তরের সন্দেহের রোগের কথা বলা হয়েছে। এটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট রোগ।

করতে গেলে তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা আবশ্যক। এ ঔষধ গ্রহণ করা নফ্সের জন্য সর্বাধিক কষ্টকর। তবে এর চেয়ে অধিক উপকারী ঔষধ আর নেই।

অন্তরের রোগে আক্রান্ত লোকেরা কখনো ধৈর্যসহকারে তিতা ঔষধ সেবন করে। অতঃপর তাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। ফলে তারা চিকিৎসা গ্রহণের উপর স্থির থাকতে পারে না। কেননা তার ইলম, দূরদর্শিতা ও সবর খুবই দুর্বল। যেমন কেউ এমন পথ অবলম্বন করলো, যা অত্যন্ত ভীতিকর। কিন্তু এ পথ তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ একটি স্থানে নিয়ে যাবে। সে ভালো করেই জানে, সে যদি সবর করে এবং যাত্রা অব্যাহত রাখে, তাহলে অচিরেই ভয় চলে যাবে। ভয়ের পরেই সে নিরাপত্তা লাভ করবে। সুতরাং গন্তব্য স্থানে পৌঁছার জন্য প্রচুর ধৈর্যধারণ করা এবং সফলতা সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। তার ধৈর্য যদি কমে যায় এবং ঈমান যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে সে মাঝ পথ থেকে ফিরে আসবে। সে পথ চলার কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না। বিশেষ করে যখন যাত্রা পথে যখন ভালো বন্ধু পাবে না বা চলার পথে একাকীত্ব অনুভব করবে। সে যদি বলতে থাকে বাকী লোকেরা কোথায় গেল? তারা যেদিকে চলে গেছে, আমারও সেদিকে যাওয়া উচিত। অধিকাংশ মানুষেরই এ অবস্থা। এটিই তাদেরকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু পর্বত প্রমাণ ধৈর্যশীল ও সত্যান্বেষী মুমিন কখনো সত্যের পথের সাথী কম হওয়ার কারণে একাকীত্ব অনুভব করে না। সাথী না থাকলেও সে বিচলিত হয় না। বিশেষ করে যখন সে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম সারির লোকদের সঙ্গী-সাথী ও সমর্থক হওয়ার দিকে নযর দিবে, তখন সে মনোবল ও সৎ সাহস ফিরে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ سورة النساء:٦٩

"আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ঐ সমস্ত লোকের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; তারা হলেন নাবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। কতইনা উত্তম বন্ধু তারা" *(সূরা আন নিসা ৪:৬৯)।*

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আবূ শামা রহিমাহুল্লাহ "الْحَوَادِثُ وَالْبِدَعُ" আল হাওয়াদিছু ওয়াল বিদা" নামক গ্রন্থে কতই না সুন্দর বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিমদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে জামা'আত বলতে হক তথা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তার অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। হকপন্থীদের সংখ্যা যদিও কম হয় এবং তাদের বিরোধীদের সংখ্যা বেশী হলেও তারা জামা'আত। কেননা এ হকের উপরই ছিলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীগণ। তারাই উম্মতে মুহাম্মাদীর হকপন্থী প্রথম জামা'আত। ছাহাবীদের যুগের পরে বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেশী হলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না।

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ! বাড়াবাড়ি ও কট্টরপন্থার মাঝখানেই সুন্নাত। সুতরাং আপনারা সুন্নাতের উপর সবর করুন। আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। পূর্ববর্তী কালে আহলে সুন্নাতের সংখ্যা একদম কম ছিল এবং এখনো তাদের সংখ্যা খুব কম। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকদের সাথে ছিলেন না এবং বিদ'আতীদের বিদ'আতের সাথেও শরীক ছিলেন না। তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাত করার পূর্ব পর্যন্ত সুন্নাতের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন। সুতরাং আপনারাও তাদের মত হয়ে যান। অন্তর রোগাক্রান্ত হওয়ার আলামত হলো তা উপকারী খাদ্য বাদ দিয়ে ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ করে এবং উপকারী ঔষধ বর্জন করে ক্ষতিকর ঔষধ সেবন করে। সুতরাং এখানে চারটি জিনিস রয়েছে।

(ক) উপকারী খাদ্য, (খ) শিফা দানকারী ঔষধ, (গ) ক্ষতিকর খাদ্য, (ঘ) ক্ষতিকর ঔষধ।

পরিশুদ্ধ অন্তর উপকারী খাদ্য ও শিফা দানকারী ঔষধ গ্রহণ করে এবং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ঔষধ পরিহার করে। অসুস্থ অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

অন্তরের জন্য ঈমানের খোরাকই সর্বোত্তম খোরাক, কুরআনের চিকিৎসাই সর্বোত্তম চিকিৎসা। ঈমান ও কুরআন -এ দু'টির মধ্যেই খাদ্য ও চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্যত্র চিকিৎসা অনুসন্ধান করবে সে সর্বাধিক মুর্খ ও গোমরাহ বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ سورة غافر: ٤٤

"এদের বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রোগ মুক্তি স্বরূপ। কিন্তু যারা ঈমান আনে না এটা তাদের জন্য পর্দা ও চোখের আবরণ। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে" *(সূরা হা-মীম সাজদা ৪১:৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ سورة الإسراء: ٨٢

"আমি এ কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং যালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না"। *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮২)* এখানে من হরফে জারটি পূর্বোক্ত বিষয়ের পূর্ণ বিবরণের জন্য এসেছে; কিয়দাংশ বর্ণনার জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ سورة يونس: ٥٧

"হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত" *(সূরা ইউনূস ১০:৫৭)*।

শরীর ও অন্তরের সকল রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কুরআন হলো পরিপূর্ণ চিকিৎসা। কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল রোগ ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। তবে সব মানুষই কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করার যোগ্য নয়।

রোগী যখন ঔষধ সেবন করার সর্বোত্তম পন্থা ব্যবহার করতে শিখবে, অতঃপর পরিপূর্ণ সত্যায়ন, বিশ্বাস, কবুল ও শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করার পর নিজের জন্য তা ব্যবহার করবে, তখন কোনো রোগই তার মোকাবেলা করতে পারবে না। রোগ-ব্যাধির পক্ষে আসমান-যমীনের প্রভুর কালামের মোকাবেলা করা কিভাবে সম্ভব!! আল্লাহর কালাম যদি পাহাড়ের উপর নাযিল হতো, তাহলে তা পাহাড়কে বিদীর্ণ করে ফেলতো, যমীনের উপর নাযিল হলে যমীনকে ফাটিয়ে ফেলতো। অন্তর ও শরীরের রোগসমূহের প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার নির্দেশনা কুরআনে রয়েছে। যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন তার জন্য কুরআনের মধ্যেই সকল রোগ ও তার কারণ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও রয়েছে। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما

নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে। অর্থাৎ ধারণার বশবর্তী হয়ে গায়েবী বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে একটি গুপ্ত গায়েবী বিষয় উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে। কেননা তাক্বদীরের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে একটি গুপ্ত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। যে এ বিষয়ে গবেষণা করতে যাবে, সে গায়েবী বিষয় অবগত হওয়ার চেষ্টাকারী হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ سورة الجن:٢٦-٢٧

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তার মনোনীত কোন রসূল ব্যতীত। *(সূরা আল-জিন ৭২:২৬-২৭)* সুতরাং তাক্বদীর তথা গায়েবী বিষয়ে মন্তব্যকারী মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৯. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১২. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৯. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০.মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৮. ছ্বিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪০. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৪১. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৪২. উসূলুস সুন্নাহ -

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪৩. লুম'আতুল ই'তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাক্বদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৪৪. 'ইতিক্বদ আইয়াম্মাতিল হাদীছ- আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৪৫. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]